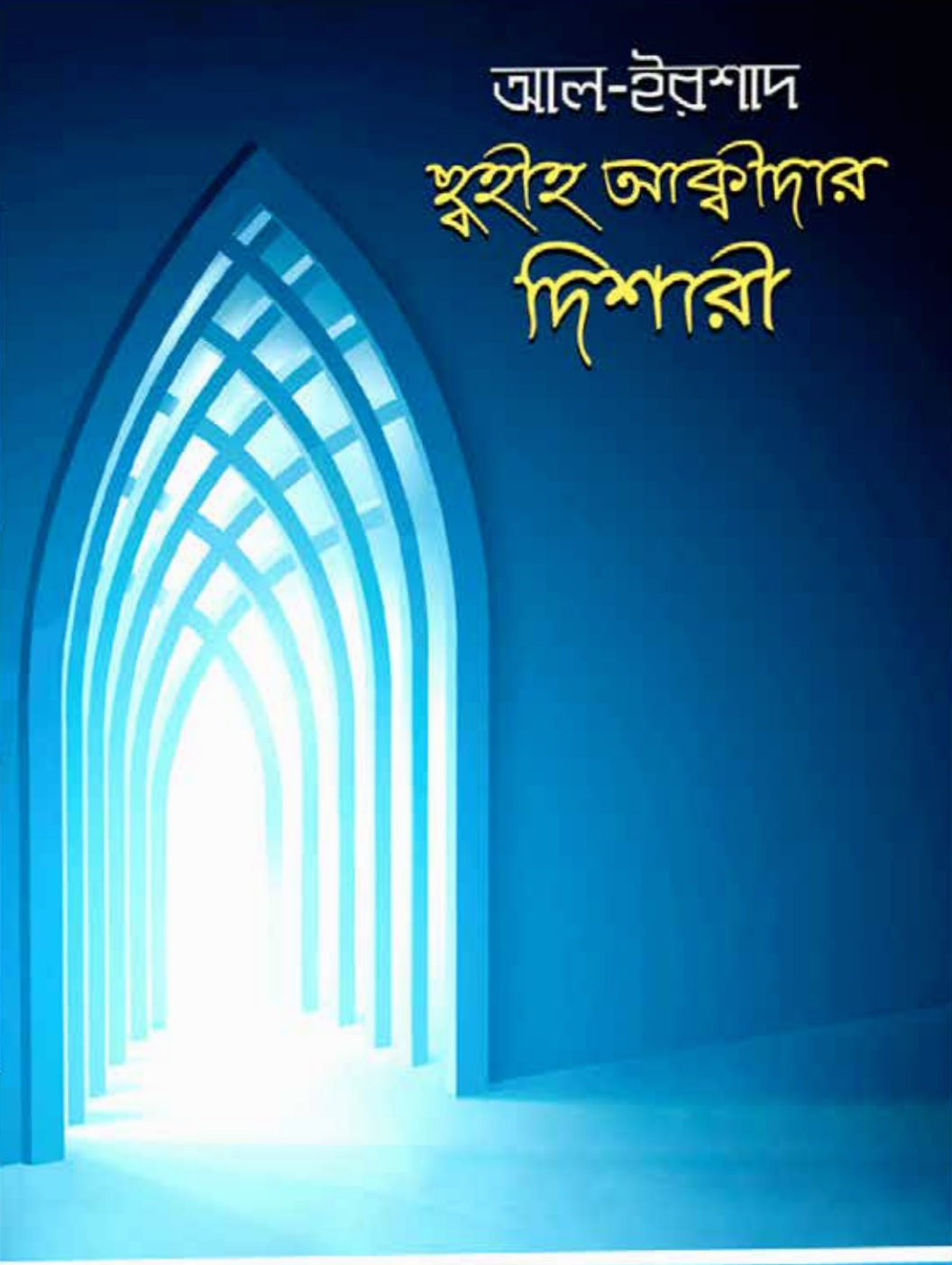
আল-ইরশাদ

শুহীহ আক্বীদার দিশারী



শাইখ ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد

আল ইরশাদ-ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী

[ঈমানের ব্যাখ্যা]

المؤلف: د صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

মূল: শাইখ ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

نقله إلى اللغة البنغالية/ محمد عبد الله شاهد

অনুবাদ: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

লিসান্স: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এম, ফাস্ট ক্লাশ

مُراجعة :الشيخ أجمل بن عبد النور

সম্পাদনা: শাইখ আযমল ইবনে আব্দুন নূর

লিসান্স: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদি আরব।

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد

المؤلف: د صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

نقله إلى اللغة البنغالية/محمد عبد الله شاهد

مراجعة: الشيخ أجمل بن عبد النور

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

web:www.maktabatussunnah.org

প্রধান অফিস:

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

শাখা অফিস:

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৭ ঈসায়ী

দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন ২০২১ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ৪৫০ (চারশত পঞ্চাশ) টাকা।

সূচিপত্র

শিরোনাম **পৃষ্ঠা**

- ভূমিকা ১৫

ইসলামী আক্বীদা

- ইসলামে আক্বীদার গুরুত্ব ১৯
- সঠিক ইসলামী আক্বীদা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের আবশ্যকতা ২৬
- পরিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদার দিকে দাওয়াত দেয়ার গুরুত্ব ৩০
- দলীলসহ ইসলামী আক্বীদার মূলনীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৩৬

প্রথম মূলনীতি: আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান

প্রথম অনুচ্ছেদ: তাওহীদুর রুবূবীয়্যা ৩৯

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: তাওহীদুল উলূহীয়া ৪৩

- ইবাদতের প্রকারভেদ ৪৫
- তাওহীদুল উলূহীয়া এবং তাওহীদুর রুবূবীয়ার মধ্যকার সম্পর্ক ৪৯
- তাওহীদুল উলূহীয়ার দিকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে কুরআনের পদ্ধতি ৫৫
- তাওহীদুল উলূহীয়াতের মধ্যে শিরক শুরু হলো কখন থেকে? ৬৪
- শিরকের ভয়াবহতা এবং যেসব বিষয় মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়, তা বর্জন করার মাধ্যমে শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা আবশ্যক ৭০
- ঐসব কথা ও কাজের বর্ণনা যা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতে নিষেধ করেছেন, কারণ তা মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায় ৭৩
- তাওহীদুল উলূহীয়ায় শিরক করার ক্ষেত্রে মুশরিকরা যেসব দলীল পেশ করে, তা খণ্ডন করা প্রসঙ্গে ৯৩

কয়েক প্রকার বড় শিরকের বর্ণনা

১. ভয়ের মধ্যে শিরক ১০০
২. ভালোবাসার মধ্যে শিরক ১১৬
আল্লাহকে ভালোবাসার আলামতসমূহ ১১৯
আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা পাওয়ার উপায় ১২১
৩. ভরসার মধ্যে শিরক ১২৩
আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের উপর ভরসা করার প্রকারসমূহ ১২৩
৪. আনুগত্যের মধ্যে শিরক ১৩০

তাওহীদ পরিপন্থি কতিপয় বিষয়
যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে মুরতাদ বানিয়ে ফেলে

১. আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা ১৪৬
২. আল্লাহর যিকির সম্বলিত বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা ১৫১

মানুষ এমন কাজ করে, যা সরাসরি শিরক কিংবা শিরকের মাধ্যম

❖ প্রথম: রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে আংটি, তাগা, সূতা ইত্যাদি পরিধান করা ১৫৬
❖ দ্বিতীয়: তাবিজ-কবচ ঝুলানো ১৫৭
❖ তৃতীয়: গাছ, পাথর, স্মৃতিচিহ্ন এবং কবরের উপর নির্মিত প্রাচীর, গ্রীল ইত্যাদি দ্বারা বরকত হাসিল করা ১৫৮
❖ চতুর্থ: যাদু করা ১৬২
❖ পঞ্চম: ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী করা ১৬৪
❖ ষষ্ঠ: কোনো কোনো সৃষ্টিকে অশুভ মনে করা ১৬৬
❖ সপ্তম: জ্যোতির্বিদ্যা ১৭২
❖ অষ্টম: তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা ১৭৭
❖ নবম: আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দিকে নিয়ামতের সম্বন্ধ করা ১৮২

ছোট শিরক (الشرك الأصغر)

১. আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা ১৮৯
২. শব্দের মাধ্যমে ছোট শিরক হয়ে থাকে ১৯০
৩. নিয়্যাত ও উদ্দেশ্যের মধ্যে ছোট শিরক ১৯২
ক. রিয়া বা লোক দেখানো আমল ১৯২
খ. মানুষের নেক আমল দ্বারা নিছক পার্থিব স্বার্থ হাসিলের নিয়্যাত করা ছোট শিরক ১৯৪
৪. যামানা কিংবা অন্যান্য সৃষ্টিকে গালি দেয়া ২০০
৫. কোনো কোনো অবস্থায় لو (যদি) শব্দ উচ্চারণ করা ২০৫
❖ আক্বীদার মধ্যে ছ্ববরের স্থান ২১০
❖ আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে তার জন্য অশোভনীয় শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নয় ২১৭

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত

❖ আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলি সম্পর্কিত তাওহীদ ২২৩
❖ আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক ২৩০
❖ আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলির ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মানহাজ ২৩৮
❖ আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও তার সুউচ্চ গুণাবলির ক্ষেত্রে জাহমীয়া ও তাদের শিষ্যদের নীতি-পদ্ধতি ২৪৪
❖ আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলির ক্ষেত্রে সালাফদের মানহাজের পক্ষ হতে পথভ্রষ্ট মুশাব্বেহা ও মুআত্তেলাদের জবাব ২৪৯

দ্বিতীয় মূলনীতিঃ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

❖ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ২৬১

তৃতীয় মূলনীতি: আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

- আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ২৭৩

চতুর্থ মূলনীতি: রসূলগণের প্রতি ঈমান

- রসূলগণের প্রতি ঈমান ২৭৯
- নাবী ও রসূলের মধ্যে পার্থক্য কী? ২৮২
- নবুওয়াতের দলীল-প্রমাণসমূহ ২৮৫
- কুরআনের মুজিযা ২৮৯
- নাবী-রসূলদের পবিত্রতা ২৯৪
- সমস্ত নাবী-রসূলের দীন এক ও অভিন্ন ৩০৫
- সংক্ষেপে রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু বৈশিষ্ট্য ৩১০
- কুরআন কি শুধু আরবদের জন্যই? ৩১২

- **প্রথমত: ইসরা ও মি'রাজ**
  - কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসরা ও মিরাজের ধরন ৩১৭
  - নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিরাজ কি শরীর ও রূহের সাথে হয়েছিল? না কি শুধু রূহের মাধ্যমে হয়েছিল? ৩১৮
  - মিরাজ কি একাধিকবার হয়েছে? ৩২০
- **দ্বিতীয়ত:** মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত বিশ্বজনীন এবং তা অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ৩২২
- **তৃতীয়ত:** মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী হিসাবে প্রেরণের মাধ্যমে নাবী-রসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করা হয়েছে ৩২৮
  - মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ করে দেয়ার হিকমাত ৩৩৩
  - ওলীদের কারামত ৩৩৬
  - ওলীদের কারামত ও যাদুকর-ভেলকিবাজ ও মিথ্যুকদের কারসাজির মধ্যে পার্থক্য ৩৩৮

পঞ্চম মূলনীতি: শেষ দিবসের প্রতি ঈমান

প্রথম অনুচ্ছেদ: ক্বিয়ামতের আলামতসমূহের প্রতি ঈমান ৩৪১

১. মাহদীর আত্মপ্রকাশ ৩৪৬
২. দাজ্জালের আগমন ৩৫০
৩. ঈসা ইবনে মারইয়াম 'আলাইহিস সালামের অবতরণ ৩৫৪
৪. ইয়াজুজ-মা'জুজের আগমন ৩৫৯
৫. দাব্বাতুল আরয বের হওয়া ৩৬৪
৬. পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় ৩৬৮
৭. ভয়াবহ একটি আগুন মানুষকে সিরিয়ার যমীনে একত্রিত করবে ৩৭২
৮. শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া এবং আসমান-যমীনের সবাই সংজ্ঞাহীন হওয়া ৩৭৭

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: শেষ দিবসের প্রতি ঈমান ৩৮৩

- আখিরাত দিবসের নামসমূহ ৩৯০
- মৃত্যু: ছোট ক্বিয়ামত ৩৯২
- নিদ্রার মাধ্যমে রূহ কবয করা এবং মৃত্যুর মাধ্যমে তা কবয করা ৩৯৫
- রূহের হাকীকত ৩৯৭
- রূহ একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি ৩৯৮
- রূহ কবয করার পদ্ধতি এবং মৃত্যুর পর তার গন্তব্যস্থল ৪০০
- মৃত্যুর সময় কাফেরদের করুণ অবস্থা ৪০১
- রূহ এবং নাফস্ কি একই জিনিস? ৪০৬

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: কবরের ফিতনা, তার আযাব ও সুখ-শান্তি

কবরে দু'জন ফেরেশতার প্রশ্ন ৪০৯
কবরের প্রশ্ন কি মুসলিম, মুনাফেক, কাফের সকলের জন্য? না কি এটি শুধু মুসলিম ও মুনাফেকের জন্য? ৪১২
কবরের প্রশ্ন কি শুধু এ উম্মতের জন্য? ৪১২
হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক ফেরেশতা দু'জনের প্রশ্নের ধরন-পদ্ধতি ৪১৪
দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক ৪১৮
কবরের আযাব ও সুখ-শান্তি ৪১৯
কবরের আযাব অথবা শাস্তির ব্যাপারে কুরআনুল কারীমের দলীল ৪১৯

সুন্নাহ থেকে কবরের আযাবের দলীল ৪২১
কবরের আযাব ও নিয়ামত অস্বীকারকারীদের বিভ্রান্তি ও তাদের জবাব ৪২৭
কবরের আযাবের কারণসমূহ ৪৩১
চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ পুনরুত্থান ও পুনর্জীবন ৪৩৩

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ ক্বিয়ামত দিবসে যা কিছু হবে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা
১. হিসাব-নিকাশ ৪৪২
২. আমলনামা প্রদান ৪৪৪
৩. আমলসমূহের ওযন ৪৪৫
৪. পুলছ্বিরাত ও তার উপর দিয়ে চলা ৪৪৭
৫. নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাউয ৪৪৯
৬. শাফা‘আত ৪৫১
পাপীদের ব্যাপারে শাফা‘আত অস্বীকারকারীদের জবাব ৪৫৩
৭. জান্নাত ও জাহান্নাম ৪৫৪

ষষ্ঠ মূলনীতিঃ ক্বদ্বা ও ক্বদর (আল্লাহর ফায়ছালা ও ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনয়ন করা)

❖ তাক্বদীরের প্রকারভেদ ৪৫৯
❖ ক্বদ্বা (ফায়ছালা) ও ক্বদরের (ভাগ্যের) প্রতি ঈমান আনয়নের ফলাফল ৪৬৩

বন্ধুত্ব রাখা এবং শত্রুতা পোষণ করার নীতিমালা

প্রথমঃ কাফেরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার কিছু বাহ্যিক রূপ ৪৭৩
দ্বিতীয়ঃ মুমিনদের বন্ধু বানানোর লক্ষণসমূহ ৪৭৯
❖ মানুষকে ভালোবাসা, বন্ধু বানানো কিংবা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের শ্রেণিবিন্যাস ৪৮৮

বিদ'আত থেকে সতর্ক করণার্থে একটি পরিশিষ্ট

প্রথম পরিচ্ছেদঃ

বিদ'আতের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও আহকাম

- বিদ'আতের সংজ্ঞা ৪৯২
- বিদ'আতের প্রকারভেদ ৪৯২
- দীনের মধ্যে বিদ'আতের বিধান ৪৯৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ

- মুসলিম সমাজে বিদ'আত প্রকাশিত হওয়া ৪৯৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ

- মুসলিম সমাজে বিদ'আত প্রকাশের কারণসমূহ ৪৯৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ

- বিদ'আতীদের ব্যাপারে মুসলিম মিল্লাতের আলেমদের অবস্থান ৫০৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ

- বিদ'আতীদের প্রতিবাদে আলেমগণের পদ্ধতি ৫০৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ

- সমকালীন বহুল প্রচলিত কতিপয় বিদ'আতের উদাহরণ ৫০৭

১. রবীউল আওয়াল মাসে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিবস উপলক্ষে মীলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন করা ৫০৮

২. বিশেষ স্থান, সৎ লোকদের পরিত্যক্ত জিনিস, প্রাচীন নির্দশনাবলী ও জীবিত-মৃত ওলীর কাছ থেকে বরকত হাসিল করা ৫১০

৩. ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদ'আতসমূহ ৫১২

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ

- বিদ'আতীদের সাথে কিরূপ আচরণ করা উচিত? ৫১৭

শাইখ ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান হাফিযাহুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী

শাইখ ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ আল-কাসীম অঞ্চলের বুরায়দাহ শহরের নিকটবর্তী শামাসীয়ার অধিবাসী। তিনি ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখ মোতাবেক ১ রজব ১৩৫৪ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট থাকতেই তার পিতা মারা যান। অতঃপর তিনি ইয়াতীম অবস্থায় স্বীয় পরিবারে প্রতিপালিত হন। শহরের মসজিদের ইমামের নিকট তিনি কুরআনুল কারীম, কিরা'আতের মূলনীতি এবং লেখা শিখেন।

শামাসীয়ায় ১৩৬৯ হিজরী সালে যখন সরকারী মাদরাসা চালু করা হয়, তখন তিনি সেখানে ভর্তি হন। অতঃপর বুরায়দা শহরস্থ ফয়সালীয়া ইবতেদায়ী মাদরাসায় ১৩৭১ হিজরী সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এ সময় তাকে ইবতেদায়ী মাদরাসায় শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। অতঃপর বুরায়দাতে ১৩৭৩ হিজরী সালে যখন ইসলামিক ইন্সটিটিউট খোলা হয়, তখন তিনি তাতে ভর্তি হন। ১৩৭৩ হিজরী সালে তিনি এখানে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি রিয়াদ শহরস্থ কুলদীয়া শারঈয়া বা শারঈয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৩৮১ হিজরী সালে শিক্ষা সমাপনী ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর তিনি একই প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামী ফিক্বহের উপর এম, এ পাস করেন এবং একই বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্ম জীবন

শারঈয়া কলেজ থেকে ডিগ্রী অর্জন করার পর তিনি রিয়াদস্থ ইসলামিক ইন্সটিটিউটে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। অতঃপর তাকে শারঈয়া কলেজের শিক্ষক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। অতঃপর তাকে ইসলামী আক্বীদা বিভাগের উচ্চতর শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। অতঃপর তাকে বিচার বিষয়ক উচ্চতর ইন্সটিটিউটে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। অতঃপর তাকে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মেয়াদ শেষে তাকে পুনরায় সেখানে শিক্ষক হিসাবে ফিরে আসেন। অতঃপর তাকে ইসলামী গবেষণা ও ফতোয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটির সদস্য নিয়োগ করা হয়। তিনি এখানো এই পদে বহাল রয়েছেন।

তিনি আরো যেসব সরকারী দায়িত্ব পালন করেন, তার মধ্যে هيئة كبار العلماء এর সদস্য, মক্কা মুকাররামায় অবস্থিত রাবেতার পরিচালনাধীন ইসলামী ফিক্বহ একাডেমীর সদস্য, ইসলামী গবেষণা ও ফতোয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটির সদস্য, হজ্জ মৌসুমে দাঈদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সদস্য এবং রিয়াদ শহরের মালায এলাকার আমীর মুতইব ইবনে

আব্দুল আযীয আল-সউদ জামে মসজিদের ইমাম, খতীব ও শিক্ষক। তিনি সৌদি আরব রেডিওতে نور على الدرب নামক প্রোগ্রামে শ্রোতাদের প্রশ্নের নিয়মিত উত্তর প্রদান করেন।

এ ছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি, গবেষণা, অধ্যয়ন, পুস্তিকা রচনা, ফতোয়া প্রদান করাসহ বিভিন্নভাবে ইলম চর্চা অব্যাহত রখেছেন। এগুলো একত্র করে কতিপয় পুস্তকও রচনা করা হয়েছে। তিনি মাস্টার্স ও ডক্টরেক ডিগ্রী অর্জনার্থী অনেক ছাত্রের গবেষণা কর্মে তত্বাবধায়ন করেছেন।

শাইখের উস্তাদবৃন্দ

১) মান্যবর শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে সা'দী

২) শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায

৩) আব্দুল্লাহ ইবনে হুমায়েদ

৪) শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন শানকিতী

৫) শাইখ আব্দুর রায্যাক আফীফী

৬) শাইখ সালেহ ইবনে আব্দুর রাহমান আস-সুকাইতী

৬) শাইখ সালেহ ইবনে ইবরাহীম আল-বুলাইহী

৭) শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সুবাইল

৮) শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে সালেহ আলখুলাইফী

৯) শাইখ ইবরাহীম ইবনে উবাইদ আল-আব্দ আল-মুহসিন

১০) শাইখ হামুদ ইবনে উকালা আশ শুআইবী

১১) শাইখ সালেহ আল-ইলদী আন্ নাসের।

এ ছাড়াও আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ধার্মিক শাইখের কাছ থেকে হাদীছ, তাফসীর এবং আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন।

শাইখের ছাত্রগণ

১) শাইখ ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল-সাদহান

২) শাইখ আলী ইবনে আব্দুর রাহমান আশ শিবিল

৩) শাইখ সাগীর ইবনে ফালেহ আলসাগীর

৪) শাইখ ইউসুফ ইবনে সা'দ আলজারীদ

৫) শাইখ সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হামাদ আল-উসাইমী

৬) শাইখ সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হামাদ আলউসাইমী

৭) মাসজিদুল হারামের ইমাম শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে সুদাইস

৮) মসজিদে নববীর ইমাম শাইখ আব্দুল মুহসিন আল কাসিম

৯) শাইখ সালেহ ইবনে ইবরাহীম আলুস-শাইখ

১০) শাইখ আয্যাম মুহাম্মাদ আল শুআইর। এ ছাড়াও তার অনেক ছাত্র রয়েছে। তারা নিয়মিত তার মজলিসে এবং নিয়মিত দারসগুলোতে অংশ গ্রহণ করতেন।

শাইখের ইলমী খেদমত

লেখালেখির কাজে রয়েছে শাইখের অনেক খেদমত। তার মধ্য থেকে নিম্নে কতিপয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো।

১) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية এটি ইলমে ফারায়েযের উপর রচিত শাইখের একটি কিতাব। এটি ছিল মাস্টার্স পর্বে তার গবেষণার বিষয়। বইটি এক খন্ডে ছাপানো হয়েছে।

২) أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية ইসলামী শরী'আতে খাদ্যদ্রব্যের বিধিবিধান।

৩) **الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد**। আমরা এর বাংলা নাম দিয়েছি **ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী। মাকতাবাতুস সুন্নাহ** কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

৪) **شرح العقيدة الواسطية** আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্যতম ইমাম শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার আল আক্বীদাতুল ওয়াসেত্বীয়ার ব্যাখ্যা **"শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসেত্বীয়া"** এটি। **মাকতাবাতুস সুন্নাহ** কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

৫) البيان فيما أخطأ فيه بعض الكتاب এটি একটি বড় মাপের কিতাব। এতে তিনি বিভিন্ন কিতাবের ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরেছেন।

৬) مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة আক্বীদা ও দাওয়া বিষয়ে শাইখের বিভিন্ন লেকচার এখানে জমা করে বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

৭) الخطب المنبرية في المناسبات العصرية যুগোপযোগী অনেক বিষয়কে একত্র করে জুমু'আর খুৎবা হিসাবে লেখা হয়েছে। এটি দু'খণ্ডে ছাপানো হয়েছে।

৮) ইসলামের সংস্কারক ইমামগণ

৯) বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা

১০) বিদ'আত থেকে সাবধান। বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

১১) مجموع فتاوى في العقيدة والفقه ফতোয়া ও আক্বীদা বিষয়ক সংকলন

১২) شرح كتاب التوحيد– للإمام محمد بن عبد الوهاب এটি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব (রহিমাহুল্লাহ) এর লিখিত কিতাবুত তাওহীদের ব্যাখ্যা।

১৩) الملخص الفقهي ফিক্বহের উপর লিখিত শাইখের এটি একটি বিশাল কিতাব।

১৪) إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان রমাদ্বান মাসের জন্য খাছ করে অনেকগুলো দারস এখানে জমা করা হয়েছে।

১৫) হাজ্জ ও উমরাহকারীর জন্য যা করণীয়

১৬) কিতাবুত তাওহীদ। এটি সৌদি আরবের স্কুলসমূহে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

১৭) কিতাবুদ দাওয়া

১৮) রমাদ্বানুল মুবারকের মজলিস

১৯) **عقيدة التوحيد** আক্বীদাতুত তাওহীদ। **মাকতাবাতুস সুন্নাহ** কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

২০) كشف الشبهات এর ব্যাখ্যা।

২১) যাদুল মুসতাকনি

২২) الملخص في شرح كتاب التوحيد এটি কিতাবুত্ তাওহীদের ব্যাখ্যা।

২৩) **شرح مسائل الجاهلية** এটি জাহেলী যুগের অনেক শিরক, কুফর এবং কুসংস্কারের প্রতিবাদে লিখিত হয়েছে। এটি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব (রহিমাহুল্লাহ) এর লিখিত মাসাঈলিল জাহিলিয়াহ নামক পুস্তিকার ব্যাখ্যা **"শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ"**। **মাকতাবাতুস সুন্নাহ** কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

২৪) حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিবস উপলক্ষে মীলাদ উদ্‌যাপন করা।

২৫) الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান এবং মানব জীবনে তার প্রভাব।

২৬) مجمل عقيدة السلف الصالح সালাফদের আক্বীদার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

২৭) حقيقة التصوف ছূফীবাদের হাকীকত।

২৮) من مشكلات الشباب যুবকদের সমস্যা

২৯) وجوب التحاكم إلى ما أنزله الله আল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার-ফায়ছালা করা আবশ্যক

৩০) من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা

৩১) دور المرأة في تربية الأسرة পরিবার পরিচালনায় নারীর ভূমিকা

৩২) معنى لا إله إلا الله লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহএর ব্যাখ্যা

৩৩) **شرح نواقض الإسلام** ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা

৩৪) التوحيد في القران কুরআনুল কারীমে তাওহীদ

৩৫) سلسلة وصايا وتوجيهات للشباب ١-٤ যুবকদের জন্য কতিপয় উপদেশ ও নির্দেশনা সিরিজ ১-৪

শাইখের প্রশংসায় বিভিন্ন আলিমের মন্তব্য

সৌদি আরবে যে সব বিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ আলিম এখনো জীবিত আছেন, তাদের মধ্যে শাইখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, শাইখ ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার পরে আমরা কার কাছে দীনের বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো? জবাবে ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, আপনারা সালেহ ফাওযান জিজ্ঞসা করবেন। এমনি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল-উছাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা আপনার পরে কাকে জিজ্ঞাসা করবো? তিনি জবাব দিলেন যে, আপনারা সালিহ ফাওযানকে জিজ্ঞাসা করবেন। কেননা তিনি একজন ফকীহ এবং ধার্মিক। শাইখ ইবনে গুদাইয়্যান প্রায়ই বলতেন, আপনারা দীনের ব্যাপারে শাইখ সালেহ ফাওযানকে জিজ্ঞাসা করবেন। আল্লাহ যেন তার আনুগত্যের উপর তার বয়স বৃদ্ধি করেন, তার শেষ পরিণাম যেন ভালো করেন এবং যেন হকের উপর তাকে টিকিয়ে রাখেন।

আমরা শাইখের জন্য দু'আ করি, তিনি যেন তার হায়াতে বরকত দান করেন এবং দীনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তা যেন কবুল করেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

ভূমিকা (المقدمة)

بسم الله الرحمن الرحيم

সৃষ্টিজগতের প্রভু ও প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি আমাদেরকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তার তাওহীদ বাস্তবায়ন করার আদেশ করেছেন এবং তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদের মুখাপেক্ষী নন; বরং আমরাই তার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٥٧ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ﴾

"আমি জিন এবং মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোনো রিযিক চাই না কিংবা তারা আমাকে খাওয়াবে তাও চাই না। আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং প্রবল শক্তিধর ও পরাক্রমশালী"। (সূরা আয-যারিয়াত ৫১: ৫৬-৫৮)

তাওহীদ (একত্ব) এর দিকে আহবান করা এবং ইখলাছ (একনিষ্ঠতা) এর সাথে তার ইবাদত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তার রসূলগণকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ﴾

"তোমার পূর্বে আমি যাকেই রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছি, তাকে আদেশ প্রদান করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত করো"। (সূরা আল-আম্বীয়া ২১:২৫)

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره المشركون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وجاهدوا وصبروا والذين آووا ونصروا وسلم تسليما كثيرًا إلى يوم الدين.

অতঃপর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তার কোনো শরীক নেই। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে থাকে। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল। তিনি তাকে সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার উপর, তার পরিবারের উপর এবং তার ঐসব ছাহাবীর উপর ছ্বলাত (দরুদ) ও সালাম বর্ষণ করুন, যারা তার সাথে হিজরত করেছে, জিহাদ করেছে এবং ধৈর্যধারণ করেছে। সে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তার ঐসব আনসার সাথীর উপরও ছ্বলাত ও সালাম বর্ষণ করুন, যারা তাকে মদীনায় আশ্রয় দিয়েছে ও তাকে সাহায্য করেছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অজস্র শান্তির ধারা বর্ষিত হোক। আমীন

অতঃপর, পরিশুদ্ধ আক্বীদার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা এবং তার দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক বিষয়। কেননা এর উপরই আমলের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে। তাই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাদের অনুসারীগণ সর্বপ্রথম আক্বীদা সংশোধনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সে সঙ্গে তারা ঐসব বিষয় থেকেও সতর্ক করেছেন, যা মানুষের আক্বীদাকে নষ্ট করে অথবা তাকে ত্রুটিযুক্ত করে।

কুরআনুল কারীমের আয়াতগুলোতে এ দিকটির প্রতিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দাওয়াতে মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাস সংশোধনের গুরুত্ব দিতেন সবচেয়ে বেশি।

মক্কায় ১৩ বছর অবস্থান করে মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং ইবাদতকে আল্লাহর জন্য খালেছ-একনিষ্ঠ করার আহবান জানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা যখন তার জন্য মক্কা বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম কাবাঘরের মূর্তিগুলো ভাঙতে শুরু করলেন এবং সেটার নিশানা-চিহ্ন মুছে ফেলতে লাগলেন। সে সঙ্গে তিনি ইখলাছের সাথে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার হুকুম করলেন। তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং তার কোনো শরীক নেই।

এ উম্মতের আলেমগণ তাদের পরিশ্রমের বিরাট অংশ আক্বীদা সংশোধনের জন্য ব্যয় করেছেন, তারা এ উদ্দেশ্যেই জিহাদ করেছেন, উম্মতের লোকদেরকে তা শিক্ষা দিয়েছেন এবং এর উপর অনেক বই-পুস্তক লিখেছেন। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আক্বীদা ও তাওহীদের কিতাবসমূহ ইসলামী পাঠাগারের বিরাট স্থান দখল করেছে। পাঠাগারের কিতাবগুলোর তালিকার সূচনাতেই রয়েছে আক্বীদার বইগুলোর নাম।

তাই এ বিরাট কাজে আমার সামান্য শ্রম ব্যয় করার ইচ্ছা পোষণ করে কিতাবটি লেখার কাজে হাত দিলাম। কিতাবটি আমি পাঠকদের সামনে পেশ করছি। এতে আমি নতুন কিছু সংযোজন করিনি। নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছ্বহীহ আক্বীদাকে ভালোভাবে বুঝার জন্য এ সংক্রান্ত কিছু ভুলভ্রান্তি পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। সে সঙ্গে বর্তমান সময়ের মানুষ ছ্বহীহ আক্বীদার ক্ষেত্রে যে ভুল-ভ্রান্তির চর্চা করছে এখানে সেদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, যাতে করে মানুষের কাছে এগুলোর হুকুম পরিষ্কার হয়ে যায় এবং যারা ভুল-ভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে, তাদের কাছে সেসব ভুল-ভ্রান্তি পরিষ্কার হয়। এতে সম্ভবত তারা সত্যের দিকে ফিরে আসবে এবং অন্যদেরকে এ দিকেই ফিরে আসার নছীহত করবে। আশা করা যায় যে, তারা সতর্ক হবে।

আমি এ কিতাবের বিষয়গুলো দীনের ইমাম ও মুসলিমদের আলেমগণের কিতাব থেকে সংগ্রহ করেছি। যেমন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া, তার ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, ইমাম ইবনে কাছীর, শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব এবং তার ছাত্রদের মধ্য থেকে যারা তাওহীদ ও আক্বীদা সংশোধন-সংস্কারের দাওয়াতে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে আমি কিতাবুত

তাওহীদের ব্যাখ্যা ফাতহুল মাজীদের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছি। সুতরাং আমি দাবি করছি না যে, আমি এতে নতুন কিছু নিয়ে এসেছি। আমি কেবল কিছু জানা বিষয়কে পাঠকদের বোধশক্তির কাছাকাছি করেছি মাত্র। যখনই কোনো বিষয় বর্ণনা করেছি, তখন সুযোগ বুঝে সেগুলোকে বর্তমান সময়ের মানুষের বাস্তব অবস্থার সাথে মিলিয়ে দিয়েছি মাত্র।

এ কিতাবের মূল বিষয়গুলো সৌদি আরব থেকে প্রচারিত আল-কুরআনুল কারীম রেডিওর বিভিন্ন ইলমী মজলিসে প্রচার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার তাওফীক না হলে বিষয়গুলো কিতাব আকারে প্রকাশ পেতো না। সে সঙ্গে কতিপয় দীনি ভাই আমার কাছে এগুলোকে একত্র করে সাজিয়ে-গুছিয়ে বই আকারে প্রকাশ করার প্রস্তাবও করেছেন। ইনশা-আল্লাহ এগুলো দ্বারা মানুষ দীর্ঘদিন উপকৃত হবে এবং এর কল্যাণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে অবদানও রাখতে পারবো। বিশেষ করে যখন দীনের সঠিক দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে অজ্ঞতা বিরাজ করছে, আক্বীদা সংশোধনের দাওয়াত না দিয়ে অনেক দাঈ যখন তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি বেশী গুরুত্ব প্রদান করছে এবং বলতে গেলে আক্বীদার বিষয়গুলো ছেড়েই দিয়েছে, তখন অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে এ বিষয়ে বই-পুস্তক লেখার গুরুত্ব আরো বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান সময়ে অনেক দাঈ লোকদেরকে বিভিন্ন সমাধিস্থল ও মাযারে শিরকে আকবার, বিদ'আত ও কুসংস্কারে ডুবে থাকতে দেখে এবং গোমরাহীর আহবানকারীদেরকে মূর্খ ও সাধারণ মানুষদের উপর জয়লাভ করতে দেখেও তা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা না করে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত রয়েছে। অথচ গোমরাহী ইমামগণ অজ্ঞ মানুষগুলোকে ওলী-আওলীয়াদের কবর ও মাযারের দিকে টেনে নিচ্ছে। ওলীদের কবরগুলোকে মানুষের জন্য উৎসবের স্থানে পরিণত করছে, তাদের বিবেক-বুদ্ধি ও ধন-সম্পদ নিয়ে খেল-তামাশা করছে। এসব ভণ্ড অন্যায়ভাবে অজ্ঞ লোকদের স্বঘোষিত নেতা হয়েছে এবং তারা আলেম ও আল্লাহর ওলী হওয়ার দাবি করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে।

আফসোসের বিষয় হলো, বর্তমানে এমন অনেক দাঈ রয়েছে, যারা আক্বীদা সংশোধনের দিকে কোনো গুরুত্ব দেন না। তাদের কেউ কেউ বলে থাকেন, লোকদেরকে তাদের নিজ নিজ আক্বীদার উপর বহাল থাকতে দাও এবং তাদের কাজের প্রতিবাদ করতে যেয়ো না। লোকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করো এবং তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করো না। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, لنجتمع على ما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه অর্থাৎ যে বিষয়ে আমরা সকলেই একমত তার উপর ঐক্যবদ্ধ হবো এবং যাতে আমরা মতভেদ করেছি, তাতে আমরা পরস্পরকে ছাড় দিবো। তারা এ রকম অন্যান্য বাক্যও বলেছেন, যা আল্লাহ তা'আলার কিতাবের সুস্পষ্ট বিরোধী। উল্লেখ্য যে, এখানে তারা যে ঐক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তা দ্বারা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করাকে বুঝিয়েছেন। আর যাতে উম্মত মতভেদ করেছে বলে উল্লেখ করেছেন, তা দ্বারা তারা আক্বীদা ও তাওহীদকে বুঝিয়েছেন।

তাদের কথা সম্পূর্ণ বাতিল। আসল কথা হলো, আক্বীদার ক্ষেত্রে উম্মতের প্রথম যুগের আলেমগণ মোটেই মতভেদ করেননি এবং এক্ষেত্রে কোনো মতভেদ গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, আনুগত্য করো রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা শাসক (কর্তৃত্বশীল ও বিদ্বান) তাদেরও। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম"। (সূরা আন-নিসা ৪:৫৯)

আমাদের সকলের জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া এবং তার বিরোধীতা বর্জন করা ব্যতীত মুসলিমদের ঐক্য ও শক্তি অর্জন হওয়ার কোনো আশা নেই। বিশেষ করে আক্বীদার বিষয়ে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরী। কেননা এটিই তাদের দীনের মূল বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ﴾

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রুজ্জুকে মজবুতভাবে আকঁড়ে ধরো এবং দলাদলি করো না। *(সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩)*

মদীনার ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহিমাহুল্লাহ) একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বর্ণনা করেছেন। এটি একটি বিরাট কথা। মুসলিমদের উচিত কথাটি ভালোভাবে বুঝা এবং তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। তিনি বলেছেন,

لا يَصْلُحُ آخِرُ هذه الأمةِ إلا بما صَلَحَ به أَوَّلُها

"এ উম্মতের প্রথম যুগের লোকেরা যার মাধ্যমে সংশোধিত হয়েছে, তা ব্যতীত শেষ যুগের লোকদের সংশোধন হওয়া অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলাই সঠিক পথের তাওফীক দাতা, তিনিই সঠিক পথের সন্ধান দাতা। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর।

ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

العقيدة الإسلامية

ইসলামে আক্বীদার গুরুত্ব

সঠিক ইসলামী আক্বীদা দিয়েই আল্লাহ তা'আলা রসূলগণকে পাঠিয়েছেন, কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন এবং সমস্ত জিন-ইনসানের উপর এটি কবুল করে নেয়াকে আবশ্যক করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٥٧ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ﴾

"আমি জিন এবং মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোন রিযিক চাই না কিংবা তারা আমাকে খাওয়াবে তাও চাই না। আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং প্রবল শক্তিধর ও পরাক্রমশালী"। (সূরা আয যারিয়াত ৫১: ৫৬-৫৮)
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾

"তোমার রব এ ফায়ছালা দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো"। (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:২৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ﴾

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি। তার মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়েছি যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আর ত্বগূতকে বর্জন করো"। (সূরা আন-নাহাল ১৬: ৩৬)

সমস্ত রসূলই এ ছ্বহীহ আক্বীদার দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। সমস্ত আসমানী কিতাবই এ ছ্বহীহ আক্বীদার বিশদ বিবরণ দেয়ার জন্য নাযিল হয়েছে এবং এটাকে ভঙ্গকারী অথবা এটাকে ত্রুটিযুক্তকারী বিষয়গুলো স্পষ্ট করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক মানুষকেই তা গ্রহণ করার আদেশ করা হয়েছে।

সুতরাং আক্বীদার বিষয়টি যেহেতু এত মর্যাদাবান ও গুরুত্বপূর্ণ, তাই সর্বপ্রথম এর প্রতি গুরুত্ব দেয়া, এ নিয়ে গবেষণা করা এবং এর জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। কেননা এ পরিশুদ্ধ আক্বীদার উপরই মানুষের ইহ-পরকালীন সৌভাগ্য নির্ভর করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

“যে ব্যক্তি ‘ত্বগূতকে’[১] অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে ধারণ করে নেয় সুদৃঢ় হাতল, যা বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ”। (সূরা আল বাকারা ২:২৫৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ সঠিক আক্বীদা থেকে হাত গুটিয়ে নিবে, সে এ বিষয়ে নিজস্ব খেয়াল-খুশী ও বাতিল ধারণার দিকে ধাবিত হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে সে তার সামনে বাতিল ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[১] মোটকথা ত্বগূতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কারো ইসলাম পরিশুদ্ধ হবে না। কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর মর্মার্থ এটিই। সুতরাং لاإله এই কথার মাধ্যমে প্রত্যেক ঐ ত্বগূতকে অস্বীকার করা হয়েছে, আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয়। আর إلا الله কালেমার এ অংশের মাধ্যমে কেবল আল্লাহর একত্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

“আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। তার মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়েছি যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, আর ত্বগূতকে বর্জন করো”। (সূরা আন নাহাল: ৩৬)

সুতরাং আল্লাহর ইবাদতকে একটি বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আর ত্বগূতের ইবাদতকে অন্য একটি বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং একজন মানুষ কেবল তখনই মুসলিম বলে গণ্য হবে, যখন সে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং একই সাথে ত্বগূত থেকে দূরে থাকবে।

আর طاغوت শব্দের উৎপত্তি হয়েছে الطغيان থেকে। ত্বগূত বলা হয় এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যে অন্যায় ও বিদ্রোহে সীমালঙ্ঘন করে। আল্লাহ তা‘আলা মূসা আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

﴿ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾

“এখন তুমি যাও ফেরাউনের কাছে। কেননা সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে”। (সূরা ত্বহা: ২৪)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾

“যে সময় পানির তুফান সীমাঅতিক্রম করলো তখন আমি তোমাদেরকে জাহাজে আরোহন করিয়েছিলাম”। (সূরা আল হাক্কাহ: ১১) অর্থাৎ পানি যখন অত্যন্ত বেড়ে গেল। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴾

“তাই সামূদ জাতিকে একটি সীমাহীন বিপদ দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে”। (সূরা আল-হাক্কাহ: ৫)

অর্থাৎ বিকট ও ভয়াবহ একটি চিৎকারের মাধ্যমে। সুতরাং যে ব্যক্তি বা বিষয় সীমা অতিক্রম করে, তাকেই ত্বগূত বলা হয়। শয়তানকে আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার কারণে এবং সীমালঙ্ঘন করার কারণে ত্বগূত বলা হয়। আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে মাবুদের ইবাদত করা হয়, সে মাবুদ যদি উক্ত ইবাদতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তাকে ত্বগূত বলা হয়। যাদুকর এবং গণক উভয়ই ত্বগূত। এমনি আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক মাবুদই ত্বগূত।

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلۡبَٰطِلُ﴾

আল্লাহ্ই সত্য; আর তার পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা বাতিল। সূরা হাজ্জ ২২:৬২

সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত লোকের পরিণাম জাহান্নামের দিকেই হবে। তা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান।

আক্বীদা কাকে বলে?

মানুষ যা সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং যাকে সে দীন হিসাবে গ্রহণ করে তাই তার আক্বীদা। এ আক্বীদাটি যদি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রসূলগণের দীন এবং তার নাযিলকৃত কিতাবসমূহ অনুযায়ী হয়, তাহলে তা ছ্বহীহ আক্বীদা হিসাবে গণ্য হয়। তার মাধ্যমে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্য লাভ করা যাবে। আর এ আক্বীদা যদি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রসূলগণের আনীত আক্বীদার বিরোধী হয় এবং তার নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহের পরিপন্থি হয়, তাহলে তার অনুসারীরা আযাবের সম্মুখীন হবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে হতভাগ্য হবে। কেউ পরিশুদ্ধ আক্বীদা গ্রহণ করলে দুনিয়াতে তার জান-মাল নিরাপদ থাকবে এবং অন্যায়ভাবে তার উপর আক্রমণ করা নিষিদ্ধ হবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»

"আমাকে মানুষের সাথে জিহাদ করার আদেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল এবং ছ্বলাত প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত দিবে। যখন তারা এ কাজগুলো সম্পাদন করবে তখন তারা আমার হাত থেকে নিজেদের জান ও মাল নিরাপদ করে নিবে"।[২]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»

[২] ছ্বহীহ বুখারী, হা/২৫, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২২, ইবনে মাজাহ, হা/৭২, সুনানে তিরমিযী, ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান, ছ্বহীহ ইবনে খুযাইমা।

“যে ব্যক্তি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য বাতিল মাবুদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে, তার জান-মাল মুসলিমদের নিকট সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে এবং তার অন্তরে লুকায়িত বিষয়ের হিসাব আল্লাহর উপরই ন্যস্ত হবে”।[৩]

এ পরিশুদ্ধ আক্বীদাই ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাবে। ছ্বহীহ মুসলিমে জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ لَقِىَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شيئا دَخَلَ النَّارِ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যু বরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যু বরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে”।[৪]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম ছাহাবী ইতবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِى بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ»

“আল্লাহ তা‘আলা এমন ব্যক্তির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে”।[৫]

পরিশুদ্ধ আক্বীদার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা মানুষের সমস্ত গুনাহ মোচন করে দেন। ইমাম তিরমিযী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা হাদীছে কুদছীতে বলেছেন,

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِى بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِى لاَ تُشْرِكُ بِى شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

“হে বনী আদম! তুমি যদি যমীন পরিপূর্ণ গুনাহ্ নিয়ে আমার কাছে আগমন করো এবং আমার সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করে মিলিত হও, তাহলে যমীন পরিপূর্ণ ক্ষমাসহ আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবো।[৬]

হাদীছের শব্দ قرابها অর্থ হলো ملؤها অর্থাৎ যমীন ভর্তি বা তার কাছাকাছি। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমা পাওয়ার শর্ত হলো শিরকমুক্ত পরিশুদ্ধ আক্বীদা থাকা চাই। চাই শিরকের পরিমাণ বেশী হোক বা কম হোক, ছোট শিরক হোক বা বড় শিরক হোক। যার

[৩] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৩।

[৪] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৩।

[৫] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৫৪০১।

[৬] ছ্বহীহ: সুনানে তিরমিযী, হা/৩৫৪০।

আক্বীদা শিরকমুক্ত হবে সেই মুক্ত ও পরিশুদ্ধ অন্তরের মালিক বলে গণ্য হবে। এ শ্রেণির লোকের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَوۡمَ لَا يَنفَعُ مَالٞ وَلَا بَنُونَ ٨٨ إِلَّا مَنۡ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلۡبٖ سَلِيمٖ﴾

"সেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না; কিন্তু যে পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে"। (সূরা আশ শুআরা ২৬: ৮৮-৮৯)

আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাহুল্লাহ) ইতবান ইবনে মালেকের হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, সেসব পরিশুদ্ধ তাওহীদের অধিকারীগণ ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে, যারা তাদের তাওহীদের সাথে শিরক মিশ্রিত করেনি। আর যাদের অবস্থা শিরকমুক্ত হবে না, তারা ক্ষমাপ্রাপ্তও হবে না।

সুতরাং তাওহীদপন্থি যে লোক আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় যমীন ভর্তি গুনাহ নিয়ে সাক্ষাৎ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে যমীন ভর্তি ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করবেন। যার তাওহীদ ত্রুটিযুক্ত হবে, সে এ ফযীলত অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং যে খাঁটি তাওহীদের সাথে শিরক মিশ্রিত হয় না, তার সাথে কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। কেননা পরিশুদ্ধ আক্বীদা আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা, তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তার ভয়, একমাত্র তার নিকট আশা-ভরসা ইত্যাদিকে আবশ্যক করে। আর এটি নিঃসন্দেহে গুনাহ মোচন হওয়ার কারণ। যদিও এটা যমীন ভর্তি হোক না কেন। সুতরাং শিরকের নাপাকী আসতেই পারে। কিন্তু তাকে দূর করার খুব শক্তিশালী মাধ্যম ও উপায় রয়েছে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের কথা এখানেই শেষ।

আক্বীদা বিশুদ্ধ থাকলে আমল কবুল হয় এবং আমল দ্বারা বান্দা উপকৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾

"যে পুরুষ বা নারীই সৎকাজ করবে, সে যদি মুমিন হয়, তাহলে তাকে আমি দুনিয়ায় পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবন দান করবো এবং আখিরাতে তাদের প্রতিদান দেবো তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুসারে"। (সূরা আন নাহাল ১৬:৯৭)

আর যদি আক্বীদা পরিশুদ্ধ না হয়, তাহলে বিপরীত হবে। কেননা বাতিল আক্বীদা সমস্ত আমল বরবাদ করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, যদি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করো, তবে তোমার কর্ম নিস্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। (সূরা আয যুমার ৩৯: ৬৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾

"তারা যদি শিরক করতো, তাহলে তাদের আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যেতো"। (সূরা আল-আনআম ৬: ৮৮)

শিরকপূর্ণ বাতিল আক্বীদার কারণে বান্দার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যায় ও সে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা হতে বঞ্চিত হয়। এর কারণে মানুষ আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হবে এবং চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শিরক করার গুনাহ মাফ করবেন না। শিরক ছাড়া অন্যান্য যেসব গুনাহ রয়েছে সেগুলো যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দিবেন"। (সূরা আন নিসা ৪: ৪৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ﴾

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। বস্তুত যালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। (সূরা আল মায়েদা ৫: ৭২)

বাতিল আক্বীদা পোষণকারীর জান ও মালের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ﴾

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর ফিতনা (শিরক) অবসান না হওয়া পর্যন্ত এবং দীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত"। (সুরা আল আনফাল ৮: ৩৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾

"অতঃপর মুশরিকদের হত্যা করো। যেখানেই তাদেরকে পাও, তাদেরকে বন্দী এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাকো। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, ছ্বলাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের রাস্তা

ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। (সূরা আত তাওবা ৯: ৫)

অপরপক্ষে মানুষের অন্তর, সামাজিক আচার-আচরণ ও জীবন-যাপনে পরিশুদ্ধ আক্বীদার বিরাট প্রভাব রয়েছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় দু'দল লোক মাসজিদ নির্মাণ করেছিল। একদল লোক সৎ নিয়্যাত ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি ছ্বহীহ আক্বীদা পোষণ করে মাসজিদ নির্মাণ করেছিল। অন্য একটি দল অসৎ উদ্দেশ্যে এবং বাতিল আক্বীদার উপর একটি মাসজিদ নির্মাণ করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে ঐ মসজিদে ছ্বলাত আদায় করার আদেশ করলেন, যা তাকওয়া এবং পরিশুদ্ধ ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর যে মাসজিদ কুফুরী করার জন্য এবং অসৎ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে, তাতে তিনি তার নাবীকে ছ্বলাতের জন্য দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسۡجِدٗا ضِرَارٗا وَكُفۡرٗا وَتَفۡرِيقَۢا بَيۡنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَإِرۡصَادٗا لِّمَنۡ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبۡلُۚ وَلَيَحۡلِفُنَّ إِنۡ أَرَدۡنَآ إِلَّا ٱلۡحُسۡنَىٰۖ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ ١٠٧ لَا تَقُمۡ فِيهِ أَبَدٗاۚ لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ فِيهِ رِجَالٞ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ ١٠٨ أَفَمَنۡ أَسَّسَ بُنۡيَٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقۡوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٍ خَيۡرٌ أَم مَّنۡ أَسَّسَ بُنۡيَٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٖ فَٱنۡهَارَ بِهِۦ فِي نَارِ جَهَنَّمَۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

"যারা সত্যের দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে, কুফুরী করার জন্য, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এবং ঐ ব্যক্তির জন্য গোপন ঘাটি বানাবার উদ্দেশ্যে একটি মাসজিদ নির্মাণ করেছে যে ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তারা অবশ্যই কসম খেয়ে বলবে, ভালো ছাড়া আর কোনো ইচ্ছাই আমাদের ছিল না। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা একেবারেই মিথ্যাবাদী। তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকেই, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতা অর্জন করাকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। তুমি কি মনে করো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ভীতি ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের উপর নিজের ইমারতের ভীত্তি স্থাপন করলো সে ভাল, না যে ব্যক্তি তার ইমারতের ভিত উঠালো পতনমুখী একটি গর্তের কিনারায়, অতঃপর তা তাকে নিয়ে সোজা জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়লো? এ ধরনের যালেমদেরকে আল্লাহ কখনো সোজা পথ দেখান না"। (সূরা আত তাওবা ৯: ১০৭-১০৯)

وجوب معرفة العقيدة الإسلامية

সঠিক ইসলামী আক্বীদা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের আবশ্যকতা

প্রিয় ভাইগণ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদেরকে ইসলামের সঠিক আক্বীদা

সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের তাওফীক দান করুন। কেননা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইসলামের ছ্বহীহ আক্বীদা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। ছ্বহীহ আক্বীদার অর্থ এবং তার ভিত্তি সম্পর্কে জানা আবশ্যক। সে সঙ্গে ছ্বহীহ আক্বীদা পরিপন্থি এবং যা এটাকে ভঙ্গ ও বাতিল করে দেয় সে সম্পর্কেও জানা আবশ্যক। বড় এবং ছোট উভয় প্রকার শিরকই ছ্বহীহ আক্বীদাকে ভঙ্গ কিংবা ত্রুটিপূর্ণ করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন,

﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ﴾

"তুমি জেনে নাও যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। অতঃপর তোমার গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করো"। (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯)

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তার ছ্বহীহ গ্রন্থে তাওহীদের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে যে অধ্যায় রচনা করেছেন, তা হলো باب العلم قبل القول والعمل অর্থাৎ কথা ও কাজের আগে জ্ঞান থাকা জরুরী। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনুল মুনীর বলেছেন, ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো কথা ও আচরণের বিশুদ্ধতার জন্য জ্ঞান থাকা জরুরী। সুতরাং জ্ঞান ছাড়া কথা ও আচরণের কোনো মূল্য নেই। তাই তাওহীদের জ্ঞানকে কথা ও কাজের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। তাওহীদের জ্ঞানই নিয়্যাতকে পরিশুদ্ধ করে। আর নিয়্যাত মানুষের আমলকে বিশুদ্ধতা দান করে।

এ কারণেই আলেমগণ আক্বীদার হুকুম-আহকাম শিক্ষা করা এবং এটাকে শিক্ষা দেয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তারা সকল প্রকার ইলম অর্জনের উপর ছ্বহীহ আক্বীদার ইলম অর্জনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ বিষয়ে তারা নির্দিষ্টভাবে অনেক কিতাব রচনা করেছেন। এতে তারা বিস্তারিতভাবে আক্বীদার মাসায়েল এবং তা গ্রহণ করার আবশ্যকতা বর্ণনা করেছেন। সে সঙ্গে তারা ছ্বহীহ আক্বীদা ভঙ্গকারী বা এটাকে ত্রুটিযুক্তকারী শিরক, বিদ'আত এবং কুসংস্কারগুলোও বর্ণনা করেছেন। এটিই হচ্ছে لا إله إلا الله -এর ব্যাখ্যা। এটি শুধু মুখের উচ্চারণের নাম নয়। বরং এর অর্থ, মর্মার্থ, তাৎপর্য ও দাবি রয়েছে। এগুলো জানা এবং প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সে অনুপাতে আমল করা আবশ্যক। এ আক্বীদাকে ভঙ্গকারী এবং ত্রুটিযুক্তকারী অনেক বিষয় রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত কারো কাছে এটা পরিষ্কার হয় না।

এ জন্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যসূচীতে আক্বীদার বিষয়কে সর্বোচ্চ স্থানে রাখা আবশ্যক এবং প্রত্যেক দিনের ক্লাশরুটিনে আক্বীদার ক্লাশের সংখ্যা যথেষ্ট থাকা চাই। যোগ্য শিক্ষকগণ এটা পাঠ দান করবে। আক্বীদার বিষয়ে কাউকে পাশ বা ফেল করানোর সময় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ পাঠ্যসূচী ও শিক্ষাক্রম এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠ্যসূচী তৈরী করার সময় আক্বীদার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। এতে মুসলিমদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আক্বীদা সম্পর্কে

অজ্ঞ থেকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে তারা শিরক, বিদ'আত এবং কুসংস্কারকে বৈধ মনে করে এটাকেই আক্বীদা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। কেননা তারা লোকদেরকে এর উপর দেখতে পাবে। এগুলো যে ভুল ও বাতিল, তারা তা বুঝতে পারবে না। এ জন্যই আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন,

يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية

"অচিরেই ইসলামের বন্ধন (হুকুম-আহকাম, আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান) একটি একটি করে খুলে ফেলা হবে। বিশেষ করে যখন ইসলামের মধ্যে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কুফর ও শিরক সম্পর্কে অজ্ঞ হবে।

এ জন্যই মুসলিম ছাত্রদের জন্য পাঠ্যসূচী হিসাবে এমন ছ্বহীহ-শুদ্ধ কিতাব নির্বাচন করা আবশ্যক, যা সালাফে ছ্বলেহীন ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মানহাজের উপর লিখিত হয়েছে এবং আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলো মুসলিম ছাত্রদের পাঠ্যসূচী হিসাবে নির্ধারণ করা হবে। সে সঙ্গে সালাফে ছ্বলেহীনদের মানহাজের পরিপন্থি কিতাবগুলো পাঠ্যসূচী থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া উচিত। যেমন আশায়েরা, মু'তাযিলা, জাহমীয়া এবং সালাফদের মানহাজ থেকে বিচ্যুত অন্যান্য গোমরাহ ফির্কার কিতাবগুলো যেন পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত না করা হয়।

মুসলিম সমাজের সরকারী-বেসরকারী নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছ্বহীহ আক্বীদার পাঠদানের সাথে সাথে মাসজিদগুলোতেও ইলমী দারসের (বিদ্যা পাঠদান) ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এসব দারসে সালাফী আক্বীদার পাঠদান করাকে সর্বোচ্চ স্থানে রাখা চাই। এখানে মূল কিতাব এবং এটার ব্যাখ্যা পড়ানো হবে। যাতে করে ছাত্র এবং উপস্থিত সাধারণ লোকেরা উপকৃত হতে পারে। সে সঙ্গে আক্বীদা সম্পর্কিত বড় বড় কিতাবগুলো সংক্ষিপ্ত করে লিখে সাধারণ লোকদের সামনে এটার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করাও জরুরী। এর মাধ্যমে ছ্বহীহ ইসলামী আক্বীদার প্রচার ও প্রসার ঘটবে। ইনশা-আল্লাহ। এর পাশাপাশি রেডিও এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে যেসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়, তার প্রতিও গুরুত্বারোপ করা জরুরী। প্রচার মাধ্যমগুলোতে এমন কিছু নিয়মিত প্রোগ্রামসূচী থাকা চাই, যাতে ইসলামী আক্বীদার মাসআলাগুলো প্রচার করা হবে।

শাসক ও নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক ব্যক্তিরই আক্বীদার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা আবশ্যক। তাদের উচিত আক্বীদার কিতাবগুলো অধ্যয়ন করা। সালাফদের মানহাজের উপর যেসব কিতাব লেখা হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা রাখা আবশ্যক। একই সঙ্গে সালাফদের মানহাজের পরিপন্থি যেসব কিতাব লেখা হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কেও সচেতন থাকা জরুরী। এতে করেই জ্ঞানে পরিপক্ক একজন মুসলিম তার দীনকে ভালোভাবে জানতে পারবে এবং আহলে সুন্নাতের আক্বীদার মধ্যে বাতিলপন্থিরা যেসব সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে চায়, তার উপযুক্ত জবাব প্রদান করতে সক্ষম হবে। হে মুসলিম! আপনি যখন কুরআনুল করীমের মধ্যে গভীর দৃষ্টি দিবেন, তখন

দেখতে পাবেন যে, কুরআনের অনেক আয়াত ও সূরা আক্বীদার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেছে। আপনি দেখবেন মক্কী সূরাগুলোকে সঠিক আক্বীদা বর্ণনার জন্যই খাছ-নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এর উপর যেসব সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে সেগুলোর পরিষ্কার জবাব রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সূরা ফাতিহার কথাই বলা যেতে পারে।

আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এ মক্কী সূরাটির ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে বলেন, জেনে রাখা আবশ্যক যে, এ সূরাটি সুমহান উদ্দেশ্যগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে এবং পরিপূর্ণ আকারে এটাকে নিজের মধ্যে ধারণ করেছে। তাতে আমাদের একমাত্র মাবুদ মহান আল্লাহর পরিচয়কে তার তিনটি নামের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলার সমস্ত অতি সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলির অর্থ বিদ্যমান এবং এর উপরই বাকিসব নাম ও গুণাবলির ভিত্তি। এগুলো হচ্ছে الله, الرب এবং الرحمن। সূরাটির মূল বিষয় হলো আল্লাহ তা'আলার উলূহীয়াত, রবুবীয়াত এবং তার সুবিশাল রহমত সম্পর্কে। إياك نعبد -এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার একচ্ছত্র উলূহীয়াত সাব্যস্ত করা হয়েছে। إياك نستعين - এর মাধ্যমে তার রুবূবীয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে ছিরাতুল মুস্তাকীমের হিদায়াত চাওয়ার সম্পর্ক হচ্ছে তার রহমত ছিফাতের সাথে। কারণ তিনি তার বান্দার প্রতি দয়াশীল বলেই তাদেরকে ছিরাতুল মুস্তাকীমের পথ দেখান।

আর الحمد বা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা তিনটি বিষয়কে শামিল করে। তিনি তার উলূহীয়াত, রবূবীয়াত এবং রহমত এ তিনটি কারণেই প্রশংসিত। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের কারণেই তার প্রশংসা ও গুণাবলি বর্ণনা করা আবশ্যক। সূরা ফাতিহায় পুনরুত্থান এবং বান্দাদের ভালো-মন্দ আমলের বিনিময় দেয়ার বিষয়টিও সাব্যস্ত হয়েছে। সেদিন আল্লাহ তা'আলা একাই সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ফায়ছালা করবেন এবং তার ফায়ছালা হবে পরিপূর্ণ ইনসাফ ভিত্তিক। সূরা আল ফাতিহার আয়াত: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ উপরোক্ত সব বিষয়কে সাব্যস্ত করেছে। এ সূরাটি নাবীদের নবুওয়াতকেও একাধিকভাবে সাব্যস্ত করেছে।

অতঃপর ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) নাবী-রসূলদের নবুওয়াত ও রিসালাত সম্পর্কে এমন দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, যা অত্যন্ত উপকারী। সূরা ফাতিহা ও মক্কী সূরা সমূহের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করার শেষ পর্যায়ে তিনি বলেছেন, শুধু এ সূরাতেই নয়; বরং পুরো কুরআন নাযিল হয়েছে তাওহীদ, এটার হক ও এটা কবুলকারীদের পুরস্কারের ব্যাপারে এবং শিরক ও এটাকে প্রত্যাখ্যানকারী মুশরিকদের শাস্তির ব্যাপারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ এর মধ্যে তাওহীদ রয়েছে ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ এর মধ্যে তাওহীদ রয়েছে এবং ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ -এর মধ্যেও তাওহীদ রয়েছে, ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ এর মধ্যেও রয়েছে তাওহীদ। সে সঙ্গে তাওহীদপন্থি হওয়ার কারণে যারা আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কৃত হয়েছেন

এখানে তাদের পথের হিদায়াতও চাওয়া হয়েছে। ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ এর মধ্যেও রয়েছে তাওহীদ। অর্থাৎ যারা তাওহীদকে প্রত্যাখ্যান করা এবং এটা থেকে দূরে থাকার কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে, এখানে তাদের আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের পথে পরিচালিত না করার প্রার্থনা করা হয়েছে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, কুরআনের অধিকাংশ সূরাতেই দু'প্রকার তাওহীদের বিশদ বিবরণ এসেছে। কুরআনে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা, তার অতি সুন্দর নামাবলী ও সুমহান গুণাবলি সম্পর্কে সংবাদ। এটি হচ্ছে التوحيد العلمي الخبري (আল্লাহ তা'আলার পরিচিত ও খবর সংক্রান্ত তাওহীদ)। আর রয়েছে তাতে তাওহীদের সাথে একমাত্র তার ইবাদতের দিকে আহবান। তিনি এক, অদ্বিতীয় ও তার কোনো শরীক নেই। সেই সঙ্গে তাতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর ইবাদত প্রত্যাখ্যান করার আহবান। আর এটি হচ্ছে তাওহীদুল উলূহীয়াহ। আর এটিকে التوحيد الإرادي والطلبي (কামনা-বাসনা সংক্রান্ত তাওহীদ) বলা হয়।

অথবা কুরআনের মধ্যে রয়েছে আদেশ, নিষেধ ও আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা আবশ্যক হওয়ার বিষয়াদি। আর এটি হচ্ছে তাওহীদের হক এবং এটার পরিপূরক। অথবা তাতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাওহীদপন্থিদেরকে সম্মানিত করা ও দুনিয়াতে তাদেরকে পুরস্কৃত করা এবং আখিরাতে তাদেরকে যা দিয়ে সম্মানিত করবেন এটার খবরাদি। অথবা তাতে রয়েছে মুশরিক ও দুনিয়াতে তাদের উপর যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নেমেছিল এবং আখিরাতে তাদের জন্য যে বিরাট শাস্তি অপেক্ষা করছে তার বিবরণ। আর এটি হলো তাওহীদ থেকে বিচ্যুত লোকদের পুরস্কারের খবরাদি। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের বক্তব্য এখানেই শেষ। পরিশুদ্ধ আক্বীদা পোষণ করার প্রতি এত গুরুত্ব দেয়ার পরও যারা কুরআন পড়ে তাদের অধিকাংশই সঠিকভাবে আক্বীদা বুঝে না। এর ফলে তারা হকের সাথে বাতিলের সংমিশ্রণ ঘটায় এবং আক্বীদার ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়। তারা বাপ-দাদাদেরকে যে আক্বীদার উপর পায়, তার অনুসরণ করার কারণেই এমনটি হয়ে থাকে। চিন্তা-গবেষণার সাথে কুরআন না পড়াও তাদের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ। মূলত আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই এবং সঠিক আক্বীদার উপর টিকে থাকারও কোনো শক্তি নেই।

الدعوة إلى العقيدة الإسلامية

পরিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদার দিকে দাওয়াত দেয়ার গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা যে মুসলিমকে ছ্বহীহ আক্বীদার নিয়ামত প্রদান করেন ও এটাকে আঁকড়ে ধরার তাওফীক দিয়ে সম্মানিত করেন, তার উপর আবশ্যক হয় যে, সে শিরক ও

জাহেলীয়াতের অন্ধকার থেকে বের করে আনার জন্য এবং তাওহীদ ও ছ্বহীহ আক্বীদার আলোর দিকে আসার জন্য মানুষকে দাওয়াত দিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخۡرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِۗ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾

"যে ব্যক্তি 'ত্বগূতকে' অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল, যা বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের বন্ধু। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফুরী করে তাদের বন্ধু হচ্ছে ত্বগূত। তারা তাদের আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়। এরা আগুনের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে"। (সূরা আল বাকারা ২:২৫৬-২৫৭)

সমস্ত রসূল আক্বীদা পরিশুদ্ধ করার দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমেই তাদের দাওয়াতের সূচনা করেছেন। এর আগে তারা অন্য কিছু দিয়ে শুরু করেননি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ﴾

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি। তার মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়েছি যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, আর ত্বগূতকে বর্জন করো"। (সূরা আন নাহল ১৬: ৩৬)

প্রত্যেক রসূলই প্রথম যখন তার জাতির লোকদেরকে দাওয়াত দিতেন, তখন বলতেন,

﴿يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓۖ﴾

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই"। (সূরা হুদ ১১: ৫০)

নূহ 'আলাইহিস সালাম, হুদ 'আলাইহিস সালাম, সালেহ 'আলাইহিস সালাম, শুআইব 'আলাইহিস সালাম, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম, মূসা 'আলাইহিস সালাম, ঈসা 'আলাইহিস সালাম, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সমস্ত রসূল 'আলাইহিমুস সালামও অনুরূপ করতেন। সুতরাং যারা এ আক্বীদার জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং এর উপর আমল করার তাওফীক পাবে, তারা যেন এটিকে নিজের মধ্যে সীমিত না রাখে। বরং তারা হিকমত ও উত্তম নছীহতের মাধ্যমে লোকদেরকে এ দিকে দাওয়াত দিবে। এ আক্বীদার দিকে দাওয়াত দেয়াকেই মূল কাজ মনে করবে এবং এখান থেকে যাত্রা শুরু করবে।

সুতরাং তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার পূর্বে ফরয বা ওয়াজিব কোনো বিষয় বাস্তবায়ন করা কিংবা হারাম কোনো জিনিস বর্জন করার দিকে দাওয়াত দিবে না। এতে করেই ছ্বহীহ আক্বীদা প্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা আক্বীদা হলো ইসলামের মূল ভিত্তি এবং সমস্ত আমলকে পরিশুদ্ধকারী। আক্বীদা ঠিক হওয়া ব্যতীত কোনো আমলই ছ্বহীহ হয় না, কবুল হয় না এবং আমলের ছাওয়াবও দেয়া হয় না। আর এ সহজ কথাটি সকলেরই জানা আছে যে, ভিত্তি প্রস্তর ব্যতীত কোনো ঘর প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং এটা ঠিকও থাকে না।

এ জন্যই রসূলগণ সর্বপ্রথম আক্বীদা সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলাম প্রচারের জন্য ছাহাবীদেরকে পাঠাতেন তখন সর্বপ্রথম আক্বীদা সংশোধন করার দাওয়াত দেয়ার আহবান জানানোর উপদেশ দিতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন তিনি বললেন,

إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فليكن أول ما تدعو إليه شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

“তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো যারা আহলে কিতাব। সর্বপ্রথম যে জিনিসের দিকে তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাবে তা হচ্ছে, “লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ”এর সাক্ষ্য দান করা”। অন্য বর্ণনায় আছে, তুমি তাদেরকে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করার আহবান জানাবে। এ বিষয়ে তারা যদি তোমার আনুগত্য করে তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত ফরয করেছেন। এ ব্যাপারে তারা যদি তোমার কথা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা বিত্তশালীদের কাছ থেকে নিয়ে গরীবদেরকে দেয়া হবে। তারা যদি এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে তাহলে তাদের উৎকৃষ্ট মালের ব্যাপারে তুমি খুব সাবধান থাকবে। আর মাযলুমের বদ দু‘আকে পরিহার করে চলবে। কেননা মাযলুমের ফরিয়াদ এবং আল্লাহ তা‘আলার মাঝখানে কোনো পর্দা নেই”।[৭]

এ হাদীছ, কুরআনুল কারীমে আলোচিত রসূলদের দাওয়াত এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী নিয়ে গবেষণা করেই কেবল আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার সঠিক মানহাজ গ্রহণ করা যায়। আর এ আক্বীদা পরিশুদ্ধ করার জন্যই সর্বপ্রথম মানুষকে দাওয়াত দিবে। আর এটা এককভাবে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করা এবং তিনি

[৭] ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৩৯৫, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৯, ইবনে মাজাহ, হা/১৭৮৩।

ব্যতীত অন্যের ইবাদত বর্জন করার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে। তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং তার কোনো শরীক নেই। এটিই হচ্ছে কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ই লাহা ইল্লাল্লাহ-এর সঠিক অর্থ। নবুওত পাওয়ার পর নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাতে ১৩ বছর অবস্থান করে এককভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা এবং মূর্তির ইবাদত বর্জন করার মাধ্যমে মানুষের আক্বীদা সংশোধনের দাওয়াত দিয়েছেন। ছ্বলাত, যাকাত, ছ্বিয়াম, হাজ্জ ও জিহাদের আদেশ এবং সুদ, যেনা-ব্যভিচার, মদ্যপান এবং জুয়া খেলাসহ অন্যান্য হারাম কাজ বর্জনের নির্দেশ দেয়ার আগে তিনি কেবল আক্বীদা সংশোধনের দাওয়াত দিতেন।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নীতি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সমসাময়িক ঐসব দলের দাওয়াতের মানহাজ ভ্রান্ত হওয়ার প্রমাণ করে, যারা দীনের দাওয়াত দেয়ার দাবি করে ঠিকই; কিন্তু তারা আক্বীদা সংশোধনের প্রতি দাওয়াত দেয়ার তেমন কোনো গুরুত্ব প্রদান করে না। তারা কেবল চরিত্র ও আচার-আচরণ ঠিক করাসহ অধিকতর কম গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয়ের উপর জোর দেয়। অথচ এসব জামা'আতের লোকেরা কতিপয় ইসলামী দেশে কবরের উপর নির্মিত মাযার ও সমাধির নিকট অনেক মানুষকে বড় শিরকে লিপ্ত দেখে। কিন্তু তার কোনো প্রতিবাদ করে না এবং তা থেকে নিষেধও করে না। ভাষণ-বক্তৃতা এবং লেখালেখির মাধ্যমে খুব কম সংখ্যক লোক আক্বীদা সংক্রান্ত এসব ভুল-ভ্রান্তির প্রতিবাদ করে থাকে। এসব জামা'আতের লোকদের কাতারে এমন লোক রয়েছে, যারা শিরক ও ছূফীবাদের চর্চা করে। তারা অন্যদেরকে নিষেধ করে না এবং সতর্কও করে না। অথচ সুস্পষ্ট কুফুরীতে লিপ্ত কাফের ও নাস্তিকদেরকে দাওয়াত দেয়ার আগে নিজের দলের লোকদেরকে দাওয়াত দেয়া ও সংশোধন করা উত্তম। কেননা নাস্তিক ও বিধর্মীরা তো সুস্পষ্টরূপেই তাদের কুফুরীর ঘোষণা দিয়েছে এবং স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা রসূলদের আনীত দীনের বিরোধীতায় লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু কবর পূজারী ও বিভ্রান্ত উপরোক্ত ছূফীরা ধারণা করে যে, তারা মুসলিম। তারা আরো ধারণা করে, তারা যার উপর রয়েছে এটাই প্রকৃত ইসলাম। সুতরাং তারা নিজেরা ধোঁকার মধ্যে রয়েছে এবং অন্যদেরকেও ধোঁকা দিচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সর্বপ্রথম নিকটবর্তী কাফেরদেরকে দাওয়াত দেয়ার আদেশ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلۡيَجِدُواْ فِيكُمۡ غِلۡظَةٗۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ﴾

হে ঈমানদারগণ! কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ করো। তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন"। (সূরা আত তাওবা ৯: ১২৩)

সুতরাং মুসলিমদের কাতারকে বহিরাগত আক্বীদা থেকে পরিষ্কার না করা হলে দুশমনদের মোকাবেলায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। বর্ণনা করা হয় যে, জনৈক কবরপূজারী

এক লোককে মূর্তিপূজা করতে দেখে প্রতিবাদ করল। মূর্তিপূজক কবর পূজারীকে বলল, তুমি এমন এক সৃষ্টির ইবাদত করছো, যা তোমার সামনে উপস্থিত নয়। আর আমি এমন এক সৃষ্টির পূজা করছি, যা আমার সামনে উপস্থিত রয়েছে এবং সে আমার দিকে ঝুকে রয়েছে। বলো তো আমাদের উভয়ের মধ্যে কার কাজটি উত্তম? এভাবেই মূর্তিপূজক কবরপূজারীকে বিতর্কে হারিয়ে দিল। যদিও তারা উভয়ই পথভ্রষ্ট মুশরিক। তারা এমন বস্তুর ইবাদত করে, যে কারো ক্ষতি কিংবা উপকার সাধন করার ক্ষমতা রাখে না। তবে গোমরাহীর দিক থেকে কবরপূজারী মূর্তিপূজকের চেয়ে বেশী অন্ধকারের মধ্যে ডুবে রয়েছে এবং অসম্ভব বস্তু প্রার্থনায় সে তার মূর্তিপূজক সাথীর সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং দাওয়াতের ক্ষেত্রে অন্যান্য জিনিসের চেয়ে আক্বীদা সংশোধনের দিকে বেশী জোর দেয়া আবশ্যক। প্রথমে মুসলিমগণ নিজেরা ভালোভাবে আক্বীদা পাঠ করবে এবং বুঝবে। অতঃপর অন্যদেরকে এটা শিক্ষা দেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। যারা আক্বীদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়েছে অথবা এটা বুঝতে ভুল করেছে, তাদেরকে ছ্বহীহ আক্বীদার দিকে আহবান করবে। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে বলেন,

﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾

"বলো! এটিই আমার পথ। পূর্ণ প্রজ্ঞার সাথে আমি আল্লাহর দিকে আহবান জানাই আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ্ পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই"। (সূরা ইউসুফ ১২: ১০৮)

ইমাম ইবনে জারীর এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার নাবী মুহাম্মাদকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি বলো, আমি যে দাওয়াত দিচ্ছি, যে পথের উপর অটল থেকে আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা দিচ্ছি এবং বাতিল মাবুদ ও মূর্তিপূজা বর্জন করে ইখলাছের সাথে তার ইবাদতের দিকে আহবান জানাচ্ছি, তার আনুগত্য করাকেই যথেষ্ট মনে করছি এবং তার বিরোধীতা বর্জন করছি, এটাই আমার তরীকা ও দাওয়াত। আমি আল্লাহর দিকে আহবান করছি। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তার কোনো শরীক নেই। আমি জেনে-বুঝে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেই এদিকে আহবান করছি। আমার অনুসারী ছাহাবীগণও সজ্ঞানে আমাকে বিশ্বাস করে এদিকেই দাওয়াত দিচ্ছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে বলেছেন, হে নাবী! তুমি বলো, আমি আল্লাহ তা'আলার রাজত্বে তার কোনো অংশীদার কিংবা তার সাম্রাজ্যে তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ থাকা হতে তার পবিত্রতা ও মহত্ত্বের ঘোষণা করছি। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করে, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই এবং তারাও আমার দলভুক্ত নয়। ইমাম ইবনে জারীরের কথা এখানেই শেষ।

উপরোক্ত মর্যাদাবান আয়াতটি ইসলামে ছ্বহীহ আক্বীদা জানা এবং তার দিকে দাওয়াত প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবীগণ এ

বিষয়ে তার অনুসরণ করেছেন এবং উপরোক্ত দু'টি বিশেষণেই বিশেষিত হয়েছেন। তারা ছ্বহীহ আক্বীদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানী ছিলেন এবং সেদিকেই তারা দাওয়াত দিতেন।

সুতরাং যারা ছ্বহীহ আক্বীদা শিখবে না, এর প্রতি গুরুত্ব দিবে না এবং এদিকে দাওয়াত দিবে না, তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত অনুসারী নয়। যদিও সে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে নিজেকে সম্বন্ধ করে এবং তার অনুসারী হওয়ার দাবি করে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন,

﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ﴾

"হে নাবী! হিকমত এবং উত্তম উপদেশ সহকারে তোমার রবের পথে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে"। সূরা আন নাহল ১৬:১২৫

আল্লাহ তা'আলা এখানে দাওয়াতের বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করেছেন এবং মানুষের অবস্থা অনুপাতে এটাকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন:

(১) কেননা মানুষ যদি হকের সন্ধানী হয় এবং হক জানার পর অন্যকে এটার দিকে আহবানকারী হবে বলে আশা করা যায়, এমন ব্যক্তিকে হিকমতের সাথে দাওয়াত দিতে হবে, তার জন্য নছীহত পেশ এবং তার সাথে বিতর্ক করার দরকার নেই।

(২) আর যদি কোনো লোক সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারী হয় এবং তার ব্যাপারে ধারণা করা হয় যে, সে সত্য জানতে পারলে এটা দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং মেনে নিবে তাহলে এমন ব্যক্তিকে উৎসাহ দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে নছীহত করার প্রয়োজন রয়েছে।

(৩) আর যদি কোনো লোক অহঙ্কারী ও হকের বিরোধী হয়, তাহলে তার সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করতে হবে। সে যদি বিরোধীতা বর্জন করে এবং হকের দিকে ফিরে আসে তাহলে ভালো। অন্যথায় সম্ভব হলে তার সাথে তর্ক-বিতর্ক বাদ দিয়ে অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।[৮] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা এখানেই শেষ।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে দাওয়াতের মানহাজ সুস্পষ্ট হলো এবং এ বিষয়ে মুসলিমদের করণীয় সম্পর্কেও জানা গেল। সে সঙ্গে দাওয়াতের দাবিদার কিছু দলের মানহাজ ভুল বলেও প্রমাণিত হলো। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এবং রসূল (ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ছ্বহীহ সুন্নাতে দাওয়াতের বিশুদ্ধ মানহাজ বর্ণনা করেছেন, তারা তার বিরোধীতা করে যাচ্ছে।

[৮] যেমন তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা বা অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

بيان أصول العقيدة الإسلامية إجمالا وأدلتها

দলীলসহ ইসলামী আক্বীদার মূলনীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

تمهيد : ভূমিকা

الأصل الأول: الإيمان بالله عزوجل

প্রথম মূলনীতি: আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান

الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة

দ্বিতীয় মূলনীতি: মালাঈকা-ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

الأصل الثالث: الإيمان بالكتب

তৃতীয় মূলনীতি: আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

الأصل الرابع: الإيمان الرسل

চতর্থ মূলনীতি: নাবী-রসূলদের প্রতি ঈমান

الأصل الخامس: الإيمان اليوم الآخر

পঞ্চম মূলনীতি: আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান

الأصل السادس: الإيمان بالقدر

ষষ্ঠ মূলনীতি: তাক্বদীরের প্রতি ঈমান

ভূমিকা (تمهيد)

প্রিয় মুসলিম ভাই! আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও আপনাকে ইসলামী আক্বীদা জানা, মেনে চলা এবং এটার দিকে দাওয়াত দেয়ার তাওফীক দিন। আপনি জেনে রাখুন যে, নাজাতপ্রাপ্ত দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট ইসলামী আক্বীদার মূলনীতিগুলো হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, নাবী-রসূলদের প্রতি ঈমান, আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এবং তাক্বদীরের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

আক্বীদার এ মূলনীতিগুলোর পক্ষে কুরআন ও হাদীছের অনেক দলীল রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর আলেমগণ এগুলো আক্বীদা ও ঈমানের মূলনীতি হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

"তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত করার মধ্যে কোন ছাওয়াব নেই; বরং পূণ্য তার, যে ব্যক্তি আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নাবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে"। (সূরা আল বাকারা ২: ১৭৭)

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

"আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি নির্দিষ্ট পরিমাপে"। (সূরা কামার ৫৪: ৪৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ

"রসূলের উপর তার রবের পক্ষ হতে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি তিনি ঈমান এনেছেন এবং ঈমানদারগণ। তারা সবাই আল্লাহকে, তার ফেরেশতাদেরকে, তার কিতাবসমূহকে ও তার রসূলদেরকে বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছে: আমরা আল্লাহর রসূলদের একজনকে অন্যজন থেকে আলাদা করি না"। (সূরা আল বাকারা ২: ২৮৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ, তার ফেরেশতাবর্গ, তার কিতাবসমূহ, তার রসূলগণ ও পরকালের প্রতি কুফুরী করলো সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূর চলে গেলো"। (সূরা আন নিসা ৪: ১৩৬)

ছ্বহীহ হাদীছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন,

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

"তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে (১) আল্লাহ পাকের উপর (২) তার ফেরেশতাদের উপর (৩) তার কিতাবসমূহের উপর (৪) তার নাবী-রসূলদের উপর (৫) আখিরাত বা শেষ দিবসের উপর এবং (৬) তাক্বদীরের ভালো-মন্দের উপর"।[৯]

আক্বীদার এ বিরাট মূলনীতিগুলোকে ঈমানের রুকন বলেও নামকরণ করা হয়। সমস্ত নাবী-রসূল এবং সমস্ত আসমানী শরী'আত এগুলো ঈমানের রুকন ও আক্বীদার মূলনীতি হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। আসমানী কিতাবসমূহ এ মূলনীতিগুলোসহ নাযিল হয়েছে। ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যারা কাফেরে পরিণত হয়েছে, তারা ব্যতীত অন্য কেউ এগুলোকে অথবা এগুলো থেকে কোনো কিছু অস্বীকার করতে পারে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ

[৯] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮, ছ্বহীহ বুখারী, হা/৫০, ইবনে মাজাহ, হা/৬৩, আবূ দাউদ, হা/৪৬৯৫।

ٱلْكَٰفِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٥١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُو۟لَٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“যারা আল্লাহ ও তার রসূলদের সাথে কুফুরী করে, আল্লাহ ও তার রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে আমরা কারো প্রতি ঈমান আনয়ন করি ও কারো প্রতি কুফুরী করি। আর তারা কুফর ও ঈমানের মাঝখানে একটি পথ বের করতে চায়, তারা সবাই আসলে কট্টর কাফের। আর এহেন কাফেরদের জন্য আমি অবমাননাকর শাস্তি তৈরী করে রেখেছি। বিপরীত পক্ষে যারা আল্লাহ ও তার রসূলদেরকে মেনে নেয় এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, তাদেরকে আমি অবশ্যই পুরস্কার দান করবো। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়”। (সূরা আন নিসা ৪: ১৫০-১৫২)

এ হলো আক্বীদার বিরাট মূলনীতিগুলো এবং ঈমানের সুদৃঢ় ও মজবুত রুকনগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা বিরণ প্রদান করা দরকার। আমরা এ কিতাবে যথাসাধ্য এ মূলনীতিগুলোর ব্যাখ্যা করবো ইনশা-আল্লাহ।

الأصل الأول: الإيمان بالله عزوجل

প্রথম মূলনীতি: আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন করাই হচ্ছে আক্বীদার প্রধান মূলনীতি। الإيمان بالله বা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ হলো অন্তর দিয়ে আল্লাহর উপর এ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, তিনিই প্রত্যেক জিনিসের একমাত্র রব ও মালিক। তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। সমগ্র সৃষ্টিজগতের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। সে সঙ্গে আরো বিশ্বাস করা যে, তিনিই একমাত্র বান্দার ইবাদতের হকদার, এতে তার কোনো শরীক নেই। তিনি ছাড়া আর যত মাবুদ রয়েছে, তা সবই বাতিল। এগুলোর ইবাদতও বাতিল।

আল্লাহ তা'আলা সূরা লুকমানের ৩০ নং আয়াতে বলেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

“এসব কিছু এ কারণে যে, আল্লাহই সত্য এবং তাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য যেসব জিনিসকে তারা ডাকে তা সবই মিথ্যা, আর আল্লাহই সুউচ্চ ও সুমহান”।

আরো বিশ্বাস করা যে, তিনি ছিফাতে কামালিয়া তথা উত্তম ও পূর্ণতার গুণাবলি দ্বারা গুণান্বিত এবং প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান বলতে তিন প্রকার তাওহীদকেই বুঝায়। তাওহীদুর রুবূবীয়্যা, তাওহীদুল উলূহীয়া এবং তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত। এতে রয়েছে কয়েকটি অনুচ্ছেদ।

المبحث الأول: توحيد الربوبية

প্রথম অনুচ্ছেদঃ তাওহীদুর রুবূবীয়্যা

তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ হল দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা একই সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা। সব কিছুর ব্যবস্থাপক, পরিচালক, জীবন দাতা, মৃত্যু দাতা। তিনিই রিযিক দানকারী এবং প্রবল শক্তিধর। এ প্রকার তাওহীদকে মেনে নেয়ার প্রবণতা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের মধ্যেই স্থাপন করে দেয়া হয়েছে। মানব জাতির কেউ এ বিষয়ে তেমন কোনো মতভেদ করেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾

"তুমি যদি এদের জিজ্ঞাসা করো, কে এদেরকে সৃষ্টি করেছে? তাহলে এরা নিজেরাই বলবে, আল্লাহ। তাহলে কোথা থেকে এরা প্রতারিত হচ্ছে? (সূরা যুখরুফ: ৮৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾

"তুমি যদি এসব লোকদের জিজ্ঞাসা করো, আসমান-যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে এরা নিজেরাই বলবে, মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী সত্তা এগুলো সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা যুখরুফ: ৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ اللهِ﴾

"তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি কে? তারা নিশ্চয় বলবে, আল্লাহ"। (সূরা মুমিনুন: ৮৬-৮৭)

এ রকম আয়াত কুরআনে অনেক রয়েছে। কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন যে, তারা আল্লাহ তা'আলার রুবূবীয়াত স্বীকার করতো। তারা বিশ্বাস করতো আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা, রিযিক দাতা, জীবন দাতা এবং মৃত্যু দাতা। মানব জাতির সামান্য লোকই কেবল তাওহীদুর রুবূবীয়াত এবং প্রভুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে।

কেউ কেউ প্রকাশ্যে প্রভু ও স্রষ্টাকে অস্বীকার করলেও গোপনে এবং হৃদয়ের গভীর থেকে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে। অহংকার করার কারণেই কেবল তারা প্রকাশ্যে প্রভুকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ তা'আলা ফেরাআউন সম্পর্কে বলেন যে, সে বলেছিল,

﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي﴾

"হে সভাসদবর্গ! আমি তো নিজেকে ছাড়া তোমাদের আর কোনে প্রভু আছে বলে জানি না"। (সূরা কাসাসঃ ৩৮)

আল্লাহর নাবী মূসা 'আলাইহিস সালামের কথা থেকে বুঝা যায় ফেরাউন আল্লাহর উপর ঈমান রাখতো। আল্লাহ তা'আলা মূসার উক্তি উল্লেখ করে বলেন,

﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ﴾

"তুমি খুব ভাল করেই জান এ প্রজ্ঞাময় নিদর্শনগুলো আকাশ ও পৃথিবীর রব ছাড়া আর কেউ নাযিল করেননি"। (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ১০২) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾

"তারা একেবারেই অন্যায়ভাবে অহংকারের সাথে নিদর্শনগুলো অস্বীকার করলো অথচ তাদের মনমগজ সেগুলোর সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছে"। (সূরা নামালঃ ১৪)

তারা সত্য অস্বীকারের ক্ষেত্রে কোনো দলীল-প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেনি। কেবল অহংকার করেই তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾

"এরা বলে, জীবন বলতে তো শুধু আমাদের দুনিয়ার এ জীবনই। আমাদের জীবন ও মৃত্যু এখানেই এবং কালের বিবর্তন ছাড়া আর কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করে না। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে এদের কোনো জ্ঞান নেই। এরা শুধু ধারণার উপর নির্ভর করে এসব কথা বলে"। (সূরা জাছিয়াঃ ২৪)

সুতরাং তাদের কাছে এমন কেনো জ্ঞান ছিল না, যা তাদেরকে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করার পথ দেখিয়েছে: বরং আসমানী শরী'আত, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এবং সৃষ্টিগত স্বভাব সবই স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার ও সাব্যস্ত করেছে।

এ সৃষ্টিজগত এবং তাতে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে তা সবই আল্লাহ তা'আলার একত্ব এবং তার প্রভুত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা থাকা আবশ্যক। সৃষ্টিজগতে যা কিছু প্রবর্তিত হচ্ছে, তার জন্য প্রবর্তক থাকা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لاَ يُوقِنُونَ﴾

"তারা কি কোনো কিছু ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে? না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না"। (সূরা আত তুরঃ ৩৫-৩৬)

কবি বলেছেন, وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ... تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِد প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে তার নিদর্শন রয়েছে, যা প্রমাণ করে তিনি একক। তারা কি কোনো কিছু ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে? না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? এ প্রশ্নটির জবাব দেয়া আবশ্যক। তাই স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে নাস্তিকরা এলোমেলো জবাব দিয়েছে। তারা কখনো বলেছে, প্রকৃতির নিয়মেই এ সৃষ্টিজগত সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মতে উদ্ভিদ, জীব ও জড় বস্তুকে প্রকৃতি বলা হয়। এ বিশাল সৃষ্টিজগতের সবকিছু তাদের নিকট প্রকৃতি। এ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে!!

তারা কখনো বলেছে, উদ্ভিদ, জীব ও জড় বস্তুর বিভিন্ন স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের নামই প্রকৃতি। যেমন গরম হওয়া, ঠান্ডা হওয়া, আর্দ্র হওয়া, শুষ্ক হওয়া, মসৃণ হওয়া, মোটা হওয়া, নড়াচড়া করা, স্থির হওয়া, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া, প্রজনন, বংশ বিস্তার করা ইত্যাদি সব কিছু প্রাকৃতিক নিয়মে হয়। তাদের মতে বস্তুসমূহের স্বভাব এবং বিভিন্ন অবস্থায় সেটা রূপান্তরিত হওয়ার যে যোগ্যতা ও ক্ষমতা রাখে তাকেই প্রকৃতি বলা হয়। তাদের মতে এ স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যগুলোই সৃষ্টিজগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছে।

উভয় দিক থেকেই তাদের কথা বাতিল। যদি বলা হয় উদ্ভিদ, জীব ও জড় পদার্থগুলোর নামই প্রকৃতি এবং প্রকৃতি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে, তাহলে তাদের কথা অনুযায়ী প্রকৃতি একই সাথে স্রষ্টা ও সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক হয়। এতে আবশ্যক হয় যে, পৃথিবী নিজেই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছে, আকাশও নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে। অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে কথা একই...। এটি অসম্ভব।

এভাবে প্রকৃতির নিয়মে এক বস্তুর সত্তা থেকে সমজাতীয় আরেক বস্তুর সত্তা সৃষ্টি হওয়া যদি অসম্ভব হয়, তাহলে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সৃষ্টি হওয়া আরো বেশী কঠিন। অর্থাৎ কেননা কোনো বস্তু নিজেই যদি নিজেকে সৃষ্টি করতে না পারে, তাহলে বস্তুর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য বস্তুকে সৃষ্টি করা আরো বেশী অসম্ভব। কেননা موصوف বা বিশেষিত সত্তার সাথে যুক্ত না হয়ে صفة বা স্বভাব ও বিশেষণ অস্তিত্বশীল হয় না। সুতরাং ছিফাত কীভাবে মাউসুফকে সৃষ্টি করতে পারে!! অথচ ছিফাত নিজেই মাউসুফের প্রতি মুখাপেক্ষী। সুতরাং যখন দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে মাউসুফ সৃষ্টি হয়েছে, তখন এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ছিফাতও সৃষ্টি হয়েছে। আরেকটি কথা বুঝা দরকার যে, প্রকৃতির কোনো অনুভূতি নেই। এটি একটি যন্ত্রের মত। সুতরাং তা থেকে কীভাবে এত বিশাল বিশাল ও সুনিপুন-অভিনব কাজ-কর্ম তৈরী হতে পারে, যা সর্বোচ্চ প্রজ্ঞার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং যা পরস্পর মিলে একটি সুশৃঙ্খল বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে।

নাস্তিকদের কেউ কেউ বলে থাকে, এ সৃষ্টিজগত আকস্মিকভাবে তৈরী হয়। অর্থাৎ আকস্মিকভাবে অনেকগুলো অণু-পরমাণু ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু একসাথে মিলিত হয়ে প্রাণ তৈরী হয়। এতে কোনো স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থাপনা ও কলা-কৌশলের প্রয়োজন হয় না। এটি একটি বাতিল কথা। বিবেক-বুদ্ধি ও সৃষ্টিগত স্বভাব এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। কেননা আপনি যখন এ সুশৃঙ্খল সৃষ্টিজগতের মহাশূন্য, ভূপৃষ্ঠ এবং মহাকাশে সূক্ষ্ম,

বিস্ময়কর ও সুবিন্যস্তভাবে চলাচলকারী সৃষ্টিসমূহের প্রতি গভীর দৃষ্টি দিবেন, তখন আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয় যাবে যে, প্রজ্ঞাবান এক স্রষ্টা ব্যতীত এসব তৈরী হওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তুমি স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী নাস্তিককে জিজ্ঞাসা করো, ঐ মেশিনের ব্যাপারে তোমার ধারণা কী, যা একটি নদীতে রাখা হয়েছে। তার যন্ত্রাংশগুলো মজবুত, সেগুলো মজবুতভাবে লাগানো হয়েছে এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেগুলো তৈরী করা হয়েছে। দর্শক মেশিনের ভিতরে যেমন কোনো দোষ ধরতে পারে না তেমনি তার বাহ্যিক সৌন্দর্যের মধ্যেও কোনো ত্রুটি খুঁজে পায় না। আর এ মেশিনটি দিয়ে বিরাট একটি বাগানে পানি দেয়া হচ্ছে। বাগানে রয়েছে প্রত্যেক প্রকার ফলফলাদির গাছপালা। মেশিনটি বাগানের গাছপালা ও ফল-ফসলের চাহিদা মোতাবেক পানি সরবরাহ করছে। ঐদিকে বাগানকে ঠিক-ঠাক রাখার জন্য তাতে একজন পরিচর্যাকারী রয়েছে। সে ভালোভাবে বাগানের যত্ন নেয়, খোঁজ-খবর রাখে এবং বাগানের সার্বিক কাজ-কর্ম সম্পন্ন করে। বাগানের কোনো কিছুই ত্রুটিযুক্ত রাখে না। অতঃপর লোকটি বাগানের ফল-ফসল উঠিয়ে মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে তাদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করে দেয়। প্রত্যেক শ্রেণির মানুষকেই প্রয়োজন মোতাবেক দান করে। সর্বদা সে এ রকমই করতে থাকে। তুমি কি মনে করো কোনো কারিগর ও ব্যবস্থাপক ছাড়াই বাগান এবং তার সবকিছু আকস্মিকভাবে হয়ে গেছে?

বাগানে পানি দেয়ার যন্ত্রটি এমনিতেই হয়ে গেছে? বাগান ও তার ভিতরকার পরিবেশ হঠাৎ করেই তৈরী হয়েছে?

কোনো কর্তা, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক ছাড়াই এসব কিছু আকস্মিকভাবেই হয়ে গেছে?

তোমার যদি বিবেক-বুদ্ধি থাকে, তাহলে এসবের ব্যাপারে তোমার বিবেক কী বলে তা খেয়াল করো। তোমার বিবেক কী জবাব দেয় তা ভালোভাবে বুঝো এবং কী দিক নির্দেশনা দেয় তা অনুধাবন করো। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলার হিকমতের দাবি এ যে, তিনি এমন কিছু অন্তর সৃষ্টি করেছেন, যা সম্পূর্ণ অন্ধ, তাতে কোনো আলো নেই। যার কারণে সে উজ্জ্বল ঝকঝকে নিদর্শনগুলো কেবল ঐসব চতুষ্পদ জন্তুর মতোই দেখতে পায় যাদের চক্ষু আছে ঠিকই; কিন্তু তাতে কোনো আলো নেই। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের উক্তি এখানেই শেষ।

المبحث الثاني: توحيد الألوهية

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: তাওহীদুল উলূহীয়া

সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য খাছভাবে সম্পন্ন করাকে توحيد الألوهية বলা হয়। উলূহীয়াত অর্থ ইবাদত। الإله অর্থ মাবুদ। এ জন্যই এ প্রকার তাওহীদকে توحيد العبادة বলেও নামকরণ করা হয়।

العبادة শব্দের আভিধানিক অর্থ নত হওয়া, বশীভূত হওয়া, পদদলিত হওয়া ইত্যাদি। যখন কোনো রাস্তার উপর দিয়ে পদচারণ করা হয়, তখন তাকে طريق معبد বলা হয়। অর্থাৎ পদদলিত ও বশীভূত রাস্তা। আলেমগণ ইবাদতের পারিভাষিক অর্থ আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন বাক্য ব্যবহার করেছেন। তবে তার মূল অর্থে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

একদল আলেমের মতে প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও বিবেক-বুদ্ধির দাবি ছাড়াই যা বাস্তবায়ন করার জন্য শরী'আতের পক্ষ হতে আদেশ করা হয়েছে, তাই ইবাদত। আরেক দল আলেমের মতে পরিপূর্ণ বিনয় মিশ্রিত পরিপূর্ণ ভালোবাসাকে ইবাদত বলা হয়। শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) ইবাদতের পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة

আল্লাহ তা'আলা বান্দার যেসব প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কথা ও কাজকে ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন, তার নামই ইবাদত।

ইবাদতের এ সংজ্ঞাটিই সর্বাধিক সূক্ষ্ম ও অধিকতর ব্যাপক। কেননা দীনের সবকিছুই ইবাদতের মধ্যে গণ্য। যারা বিনয় মিশ্রিত ভয়কে ইবাদত বলে নামকরণ করেছেন, তাদের কথা হলো পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে পরিপূর্ণ ভালোবাসা প্রিয়পাত্রের আনুগত্য করা ও তার সামনে নত হওয়ার দাবি জানায়। বান্দাকে কেবল ভালোবাসা ও বিনয়ই প্রিয়পাত্রের জন্য নত করে। সুতরাং বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসা ও তার সামনে নত হওয়া অনুপাতেই বান্দার আনুগত্য হয়ে থাকে। বান্দার তরফ থেকে তার রবের প্রতি ভালোবাসা এবং তার রবের সামনে বিনয়ী ও নত হওয়া একমাত্র তারই ইবাদতের দাবি জানায়। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তার কোনো শরীক নেই।

ইসলামী শরী'আতে যেসব ইবাদতের আদেশ এসেছে, তাতে একই সঙ্গে বিনয়-নম্রতা ও ভালোবাসা থাকা আবশ্যক। এতে তিনটি রুকন থাকা জরুরী। ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্খা এবং ভয়-ভীতি। ইবাদতের মধ্যে এসব বিষয় একসাথে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তির মধ্যে এগুলো থেকে শুধু একটি পাওয়া যাবে, সে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতকারী নয়। অন্তরে শুধু ভালোবাসা নিয়ে ইবাদত করা ছূফীদের তরীকা, শুধু আশা-আকাঙ্খা নিয়ে ইবাদত করা মুরজিয়াদের তরীকা, আর শুধু ভয় নিয়ে ইবাদত করা খারেজীদের তরীকা।

বিনয়হীন ভালোবাসা ইবাদতের মধ্যে গণ্য নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো জিনিসকে ভালোবাসে ঠিকই; কিন্তু তার সামনে নত হয় না, সে তার ইবাদতকারী হিসাবে গণ্য নয়। যেমন কোনো মানুষ তার সন্তান ও বন্ধুবান্ধবকে ভালোবাসে। এ ভালোবাসা ইবাদত নয়। এমনি ভালোবাসাবিহীন নতি স্বীকারও ইবাদত নয়। যেমন রাজা-বাদশা কিংবা যালেম ও সন্ত্রাসীর ক্ষতি থেকে বাচার জন্য মানুষ তাদের সামনে নত হয়। এ নতি স্বীকারও ইবাদত নয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের ক্ষেত্রে এ দু'টি বিষয়ের একটি অন্যটি থেকে আলাদা হলে ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে না। বরং বান্দার নিকট আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক প্রিয় হওয়া আবশ্যক। সে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার সামনে বান্দা সর্বাধিক বিনয়ী হওয়া ও নতি স্বীকার করা আবশ্যক। সুতরাং বান্দার ইবাদত আল্লাহ তা'আলার কাছে খুব প্রিয় এবং এটা তার সন্তুষ্টি পাওয়ার মাধ্যম। ইবাদতের জন্যই আল্লাহ তা'আলা মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

"আমি জিন এবং মানবকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোনো রিযিক চাই না কিংবা তারা আমাকে খাওয়াবে তাও চাই না। আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং প্রবল শক্তিধর ও পরাক্রমশালী"। (সূরা যারিয়াত ৫১: ৫৬-৫৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন.

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি। তার মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়েছি যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, আর ত্বগূতকে বর্জন করো"। (সূরা আন নাহল ১৬: ৩৬)

أنواع العبادة

ইবাদতের প্রকারভেদ

ইবাদতের অনেক প্রকার রয়েছে। যেমন ছ্বলাত, যাকাত, ছ্বিয়াম, হাজ্জ, কথা-বার্তায় সত্য বলা, আমানত আদায় করা, পিতা-মাতার সেবা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করা, সৎকাজের আদেশ দেয়া, অন্যায় কাজে বাধা দেয়া, কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, জীবের প্রতি দয়া করা, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির ও দাস-দাসির প্রতি অনুগ্রহ করা, জীব-জন্তুর প্রতি ইহসান করা, আল্লাহর নিকট দু'আ করা, আল্লাহর যিকির করা, কুরআন তেলাওয়াত করা ইত্যাদি। এসবগুলোই

ইবাদতের মধ্যে গণ্য। এমনি আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসা, আল্লাহর রসূলকে ভালোবাসা, আল্লাহকে ভয় করা এবং তার নিকট তাওবা করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। এমনি কুরবানী করা, মানত করা, আশ্রয় প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া এবং ফরিয়াদ করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করা আবশ্যক। তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং তার কোনো শরীক নেই। এগুলো থেকে কোনো কিছু যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য সম্পাদন করলো, যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দু'আ করলো, অথবা কুরবানী করলো কিংবা মানত করলো, কিংবা মৃত-অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট সাহায্য বা আশ্রয় চাইলো অথবা জীবিত উপস্থিত ব্যক্তির নিকট এমন বিষয়ে সাহায্য চাইলো, যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না, সে বড় শিরকে লিপ্ত হলো এবং এমন ভয়াবহ গুনাহয় লিপ্ত হলো, যা তাওবা ছাড়া ক্ষমা করা হবে না। চাই সে এগুলো থেকে কোনো কিছু মূর্তির উদ্দেশ্যে বা গাছের উদ্দেশ্যে অথবা পাথরের উদ্দেশ্যে অথবা কোনো নাবীর উদ্দেশ্যে বা কোনো মৃত বা জীবিত ওলীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত করুক, সবই শিরক। যেমন বর্তমানে কবরের উপর নির্মিত সমাধিগুলোর নিকট করা হয়ে থাকে। ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সাথে কেউ অন্যকে শরীক করুক, -এটি আল্লাহ তা'আলা মোটেই পছন্দ করেন না। চাই কোনো নৈকট্যশীল ফেরেশতা, প্রেরিত রসূল, ওলী বা অন্য কাউকে শরীক করা হোক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

"আল্লাহ তার সাথে শিরক করার গুনাহ মাফ করবেন না। শিরক ছাড়া অন্যান্য যেসব গুনাহ রয়েছে সেগুলো যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন।" (সূরা আন নিসা: ৪৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

"মাসজিদসমুহ আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে ডেকো না"। (সূরা আল জিন: ১৮) সূরা আন নিসার ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না"।

অত্যন্ত আফসোসের ব্যাপার হলো বর্তমানে বেশ কিছু দেশে ইসলামের দাবিদার অনেক লোক কবরকে মূর্তি বানিয়ে আল্লাহর পরিবর্তে সেগুলোর পূজা করছে। কখনো কখনো তাদের কেউ কেউ কবর ছাড়া অন্যান্য স্থানেও আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দু'আ করে থাকে। কেউ কেউ বসা থেকে উঠার সময় কিংবা আকস্মিক কোনো বিপদা-পদের

সম্মুখীন হয়ে বলে ফেলে, ইয়া রসূলাল্লাহ! অথবা বলে মদদ ইয়া রসূলাল্লাহ! মদদ ইয়া ফুলান!

তাদেরকে এ ধরনের কাজ থেকে নিষেধ করা হলে তারা বলে, আমরা জানি এদের হাতে কোনো ক্ষমতা নেই বা এদের কিছু করার নেই, তবে এরা আল্লাহর সৎ বান্দা, আল্লাহর নিকট তাদের মান-মর্যাদা ও ক্ষমতা আছে। আমরা তাদের মান-মর্যাদার উসীলায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি। অথচ কুরআন পড়া সত্ত্বেও তারা কুরআনের এ কথা ভুলে গেছে কিংবা ভুলে যাওয়ার ভান করছে যে, হুবহু এ কথাই ছিল মক্কার মুশরিকদের। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথাকে উল্লেখ করেছেন। যেমন-আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"আর তারা ইবাদত করে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, এরা তো আল্লাহ্র কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী। তুমি বলো, তোমরা কি আল্লাহ্কে এমন বিষয়ে অবহিত করছো, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি পবিত্র সেসব বস্তু থেকে যাকে তোমরা শরীক করছো"। (সূরা ইউনুসঃ ১৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

"যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য ওলী-আওলীয়াদেরক উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফায়ছালা করে দিবেন। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না"। (সূরা আয যুমারঃ ৩)

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যুক ও কাফের হিসাবে নাম দিয়েছেন। তারা বিশ্বাস করে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য এসব ওলী-আওলীয়া আল্লাহ তা'আলা ও তাদের মধ্যে শুধু মধ্যস্থতাকারী। বর্তমানে কবরপূজারীরা এ কথাই বলে। আসলে তাদের অন্তর এবং আইয়্যামে জাহেলীয়ার মুশরিকদের অন্তর পরস্পর সমান। আলেম সমাজের উপর আবশ্যক হলো, তারা যেন এ নিকৃষ্ট শিরকের প্রতিবাদ করেন এবং মানুষের জন্য এর ভয়াবহতা বর্ণনা করেন। মুসলিম শাসকদের উচিত এ কবরগুলো ভেঙ্গে ফেলা এবং যেসব মসজিদে কবর রয়েছে, তা থেকে সেগুলো সরিয়ে ফেলে মাসজিদগুলো পবিত্র করা।

মুসলিমদের অনেক ইমাম এসব শিরকের প্রতিবাদ করেছেন, তা থেকে নিষেধ করেছেন, সাবধান করেছেন এবং এর ভয়াবহ পরিণতির ভয় দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া, তার সুযোগ্য শিষ্য ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আস সানআনী, মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ শাওকানী এবং অতীত ও বর্তমানের আরো অনেক ইমাম রয়েছেন। এ বিষয়ে লেখা তাদের কিতাবগুলো আমাদের হাতেই রয়েছে।

ইমাম শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় কিতাব নাইলুল আওতারে বলেন, কবরের উপর সমাধিগুলো মজবুতভাবে নির্মাণ করা এবং সেটাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার এমন ফিতনা-ফাসাদ চালু হয়েছে, যার জন্য ইসলাম তার চোখের পানি ফেলছে। অজ্ঞ মুসলিমরা এগুলোর প্রতি ঐ রকমই আক্বীদা পোষণ করছে, যেমন আক্বীদা পোষণ করেছিল কাফেররা তাদের মূর্তিগুলোর প্রতি। ক্ষেত্র বিশেষে এর চেয়ে ভয়াবহ আক্বীদাও রাখছে। তাদের ধারণা এই কবরগুলো তাদের উপকার করতে এবং বিপদাপদ দূর করতে সক্ষম। তাই তারা প্রয়োজন পূরণের জন্য এগুলোকে উদ্দেশ্য হাসিলের স্থান ও আশ্রয় স্থলে পরিণত করেছে। এখান থেকে তারা সেটাই চাচ্ছে, যা আল্লাহর বান্দারা কেবল তার কাছেই চায়। এগুলোর দিকে তারা সফর করছে, এখানে তারা কবর ও সমাধিগুলো স্পর্শ করছে এবং ফরিয়াদ করছে। মোটকথা মক্কার মুশরিকরা জাহেলী যুগে তাদের মূর্তির নিকট যা করতো এ যুগের কবর পূজারীরা কবরের নিকট তা থেকে একটিও বাদ দেয়নি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এত বড় অন্যায় ও কুফরী মুসলিম সমাজে বিদ্যমান থাকার পরও কাউকে আল্লাহর জন্য রাগান্বিত হতে এবং তার পবিত্র দীনের জন্য ক্রোধান্বিত হতে দেখা যায় না। কোনো আলেম, ছাত্র, শাসক, মন্ত্রী বা বাদশাহ কেউই এগুলোর প্রতিবাদ করার আগ্রহ দেখাচ্ছে না!!

বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের কাছে অনেক খবর এসেছে যে, অনেক কবরপূজারী আছে, তাদেরকে যদি কোনো ব্যাপারে আল্লাহর নামে কসম করতে বলা হয়, তখন আল্লাহর নামে সরাসরি মিথ্যা কসম খেয়ে বসে। অতঃপর যখন তাকে ঐ বিষয়ে তার শাইখের নামে অথবা তার ওলীর নামে কসম খেতে বলা হয়, তখন তোতলানো ও ইতস্ততা শুরু করে এবং গড়িমসি করে। পরিশেষে তার ওলীর নামে কসম খেতে অস্বীকার করে এবং ঐ ব্যাপারে সত্য স্বীকার বরে। এটি সত্য সুস্পষ্ট দলীল যে, তাদের শিরক ঐসব লোকের শিরকের চেয়েও ভয়াবহ, যারা বলে নিশ্চয় আল্লাহ দুই মাবুদের এক মাবুদ অথবা তিন মাবুদের এক মাবুদ। হে মুসলিমদের আলেম সম্প্রদায়! হে মুসলিমদের শাসক গোষ্ঠি! আপনারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন।

ইসলামের জন্য কুফরের চেয়ে অধিক বিপর্যয় আর কিছু আছে কি? এ দীনের মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করার চেয়ে অধিক বিপদ আর কিছু আছে কি? মুসলিমরা যত মুছীবতে আক্রান্ত হয়ে থাকে এর মতো আর কোনো মুছীবত নেই। এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যদি ওয়াজিব না হয়, তাহলে প্রতিবাদ করার মত আর কোনো অন্যায় মুসলিমদের সামনে আছে বলে আমি মনে করি না। কোনো এক আরব কবি বলেছেন,

لقد أسمعت لو ناديت حيا + ولكن لا حياة لمن تنادي

ولو نارا نفخت بها أضاءت ، ولكن أنت تنفخ في رماد

তুমি যদি কোনো জীবিত মানুষকে ডাকতে, তাহলে তুমি তাকে শুনাতে সক্ষম হতে। কিন্তু তুমি এমন কাউকে ডাকছো, যে প্রাণহীন। তুমি যদি আগুনে ফুঁ দিতে তাহলে সেটা আলোকিত করতো। কিন্তু তুমি যাতে ফুঁ দিচ্ছো, তা ছাই ব্যতীত অন্য কিছু নয়। ইমাম শাওকানীর কথা এখানেই শেষ।

ইমাম শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) তার সময়ের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তার যুগের পর মুছীবত আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية والعكس

তাওহীদুল উলূহীয়া এবং তাওহীদুর রুবূবীয়ার মধ্যকার সম্পর্ক

উপরোক্ত দু'প্রকার তাওহীদের এক প্রকারের সাথে অন্য প্রকারের সম্পর্ক হলো, তাওহীদুর রুবূবীয়া তাওহীদুল উলূহিয়াকে আবশ্যক করে। অর্থাৎ তাওহীদুর রুবূবীয়াহকে স্বীকৃতি দেয়া তাওহীদুল উলূহীয়ার স্বীকৃত প্রদানকে আবশ্যক করে এবং সেটাকে বাস্তবায়ন করার দাবি জানায়।

সুতরাং যে ব্যক্তি জানতে পারবে, আল্লাহ তার প্রভু, স্রষ্টা এবং তার সকল কাজের ব্যবস্থাপক, তার উপর আবশ্যক হয়ে যাবে যে, সে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে। তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং তার কোনো শরীক নেই।

এমনি তাওহীদুল উলূহীয়া তাওহীদুর রুবূবীয়াকেও শামিল করে। অর্থাৎ তাওহীদুর রুবূবীয়াহ তাওহীদুল উলূহীয়ার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে, তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে না, সে অবশ্যই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলাই তার একমাত্র প্রভু ও স্রষ্টা। যেমন ইবরাহীম খলীল 'আলাইহিস সালাম বলেছেন,

□أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٥ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٧٦ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٧٧ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ٧٨ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ٧٩ وَإِذَا مَرِضْتُ

فَهُوَ يَشۡفِينِ ٨٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحۡيِينِ ٨١ وَٱلَّذِيٓ أَطۡمَعُ أَن يَغۡفِرَ لِي خَطِيٓـَٔتِي يَوۡمَ ٱلدِّينِ□

"তোমরা ভেবে দেখেছো কি তার সম্বন্ধে যার ইবাদত করছো? তোমরা এবং তোমাদের অতীতের পিতৃপুরুষেরা। বিশ্বজগতের প্রতিপালক ব্যতীত এরা তো সবাই আমার দুশমন। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ দেখান। তিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। তিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন এবং পুণর্বার আমাকে জীবন দান করবেন। এবং আশা করি তিনি ক্বিয়ামতের দিন আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করবেন। (সূরা আশ শুআরা ২৬: ৭৫-৮২)

তাওহীদুল উলূহীয়া এবং রুবূবীয়া কখনো একসাথে উল্লেখ করা হয়। যখন উভয়টি একসাথে উল্লেখ করা হবে, তখন উভয়ের অর্থ আলাদা হবে এবং একটি অন্যটির অংশ হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ﴾

"বলো, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের রবের। মানুষের অধিপতির। মানুষের মাবুদের"। (সূরা আন নাস ১১৪: ১-৩)

এখানে الرب অর্থ সৃষ্টির মালিক এবং তাদের মধ্যে কর্তৃত্বকারী। আর الإله অর্থ হবে সত্য মাবুদ, যিনি ইবাদতের একমাত্র হকদার।

কখনো উভয় প্রকার তাওহীদের একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়। তখন উভয়টি একই অর্থ প্রদান করে। যেমন কবরে নাকীর-মুনকার ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে, من ربك তোমার প্রভু কে? এখানে ربك অর্থ হবে তোমরা মাবুদ ও স্রষ্টা কে? যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾

"যাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র এ অপরাধে যে, তারা বলেছিল, আল্লাহ আমাদের রব"। (সূরা আল হাজ্জ: ৪০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾

"বলো, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো রবের সন্ধান করবো অথচ তিনিই সবকিছুর মালিক? (সূরা আল আন'আম ৬:১৬৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَبۡشِرُواْ بِٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ ٣٠ نَحۡنُ أَوۡلِيَآؤُكُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۖ وَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَشۡتَهِيٓ أَنفُسُكُمۡ وَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣١ نُزُلٗا مِّنۡ غَفُورٖ رَّحِيمٖ﴾

“নিশ্চয় যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে বলতে থাকে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমাদের মন চায় এবং তোমরা যা দাবী কর। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। (সূরা হামীম সাজদাহ ৪১: ৩০-৩২)

রসূলগণ উপরোক্ত দু’প্রকার তাওহীদের মধ্য থেকে যে প্রকার তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, সেটা হলো তাওহীদুল উলূহীয়াহ। কেননা অধিকাংশ জাতিই তাওহীদুর রুবূবীয়াহকে স্বীকার করে নিয়েছে। অল্প সংখ্যক লোক কেবল এটাকে অস্বীকার করেছে। তারাও আবার প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছে। অন্তরে অন্তরে তারা স্রষ্টার অস্তিত্ব ও রুবূবীয়াতকে স্বীকার করতো।

তবে শুধু রুবূবীয়াতকে স্বীকার করা মুসলিম হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। ইবলীসও রুবূবীয়াতকে স্বীকার করেছিল। সে বলেছিল,

﴿رَبِّ بِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ﴾

“হে আমার রব! তুমি যেমন আমাকে বিপথগামী করলে ঠিক তেমনিভাবে আমি পৃথিবীতে এদের জন্য প্রলোভন দেখিয়ে এদের সবাইকে বিপথগামী করবো”। (সূরা আল হিজর ১৫: ৩৯)

মক্কার যেসব মুশরিকের নিকট আল্লাহ তা‘আলা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছিলেন তারাও রুবূবীয়াতকে স্বীকার করেছিল। অনেক সুস্পষ্ট আয়াত এ কথা প্রমাণ করে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَهُمۡ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ﴾

“আর যদি তোমরা এদের জিজ্ঞাসা করো, কে এদের সৃষ্টি করেছে তাহলে এরা নিজেরাই বলবে, আল্লাহ। তাহলে কোথা থেকে এরা প্রতারিত হচ্ছে? (সূরা আয যুখরুফ ৪৩: ৮৭)

সুতরাং যে ব্যক্তি শুধু তাওহীদুর রুবূবীয়ার স্বীকৃতি প্রদান করলো সে মুসলিম হবে না। যতক্ষণ না সে তাওহীদুল উলূহীয়াতের স্বীকৃতি দিবে এবং এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে। তাওহীদুল উলূহীয়াতের স্বীকৃতি না দিলে তার জান-মাল নিরাপদ হবে না।

এর মাধ্যমে ঐসব ছূফী ও যুক্তিবাদীদের বিভ্রান্তিকর ধারণা বাতিল প্রমাণিত হলো, যারা বলে বান্দাদের থেকে যে তাওহীদ উদ্দেশ্য তা হলো তারা কেবল এই স্বীকৃতি দিবে যে আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক। যারা এ কথা স্বীকার করবে তারাই তাদের নিকট মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে। এ জন্যই তারা আক্বীদা বিষয়ে যেসব কিতাব লিখেছে, তাতে তারা তাওহীদের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা কেবল তাওহীদুর রুবূবীয়াতের উপর প্রযোজ্য হয়। তারা বলে, তাওহীদ হলো আল্লাহ আছে এ কথার স্বীকৃতি দেয়া, তিনিই রিযিক দাতা এবং তিনিই সৃষ্টিকর্তা। এরপর তারা শুধু তাদের কথার উপর রুবূবীয়াতের দলীলগুলো পেশ করে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যেসব যুক্তিবাদী আলেম তাদের ইলমে কালামের কিতাবসমূহে তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েছে, তারা তাওহীদকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। তারা বলে,

(১) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তায় একক, তার কোনো অংশ নেই।

(২) তিনি তার ছিফাতসমূহের ক্ষেত্রে একক, তার কোনো সদৃশ নেই এবং

(৩) তিনি তার কর্মসমূহে একক, তার কোনো শরীক নেই। এ তিন প্রকারের মধ্যে তাদের নিকট সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলো আল্লাহ তা'আলার কর্ম সম্পর্কিত তাওহীদ। তাহলো সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা মাত্র এক। তারা এর উপর التمانع এবং অন্যান্য দলীল পেশ করে থাকে।[১০] তাদের ধারণায় এটিই হলো আসল তাওহীদ এবং এটিই আমাদের কালেমা তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ। তারা সৃষ্টি করার উপর ক্ষমতা রাখাকেই উলূহীয়াতের অর্থ হিসাবে নির্ধারণ করেছে।

জানা কথা যে, আরবের যেসব মুশরিকের নিকট মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানো হয়েছিল, তারা এ বিষয়ে তার বিরোধীতা করেনি। বরং তারা স্বীকার করতো যে, আল্লাহ তা'আলাই প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা। এমনকি তারা তাক্বদীরের প্রতিও

---

[১০] المنع শব্দের অর্থ التمانع এর মধ্যে বিদ্যমান। এটি কোনো জিনিস অর্জিত না হওয়া বা বাধা প্রদান করার অর্থ প্রদান করে। কুরআন ও হাদীছের কোথাও আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের ব্যাপারে التمانع শব্দের উল্লেখ না থাকলেও এর অর্থ কুরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

"আল্লাহ কাউকে নিজের সন্তানে পরিণত করেননি এবং তার সাথে অন্য কোনো ইলাহও নেই। যদি থাকতো তাহলে প্রত্যেক ইলাহ নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো এবং তারপর একজন অন্যজনের উপর চড়াও হতো। এরা যেসব কথা তৈরী করে তা থেকে আল্লাহ পাক-পবিত্র"। (সূরা মুমিনুন: ৯১)

যুক্তিবিদরা আল্লাহ তা'আলার একত্বের ব্যাপারে এটি উল্লেখ করে থাকে। ইমাম রাযি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কালাম শাস্ত্রবিদ একত্বের অনেক প্রমাণ উল্লেখ করেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দলীল হলো دليل التمانع অর্থাৎ এক সঙ্গে দুই স্রষ্টার ধারণা অসম্ভব হওয়ার দলীল।

ঈমান আনয়ন করতো। এরপরও তারা মুশরিকই ছিল। এই হলো শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার বক্তব্য। এখানে সুস্পষ্টভাবে ঐসব লোকের আক্বীদার প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা বলে সৃষ্টির পক্ষ হতে কাঙ্খিত তাওহীদ হলো কেবল তাওহীদুর রুবূবীয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করা। কুরআনের এ আয়াতটি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এর কথাকে সমর্থন করে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি। তার মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়েছি যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, আর ত্বগূতকে বর্জন করো" (সূরা আন নাহাল ১৬:৩৬)

রসূলগণ তাদের জাতিকে এটি বলেননি যে, তোমরা স্বীকার করো যে, আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা। কেননা তারা আগে থেকেই স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করতো। এ জন্যই তারা বলেছেন,

﴿اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, আর ত্বগূতকে বর্জন করো *(সূরা আন নাহল ১৬:৩৬)।*

শাইখুল ইসলাম আরো বলেন, রসূলগণ যে প্রকার তাওহীদ নিয়ে এসেছেন, তা হলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য উলূহীয়াত সাব্যস্ত করা। লোকেরা এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না। তিনি আরো বলেন, তাওহীদ বলতে শুধু তাওহীদুর রুবূবীয়াত উদ্দেশ্য নয়। তাওহীদুর রুবূবীয়াহ হলো এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা একাই সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন। ছূফী এবং কালাম শাস্ত্রবিদরা এ রকমই মনে করে। তারা মনে করে, দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে যখন তা সাব্যস্ত করা হবে, তখন তারা সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক পরিপূর্ণ তাওহীদ সাব্যস্ত করেছে। তারা যখন এটি সাব্যস্ত করে এবং এর মধ্যে ফানা-বিলীন হয়ে যায়, তখন তারা সর্বোচ্চ তাওহীদের মধ্যেই ফানা-বিলীন হয়েছে বলে মনে করে।

কোনো মানুষ আল্লাহ তা'আলার জন্য শোভনীয় ও উপযুক্ত ছিফাতগুলো সাব্যস্ত করলেই, তিনি নিজেকে যেসব ত্রুটিযুক্ত স্বভাব থেকে পবিত্র করেছেন, তা থেকে তার পবিত্রতার ঘোষণা দিলেই এবং এটি স্বীকার করলেই তাওহীদপন্থি মুসলিম হয়ে যায় না যে, আল্লাহ তা'আলাই সবকিছুর একমাত্র স্রষ্টা। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সাক্ষ্য না দিবে যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই, এটি স্বীকার না করবে যে, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র মাবুদ হওয়ার যোগ্য, তিনিই বান্দাদের ইবাদতের একমাত্র হকদার এবং সে সঙ্গে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পাবন্দী না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাওহীদপন্থি মুসলিম বলে গণ্য হবে না।

إله অর্থ হলো সে মাবুদ, যিনি বান্দাদের ইবাদত পাওয়ার একমাত্র হকদার। সৃষ্টি করতে সক্ষম হওয়াই ইলাহ-এর অর্থ নয়। সুতরাং যারা إله -কে এভাবে ব্যাখ্যা করবে যে, তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম বা তিনি ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই, যারা বিশ্বাস করবে, এটিই ইলাহ এর সবচেয়ে বড় গুণ এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য এ অর্থ সাব্যস্ত করাই তাওহীদের মূল উদ্দেশ্য, তারা তাওহীদের হাকীকত বুঝতে পারেনি। যে তাওহীদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকে পাঠিয়েছেন, তারা সেটা বুঝতে পারেনি। আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্তকারী কালাম শাস্ত্রবিদরা আবুল হাসান আশআরী ও তার অনুসারীর বরাত দিয়ে তাওহীদের উপরোক্ত ব্যাখ্যাই করে থাকে। আরবের মুশরিকরাও স্বীকার করতো যে, আল্লাহ তা'আলা একাই সবকিছু সৃষ্টিকারী। এটি স্বীকার করার পরও তারা মুশরিক ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾

"আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী অধিকাংশ মানুষ মুশরিক"। (সূরা ইউসুফ ১২: ১০৬)

সালাফদের একদল আলেম বলেছেন, তাদেরকে যদি এ কথা জিজ্ঞাসা করা হয় আসমান-যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা বলে, আল্লাহ। এ কথা স্বীকার করারও পরও তারা আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لِّمَنِ ٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٨٥ قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبۡعِ وَرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ٨٦ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٨٧ قُلۡ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيۡهِ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ فَأَنَّىٰ تُسۡحَرُونَ﴾

"তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা জানো তাহলে বলো, পৃথিবী এবং এর মধ্যে যারা বসবাস করছে তারা কার? তারা নিশ্চয়ই বলবে, সবই আল্লাহ্‌র। বলো, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি কে? তারা নিশ্চয় বলবে, আল্লাহ্। বলো, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা জেনে থাকো তাহলে বলো, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব? আর কে তিনি যিনি আশ্রয় দেন এবং তার মুকাবেলায় কেউ আশ্রয় দিতে পারে না? তারা নিশ্চয় বলবে এ বিষয়টি আল্লাহ্‌র জন্যই নির্ধারিত। বলো, তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?"। (সূরা মুমিনূন ২৩: ৮৪-৮৯)

আল্লাহ তা'আলাকে প্রত্যেক বস্তুর রব ও স্রষ্টা বলে স্বীকার করলেই মানুষ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদতকারী হয়ে যায় না এবং সবকিছু বাদ দিয়ে তার কাছে দু'আকারী হয়ে যায় না। সে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা জন্য বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরী কারী, আল্লাহ তা'আলার জন্য শত্রুতা পোষণকারী এবং রসূলদের অনুসারী হয়ে যায় না। সব মুশরিকই আল্লাহ তা'আলাকে স্রষ্টা হিসাবে স্বীকার করেছে। কিন্তু যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক

করেছে এবং যাদেরকে তার সমকক্ষ মনে করেছে তাদেরকে তারা আল্লাহর নিকট সুপারিশ ও মধ্যস্থতাকারী হিসাবে সাব্যস্ত করেছে।

শাইখুল ইসলাম আরো বলেন, যারা কেবল রুবূবীয়াত সাব্যস্ত করাকেই প্রকৃত তাওহীদ মনে করে তাদের অনুসারীদের মধ্য থেকে যারা সূর্য, চন্দ্র ও তারকাকে সেজদাহ করে, এগুলোকে আহবান করে, এদের জন্য ছিয়াম রাখে, কুরবানী করে এবং তাদের নৈকট্য হাসিল করে অতঃপর বলে এটি শিরক নয়; বরং শিরক তখনই হবে, যখন আমি এ বিশ্বাস করবো যে, এরা আমার কাজকর্মের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। আমি যখন এগুলোকে মাধ্যম ও মধ্যস্থতাকারী মনে করবো তখন আমি শিরককারী হবো না। অথচ দীন ইসলামের সাধারণ জ্ঞান যার আছে, সে বুঝতে সক্ষম হবে যে, এ কাজ শিরক। শাইখুল ইসলামের বক্তব্য এখানেই শেষ। আমি বলছি যে, বর্তমান সময়ের কবরপূজারীরা একই কথা বলে। বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে তারা কবরবাসীর নৈকট্য হাসিল করে এবং বলে এটি শিরক নয়। কেননা আমরা এ আক্বীদা পোষণ করি না যে, কবরে সমাধিস্থ ওলী-আওলীয়ারা সৃষ্টি ও তদবীর করতে পারে। আমরা কেবল কবরবাসীকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নির্ধারণ করি এবং তাদের উসীলা দেই মাত্র।

اساليب القرأن في الدعوة إلى توحيد الألوهية

তাওহীদুল উলূহীয়ার দিকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে কুরআনের পদ্ধতি

ফিতরাত বা সৃষ্টিগত স্বভাবের দাবি ও সৃষ্টিজগতের নিদর্শনাবলী দেখেই মানুষ যখন তাওহীদুর রুবূবীয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করেছে, আর শুধু স্বীকৃতি প্রদানই যেহেতু আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের জন্য যথেষ্ট নয় এবং স্বীকৃতি প্রদান কাউকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাবে না, তাই রসূলগণ তাওহীদুল উলূহীয়াতের দিকে দাওয়াত দেয়ার উপরে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষ করে সর্বশেষ ও সর্বোত্তম রসূল আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়টির উপর সবেচেয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি মানুষকে لاإله إلا الله বলার দাবি জানাতেন। এর দাবি হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং তিনি ছাড়া অন্যের ইবাদত বর্জন করা। লোকেরা তার কথা শুনে দূরে চলে যেতো। তারা বলেছিল,

﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾

“সে কি বহু মাবুদকে এক মাবুদে পরিণত করে দিয়েছে? নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার! (সূরা সোয়াদঃ ৫)

তারা নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দাওয়াত থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছে এবং তাদেরকে মূর্তিপূজার উপর ছেড়ে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন। এই জন্য তারা সকল প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কখনো তারা লোভ দেখিয়েছে আবার কখনো ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছে। তিনি বলতেন আল্লাহর কসম! তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় এবং এর বিনিময়ে আমাকে এ দীনের দাওয়াত ছেড়ে দিতে বলে, তাতেও আমি সম্মত হবো না। আল্লাহ তা‘আলা এ দীনকে বিজয়ী না করা পর্যন্ত অথবা আমরণ আমি এ দাওয়াত চালিয়ে যাবো।

তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দেয়ার আদেশসহ এবং মুশরিকদের সন্দেহগুলোর প্রতিবাদে কুরআনের আয়াতগুলো তার উপর নাযিল হতো। তাতে তাদের দীনের অসারতা প্রমাণের জন্য দলীল-প্রমাণও কায়েম করা হতো। তাওহীদুল উলূহীয়াতের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে কুরআনে অনেক পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্য থেকে আমরা এখানে কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করবো:

(১) আল্লাহ তা‘আলা একমাত্র তার ইবাদত করা এবং তাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত বর্জন করার আদেশ দিয়েছে।

সূরা আন নিসার ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

“তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। আর তার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না”।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

“হে মানব জাতি। ইবাদত করো তোমাদের রবের, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, এভাবেই তোমরা নিষ্কৃতি লাভের আশা করতে পারো। তিনিই তোমাদের জন্য মাটিকে বিছানা স্বরূপ বিছিয়েছেন, আকাশকে ছাদ স্বরূপ করেছেন, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে সব রকমের ফসলাদি উৎপন্ন করে তোমাদের আহার যুগিয়েছেন। অতএব জেনে-বুঝে তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ নির্ধারণ করো না”। (সূরা আল বাকারা ২: ২১-২২)

(২) কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি জিন-ইনসানকে একমাত্র তার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

"আমি জিন এবং মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি"। (সূরা যারিয়াত ৫১: ৫৬)

(৩) কুরআন সংবাদ দিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত রসূলকে একমাত্র তার দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য এবং তাকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করতে নিষেধ করার জন্য পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি। তার মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়েছি যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, আর ত্বগূতকে বর্জন করো"। (সূরা আন নাহাল ১৬: ৩৬)

(৪) তিনিই একমাত্র রব, স্রষ্টা এবং ব্যবস্থাপক বলে সংবাদ দেয়ার মাধ্যমে তাওহীদুল উলূহীয়ার উপর দলীল পেশ করেছেন। যেমন একটু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾

"হে মানব জাতি। ইবাদত করো তোমাদের রবের, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা আল বাকারা ২:২১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

"রাত-দিন এবং চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। সূর্য ও চাঁদকে সিজদা করো না, সে আল্লাহকে সিজদা করো যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, যদি সত্যিই তোমরা তার ইবাদতকারী হয়ে থাকো"। (সূরা হামীম সাজদা ৪১: ৩৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

"যে সৃষ্টি করেন এবং যে কিছুই সৃষ্টি করে না তারা উভয় কি সমান? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?" (সূরা আন নাহাল ১৬: ১৭)

(৫) তিনিই একমাত্র পূর্ণ গুণ দ্বারা বিশেষিত হওয়া এবং মুশরিকদের মাবুদদের মধ্য থেকে সেটা নাকোচ করার মাধ্যমে তার ইবাদত আবশ্যক হওয়ার দলীল প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

"তিনি আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মাঝখানের সবকিছুর রব। কাজেই তুমি তার ইবাদত করো এবং তার ইবাদতের উপর অবিচল থাকো। তোমার জানা মতে তার সমকক্ষ কোনো সত্তা আছে কি? (সূরা মারইয়াম ১৯: ৬৫)

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আরাফের ১৮০ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"আল্লাহ তা'আলার অনেকগুলো সুন্দরতম নাম রয়েছে। সুতরাং তাকে সেই নামেই ডাকো এবং তার নামসমূহের মধ্যে যারা বিকৃতি করে, তোমরা তাদেরকে বর্জন করো। তারা যা করে আসছে, তার ফল অবশ্যই তারা পাবে"।

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলেন,

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا﴾

"স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন ইবরাহীম নিজের বাপকে বললো, আব্বাজান! আপনি কেন এমন জিনিসের ইবাদত করেন, যা শোনেও না দেখেও না এবং আপনার কোনো উপকারও করতে পারে না?" (সূরা মারইয়াম: ৪২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ﴾

"তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনতে পারে না এবং শুনলেও তোমাদের কোনো জবাব দিতে পারে না"। (সূরা ফাতির: ১৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾

" মূসার অনুপস্থিতিতে তার জাতির লোকেরা নিজেদের অলংকার দিয়ে বাছুরের মূর্তি তৈরী করলো। তার মুখ দিয়ে গরুর মতো হাম্বা রব বের হতো। তারা কি দেখতে পেতো না যে, ঐ বাছুর তাদের সাথে কথা বলে না আর কোনো ব্যাপারে তাদেরকে পথ নির্দেশনাও দেয় না? কিন্তু এরপরও তাকে মাবুদে পরিণত করলো। বস্তুত তারা ছিল বড়ই যালেম"। (সূরা আল আরাফ ৭: ১৪৮)

(৬) মুশরিকদের মাবুদদের অক্ষমতা বর্ণনা করার মাধ্যমে নিজের তাওহীদের দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾

"তারা কি আল্লাহর সাথে এমন সব বস্তুকে শরীক করে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না? বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট হয়। আর তারা না তাদেরকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারে, না নিজেদের সাহায্য করতে পারে"। (সূরা আল আরাফ ৭: ১৯১-১৯২)

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ইসরার ৫৬ নং আয়াতে বলেন,

﴿قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً﴾

"বলো, আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে করো, তারা তো তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না"।

আল্লাহ তা'আলা সূরা নাহালের ৭৩ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾

"আর তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব বস্তুর পূজা করে যারা আসমান ও যমীন থেকে তাদের কিছু রিযিক দেবার ক্ষমতা রাখে না"।

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা হজ্জের ৩৭ নং আয়াতে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾

"হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের পূজা করো, তারা কখনো একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই অসহায়"।

(৭) যেসব মুশরিক আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যসব বস্তুর ইবাদত করে, তাদেরকে তিনি মূর্খ বলে উল্লেখ করেছেন। ইবরাহীম খলীল 'আলাইহিস সালাম শিরকের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যা বলেছিলেন, তা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

"ইবরাহীম বললো, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমনসব জিনিসের পূজা করছো যারা তোমাদের না উপকার করতে পারে, আর না করতে পারে ক্ষতি? ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব উপাস্যের তোমরা পূজা করছো তাদেরকে। তোমাদের কি বুদ্ধি নেই?" (সূরা আম্বীয়া ২১: ৬৬-৬৭)

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾

"তার চেয়ে অধিক ভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে আল্লাহকে ছাড়া এমন কাউকে ডাকে, যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবেনা। তারা তো তাদের দু'আ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যখন মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রুতে পরিণত হবে এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে"। (সূরা আহকাফ ৪৬: ৫-৬)

(৮) যেসব মুশরিক আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করে, তিনি তাদের শাস্তি ও পরিণাম বর্ণনা করেছেন। তারা যাদের ইবাদত করে, তারাও তাদের পরিণতি ভোগ করবে। ক্বিয়ামতের কঠিন ময়দানে এ মাবুদগুলো তাদের অনুসারীদের থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্তি ঘোষণা করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾

"যালেমরা যা কিছু অনুধাবন করার তা যদি আজ অনুধাবন করতো যে, সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর অধীন এবং শাস্তি ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর। যখন তিনি শাস্তি দেবেন তখন এ সমস্ত নেতা ও প্রধান ব্যক্তিরা, দুনিয়ায় যাদের অনুসরণ করা হতো, তাদের অনুগামীদের সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করতে থাকবে। কিন্তু শাস্তি তারা পাবেই এবং তাদের সমস্ত উপায়- উপকরণের ধারা ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যেসব লোক দুনিয়ায় তাদের অনুসারী ছিল তারা বলতে থাকবে, হায়! যদি আমাদের আর একবার সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আজ এরা যেমন আমাদের সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছে তেমনি আমরাও এদের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে যেতাম। এরা যে সমস্ত কাজ করছে সেগুলো আল্লাহ তাদের সামনে এমনভাবে উপস্থিত করবেন যাতে তারা কেবল আক্ষেপই করতে থাকবে কিন্তু জাহান্নামের আগুন থেকে তারা বের হতে পারবে না। (সূরা আল বাকারা ২: ১৬৫-১৬৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾

"ক্বিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহ্‌র ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না"। (সূরা ফাতির ৩৫: ১৩-১৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾

"তার চেয়ে অধিক ভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছাড়া এমন কাউকে ডাকে, যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবেনা। তারা তো তাদের দু'আ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যখন মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রুতে পরিণত হবে এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে"। (সূরা আহকাফ ৪৬: ৫-৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾

"যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করত? ফেরেশতারা বলবে, আপনি পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত আপনিই আমাদের বন্ধু; বরং তারা জিনের পূজা করত। তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী"। (সূরা সাবা ৩৪: ৪০-৪১) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾

"যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করো? ঈসা বলবেন, আপনি পবিত্র। আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোনো অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে তুমি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; তুমি তো আমার মনের কথাও জান এবং আমি জানি না যা তোমার মনের মধ্যে রয়েছে। নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত"। (সূরা আল মায়িদা ৫: ১১৬)

(৯) মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলা ও তাদের মধ্যে যে মধ্যস্থতাকারী ও সুপারিশকারী নির্ধারণ করেছিল আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিবাদ করেছেন। তাদের প্রতিবাদ এভাবে করা হয়েছে যে, শাফা'আতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো কাছে শাফা'আত চাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া কেউ তার নিকট শাফা'আত করতে পারবে না। সে সঙ্গে যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি থাকা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾

"তবে কি ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে সুপারিশকারী বানিয়ে রেখেছে? বলো, তাদের কোনো ক্ষমতা যদি নাও থাকে এবং তারা কিছু না বুঝলেও কি সুপারিশ করবে? বলো, সমস্ত শাফা'আত কেবল আল্লাহরই মালিকানাধীন"। (সূরা আয যুমার ৩৯: ৪৩-৪৪) আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

"তার অনুমতি ব্যতীত তার নিকট কে শাফা'আত করতে পারে?" (সূরা আল বাকারা ২: ২৫৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾

"আকাশমণ্ডলে এমন অনেক ফেরেশতা রয়েছেন, যাদের শাফা'আত কোনো কাজেই আসবে না, তবে আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় যাকে খুশী তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিলে সে কথা ভিন্ন। (সূরা আন নাজম ৫৩: ২৬)

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলোতে বর্ণনা করেছেন যে, শাফা'আত একমাত্র তারই মালিকানাধীন। সেটা তার নিকটেই চাইতে হবে। শাফা'আতকারীকে সুপারিশের অনুমতি দেয়ার আগে এবং যার জন্য শাফা'আত করা হবে, তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি না থাকলে সেটা অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়।

(১০) তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমের আরেকটি পদ্ধতি হলো, আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, তাকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদের ইবাদত করা হচ্ছে কোনভাবেই এসব মাবুদ তাদের অনুসারীদের উপকার করতে পারবে না। সুতরাং যে তার অনুসারীর উপকার করতে পারে না, সে উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾

হে নাবী! বলো, আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে করো, তাদেরকে আহবান করো। তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অণু পরিমাণ বস্তুরও মালিক নয়, এতে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহ্র সহায়কও নয়। যার জন্য অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহ্র কাছে অন্য কারো সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না। (সূরা সাবা ৩৪: ২২)

(১১) তার মধ্য থেকে আরেকটি পদ্ধতি হলো, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, যার দ্বারা মুশরিকদের শিরক বাতিল হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾

"যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়লো, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী কোনো স্থানে নিক্ষেপ করল"। (সূরা আল হাজ্জ ২২: ৩১)

উচ্চতা, প্রশস্ততা এবং মান-মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহ তা'আলা এখানে তাওহীদকে আসমানের সাথে তুলনা করেছেন এবং তাওহীদ বর্জনকারীকে আসমান থেকে যমীনের সর্বনিম্নস্তরে নিপতিত ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন। কেননা সে ঈমানের শীর্ষস্থান থেকে কুফরীর সর্বনিম্নস্তরে পড়ে গেছে। যে শয়তান তাকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়, তাকে এমন পাখির সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। তার যে প্রবৃত্তি তাকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে সেটাকে ঐ বাতাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা তাকে দূরবর্তী কোনো স্থানে নিক্ষেপ করে। শিরকের অসারতা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে মুশরিকদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে যেসব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে এটি অন্যতম।[১১]

---

[১১] শিরকের অসারতা ও মুশরিকদের মূর্খতা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"হে লোক সকল! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোনো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব উপাস্যকে তোমরা ডাকো তারা সবাই মিলে একটি মাছি সৃষ্টি করতে চাইলেও করতে পারবে না। বরং মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তারা তা ছাড়িয়েও নিতে পারবে না। সাহায্য প্রার্থীও দুর্বল এবং যার কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে সেও দুর্বল। সূরা আল হাজ্জ আয়াত ৭৩

"আল্লাহ একটি উপমা দিচ্ছেন, একজন গোলাম, যে অন্যের অধিকারভুক্ত এবং নিজেও কোনো ক্ষমতা রাখে না। দ্বিতীয়জন এমন এক ব্যক্তি যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে ভালো রিযিক দান করেছি এবং সে তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে। বলো, এরা দু'জন কি সমান? আলহামদু লিল্লাহ, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। আল্লাহ আরেকটি উপমা দিচ্ছেন। দুজন লোক, একজন বধির ও বোবা, কোনো কাজ করতে পারে না। নিজের প্রভুর ঘাড়ে বোঝা হয়ে চেপে আছে। যে দিকেই তাকে পাঠায় সে ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারে না। দ্বিতীয়জন ইনসাফের হুকুম দেয় এবং নিজে সত্য সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত আছে। বলো, এরা দু'জন কি সমান?" (সূরা আন নাহাল: ৭৬)

তাকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে তোমরা ডাকছো তারা তো একটি খেজুরের বীচির উপরের পাতলা পর্দার অধিকারীও নয়। তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনতে পারে না এবং শুনলেও তোমাদের কোনো জবাব দিতে পারে না এবং ক্বিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। প্রকৃত অবস্থান এমন সঠিক খবর একজন সর্বজ্ঞ ছাড়া কেউ তোমাদের দিতে পারে না"। (সূরা ফাতির: ১২-১৩)

তাওহীদুল উলূহীয়াতের দাওয়াত দিতে গিয়ে এবং শিরকের অসারতা বর্ণনায় কুরআনুল কারীম যেসব দৃষ্টান্ত ও উপমা পেশ করেছে, তার মধ্য থেকে আমরা এখানে যা উল্লেখ করলাম, তা খুবই অপ্রতুল। মুসলিমদের উচিত চিন্তা-গবেষণার সাথে কুরআন পড়া। তাতেই সে অনেক কল্যাণ, সন্তোষজনক দলীল এবং এমন উজ্জ্বল প্রমাণাদি খুঁজে পাবে, যা মুমিনের অন্তরে তাওহীদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করবে এবং তা থেকে শিরকের সকল সন্দেহের মূলোৎপাটন করবে। ইনশা-আল্লাহ।

حدوث الشرك في توحيد الألوهية

তাওহীদুল উলূহীয়াতের মধ্যে শিরক শুরু হলো কখন থেকে?

মুসলিমের উচিত, হক্ব জানার পর তার বিপরীতে যে বাতিল রয়েছে, তাও জানবে। যাতে করে সে বাতিল বর্জন করতে পারে এবং সেটা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারে। যেমন বলা হয়,

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه

অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্যই আমি সেটা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছি। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণ সম্পর্কে জানতে পারেনি, সে তাতে লিপ্ত হবেই।

হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن أقع فيه

“লোকেরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত। আর আমি তাকে অকল্যাণ ও অমঙ্গল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। এ আশঙ্কায় যে, আমাকে তা পেয়ে বসে কি না”।[১২]

এ জন্যই আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন,

---

“যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে ঘর তৈরী করে। আর ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো সবচেয়ে দুর্বল। যদি তারা জানতে পারতো”। (সূরা আল আনকাবুত: ৪১)

[১২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬০৬, ৭০৮৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৪৭, আবূ দাউদ হা/৪২৪৪।

يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية

অচিরেই ইসলামের বন্ধন (হুকুম-আহকাম, আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান) একটি একটি করে খুলে ফেলা হবে। বিশেষ করে যখন ইসলামের মধ্যে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কুফর ও শিরক সম্পর্কে অজ্ঞ হবে।

ইবরাহীম খলীল 'আলাইহিস সালামও তার সন্তানদের মধ্যে শিরক ও মূর্তিপূজা অনুপ্রবেশ করার আশঙ্কা করেছিলেন। তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন যে,

﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ﴾

"হে আমার রব! এ শহরকে তুমি নিরাপদ করো এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করো। হে আমার প্রতিপালক, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে" *(সূরা ইবরাহীম: ৩৫)।*

এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, শিরক থেকে বিরত থাকা আবশ্যক এবং সেটা থেকে বাঁচার জন্য সেটার পরিচয় জানা থাকাও আবশ্যক।

শিরক কাকে বলে?

ইবাদতের প্রকারসমূহ থেকে কোনো কিছু আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য সম্পাদন করাকে শিরক বলে। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দু'আ করা, গাইরুল্লাহর জন্য কুরবানী করা, মানত করা এবং এমন বিষয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকট উদ্ধার কামনা করা, যা থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ রাখে না। আর তাওহীদ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য ইবাদতকে নির্দিষ্ট করা।

তাওহীদ বনী আদমের মূল বিষয়। পরে তাদের মধ্যে শিরক প্রবেশ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾

"প্রথমে সব মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। তাদের মধ্যে যখন মতভেদ শুরু হলো তখন আল্লাহ নাবীদেরকে পাঠালেন। তারা ছিলেন সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা এবং বেঠিক পথ অবলম্বনের পরিণতির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শনকারী। আর তাদের সাথে সত্য কিতাব পাঠান, যাতে সত্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল তার মীমাংসা করা যায়"। (সূরা আল বাকারা: ২১৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আদম ‘আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে নূহ ‘আলাইহিস সালাম এর জাতি পর্যন্ত একহাজার বছরের ব্যবধান ছিল। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সকল মানুষই তাওহীদের উপর ছিল। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথাটি সঠিক। ইমাম ইবনে কাছীরও এ কথাকে ছ্বহীহ বলেছেন। অতঃপর নূহ (আলাইহিস সালাম) এর জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম শিরকের আবির্ভাব হয়। কতিপয় সৎ লোককে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণেই তাদের মধ্যে শিরক প্রবেশ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

“কাফেররা বলল, তোমরা নিজেদের মাবুদগুলোকে পরিত্যাগ করো না। বিশেষ করে ‘ওয়াদ’, ‘সুআ’, ‘ইয়াগুছ’ ‘ইয়াঊক’ এবং ‘নাসর’কে কখনও পরিত্যাগ করো না”। (সূরা নূহ: ২৩)

ছ্বহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, এগুলো হচ্ছে নূহ ‘আলাইহিস সালামের গোত্রের কতিপয় সৎ ব্যক্তির নাম। তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান তাদের কওমকে বুঝিয়ে বলল, যেসব জায়গায় তাদের মজলিস বসতো, সেসব জায়গাতে তাদের মূর্তি স্থাপন করো এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের নামেই মূর্তিগুলোর নামকরণ করো। তখন তারা তাই করল। তাদের জীবদ্দশায় মূর্তিগুলোর পূজা করা হয়নি ঠিকই; কিন্তু মূর্তি স্থাপনকারীরা যখন মৃত্যু বরণ করল এবং পরবর্তীরা মূর্তি স্থাপনের ইতিহাস ভুলে গেল, তখনই মূর্তিগুলোর ইবাদত শুরু হলো।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অনেক সালাফ বলেছেন, যখন সৎ লোকগুলো মারা গেল, তখন তারা তাদের কবরগুলোর উপর অবস্থান করতে লাগল। অতঃপর তারা তাদের মূর্তি বানালো। অতঃপর যখন বহু সময় পার হলো, তখন তারা সেগুলোর ইবাদত শুরু করলো।

সৎ লোকদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা, তাদের ছবি নির্মাণ ও সংরক্ষণ করা, সেগুলোকে তাদের মজলিসে স্থাপন করার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তা থেকে আমরা ছবি নির্মাণ করা, সেটা দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা, মাঠে-ময়দানে ও রাজপথে সেটা স্থাপন করার ভয়াবহতা অনুভব করতে পারি। এগুলো মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়। এ ছবিগুলো এবং রাজপথে ও মাঠে-ময়দানে স্থাপিত মূর্তিগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এমনভাবে বাড়তে থাকে যে, এক সময় এগুলোর ইবাদত শুরু হয়ে যায়। যেমন হয়েছিল নূহ ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের মধ্যে।

এ জন্যই ইসলামে ছবি অঙ্কন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছবি অংকনকারীকে অভিশাপ করেছেন এবং তাকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। আর ছবি অঙ্কনের মাধ্যমে যাতে এ উম্মতের মধ্যে শিরক প্রবেশ করতে না পারে, তাই এ

দরজাকে বন্ধ করার জন্য এবং আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সাদৃশ্য করা থেকে দূরে রাখার জন্যই বলা হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের দিন ছবি অংকনকারীরাই সবচেয়ে কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে।

নূহ 'আলাইহিস সালামের জাতির বিভ্রান্তির ঘটনা থেকে আমরা পথভ্রষ্ট করা ও তাদের সাথে ধোঁকাবাজি করার ক্ষেত্রে অভিশপ্ত শয়তানের সুদূর প্রসারি চেষ্টা ও আগ্রহের কথা জানতে পারলাম। মানুষকে গোমরাহ করার জন্য সে কখনো তাদের আবেগ ও সহানুভূতিকে কাজে লাগায় এবং তাদেরকে ভালো কাজে উৎসাহ দেয়ার বেশ ধরে। সে যখন নূহ আলাইহসি সালামের জাতির লোকদের মধ্যে সৎ লোকদের প্রতি প্রচুর ভালোবাসা দেখতে পেলো, তখন এতে আরো বাড়াবাড়ি করার আহ্বান জানালো। তাদেরকে সৎ লোকদের স্মরণার্থে ছবি স্থাপন করার আদেশ দিলো। এতে ইবলীসের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে ধীরে ধীরে হক থেকে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যাওয়া। সে শুধু তার সামনে উপস্থিত লোকদেরকেই গোমরাহ করে ক্ষ্যান্ত হতে চায়নি; বরং পরবর্তীতে আগমনকারী স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী ও মূর্খতায় আচ্ছন্ন প্রজন্মকেও গোমরাহ করার সুদূর প্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করেছিল। সুতরাং সে তাদের জন্য এ ছবিগুলোর ইবাদত করাকে সুশোভিত করে দেখালো এবং শিরকে আকবারে লিপ্ত করে ছাড়লো। তারা তাদের নাবী নূহের সাথে এ বলে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করলো, لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ "তোমরা নিজেদের মাবুদগুলোকে পরিত্যাগ করো না"।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, শয়তান মুশরিকদেরকে নিয়ে বিভিন্ন রকম খেল-তামাশা করে এবং মূর্তিপূজায় লিপ্ত করে। প্রত্যেক জাতির বিবেক-বুদ্ধি অনুপাতে তার খেল-তামাশা হয় বিভিন্ন রকম।

মৃত মানুষের ছবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামে শয়তান কোনো কোনো সম্প্রদায়কে তার নিজের ইবাদতের আহ্বান জানায়। যেমনটি নূহ 'আলাইহিস সালামের জাতির মধ্যে লক্ষ্যণীয়। সাধারণ মুশরিকদের গোমরাহির কারণ এটিই। আর বিশিষ্ট ও অভিজাত শ্রেণির মুশরিকরা তাদের ধারণারূপ সৃষ্টিজগতে প্রভাব বিস্তারকারী তারকাসমূহের আকৃতিতে মূর্তি বানিয়ে সেগুলোর উপাসনা করতো। এগুলোর জন্য তারা ঘর তৈরি করতো, দারোয়ান নিযুক্ত করতো, তাদের সামনে পর্দা ঝুলিয়ে রাখতো এবং তাদের জন্য কোরবানি পেশ করতো। পৃথিবীতে এগুলো অতীত ও বর্তমানের সবসময়ই লক্ষ্য করা যায়। বেদীন মুশরিকদের থেকে এ প্রথাগুলোর উৎপত্তি হয়েছে। এরা ছিল ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের গোত্রের ঐসব লোক, শিরকের অসারতা বর্ণনা করার জন্য ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম বিতর্কে নেমেছিলেন। আর তিনি তার ইলমের মাধ্যমে মুশরিকদের দলীল-প্রমাণগুলো খণ্ডন করেছিলেন এবং স্বীয় হাত দিয়ে তাদের বাতিল মাবুদগুলো ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলেছিলেন। এর কারণে মুশরিকরা তাকে আগুনে পুড়ে হত্যা করার দাবি জানিয়েছিল।

আরেক শ্রেণির মুশরিক রয়েছে, যারা চন্দ্রের আকৃতিতে মূর্তি বানিয়েছে। তাদের ধারণা চন্দ্র তাদের ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। তাদের ধারণা মতে নিম্নজগত চন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাধীন।

তাদের আরেক শ্রেণি আগুনের পূজা করে। এরা হলো অগ্নিপূজক। আরেক শ্রেণির লোক পানির ইবাদত করে। কেউ আবার জীব-জানোয়ারের উপাসনা করে। কেউ ঘোড়ার, কেউ গরুর, কেউ জীবিত মানুষের ইবাদত করে, কেউ মৃত মানুষের ইবাদত করে, কেউ জিনের ইবাদত করে, কেউ গাছের ইবাদত করে আবার আরেক শ্রেণির লোক ফেরেশতাদের ইবাদত করে থাকে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের উক্তি এখানেই শেষ। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের উক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থ জানা গেল,

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾

এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী কোনো স্থানে নিক্ষেপ করল"। (সূরা আল হজ্জ: ৩১)

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থও জানা গেল, তিনি বলেন,

﴿يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"হে আমার জেলখানার সাথীরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, বহু সংখ্যক রব উত্তম, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এমন কতগুলো নামের ইবাদত করে থাকো, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ্ এদের কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ্ ছাড়া কারও হুকুম করার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। এটিই সঠিক দীন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না"। (সূরা ইউসুফ: ৩৯-৪০)

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থও বুঝা গেল, তিনি বলেন,

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। একজন ক্রীতদাস লোকের মনিব অনেক, যারা তাতে পরস্পর কলহপ্রিয় শরীক এবং আরেক ব্যক্তির মনিব কেবল একজন। তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না"। (সূরা আয যুমার: ২৯)

এ মুশরিকরা যখন এক আল্লাহ তা'আলার সে ইবাদত বর্জন করেছে, যার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যাতেই তাদের সৌভাগ্যের বিষয়টি নিহিত রয়েছে তখন তারা শয়তানের ইবাদত করার ফিতনায় পড়েছে। প্রবৃত্তির প্ররোচনায় পড়ে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। যেমন ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

فبلوا برق النفس والشيطان + هربوا من الرق الذي خلقوا له

যার দাসত্ব করার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার দাসত্ব বর্জন করে তারা এখন নাফ্স ও শয়তানের ইবাদতের ফিতনায় পড়েছে। সুতরাং তাওহীদ ব্যতীত মানুষের অন্তরসমূহ এক হবে না এবং পৃথিবীর মানুষগুলো সংশোধনও হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

"এরা যমীন হতে যেসব উপাস্য গ্রহণ করেছে সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকতো, তাহলে আসমান-যমীন ধ্বংস হয়ে যেতো। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র"। (সূরা আম্বীয়াঃ ২১-২২)

এ জন্যই যখন পৃথিবী তাওহীদ মুক্ত হবে, তখনই ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। যেমন ইমাম মুসলিম নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ

"পৃথিবীতে যতদিন আল্লাহ আল্লাহ বলা হবে ততোদিন ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না"।[১৩]

পূর্বকালের মুশরিকরা যেমন তাদের ইবাদত ও মাবুদগুলো নিয়ে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছিল, আজও কবরপূজারীরা কবরের ইবাদত নিয়ে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত। তাদের প্রত্যেকেরই একটি করে খাছ সমাধি রয়েছে, যে বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে সেটার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। প্রত্যেক ছূফী তরীকার একজন করে শাইখ আছেন, যাকে মুরীদরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের রব হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। তাদের রব এমন দীনের প্রবর্তন করে, যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোনো অনুমতি নেই।

এভাবেই শয়তান বনী আদমের সাথে খেল-তামাশা করে থাকে। আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের উপায় অবলম্বন ছাড়া, তার কিতাব ও তার রসূলের সুন্নাতকে মজবুতভাবে ধারণ করা ব্যতীত শয়তানের চক্রান্ত ও প্ররোচনা ছাড়া মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

---

[১৩] মুসলিম, হা/১৪৮, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদের সামনে সত্যকে সত্য হিসাবে তুলে ধরেন এবং সেটার অনুসরণ করার তাওফীক দেন। আর বাতিলকে বাতিল হিসাবে আমাদের সামনে পরিষ্কার করে দেখান এবং আমাদেরকে যেন সেটা থেকে দূরে রাখেন। তিনিই আমাদের অভিভাবক। তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক, কতই না উত্তম সাহায্যকারী।

خطر الشرك ووجوب الحذر منه بتجنب أسبابه

শিরকের ভয়াবহতা এবং যেসব বিষয় মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়, তা বর্জন করার মাধ্যমে শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা আবশ্যক

শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, যারা শিরক থেকে তাওবা করবে না, তিনি তাদের জন্য ক্ষমার কোনো ব্যবস্থা রাখেননি। অথচ আল্লাহ তা'আলা নিজের উপর রহমত করাকে আবশ্যক করেছেন। শিরকের অবস্থা যেহেতু এরকমই এবং তা যেহেতু সর্বাধিক বড় গুনাহ, তাই বান্দার উপর আবশ্যক হলো শিরক থেকে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা এবং সেটাকে খুব ভয় করবে। শিরক থেকে বাঁচার জন্য সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। কেননা সর্বাধিক নিকৃষ্ট গুনাহ এবং সবচেয়ে বড় যুলুম। লুকমান 'আলাইহিস সালাম স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে যা বলেছিলেন, তা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

"হে প্রিয় বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা মহা যুলুম"। (সূরা লুকমান ৩১: ১৩)

শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়ার কারণ হলো এতে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদা কমানো হয় এবং অন্যকে আল্লাহ তা'আলার সমান করে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾

অতঃপর কাফেররা অন্যদেরকে তাদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছে। (সূরা আল আনআম ৬: ১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

অতএব জেনে-বুঝে তোমরা আল্লাহর সাথে সমকক্ষ নির্ধারণ করো না। (সূরা আল বাকারা ২: ২২)

আল্লাহ তা'আলা যে উদ্দেশ্যে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, শিরক সে উদ্দেশ্যের পরিপন্থি এবং আল্লাহ তা'আলাই যে হুকুম করার একমাত্র মালিক, শিরক তারও পরিপন্থি। শিরক করার মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সাদৃশ্য করা হয়। অভাবী অক্ষম সৃষ্টিকে ক্ষমতাবান এবং সৃষ্টি থেকে অভাবমুক্ত অমুখাপেক্ষী সত্তার সাথে তুলনা করা সর্বনিকৃষ্ট সাদৃশ্য স্থাপন।

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতকে শিরক থেকে সাবধান করেছেন এবং শিরকের দিকে নিয়ে যায় এমন সমস্ত পথ বন্ধ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন, তখন আরবের অবস্থা এমনকি অল্প সংখ্যক আহলে কিতাব ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীর অবস্থা ছিল খুব নিকৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি তাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়ে বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তার আয়াতসমূহ তাদেরকে পাঠ করে শুনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেন। অথচ এর আগে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল"। (সূরা আলে-ইমরান ৩: ১৬৪)

এ সময় মানুষ সঠিক পথের দিশা হারিয়ে মূর্তিপূজার মধ্যে ডুবে ছিল। তারা পাথর খোদাই করে নির্মিত মূর্তিকে এবং মাঠে-ময়দানে স্থাপিত ভাস্কর্যকে তাদের মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করতো। ইবাদতের নিয়্যাতে তারা এগুলোর উপর অবস্থান করতো, এগুলোর চারপাশে তাওয়াফ করতো, এগুলোর জন্য তাদের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ থেকে কুরবানী করতো। এমনকি তারা তাদের সন্তা-সন্ততিও উৎসর্গ করতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَٰدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا۟ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾

"আর এভাবেই বহু মুশরিকের জন্য তাদের শরীকরা নিজেদের সন্তান হত্যা করাকে সুশোভিত করে দিয়েছে, যাতে তাদেরকে ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষেপ করতে এবং তাদের দীনকে তাদের কাছে সংশয়িত করে তুলতে পারে। আল্লাহ চাইলে তারা এমনটি করতে পারতো না। কাজেই তাদেরকে ছেড়ে দাও। তারা নিজেদের মিথ্যা রচনায় ডুবে থাকে"। (সূরা আল 'আনআম ৬: ১৩৭)

ঐ সময় আরেকদল ছিল আহলে কিতাব। আহলে কিতাবদের একদল ছিল খ্রিষ্টান। তারাও দিশেহারা হয়ে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েছিল। তারা তিন

মাবুদের ইবাদত করতো। তারা তাদের পাদ্রীদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছিল। আর ধ্বংসকারী ইয়াহূদীরা তো পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেই যাচ্ছিল, ফিতনার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেই যাচ্ছিল এবং তারা তাদের কিতাবের মূলবক্তব্য নিয়ে খেল-তামাশা করে সেটাকে স্বীয় স্থান হতে পরিবর্তন করেই যাচ্ছিল।

তৃতীয় আরেকদল লোক ছিল অগ্নিপূজক। তারা আগুন পূজা করতো। তারা দুই মাবুদের ইবাদত করতো। তাদের মতে এক মাবুদ কল্যাণের স্রষ্টা আরেক মাবুদ অকল্যাণের স্রষ্টা।

চতুর্থ আরেকদল ছিল, বেদীন। তারা গ্রহ-নক্ষত্রের ইবাদত করতো। তারা মনে করতো, পৃথিবীর উপর এগুলোর প্রভাব রয়েছে। পঞ্চম আরেক দল ছিল দাহরিয়া সম্প্রদায়। এরা কোনো দীন মানতো না। এমনকি পুনরুত্থান কিংবা আখিরাতে হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস করতো না।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরণের সময় পৃথিবীর অধিবাসীদের অবস্থা এরকমই ছিল। মূর্খতায় পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছিল এবং গোমরাহীর অন্ধকারে পৃথিবী ভরে গিয়েছিল। অতঃপর যে তার দাওয়াত কবুল করলো এবং তার আহবানে সাড়া দিল, আল্লাহ তা‘আলা তাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসলেন। তিনি ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের মহাপবিত্র দীনে হানীফ ফিরিয়ে আনেন এবং শিরক থেকে নিষেধ করেন ও শিরকের দিকে নিয়ে যায় এমন সকল পথই বন্ধ করার চেষ্টা করলেন।

إليك بيان الوسائل القولية والفعلية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تفضي إلى الشرك

ঐসব কথা ও কাজের আলোচনা করা হলো, যা থেকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন, কারণ তা মানুষকে শিরকে লিপ্ত করে।

১) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন শব্দসমূহ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন যাতে আল্লাহ তা‘আলার ও তার সৃষ্টির মধ্যে সমান করে দেয়ার ধারণা হয়। যেমন কেউ বলে থাকেন, ماشَاء الله وشِئْتَ আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন। অথবা কেউ বললো, لولا الله وأنت যদি আল্লাহ না থাকতেন এবং আপনি না থাকতেন। এর বদলে যেন বলে, ماشاء الله ثم شئت আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন। কেননা واو দ্বারা সম্পর্ক করা হলে মাতুফ এবং মাতুফ ‘আলাইহিকে সমান করে দেয়া হয়। এভাবে শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সমান করে দেয়া ছোট শিরক। আর এটি বড় শিরকের দিকে নিয়ে যায়।

ماشاء الله ثم شئت ‘আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন’ এ কথা বললে শিরক না হওয়ার কারণ হলো, ثُمَّ দ্বারা তারতীব ও তাখীর অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ ثُمَّ-এর পূর্বে উল্লেখিত শব্দের মধ্যে যে অর্থ থাকে, সেটা ثُمَّ-এর পরে উল্লেখিত শব্দের অর্থের পূর্বে বাস্তবায়ন হওয়ার দাবি রাখে।

২) কবর পাকা করা, সেটাতে বাতি জ্বালানো, চুনকাম করা এবং তাতে কিছু লেখার মাধ্যমে কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

৩) ছ্বলাত আদায়ের জন্য কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটি মানুষকে কবরের ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়।

৪) সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় এবং সূর্য ডুবার সময় ছ্বলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এতে ঐসব লোকের সাথে সাদৃশ্যের সম্ভাবনা রয়েছে, যারা এই সময়গুলোতে সূর্যকে সিজদাহ করে।

৫) তিন মাসজিদ ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের আশায় অন্য কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যে মাসজিদ তিনটিতে ছাওয়াবের আশায় ভ্রমণ করা যায়, তা হলো মাসজিদুল হারাম, মাসজিদে নববী এবং মাসজিদুল আকসা।

৬) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

«لاَ تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»

"তোমরা আমার অতিরিক্ত প্রশংসা করো না। যেমন প্রশংসা করেছিল খ্রিষ্টানরা মারইয়াম তনয় ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর। আমি কেবল আল্লাহ তা'আলার একজন বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তারই রসূল বলবে"।[১৪] প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করাকে الإطراء বলা হয়।

৭) যেসব স্থানে মূর্তিপূজা করা হয় অথবা যেখানে জাহেলী যুগের কোনো উৎসব পালন করা হয়, সেখানে মানত পূরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাওহীদের সংরক্ষণ, তাকে হেফাযত এবং শিরকের রাস্তা বন্ধ করার জন্যই নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত কথা বলেছেন।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে শিরকের সুস্পষ্ট বর্ণনা করা এবং উম্মতকে শিরক থেকে দূরে রাখার জন্য কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করার পরও কবরপূজারীরা তার সুন্নাতের বিরোধীতা করেছে এবং তার আদেশের বিরুদ্বাচরণ করে ঐসব কাজেই লিপ্ত রয়েছে, যা থেকে তিনি নিষেধ করেছেন। তারা কবরের উপর মজবুত গম্বুজ নির্মাণ করেছে। তার উপর মাসজিদ নির্মাণ করেছে, বিভিন্ন অলঙ্কার দিয়ে সেটাকে অলংকৃত করেছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা এগুলোর জন্য বিভিন্ন প্রকার ইবাদতও পেশ করছে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কবরের ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত, তার আদেশ, তার নিষেধ, তার ছাহাবীদের আমল এবং বর্তমান সময়ের অধিকাংশ মানুষের আমলকে যে ব্যক্তি একত্র করবে, সে উভয়ের মাঝে এমন অসংগতি দেখতে পাবে, যা একসাথে একত্রিত হতেই পারে না। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের দিকে ফিরে ছ্বলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন, আর এরা কবরের নিকট এবং কবরের দিকে ফিরে ছ্বলাত পড়ছে। তিনি কবরকে মাসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন, আর এরা কবরের উপর মাসজিদ বানাচ্ছে এবং আল্লাহর ঘরের মতো বানিয়ে এগুলোকে সমাধি ও পবিত্র স্থান হিসাবে নামকরণ করেছে। তিনি কবরের উপর বাতি জ্বালাতে নিষেধ করেছেন, আর এরা সেটার উপর মোমবাতি ও বাতি জ্বালানোর জন্য

[১৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৪৫।

সম্পদ ওয়াক্ফ করছে। তিনি কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন, আর এরা একে বিভিন্ন ঈদ ও উৎসবের স্থানে পরিণত করেছে। তাতে ঈদের দিন মুসলিমদের একত্রিত হওয়ার মতো কিংবা তারচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক একত্রিত হয়।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরকে মাটির সমান করার আদেশ দিয়েছেন। যেমন আবুল হাইয়্যাজ আল্ আসাদী (রহিমাহুল্লাহ আনহু) বলেন, আলী ইবনে আবু তালেব একদা আমাকে বলেন,

«أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ»

হে আবু হাইয়্যাজ! আমি কি তোমাকে ঐ কাজ দিয়ে প্রেরণ করবো না যা দিয়ে আমাকে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরণ করেছিলেন? আর তা ছিল এই যে, তুমি কোনো মূর্তি পেলে তা ভেঙে চুরমার করে দিবে, কোনো উচু কবর পেলে তা মাটির বরাবর না করে ছাড়বে না।[১৫]

কবরপূজারীরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ আদেশের মারাত্মক বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে। তারা কবরকে যমীন থেকে উচু করতে করতে ঘরের মত উঁচু করছে এবং সেটার উপর গম্বুজও নির্মাণ করছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উপর চুনকাম করতে এবং সেটার উপর বসতে নিষেধ করেছেন। যেমন ছ্বহীহ মুসলিমে জাবের (রহিমাহুল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ»

"রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উপর চুনকাম করতে, সেটার উপর বসতে এবং তার উপর নির্মাণকাজ করতে নিষেধ করেছেন"।[১৬]

কবরের উপর কিছু লিখতেও তিনি নিষেধ করেছেন। যেমন সুনানে তিরমিযীতে জাবের (রহিমাহুল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

«أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أنْ تجصص الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا»

"রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উপর চনুকাম করতে এবং সেটার উপর লিখতে নিষেধ করেছেন"।[১৭] ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীছটি হাসান-ছ্বহীহ।

---

[১৫] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৬৯।

[১৬] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৭০।

[১৭] ছ্বহীহ: তিরমিযী, হা/ ১০৫২।

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তারা কবরের উপর বোর্ড লাগিয়ে তাতে কুরআনের আয়াত এবং অন্যান্য জিনিস লিখে রাখছে।

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উপর মাটি ছাড়া অন্য কিছু রাখতে নিষেধ করেছেন। যেমন ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণনা করেছেন যে, **নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উপর চুনকাম করতে অথবা সেটার উপর লিখতে কিংবা তাতে মাটি ছাড়া অন্য কিছু রাখতে নিষেধ করেছেন”**।[১৮]

অথচ এরা কবরের উপর ইট, টালি, চুনা, পাথর ইত্যাদি ব্যবহার করছে। ইমাম ইবরাহীম নাখঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সালাফগণ কবরের উপর ইট, টালি ইত্যাদি রাখাকে অপছন্দ করতেন। মোটকথা কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী, কবরকে উৎসবের স্থান হিসাবে গ্রহণকারী, কবরের উপর বাতি প্রজ্বলিতকারী, কবরের উপর গৃহ ও গম্বুজ নির্মাণকারী এসব লোক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশের বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে। এর চেয়ে আরো ভয়াবহ হলো কবরসমূহকে মসজিদে রূপান্তরিত করা এবং তার উপর বাতি জ্বালানো। এটি কাবীরাহ গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। কবর পূজারীদের বিদ‘আতের ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা এখানেই শেষ।

তার যুগের পরে বিষয়টি তাদের অপকর্ম আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরো ভয়াবহ নিকৃষ্ট আকার ধারণ করেছে। পরবর্তীতে বিষয়টি এমন হয়েছে যে, যারা কবর পূজারীদের বিরোধীতা করে, তাদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, কট্টরপন্থি এবং ওলীদের হক নষ্টকারী হিসাবে গণ্য করা হয়। আফসোসের ব্যাপার হলো, ওলীদের হক নষ্ট করা হলে রাগান্বিত হয়। তাদের ইবাদত বর্জন করাকে তাদের হক নষ্ট হয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু বড় বড় শিরকের মাধ্যমে আল্লাহর হক নষ্ট করা হলে তারা মোটেই রাগ করে না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের বিরোধীতার মাধ্যমে তার হক নষ্ট করা হলেও তারা রাগ করে না। আসলে মহান আল্লাহ তা‘আলার শক্তি না হলে অন্যায় কাজ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই এবং তার সাহায্য না হলে সৎ আমল করারও সম্ভব নয়।

৮) যেসব কথা ও কাজ মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়, তার মধ্যে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি অন্যতম। তাই তিনি তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তার প্রশংসায় যেখানে বাড়াবাড়ি করা নিষেধ, সেখানে অন্যদের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কেননা এটি ক্ষুদ্র সৃষ্টিকে মহান স্রষ্টার হকের মধ্যে শরীক করে দেয়া হয়। এ জন্যই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। যেমন,

---

[১৮] ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৩২২৫-৩২২৬।

«لاَ تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْد فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»

“তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না। যেমন প্রশংসা করেছিল খ্রিষ্টানরা মারইয়াম তনয় ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর। আমি কেবল আল্লাহ তা‘আলার একজন বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তার রসূল বলবে”।[১৯]

কারো প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করাকে الإطراء বলা হয়। অর্থাৎ তোমরা আমার এমন প্রশংসা করবে না, যাতে সীমালঙ্ঘন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা ‘আলাইহিস সালামের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছিল। এমনকি তারা তার মধ্যে উলূহীয়াতের দাবিও করেছিল। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি একজন বান্দা মাত্র। সুতরাং তোমরা আমাকে কেবল আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল বলবে। অর্থাৎ আমাকে উপরোক্ত বিশেষণে বিশেষিত করো। এর সাথে অন্য কিছু যুক্ত করবে না। তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তার রসূল বলো। আল্লাহ তা‘আলা আমাকে এ গুণেই বিশেষিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا﴾

“প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তার বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এর মধ্যে কোনো বক্রতা রাখেননি”। (সূরা কাহাফ: ১) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾

“বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি, যিনি তার বান্দার উপর নাযিল করেছেন ফুরকান। যাতে সে সমগ্র সৃষ্টির জন্য সতর্ককারী হন”। (সূরা আল ফুরকান: ১) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾

“আর আল্লাহর বান্দা যখন তাকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন তারা সবাই তার নিকট ভিড় জমালো”। (সূরা আল জিন: ১৯) আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾

“হে রসূল! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা নাযিল করা হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌঁছাও” (সূরা আল মায়িদা: ৬৭) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾

[১৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৪৫ ও মুসলিম।

“হে নাবী! তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিলে তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও”। (সূরা আত-তালাক: ১)

কিন্তু মুসলিম নামধারী মুশরিকরা তার আদেশের বিরোধীতা করাকেই বেছে নিয়েছে এবং তার নিষেধাজ্ঞার বিরোধীতা করাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। তার প্রতি যে তা'যীম-সম্মান প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন এবং যা থেকে তাদেরকে সতর্ক করেছেন, তারা তাই করছে। তারা তার আদেশের মারাত্মক বিরোধীতা করেছে এবং তারা বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের ক্ষেত্রে নাসারাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করেছে। কবিতা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় এমন বাড়াবাড়ি করেছে, যা সুস্পষ্ট শিরক। যেমন কাসীদা বুরদায় বুসেরী নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় বলেছেন,

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به + سواك عند حلول الحادث العمم

“হে সৃষ্টির সেরা সম্মানিত! আমার জন্য কে আছে আপনি ব্যতীত, যার কাছে কঠিন বালা-মুছীবতে আশ্রয় প্রার্থনা করবো?” (নাউযুবিল্লাহে)

এর পরের লাইনগুলোর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, তাতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দু'আ করা, তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা ও আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গিয়ে সঙ্কটময় সময়ে এবং ভয়াবহ মুছীবতের সময় তার নিকট বিপদাপদ থেকে উদ্ধার কামনা করা হয়েছে। আসল কথা হলো, এ কবি ও তার মতো অন্যান্য লোকের জন্য শয়তান শিরকী কাজগুলোকে সুসজ্জিত করে দেখিয়েছে। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় বাড়াবাড়ির পথ দেখিয়েছে। অথচ এগুলোকে ভালোবাসা ও সম্মানের লেবাস পরিয়ে দেখালেও এগুলো বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত এবং তার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে সুন্নাতের পাবন্দী হওয়াকে শয়তান তাদের জন্য তার প্রতি ঘৃণা ও মানহানির পোশাকে প্রকাশ করেছে।

আসল কথা হলো, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা নিষিদ্ধ। সুতরাং এতে বাড়াবাড়ি করা, কথায় ও আমলে তার অনুসরণ বর্জন করা এবং তার হুকুমের প্রতি সন্তুষ্ট না থাকাই তার মর্যাদা খাটো করার নামান্তর। সুতরাং তার অনুসরণ করা, তার দীন ও সুন্নাতের সাহায্য করা ব্যতীত তার প্রতি তা'যীম প্রদর্শন হয় না এবং তার ভালোবাসার দাবিও বাস্তবায়ন হয় না।

আব্দুল্লাহ ইবনে শিক্ষীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি বনী আমেরের প্রতিনিধি দলের সাথে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে বললাম,

«أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ»

“আপনি আমাদের সায়্যেদ! মনিব বা প্রভু। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা‘আলাই হচ্ছেন একমাত্র সায়্যেদ! মনিব, প্রভু। আমরা বললাম: আমাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল। এরপর তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের এ সব কথা অথবা এগুলো থেকে কতিপয় কথা বলে যাও। তবে শয়তান যেন তোমাদেরকে তার বশীভূত করতে না পারে। ইমাম আবু দাউদ এই হাদীছকে ভাল সনদে বর্ণনা করেছেন”।[২০]

উপরোক্ত হাদীছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এ কথা বলতে নিষেধ করেছেন যে, ‘আপনি আমাদের সাইয়্যেদ’। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলাই প্রকৃত সাইয়্যেদ (মনিব)। তিনি তাদেরকে এ কথা বলতে নিষেধ করেছেন যে, আমাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল। তাদের পক্ষ হতে বাড়াবাড়ি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি এটি বলতে নিষেধ করেছেন। তারা তার সামনে উপস্থিত হয়ে প্রশংসা করাকে অপছন্দ করেছেন। কারণ এটি তাদেরকে বাড়াবাড়ির দিকে নিয়ে যেতে পারে। তিনি বলেছেন, وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ অর্থাৎ শয়তান যেন তোমাদেরকে তার পিছনে টেনে না নেয়। তোমরা যেনে শয়তানের প্রতিনিধি না হয়ে যাও। الجري শব্দের অর্থ দূত ও প্রতিনিধি।

সুতরাং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত হাদীছে বর্ণনা করেছেন যে, প্রশংসিত ব্যক্তির সামনে প্রশংসাকারীর প্রশংসা শয়তানের কাজের অন্তর্ভুক্ত। যদিও প্রশংসার গুণাবলি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এতে করে প্রশংসিত ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করতে পারে। আর এটি পূর্ণাঙ্গ তাওহীদেরও পরিপন্থি। এমনি প্রশংসাকারী প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করে ফেলতে পারে। এতে করে সে প্রশংসিত ব্যক্তিকে এমন মর্যাদার আসনে নিয়ে যাবে, যার যোগ্য সে নয়।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে إطراء করতে নিষেধ করেছেন। প্রশংসায় এমন বাড়াবাড়ি করাকে إطراء বলা হয়, যা মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়। এমনকি প্রশংসিত ব্যক্তি রুবূবীয়ার গুণাবলিতেও গুণান্বিত করে ফেলতে পারে। কতক সীমালঙ্ঘনকারী রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আআইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় এমন কবিতা রচনা করেছে, যাতে অনেক বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। যেমন কাসীদা বুরদাহ এর লেখক বুসেরী এবং অন্যরা এমন কবিতা লিখেছেন, যা তাদেরকে বড় শিরক পর্যন্ত নিয়ে গেছে। বুসেরী বুরদাহয় নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় বলেন,

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به + سواك عند حلول الحادث العمم

[২০] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৮০৬।

"হে সৃষ্টির সেরা সম্মানিত! আমার জন্য কে আছে আপনি ব্যতীত, যার কাছে আমি কঠিন বালা মুছীবতে আশ্রয় প্রার্থনা করবো?" (নাউযুবিল্লাহ) বুরদাহর আরেক লাইনে সে বলেছে,

فإنَّ من جودك الدنيا وضرَّتها + ومن علومك علم اللوح والقلمِ

হে নাবী! আপনার দয়া থেকেই দুনিয়া ও আখিরাত সৃষ্টি হয়েছে। আর আপনার জ্ঞান থেকেই লাওহে মাহফুয ও কলমের জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়েছে।

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আল্লাহ তা'আলা উবুদীয়াতের মর্যাদাপূর্ণ করার পরও তিনি তার প্রশংসা করাকে অপছন্দ করতেন। উবুদীয়াতের মর্যাদাকে সংরক্ষণ করা এবং আক্বীদাকে হেফাযত করার জন্যই তিনি তার প্রশংসা করাকে অপছন্দ করেছেন। উম্মতকে তার অতিরিক্ত প্রশংসা বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। উম্মতের কল্যাণ কামনা করা, তাওহীদের মর্যাদা রক্ষা করা এবং শিরক ও শিরকের মাধ্যমগুলো যেন তাওহীদকে নষ্ট করে ফেলে অথবা সেটাকে যেন দুর্বল না করে ফেলে, তাই তিনি বনী আমের গোত্রের প্রতিনিধি দলকে أنت سيدنا আপনি আমাদের মনিব বলতে নিষেধ করেছেন। السيد শব্দটি السؤدد থেকে নেয়া হয়েছে।

ইবনুল আছীর النهاية গ্রন্থে বলেন, প্রভু, মালিক, ভদ্র, মর্যাদাবান, দয়ালু-দাতা, সহনশীল, স্বজনদের কষ্ট বরদাশতকারী, স্বামী, সভাপতি, অগ্রগামী ইত্যাদি অর্থে السيد শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এ হাদীছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের কথা السيد الله এর অর্থ হলো প্রকৃত প্রভুত্ব কেবল আল্লাহর জন্যই। আর সমস্ত সৃষ্টিই তার গোলাম। আল্লাহ তা'আলার জন্য السيد শব্দটি প্রয়োগ হলে এর অর্থ হবে মালিক, অভিভাবক এবং প্রভু। ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লরাহু আনহু الله الصمد এর ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি এমন প্রভু, যিনি প্রভুত্বের সকল গুণাবলিতে পূর্ণতায় পৌঁছেছেন।

ইমাম ইবনুল আছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কোরাইশদের এক লোক নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, আপনি কোরাইশদের সাইয়্যেদ বা প্রভু। তিনি তখন বললেন, আল্লাহই সায়্যেদ বা প্রভু ও মনিব। অর্থাৎ তিনিই যথাযোগ্য প্রভু হওয়ার অধিকারী। আসলে তিনি তার সামনে প্রশংসা করাকে অপছন্দ করেছেন এবং বিনয়ী হওয়াকে পছন্দ করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ

"আমি আদম সন্তানের নেতা। তবে এটি কোনো অহংকারের বিষয় নয়"।[২১]

[২১] ছ্বহীহ: তিরমিযী, হা/৩১৪৮, ইবনে মাজাহ, হা/৪৩০৮।

আল্লাহ তা'আলা তাকে যে সম্মান, মর্যাদা ও নেতৃত্বের গুণাবলি প্রদান করেছেন, সে বিষয়ে সংবাদ দিতে গিয়ে এবং তাকে আল্লাহ তা'আলা যে নিয়ামত দিয়েছেন, তা উম্মতকে জানাতে গিয়ে এ কথা বলেছেন। যাতে করে তারা সেটার দাবি অনুপাতেই তার প্রতি ঈমান আনয়ন করে। এ জন্যই তিনি স্বীয় ফযীলত বর্ণনা করার পরপরই বলেছেন, وَلاَ فَخْرَ "তবে এটি কোনো অহংকারের বিষয় নয়"। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে সম্মান স্বরূপ আমি ফযীলতটি অর্জন করেছি। আমি এটা নিজে অর্জন করিনি এবং স্বীয় শক্তির বলেও উপার্জন করিনি। সুতরাং এতে আমার অহংকার করার কিছু নেই। ইমাম ইবনে আছীরের কথা এখানেই শেষ।

তিনি বনী আদমের নেতা। যেমনটি খবর দিয়েছেন। কিন্তু তারা যখন এ শব্দের মাধ্যমে তার প্রশংসা করলো, তখন তাদেরকে এমন বাড়াবাড়ির আশঙ্কায় তা বলতে নিষেধ করেছেন, যা শিরকের দিকে নিয়ে যাতে পারে।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীছ উপরোক্ত কথাটি সুস্পষ্ট করেছে। তিনি বলেন, কতিপয় লোক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বললো, হে আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি! হে আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র! হে আমাদের সাইয়্যেদ (নেতা বা প্রভু)! হে আমাদের নেতার পুত্র! তখন তিনি বললেন:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ ولاَ يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولُه وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»

"হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের কথা বলে যাও। এমন যেন না হয় যে, শয়তান তোমাদেরকে প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত করে ফেলবে এবং পরিণামে তোমরা আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি শুরু করে দিবে। আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ, আল্লাহর বান্দা এবং তার রসূল। আল্লাহর শপথ! আমি পছন্দ করি না যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন, তোমরা আমাকে তার উপরে উঠাবে। ইমাম নাসায়ী ভাল সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীছ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা গেলো যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে লোকদের বাড়াবাড়ির আশঙ্কায় তাদেরকে يا سيدنا "হে আমাদের নেতা বলতে নিষেধ করেছেন"।

সুতরাং শুরু থেকেই তিনি এ পথ বন্ধ করেছেন। সুতরাং আমাদের সাইয়্যেদ বলার পরিবর্তে তিনি তাদেরকে এমন দু'টি বিশেষণে বিশেষিত করার আদেশ করেছেন, যা উবুদীয়াতের সর্বোচ্চ স্তর। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবের একাধিক স্থানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ গুণ দু'টিতে বিশেষিত করেছেন। এ গুণ দু'টির একটি হলো আব্দুল্লাহ, অন্যটি হলো রসূলুল্লাহ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তাওহীদ সংরক্ষণ করার জন্য তিনি এটি চাননি যে, লোকেরা তাকে তার চেয়ে উপরে

উঠাবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনেক ছ্বহীহ সুন্নাতে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন,

«لاَ تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْد فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»

“তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না। যেমন বাড়াবাড়ি করেছিল খ্রিষ্টানরা মারইয়াম তনয় ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর। আমি কেবল আল্লাহ তা‘আলার একজন বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তার রসূল বলবে”।[২২]

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إنه لا يستغات بي وإنما يستغاث بالله»

আমার কাছে ফরিয়াদ করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহর কাছেই ফরিয়াদ করতে হবে।[২৩]

তিনি কারো প্রশংসা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তার সামনে এক লোক অন্য লোকের প্রশংসা করলে তিনি বলেন,

ويلك! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ

ধ্বংস তোমার জন্য! তুমি তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেলেছো।[২৪] অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন,

إِذَا لَقِيتُمْ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمْ التُّرَابَ

“যখন তুমি লোকদেরকে দেখবে যে, তারা মানুষের খুব প্রশংসা করছে, তখন তাদের মুখ-মণ্ডলে মাটি নিক্ষেপ করো”।[২৫]

প্রশংসাকারীর পক্ষ হতে বাড়াবাড়ি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি এ কথা বলেছেন। ঐদিকে যার প্রশংসা করা হবে, তার গর্ব-অহংকারও বেড়ে যেতে পারে। উভয়টিই আকীদহার জন্য ক্ষতিকর।

তবে কোনো মানুষকে سيد বলা যাবে কি না, এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মানুষকে সাইয়্যেদ বলার ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। একদল আলেম তা বলতে নিষেধ করেছেন।

---

[২২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৪৫ ও মুসলিম।

[২৩] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় মুসনাদে এবং ইমাম তাবারানী (রহিমাহুল্লাহ) আলমুজামুল কবীরে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাদীছের সনদে ইবনে লাহীয়া থাকার কারণে মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন।

[২৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৬২, মুসলিম হা/৩০০০।

[২৫] ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪৮০৪।

ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) থেকে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের দলীল হলো নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন বলা হলো, «يا سَيِّدُنَا» "আপনি আমাদের নেতা! মনিব বা প্রভু। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى "আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন একমাত্র সায়্যেদ! মনিব বা, প্রভু"।[২৬]

আরেকদল আলেমের মতে, মানুষকে সাইয়্যেদ বলা বৈধ। তারা আনসারদের জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীছকে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। আনসারদের নেতা যখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে আগমন করলেন, তখন তিনি তাদেরকে বললেন, قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ "তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়াও"।[২৭] এ হাদীছটি প্রথম হাদীছের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের উক্তি এখানেই শেষ।

ব্যাখ্যাকার বলেন, আনসারদের জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা, "তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়াও" দ্বারা দলীল পেশ করার ব্যাপারে কথা হলো, তিনি সা'দের উপস্থিতিতে এবং তাকে লক্ষ্য করে এ কথা বলেননি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। ভাষ্যকারের কথা এখানেই শেষ।

তাদের দলীলটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, এ কথার অর্থ হলো, মানুষের সামনে প্রশংসা স্বরূপ এ কথা বলা যাবে না যে, يا سيد হে আমাদের নেতা বা প্রভু বা মনিব! তবে অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রশংসায় এটি বলা যাবে। তবে সে যদি প্রকৃত পক্ষেই এ বিশেষণের অধিকারী হয়ে থাকে, তাহলেই কেবল এটি বলা যাবে; অন্যথায় নয়। এভাবে ব্যাখ্যা করলে উভয় দলীলের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

৯) আরো যেসব জিনিস মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায় তার মধ্যে الغلو في الصالحين সৎ লোকদের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা। নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা যদি নিষেধ হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য সৎ লোকদের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা আরো কঠোরভাবেই নিষিদ্ধ হবে।

সৎ লোকদের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে মর্যাদা প্রদান করেছেন, তার উপরে উঠিয়ে এমন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা, যা কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্যই শোভনীয় হতে পারে। যেমন বিপদ-মুছীবতের সময় সৎ লোকদের কাছে

[২৬] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৮০৬।

[২৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০৪৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৬৮, আবু দাউদ হা/৫২১৫।

ফরীয়াদ করা, তাদের কবরের তাওয়াফ করা, কবরের মাটি দিয়ে বরকত হাসিল করা, তাদের সমাধির জন্য কুরবানী যবেহ করা, তাদের কাছে মদদ চাওয়া ইত্যাদি।

সৎ লোকদের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করার রাস্তা দিয়েই শয়তান নূহ 'আলাইহিস সালামের বংশের মধ্যে শিরক ঢুকিয়েছে। সুতরাং সৎ লোকদের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা থেকে সাবধান থাকা আবশ্যক। যদিও ভালো উদ্দেশ্যে প্রশংসা করা হয়।

নূহ 'আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের মধ্যে যে শিরক প্রবেশ করেছিল, উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যেও অনুরূপ শিরক প্রবেশ করেছে। নূহ 'আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের মধ্যে শয়তান যে শিরক ঢুকিয়ে দিয়েছিল, বর্তমানেও সৎ লোকদের প্রতি তা'যীম ও ভালোবাসা প্রদর্শনের পোশাক পরিয়ে সে অনেক লোকের সামনে শিরক ও বিদ'আতকে প্রকাশ করেছে। শয়তান সব সময় কবর পূজারীদের নিকট এ ওয়াসওয়াসা দিয়ে যাচ্ছে যে, সৎ লোকদের কবরের উপর মাসজিদ, সমাধি, ঘর, গম্বুজ নির্মাণ করা এবং সেগুলোর উপর অবস্থান করা তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের কবরের পাশে দু'আ কবুল হয়ে থাকে। অতঃপর এই স্তর থেকে শয়তান তাদেরকে কবরবাসীর মধ্যস্থতায় দু'আ করা এবং তাদেরকে সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করার আহ্বান জানায়। তারা যখন এটি করে অভ্যস্ত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে সরাসরি কবরবাসীর নিকট দু'আ করা, তাদের ইবাদত করা এবং তাদের কাছে শাফা'আত চাওয়ার আহবান জানায়।

পরিশেষে তাদের কবরগুলো এমন মূর্তি পূজার আড্ডায় পরিণত হয়, যাতে তারা প্রদীপ বাতি জ্বালায়, তাতে মূল্যবান পর্দা ঝুলিয়ে রাখে, তাকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করে, তাতে স্পর্শ করে এবং চুম্বন করে। এতে যখন তারা অভ্যস্থ হয়ে যায়, তখন তারা অন্যান্য মানুষকেও কবর পূজা করা, সেটাকে ঈদের স্থান হিসাবে গ্রহণ করা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কেন্দ্র বানানোর আহবান জানায়। অতঃপর শয়তান তাদেরকে এ বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায় যে, যারা কবর পূজা করতে নিষেধ করে, তারা ওলীদেরকে অবমাননা করে, তাদেরকে ঘৃণা করে এবং মনে করে যে, ওলীদের কোনো সম্মান-মর্যাদা ও কদর নেই।

অনেক মূর্খ সাধারণ মানুষের অন্তরে এমনকি ইলম ও দীনের দাবিদার অনেক লোকের অন্তরে কবর পূজার ফিতনা প্রবেশ করেছে। তারা সত্যিকার তাওহীদপন্থিদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে, বড় বড় অপবাদ দিয়েছে এবং মানুষকে তাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এসব কিছুই তারা করছে সৎ লোকদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও সম্মান প্রদর্শনের ছত্রছায়ায়। তারা তাদের কথায় মিথ্যুক। কেননা সৎ লোকদের প্রতি তখনই প্রকৃত ভালোবাসা প্রদর্শন করা হবে, যখন সেটা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত মোতাবেক হবে। তাদের ফযীলত সম্পর্কে অবগত হওয়া, শৈথিল্য ও বাড়াবাড়ি ব্যতীত ভালো কাজে তাদের অনুসরণ করার মাধ্যমেই তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হতে পারে। যেমন-আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

"তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে ক্ষমা করো। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না"। (সূরা আল হাশরঃ ১০)

শাইখুল ইসলাম ইমাম তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তিই কোনো নাবী বা সৎ লোকের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে অথবা তার মধ্যে উলূহীয়াতের আক্বীদা পোষণ করেছে সেই বলেছে,

يا سيدي فلان! أنصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك

হে আমার সাইয়্যেদ অমুক! আমাকে সাহায্য করুন অথবা আমাকে উদ্ধার করুন, অথবা আমাকে রিযিক প্রদান করুন কিংবা বলেছে, আমার জন্য আপনিই যথেষ্ট। অথবা এ ধরনের অন্যান্য কথা বলেছে। এসবগুলোই শিরক ও গোমরাহী। যারা এগুলো বলবে, তাদেরকে তাওবা করতে বলা হবে। তারা যদি তাওবা করে তাহলে তো ভালো। অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে।[২৮]

কেননা আল্লাহ তা'আলা রসূলদেরকে এ জন্য পাঠিয়েছেন এবং আসমানী কিতাবসমূহ এ জন্যই নাযিল করেছেন, যাতে একমাত্র তারই ইবাদত করা হয়, তার সাথে অন্য কাউকে আহ্বান না করা হয়। তিনি একক এবং তার কোনো শরীক নেই। যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কোনো ইলাহকে আহবান করে, যেমন ঈসা 'আলাইহিস সালাম, ফেরেশতা কিংবা মূর্তি তারা এটি বিশ্বাস করে না যে, এরা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে অথবা বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারে অথবা উদ্ভিদ উদগত করতে পারে। বরং তারা এগুলোর ইবাদত করতো অথবা তাদের কবরের উপাসনা করতো অথবা তাদের ছবির পূজা করতো এবং বলতো,

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾

"আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়"। (সূরা আয যুমারঃ ৩)

---

[২৮] শাস্তি প্রয়োগ কিংবা দণ্ডবিধি কায়েম করা কেবল ইসলামী সরকার অথবা তার যথাযথ প্রতিনিধির দায়িত্ব। কারণ কোনো ব্যক্তি বিশেষ যদি নিজস্ব উদ্যোগে অন্য কোনো লোকের উপর শাস্তি প্রয়োগ করতে যায়, তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এবং মানুষের জান-মাল ও মান-ইজ্জতের চরম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সাধ্যানুযায়ী জবান দ্বারা অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করা সকল মুসলিমের উপরই আবশ্যক।

তারা আরো বলে, এ মাবুদগুলো আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশকারী মাত্র। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রসূলদেরকে পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে দু'আ না করে। ইবাদতের দু'আ এবং ফরিয়াদের দু'আ, এ দু'টির কোনোটিই যেন আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো কাছে না করে। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার কথা এখানেই শেষ।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার উপরোক্ত কথার মাধ্যমে কবর পূজারীদের সন্দেহের মুখোশ উন্মোচন হয়ে গেল। যেসব কবর পূজারী তাদের কাজকে এই বলে বৈধ করতে চায় যে, তারা ওলী-আওলীয়াদের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস করে না যে, এরা সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া, জীবিত করা কিংবা মৃত্যু দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর শরীক। তারা কেবল তাদের ব্যাপারে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, এরা হলো তাদের প্রয়োজন পূরণ করা এবং বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ও তাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী মাত্র। আসলে জাহেলী যুগে মক্কার মুশরিকরা এ কথাই বলতো। আর আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এ কথা উল্লেখ করেছেন এবং তা খণ্ডন করেছেন।

বাস্তব কথা হলো, পরবর্তীকালের লোকদের শিরক জাহেলী যুগের মুশরিকদের শিরকের চেয়ে বেড়ে গেছে। তারা তাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই এগুলোর নাম উচ্চারণ করে চিল্লাতে থাকে। আল্লাহ তা'আলার নাম তারা খুব কমই স্মরণ করে। তাদের মুখে সবসময় ওলীর নাম শুনা যায়। পূর্বযুগের মুশরিকরা কেবল সুখের সময় আল্লাহর সাথে শরীক করতো আর বিপদের সময় তারা ইখলাছের সাথে আল্লাহকেই ডাকতো। আর এদের শিরক সব সময়ই হয়ে থাকে। সুখের সময়ও তারা শিরক করে এবং বিপদের সময়ও শিরক করে। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আস সানআনী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد

বিপদাপদ ও মুছীবতের সময় তাদের নাম ধরে তারা কতই না আহবান করল। যেমন বিপদগ্রস্ত একক অমুখাপেক্ষী সত্তার নাম ধরে আহবান করে। হে মুসলিমদের আলেম সম্প্রদায়! পথহারা, ভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি মানুষগুলোকে সঠিক পথ দেখানোর দায়িত্ব আপনাদের স্কন্ধে অর্পিত।

হে আলেম সম্প্রদায়! আপনারা তাদেরকে সঠিক পথ দেখাচ্ছেন না কেন? এই ভয়াবহ শিরক থেকে তাদেরকে নিষেধ করছেন না কেন? অথচ আপনারা তাদের সাথেই মিলে মিশে বসবাস করছেন। দাওয়াত দেয়া ও মানুষের কাছে হক বয়ান করার যে দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে দিয়েছেন, তা নষ্ট করছেন কেন? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾

“স্মরণ করো সেই সময়ের কথা! যখন আল্লাহ আহলে কিতাবদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমরা কিতাবের শিক্ষা মানুষের মধ্যে প্রচার করবে, তা গোপন করবে না”। (সূরা আলে-ইমরান: ১৮৭)

আলেমগণ কি নাবীদের ওয়ারিছ নন? নাবীগণ তো শিরকের প্রতিবাদ করার জন্যই আগমন করেছেন এবং দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার জন্য না হওয়া পর্যন্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যই আগমন করেছেন। সুতরাং হে আলেমগণ! আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। যিনি আপনাদেরকে এ দায়িত্ব প্রদান করেছেন, তিনি অচিরেই এ সম্পর্কে আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। ছ্বহীহ হা্দীছে বর্ণিত হয়েছে, যে আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে না, তার দ্বারাই ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে।

আপনারা যদি শিরক দেখেও প্রতিবাদ না করেন এবং তাদেরকে যদি তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেন, তাহলে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। আর যদি এগুলোকে আপনারা শিরক মনে না করেন, তাহলে বিষয়টি আরো ভয়াবহ। কেননা আপনারা এমন একটি বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ রয়েছেন, যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। হে আল্লাহ! তুমি মুসলিমদের অবস্থা সংশোধন করো, তাদেরকে গোমরাহী থেকে উদ্ধার করো। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

১০) ছবি উঠানো শিরকের অন্যতম মাধ্যম (التصوير وسيلة إلى الشرك):

التصوير। অর্থ হলো হাত দিয়ে আর্ট করার মাধ্যমে অথবা যন্ত্রের মাধ্যমে কিংবা খোদাই করার মাধ্যমে কোনো জিনিসের আকৃতি স্থানান্তর করা এবং সেটাকে বোর্ডে, কিংবা কাগজে অঙ্কন করা অথবা প্রতিমূর্তি আকারে স্থাপন করা। আলেমগণ আক্বীদা সম্পর্কিত কিতাবগুলোতে ছবি আঁকা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। কেননা এটি শিরকের মাধ্যম। সে সঙ্গে এতে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক হওয়ার দাবি করা হয় অথবা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়। ছবি উঠানোর মাধ্যমে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শিরক সংঘটিত হয়েছে। যখন নূহ 'আলাইহিস সালামের কাওম ছবি তুলতে অগ্রসর হয়েছিল এবং তাদের ছবিগুলো বিভিন্ন মজলিসে স্থাপন করেছিল, তখন থেকেই পৃথিবীতে শিরকের সূচনা হয়।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল প্রকার ছবি উঠানো থেকে নিষেধ করেছেন। যারা ছবি আঁকে তাদেরকে তিনি কঠিন শাস্তির ধমক দিয়েছেন, তিনি ছবি মিটিয়ে ফেলতে এবং সেটার নাম-নিশানা পরিবর্তন করে ফেলতে বলেছেন। কেননা ছবি উঠানোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি করা বিশেষণের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয়। অথচ তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। আল্লাহ তা'আলা যা একাই সৃষ্টি করেন, ফটোগ্রাফার তাতে তার সাদৃশ্য গ্রহণ করতে চায়। আর ছবি উঠানো শিরকের অন্যতম মাধ্যম। সুতরাং ছবি উঠানো থেকেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শিরক এসেছে। শয়তান নূহ 'আলাইহিস সালামের

কাওমের জন্য সৎ লোকদের ছবি উঠানোকে এবং তাদের অবস্থার স্মরণার্থে ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণার্থে ছবিগুলো বিভিন্ন মজলিসে রেখে দেয়াকে খুব সুন্দর করে দেখালো। পরিশেষে এ কাজ তাদেরকে ঐ ছবিগুলোর ইবাদতের দিকে নিয়ে গেলো এবং শয়তান তাদের মধ্যে এ বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিলো যে, আল্লাহ ব্যতীত এগুলো মানুষের উপকার ও ক্ষতি করতে পারে।

সুতরাং ছবি উঠানো থেকেই মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছে। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ সৃষ্টির প্রতি তা'যীম-সম্মান প্রদর্শন ও তার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্যই ছবি তুলে। বিশেষ করে যার ছবি উঠানো হয়, সে যদি ক্ষমতাবান, জ্ঞানী কিংবা সৎ লোক হয়ে থাকে এবং দেয়ালে, রাজপথে অথবা মাঠে-ময়দানে ছবি স্থাপন করে যখন সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, সময়ের ব্যবধান ও কালের পরিক্রমায় এটি পথহারা মানুষকে ছবিগুলোর সাথে সম্পৃক্ত করে তুলে। সর্বোপরি সৎ লোকের ছবি স্থাপন করার মাধ্যমে ঐসব মূর্তি ও ভাস্কর্য স্থাপনের দরজা খুলে যায়, যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে ইবাদতও করা হয়।

ছবি অঙ্কন সম্পর্কে আমি এখানে ছ্বহীহ ও সুস্পষ্ট হাদীছ উল্লেখ করবো। সাধ্যানুসারে তার সাথে কিছু টীকাও যোগ করবো, ইনশা-আল্লাহ।

১) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً وَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً أو لِيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً»

"আমার সৃষ্টির মত যে কেউ কিছু সৃষ্টি করতে চায়, তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে? পারলে তারা একটি দানা বা একটি অণু সৃষ্টি করুক তো দেখি। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা একটি গম তৈরী করুক তো দেখি"।[২৯]

অর্থাৎ ছবি অঙ্কনকারীর চেয়ে বড় যালেম আর কেউ নেই। কেননা সে যখন রূহ ওয়ালা কোনো সৃষ্টি যেমন মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু অথবা অন্য কিছুর আকৃতিতে ছবি তুলে, সে তখন সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্য গ্রহণ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত মাখলুকের আকার-আকৃতি দান করেছেন এবং জীবিত রাখার জন্য তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾

"তিনি আসমান ও যমীনকে যথাযথ রূপে সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাদেরকে আকার-আকৃতি দান করেছেন এবং অতি উত্তম আকার-আকৃতি দান করেছেন। অবশেষে তার

[২৯] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৭৫৫৯।

কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে”। *(সূরা আত তাগাবুন: ৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

“তিনিই আল্লাহ, خَالِق (সৃষ্টিকারী), بَارِي (উদ্ভাবক) এবং مُصَوِّر (রূপদাতা)। তার জন্য রয়েছে অনেক অতি সুন্দর নাম। আর তিনিই عَزِيز (পরাক্রমশালী) ও حَكِيم (প্রজ্ঞাবান)”। (সূরা আল হাশর: ২৪)।

আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলির বিষয়ে এমনি আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যার বেশ কিছু নমুনা সম্মানিত শাইখ সামনে উল্লেখ করবেন।

এসব ছবি অঙ্কনকারীদের যারা আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করতে চায় তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ করেছেন। পারলে তারা যেন তাদের অঙ্কিত ছবিগুলোতে প্রাণের সঞ্চার করে দেখায়, যাতে করে আল্লাহর সৃষ্টির মতই ও গুলো বাঁচতে পারে। আসলে এ চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে তাদেরকে অক্ষম করা হয়েছে এবং তাদের প্রচেষ্টায় তাদেরকে ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তারা যেমন প্রাণ ওয়ালা কোনো প্রাণী সৃষ্টি করতে অক্ষম, তেমনি তারা একটি ফল ও ফলের দানা তৈরী করতেও অক্ষম। সুতরাং প্রাণী সৃষ্টি করা তো দূরের কথা তারা একটি দানা সৃষ্টি করতে পারবে না।

২) বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ»

“ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তাদেরই, যারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মতো ছবি বা চিত্র অঙ্কন করে”।[৩০]

এ হাদীছে ক্বিয়ামতের দিন ছবি অঙ্কনকারীদের কঠিন শাস্তি এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিণতির কথা বলা হয়েছে। যদিও তারা দুনিয়াতে নিরাপদে জীবন যাপন করে, কিন্তু পরকালে তাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ। এ ছবি অঙ্কনকারীদেরকে শিল্পী বলা হয় এবং তাদেরকে বিভিন্ন পক্ষ থেকে তাদের কাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়। তারা যদি তাওবা না করে, তাহলে তাদের জন্য কঠিণ পরিণতি অপেক্ষা করছে। কেননা তারা এই কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য গ্রহণ করতে চাচ্ছে। অর্থাৎ তারা যেসব ছবি তুলছে, তার মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি কর্মের অনুরূপ করতে চাচ্ছে, যা আল্লাহ তা'আলা একাই সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি হলেন মহান স্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[৩০] ছ্বহীহ বুখারী, অধ্যায়: ছবিকে পদদলিত করা। হা/৫৯৫৪।

﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

"তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক স্থাপন করেছে যারা তার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছে যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বলুন, আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি একক ও পরাক্রমশালী"। (সূরা আর রা'দ: ১৬)

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছবি বানায়, তার ক্ষেত্রে এ হাদীছটি প্রযোজ্য। সে হলো মূর্তি এবং অনুরূপ বস্তু নির্মাণকারী। এ লোক কাফের। ক্বিয়ামতের দিন তার আযাব হবে সবচেয়ে বেশি। কেউ কেউ বলেছেন, হাদীছে বর্ণিত আযাব ঐ ব্যক্তির হবে, যে ইবাদতের নিয়্যাতে আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য করবে এবং অনুরূপ আক্বীদা পোষণ করবে। এ লোকও কাফের হবে। কাফেরের আযাবের ন্যায় তারও কঠিন আযাব হবে। কুফরী বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে আযাবও বেশি হবে। আর যে ব্যক্তি ইবাদতের নিয়্যাতে ছবি আঁকবে না এবং আল্লাহর সাদৃশ্য করার নিয়্যাতও করবে না, সে কাফের হবে না। কিন্তু সে কাবীরাহ গুনাহকারী বলে গণ্য হবে, যা তাওবা ছাড়া ক্ষমা হবে না।

আব্দুর রাহমান ইবনে হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির আকৃতিতে ছবি অঙ্কনকারীর যদি এ শাস্তি হয়, তাহলে যে ব্যক্তি কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সমান মনে করে এবং তার জন্য ইবাদতের কোনো অংশ নির্ধারণ করে, তার শাস্তি কেমন হতে পারে?

৩) ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا يُعَذِّبُ فِي جَهَنَّمَ»

প্রত্যেক চিত্র অঙ্কনকারীই জাহান্নামী। চিত্রকর যতটি প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করবে, তার প্রত্যেকটির বদলে একটি করে প্রাণ সৃষ্টি করা হবে। এর মাধ্যমে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে।[৩১]

অর্থাৎ সে দুনিয়াতে যত ছবি এঁকেছে, ক্বিয়ামতের দিন তা হাজির করা হবে এবং সেগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করে রূহ সঞ্চার করা হবে। অতঃপর সেটার মাধ্যমে তাকে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেয়া হবে। কম অঙ্কন করুক আর বেশী অঙ্কন করুক,- সে সেটার আযাব ভোগ করবেই। প্রত্যেক ছবি দ্বারা এমন একটি প্রাণী বানানো হবে, যার মাধ্যমে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

৪) ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আরো বর্ণিত 'মারফু' হাদীছে এসেছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

[৩১] ছ্বহীহ মুসলিম, অধ্যায়: যে ঘরে ছবি থাকে, তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। হা/২১১০।

«مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ»

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করবে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে ঐ চিত্রে আত্মা দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে আত্মা দিতে সক্ষম হবে না"।[৩২]

এটি হচ্ছে ছবি অঙ্কনকারীর আরেক প্রকার শাস্তি। এর অর্থ সুস্পষ্ট। ছবি অঙ্কনকারী দুনিয়াতে যত ছবি এঁকেছে, সবগুলো ক্বিয়ামতের দিন তার সামনে হাজির করা হবে। অতঃপর তাকে প্রত্যেকটির মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়ার হুকুম করা হবে। এমন কাজ করার শক্তি সে পাবে কোথায়? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

"এরা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলে দাও, রূহ আমার রবের আদেশ মাত্র। কিন্তু তোমরা সামান্য জ্ঞানই লাভ করেছো"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ৮৫)*

সুতরাং ছবি অঙ্কনকারীর অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য এবং তাকে শাস্তি দেয়ার জন্যই তাকে এমন আদেশ দেয়া হবে। তার উপর এমন দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হবে, যা সে সম্পন্ন করতে পারবে না। ফলে সে অবিরাম শাস্তি পেতেই থাকবে। মোটকথা হাদীছটি তাকে দীর্ঘ মেয়াদী শাস্তি দেয়া এবং দুনিয়াতে আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য করার ব্যাপারে তার অক্ষমতা প্রকাশের প্রমাণ করে।

৫) ইমাম মুসলিম আবুল হাইয়াজ আল-আসাদী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদা আমাকে বললেন,

«أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا تدع صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا و لَا تَدَعَنَّ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ»

"আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাবো না, যে কাজে স্বয়ং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? সে কাজটি হচ্ছে, 'তুমি কোনো প্রাণীর ছবি দেখলেই তা বিলুপ্ত না করে ছাড়বে না। আর কোনো উঁচু কবরকে মাটির সমান না করে ছাড়বে না"।[৩৩]

এ হাদীছে ছবি মিটিয়ে ফেলার আদেশ করা হয়েছে। তার আকার-আকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করার মাধ্যমেই সেটা করা সম্ভব। যাতে করে আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ অবস্থায় সেটি অবশিষ্ট না থাকে। এতে কবরের উপরে নির্মিত গম্বুজ, মাসজিদ এবং শিরকের অন্যান্য লক্ষণাদিও মুছে ফেলতে বলা হয়েছে।

---

[৩২] মুসলিম, অধ্যায়: প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা হারাম। হা/২১১০।

[৩৩] নাসায়ী, অধ্যায়: কবরকে মাটির সমান করে দেয়ার আদেশ, হা/২০৩১।

এ হাদীছে শিরকের সর্বাধিক বড় দু'টি রাস্তা বন্ধ করার আদেশ এসেছে। একটি হলো ছবি উঠানো এবং অন্যটি হলো কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা। ছবি মিটিয়ে ফেলা এবং কবরের উপর নির্মিত গম্বুজ, মাসজিদ ইত্যাদি ভেঙে ফেলায় দীনের বিরাট কল্যাণ অর্জিত হবে এবং মুসলিমদের আক্বীদারও সংরক্ষণ হবে।

বর্তমান সময়ে ছবি অঙ্কন করা, ছবি ব্যবহার করা, ছবি ঝুলিয়ে রাখা, স্থাপন করা এবং স্মরণার্থে নির্মিত ছবি সংরক্ষণ করা ব্যাপকারে বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩৪] কবরের উপর নির্মাণ কাজও বেড়ে গেছে। এমনকি বর্তমানে এগুলো সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। দীনের সঠিক শিক্ষার অভাব, সুন্নাতের বিলুপ্তি, বিদ'আত ছড়িয়ে পড়া, অনেক আলেমের নিরব ভূমিকা পালন এবং বাস্তব পরিস্থিতির কাছে তাদের নতি স্বীকার করার কারণেই এমনটি হয়েছে। অধিকাংশ দেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে ভালো মন্দে এবং মন্দ ভালোয় পরিণত হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া এ ধরনের অন্যায় থেকে বিরত থাকা এবং সঠিক তাওহীদের উপর টিকে থাকা মোটেই সম্ভব নয়।

সুতরাং আমাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক, আল্লাহর জন্য, আল্লাহর কিতাবের জন্য, তার নাবীর জন্য, মুসলিমদের ইমাম এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য নছীহত পেশ করা। বিশেষ করে গোমরাহী দাঈ এবং বাতিল প্রচারকদের সংখ্যা যখন বেড়ে চলেছে, তখন নছীহতের প্রয়োজন আরো বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং বাতিলপন্থিদের মুখোশ উন্মুক্ত করা, তাদের গোমরাহীর প্রতিবাদ করা এবং তাদের ক্ষতি থেকে মুসলিমদেরকে জ্ঞান দান করা আবশ্যক। তাহলেই তারা সাবধান ও সতর্ক হতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে তার কিতাব এবং তার রসূলের সুন্নাত মোতাবেক আমল করার তাওফীক দিন।

---

[৩৪] তবে বিশেষ প্রয়োজনে ছবি উঠানো জায়েয আছে। যেমন ব্যক্তিগত পরিচয় পত্রের জন্য, পাসপোর্টের জন্য, ড্রাইভিং লাইসেন্স তৈরীসহ আরো কিছু প্রয়োজনীয় অবস্থায় ছবি উঠানো। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে ব্যাপক আকারে ছবি উঠানো যাবে না।

نقض شبهات المشركين التي يتعلقون بها في تبرير شركهم في توحيد الألوهية

نقض المشركين التى يتعلقون بها في تسويغ شركهم في توحيد الإلهية

তাওহীদুল উলূহীয়ায় শিরক করার ক্ষেত্রে মুশরিকরা যেসব দলীল পেশ করে তা খণ্ডন করা প্রসঙ্গে

কবর পূজারী মুশরিকরা এমন অনেক বানোয়াট কাহিনী বলে থাকে, যা অধিকাংশ মানুষের বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা তাদের শিরক ও গোমরাহীর পক্ষে এগুলোকে দলীল হিসাবে পেশ করেছে এবং তাদের বাতিলগুলো নিয়েই তারা সন্তুষ্ট রয়েছে। সুতরাং তাদের মিথ্যা ও বাতিলগুলোর মুখোশ উন্মুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ﴾

"যে ধ্বংস হওয়ার সে যেন দলীল-প্রমাণ সুস্পষ্ট হওয়ার পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকার সে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে জীবিত থাকে"। (সূরা আল আনফাল: ৪২)

এ সন্দেহগুলোর মধ্যে কিছু সন্দেহ এমন রয়েছে, পূর্বের জাতিসমূহের মুশরিকরা পেশ করতো এবং তার মধ্যে আরো এমন কিছু সন্দেহ রয়েছে, যা বর্তমান সময়ের মুশরিকরা পেশ করে থাকে। এ সন্দেহগুলোর মধ্যে রয়েছে:

প্রথমত: বিভিন্ন জাতির মুশরিকদের বহু দলের মধ্যে এ সন্দেহগুলোর সংমিশ্রণ ঘটেছে। এটি হচ্ছে বাপ-দাদাদের আক্বীদা-বিশ্বাসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করার সন্দেহ। তারা বলতো, এ আক্বীদা ও ধর্ম তারা তাদের পূর্বপুরুষ থেকে পেয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾

“এমনিভাবে তোমার পূর্বে আমি যখন কোনো জনপদে কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখন তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি এ পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি”। (সূরা আয যুখরুফ: ২৩)

যে ব্যক্তি তার দাবির পক্ষে সঠিক কোনো দলীল-প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে না, সে এ দলীলের আশ্রয় নেয়। এটি একটি বাতিল ও অসত্য দলীল। তর্ক-বিতর্কের সময় এর কোনো মূল্য নেই। কেননা তারা তাদের যেসব বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুসরণ করে যাচ্ছে, তারা কোনো সুস্পষ্ট হেদায়াতের উপর ছিল না। যাদের অবস্থা ঠিক এ রকমই তাদের অনুসরণ করা এবং তাদেরকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয নেই।

আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিবাদে বলেন,

﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ﴾

প্রত্যেক নাবীই তাদের বলেছেন, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের যে পথে চলতে দেখেছো আমি যদি তোমাদেরকে তার চেয়ে অধিক সঠিক রাস্তা বলে দেই তাহলেও কি তোমরা সে পথেই চলতে থাকবে? তারা সব রসূলকে এ জবাবই দিয়েছে, যে দীনের দিকে আহ্বান জানানোর জন্য তুমি প্রেরিত হয়েছো, আমরা তা অস্বীকার করি। (সূরা আয যুখরুফ: ২৪)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সে বিধানের দিকে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এসো রসূলের দিকে, তখন তারা জবাব দেয়, আমাদের বাপ-দাদাকে যে পথে পেয়েছি সে পথই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা কি নিজেদের বাপ-দাদারই অনুসরণ করে চলবে, যদিও তারা কিছুই জানতো না এবং সঠিক পথও তাদের জন্য ছিল না? (সূরা আল মায়েদা: ১০৪)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

“তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তা মেনে চলো, জবাবে তারা বলে আমাদের বাপ-দাদাদের যে পথের অনুসারী পেয়েছি আমরা তো সে পথে চলবো। যদিও তাদের বাপ-দাদাদের বিবেক-বুদ্ধিই ছিল না এবং তারা সুপথগামী ছিল না। তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে?” (সূরা আল বাকারা: ১৭০)

বাপ-দাদারা যদি হকের উপর থাকে, তাহলে তাদের অনুসরণ করা প্রশংসনীয় হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾

"আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকূবের দীন অনুসরণ করেছি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা আমাদের জন্য শোভনীয় নয়"। (সূরা ইউসুফ: ৩৮)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾

"যারা ঈমান গ্রহণ করেছ এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানসহ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে আমি তাদের সেসব সন্তানকেও তাদের সাথে (জান্নাতে) একত্র করে দেব। আর আমি তাদের আমল থেকে কোনো কিছুই কমাবো না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ"। (সূরা আত তুর: ২১)

পথভ্রষ্ট বাপ-দাদারা যে দীনের উপর ছিল, তা দিয়ে দলীল পেশ করার সন্দেহটি মুশরিকদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেছে। এ দলীল দিয়ে তারা নাবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে।

নূহ 'আলাইহিস সালামের কাওমের লোকদেরকে যখন নূহ 'আলাইহিস সাল্লাম বললেন,

﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾

"হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো সত্য মাবুদ নেই, তোমরা কি ভয় করো না? তার সম্প্রদায়ের যেসব সরদার তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করলো তারা বলতে লাগলো, এ ব্যক্তি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর লক্ষ্য হচ্ছে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা। আল্লাহ পাঠাতে চাইলে ফেরেশতা পাঠাতেন একথা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের আমলে কখনো শুনিনি"। (সূরা আল মুমিনূন: ২৩-২৪)

সুতরাং তাদের বাপ-দাদারা যে দীনের উপর ছিল, তাকে দলীল হিসাবে পেশ করে তারা নূহ 'আলাইহিস সালামের দাওয়াতের বিরোধীতায় লিপ্ত হয়েছিল। সালেহ 'আলাইহিস সালামের গোত্রের লোকেরা তাকে বলেছিল,

﴿أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾

আমাদের বাপ-দাদারা যেসব উপাস্যের পূজা করতো তুমি কি তাদের পূজা করা থেকে আমাদের বিরত রাখতে চাচ্ছো? আর যে ধর্মের দিকে তুমি আমাদেরকে আহ্বান করছো, বস্তুত আমরা তো সে সম্পর্কে গভীর সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছি”। (সূরা হুদঃ ৬২)

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের গোত্রের লোকেরা তাকে বলেছিল,

﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾

“তারা বলল না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি, তারা এরূপই করতো”। (সূরা শুআরাঃ ৭৪) যেমন ফিরআউন মূসাকে বলেছিল,

فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى

“তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী?” (সূরা তোহাঃ ৫১)

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আরবের মুশরিকদেরকে বললো, তোমরা لاإله إلا الله বলো, তখন তারা বলেছিল,

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾

“পরবর্তী দীনের ভিতরে এ ধরনের কথা শুনিনি। এটি একটি বানোয়াট কথা”। (সূরা সোয়াদঃ ৭)

দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে কবর পূজারীরা আরো যেসব সন্দেহকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে, তাহলো তাদের মতে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করাই যথেষ্ট। এরপর মানুষ যা কিছুই করুক না কেন, لاإله إلا الله বলার পর সে আর কখনো কাফের হবে না। তারা ঐসব হাদীছের বাহ্যিক অর্থকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে যেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কালেমায়ে তাওহীদ ও রেসালাতে মুহাম্মাদীয়ার সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন।

এ সন্দেহের জবাব হলো, হাদীছগুলোর সাধারণ ও বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এসব হাদীছকে অন্যান্য হাদীছের সাথে মিলিয়ে বুঝতে হবে। সেসব হাদীছে যা এসেছে, তার অর্থ হলো যে ব্যক্তি জবান দিয়ে لاإله إلا الله পাঠ করবে, তাকে অবশ্যই অন্তর দিয়ে সেটার অর্থ বুঝতে হবে ও বিশ্বাস করতে হবে এবং সেটার দাবি অনুযায়ী আমল করতে হবে। সেই সঙ্গে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য যেসব বস্তুর ইবাদত করা হয়, তার প্রতি কুফুরীও করতে হবে। যেমন ইতবান ইবনে মালেকের হাদীছে এসেছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِى بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ»

“আল্লাহ তা‘আলা এমন ব্যক্তির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে”।[৩৫]

অন্যথায় মুনাফেকরাও তাদের জবান দিয়ে لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ পাঠ করেছে। এরপরও তারা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে প্রবেশ করবে। লা-ইলাহা-এর উচ্চারণ তাদের কোনো কাজে আসবে না। কেননা তারা তাদের অন্তর দিয়ে এর অর্থকে বিশ্বাস করতো না।

ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»

“যে ব্যক্তি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে আর আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য যেসব বস্তুর ইবাদত করা হয় তাকে অস্বীকার করবে, তার জান-মাল মুসলিমদের নিকট সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে এবং তার অন্তরে লুকায়িত বিষয়ের হিসাব আল্লাহর উপরই ন্যস্ত হবে”।[৩৬]

এখানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান-মাল হারাম হওয়ার জন্য দু’টি জিনিসের শর্ত করেছেন।

(১) لا إله إلا الله উচ্চারণ করা এবং

(২) আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য যেসব বস্তুর ইবাদত করা হয় তাকে অস্বীকার করা। শুধু জবানের উচ্চারণকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি। এতে বুঝা গেলো, যে ব্যক্তি لا إله إلا الله পাঠ করবে, কিন্তু মৃত আওলীয়াদের ইবাদত বর্জন করবে না এবং সমাধি-মাজার ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না, তার জান-মাল হারাম হবে না।[৩৭]

তৃতীয়তঃ কবরপূজারীরা আরো যেসব সন্দেহ উপস্থাপন করে, তার মধ্যে এও রয়েছে যে, তারা দাবি করে এ উম্মতে মুহাম্মাদী যেহেতু لا إله إلا الله محمد رسول الله পাঠ করে নিয়েছে, তাই তাদের মধ্যে আর শিরক প্রবেশ করবে না। আর কবর, সমাধি ইত্যাদির পাশে তারা যে মৃতদের ইবাদত করছে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের কাছে দু‘আ করছে তাদের মতে এটিকে শিরক বলা হয় না।

তাদের এ কথার জবাব হলো, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, ইয়াহূদী- খ্রিষ্টানরা যে দীনের উপর ছিল এ উম্মতের মধ্যেও তার সদৃশ পাওয়া যাবে। ইয়াহূদী- খ্রিষ্টানদের দীনের মধ্যে এটি ছিল যে, তারা তাদের পোপ ও

---

[৩৫] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৫৪০১, অধ্যায়: বাড়িঘরে ছ্বলাতের স্থান নির্ধারণ করা। মুসলিম, অধ্যায়: জামা‘আতের সাথে ছ্বলাত পড়া হতে বিরত থাকার অনুমতি।

[৩৬] মুসলিম, হা/২৩, অধ্যায়: লা-ইলাহা পাঠ না করা পর্যন্ত লোকদের সাথে জিহাদ করার আদেশ।

[৩৭] আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কারো জান-মালের উপর আক্রমণ করা কোনো ব্যক্তি বিশেষের দায়িত্ব নয়। এটি সরকার বা সরকারের প্রতিনিধি ও প্রশাসনের দায়িত্ব।

পাদ্রীদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছিল। আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, ততোক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতোক্ষণ না তার একদল উম্মত মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং যতোক্ষণ না তার উম্মতের একটি শ্রেণি মূর্তি পূজা করবে। বাস্তবেই এ উম্মতের মধ্যে এমন শিরক এবং ধ্বংসাত্মক মতবাদ এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রবেশ করেছে, যা অনেক মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকেই বের করে দিয়েছে। অথচ তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে থাকে।

চতুর্থত: তারা আরো যেসব সন্দেহের আশ্রয় নিয়েছে, তার মধ্যে শাফা'আতের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা বলে, আমরা আল্লাহর পরিবর্তে আওলীয়া ও ছ্বলেহীনদের কাছে প্রয়োজন পূরণ করার জন্য দু'আ করি না। তবে তাদের থেকে আমরা চাই যে, তারা আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। কেননা তারা খুব ভালো মানুষ এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং আমরা তাদের সম্মানের মাধ্যমে এবং তাদের শাফা'আতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছেই চাই।

তাদের এ সন্দেহের জবাব হলো, জাহেলী যুগের মুশরিকরা তাদের বাতিল দীনের পক্ষে হুবহু এই সন্দেহটিই ব্যক্ত করতো। এরপরও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কাফের বলেছেন এবং মুশরিক হিসাবেই নামকরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"আর তারা ইবাদত করে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারতোনা এবং তাদের কোনো উপকারও করতে পারতোনা। তারা বলে, এরা তো আল্লাহ্র কাছে আমাদের সুপারিশকারী মাত্র। তুমি বলো, তোমরা কি আল্লাহ্কে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি পবিত্র ও মহান সেসব বস্তু থেকে যাকে তোমরা শরীক করছো"। (সূরা ইউনুস: ১৮)

শাফা'আত সত্য। কিন্তু তার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা সূরা যুমারের ৪৪ নং আয়াতে বলেন,

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾

"বলো, সমস্ত শাফা'আত কেবল আল্লাহরই মালিকানাধীন"।

সুতরাং তা কেবল আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। মৃত ওলী-আওলীয়াদের কাছে নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের কাছে, নাবীদের কাছে কিংবা অন্যদের কাছে শাফা'আত চাওয়ার অনুমতি দেননি। অতএব শাফা'আত আল্লাহর অধিকারভুক্ত এবং তা তার কাছেই চাইতে হবে। যাতে করে তিনি সুপারিশকারীকে সুপারিশ করার অনুমতি দেন। শাফা'আতের যে নিয়ম মানব সমাজে প্রচলিত আছে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সে

নিয়ম অগ্রহণযোগ্য। মানুষের নিকট পরিচিত শাফা'আতের স্বরূপ হলো, তাদের বড়দের নিকট বিনা অনুমতিতেই শাফা'আতকারীগণ কারো জন্য শাফা'আত করার দাবি নিয়ে আসে। বড়রা এ ক্ষেত্রে সুপারিশকারীদের সুপারিশ কবুল করতে বাধ্য। যার ব্যাপারে সুপারিশ করা হচ্ছে, যদিও তারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে। কারণ সুপারিশ কারীদের প্রতি তাদের প্রয়োজন রয়েছে। তাদের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন ছাড়া চলতে পারে না।

সুতরাং তারা তাদের কাজে সমর্থক ও সাহায্যকারীদের প্রতি মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কথা হলো, তার অনুমতি ছাড়া কেউ তার কাছে সুপারিশ করতে পারবে না এবং যার জন্য সুপারিশ করা হবে, তার প্রতিও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি থাকতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার কোনো সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে না এবং তিনি কারো প্রতি মুখাপেক্ষীও নন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾

"আকাশ মণ্ডলে এমন অনেক ফেরেশতা রয়েছে, যাদের শাফা'আত কোনো কাজেই আসবে না, তবে আল্লাহ তা'আলা নিজ ইচ্ছায় যাকে খুশি তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিলে সে কথা ভিন্ন। (সূরা আন নাজমঃ ২৬)

পঞ্চমত: এসব লোকের সন্দেহের মধ্যে এও রয়েছে যে, তারা বলে আল্লাহ তা'আলার নিকট ওলী ও সৎ লোকদের বিরাট মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং আমরা তাদের সম্মান ও মর্যাদার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি। তাদের এ সন্দেহের জবাবে আমরা বলবো যে, সমস্ত মুমিন আল্লাহর ওলী। তবে খাছ করে দৃঢ়তার সাথে নির্দিষ্ট করে কোনো ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে এ কথা বলা যাবে না যে, অমুকের পুত্র অমুক আল্লাহর ওলী। কেননা এ রকম বলতে গেলে কুরআনুল কারীম এবং রসূলের সুন্নাহ থেকে কোনো না কোনো দলীলের প্রয়োজন রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের মাধ্যমে যার বেলায়াত প্রমাণিত হয়েছে, তার ব্যাপারে আমাদের জন্য বাড়াবাড়ি করা এবং তার থেকে বরকত ও কল্যাণ হাসিল করা বৈধ নয়। কেননা এটি শিরকের অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন সরাসরি তার কাছে দু'আ করি, তার মাঝে ও আমাদের মাঝে কোনো মাধ্যম নির্ধারণ না করি। কেননা পূর্বের মুশরিকরাও এ কথা বলতো যে, তাদের মূর্তিগুলোকে তাদের মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে সুপারিশকারী ও মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ করেছে। তারা আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা ও নৈকট্যের মাধ্যমে প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কাজের প্রতিবাদ করেছেন।

بيان أنواع من الشرك الأكبر

কয়েক প্রকার বড় শিরকের বর্ণনা

শিরক দু'প্রকার। বড় শিরক ও ছোট শিরক। বড় শিরক তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। মানুষকে এটি ইসলাম থেকে বের করে দেয়। বড় শিরকের অনেক প্রকার রয়েছে। কতিপয় বড় শিরকের আলোচনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। কবর ও সমাধির আশপাশে বড় শিরকের চর্চা করা হয়ে থাকে। এখানে আমরা আরো কয়েক প্রকার বড় শিরকের আলোচনা করবো।

১) الشرك في الخوف ভয়ের মধ্যে শিরক:

আলেমগণ যেভাবে ভয়ের সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন, তা হলো সম্ভাব্য কিংবা নিশ্চিত কোনো লক্ষণ থেকে অপ্রিতিকর কিছু হওয়ার আশঙ্কা করাকে ভয় বলা হয়। ভয় তিন প্রকার।

প্রথম প্রকার ভয়: গোপন ভয়। আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য জিনিস যেমন মূর্তি, ত্বগূত, মৃত ব্যক্তি, গায়েবী জগতের জিন কিংবা অনুপস্থিত মানুষের পক্ষ থেকে অপ্রিয় কিছু হওয়ার আশঙ্কা করার নাম ভয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা হুদ 'আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন যে, তারা হুদকে বলেছিল,

﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُون مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ﴾

আমরা তো মনে করি তোমার উপর আমাদের কোনো দেবতার অভিশাপ পড়েছে। হুদ বললো, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরা সাক্ষী থাকো। তোমরা যে শিরক করছো, নিশ্চিতভাবে আমি তা থেকে মুক্ত। সুতরাং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো। অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশও দিয়ো না। (সূরা হুদ: ৫৪-৫৫)

মক্কার মুশরিকরা নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের মূর্তিদের ভয় দেখিয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾

"এসব লোক তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের ভয় দেখায়"। *(সূরা আয যুমার: ৩৬)*

বর্তমান সময়ের কবর পূজারী এবং মূর্তিপূজকরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে এ ধরনের ভয় করে থাকে। তারা কবরকে ভয় করে। তাওহীদপন্থি যেসব লোক কবর পূজার প্রতিবাদ করে এবং ইখলাছের সাথে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার আদেশ দেয় তাদেরকেও কবর পূজারীরা কবর ও কবরে দাফনকৃত ওলী-আওলীয়াদের ভয় দেখায়।

এ শ্রেণির ভয় তথা গোপন ভয় গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। এ শ্রেণির ভয় একমাত্র আল্লাহকেই করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"এ হলো শয়তান, সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের দ্বারা ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক তাহলে তাদেরকে ভয় করো না; বরং আমাকেই ভয় করো"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৭৫)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ﴾ **কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো"।** *(সূরা আল মায়িদা: ৩)*

এ ভয় দীনের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম স্তরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে এ শ্রেণির ভয় করবে, আল্লাহর সাথে বড় শিরকে লিপ্ত হবে। আমরা এ থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয় প্রকার ভয়: ভয়ের আরেকটি প্রকার হলো মানুষের ভয়ে কিছু ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেয়া। এটি হারাম ও ছোট শিরক। আল্লাহ তা'আলার নিম্নের বাণীতে এ শ্রেণির ভয়ের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা বহু সাজ-সরঞ্জাম সমবেত করেছে। সুতরাং তাদের ভয় করো। তখন তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম কর্ম সম্পাদনকারী। অবশেষে তারা ফিরে এলো আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ সহকারে। তাদের কোনো রকম ক্ষতি হয়নি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর চলার সৌভাগ্যও তারা লাভ করলো। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহকারী। এ হলো শয়তান, সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের দ্বারা ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক তাহলে তাদেরকে ভয় করো না; বরং আমাকেই ভয় করো"। (সূরা আলে- ইমরান: ১৭৩-১৭৫)

সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছে এ ভয়ের কথাই এসেছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَرَى أَمْرًا، لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لَا يَقُولُ فِيهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: خَشْيَةُ النَّاسِ، فَيَقُولُ: فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى

"তোমাদের কেউ যেন নিজেকে লাঞ্ছিত না করে। ছাহাবীগণ বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কীভাবে আমাদের কেউ নিজেকে লাঞ্ছিত করতে পারে? তিনি বললেন, বান্দা কখনো এমন অন্যায় কাজ দেখে, যার প্রতিবাদ করা কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্যই তার উপর আবশ্যক। অথচ সে তার প্রতিবাদ করে না। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন বলবেন, অমুক অমুক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কিসে তোমাকে বারণ করলো? বান্দা বলবে, মানুষের ভয়। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, কেবল আমাকেই ভয় করা তোমার উপর আবশ্যক ছিল"।[৩৮]

---

[৩৮] ইবনে মাজাহ, ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) ضعيف الجامع গ্রন্থে হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন, দেখুন, হা/৬৩৩২। অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সত্য বলা প্রত্যেক আল্লাহ ভীরু মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব পালনার্থে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিবে পরিণত হয়েছে। এভাবে জানের ভয়ে ও দুনিয়াবী স্বার্থ নষ্ট হওয়ার ভয়ে সত্য বলা থেকে বিরত থাকলে অচিরেই ইসলামী আক্বীদা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিলীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মুছে যেতে পারে আমাদের দেশ ও সমাজ থেকে ইসলামী পরিচয়। তার স্থলে মুসলিম জাতির উপর চেপে বসতে পারে কুফরী, নাস্তিক্যবাদ, বিজাতীয় সংস্কৃতি, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা।

আলেম, দাঈ ও সাধারণ মুসলিমগণ যেভাবে দিন দিন সত্য বলা থেকে পিছিয়ে আসছে, হিকমতের দোহাই দিয়ে যেভাবে মুখ বন্ধ করে রাখা হচ্ছে, তাতে ইসলাম ও মুসিলমদের সুবিধা হওয়ার বদলে অস্তিত্ব হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। তাই হিকমতের দোহাই দিয়ে সকল ক্ষেত্রেই হক বলা বর্জন করলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় আসার সম্ভাবনা রয়েছে। মানুষের ভয়ে কিংবা পার্থিব স্বার্থ ছুটে যাওয়ার ভয়ে সত্য বলা পরিত্যাগ করার ভয়াবহ পরিণতির বিষয়টি কুরআনের অনেক আয়াত ও নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একাধিক ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾

"আহলে কিতাবদের সেই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দাও, যা আল্লাহ তাদের থেকে নিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছিল, তোমরা কিতাবের শিক্ষা মানুষের মধ্যে প্রচার করবে, তা গোপন করতো পারবে না"। (সূরা আলে-ইমরান: ১৮৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

"বনী ইসরাঈল জাতির মধ্য থেকে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের উপর দাউদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কারণ তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং পাপাচারে

সীমালঙ্ঘন করেছিল। তারা পরস্পরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা পরিহার করেছিল, তাদের গৃহীত সেই কর্ম ছিল বড়ই জঘণ্য"। (সূরা আল মায়িদা: ৭৯-৮০)

নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ "কেউ যখন সত্য জানতে পারবে তখন মানুষের ভয় যেন তাকে সত্য বলতে বারণ না করে"। তিরমিযী, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) আরো বাড়িয়ে বলেন যে, فإنه لا يُقرِّب من أَجَلٍ ذلك ولا يُبَاعد من رِزْقٍ "কেননা সত্য বলা মানুষকে মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দেয় না এবং রিযিক থেকেও দূরে সরিয়ে দেয় না"।

সুতরাং আমরা সুস্পষ্ট করে সত্য বলতে চাই। সাধ্যানুসারে ইসলামের পক্ষে কথা বলতে চাই। এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করি না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যা নাযিল করেছেন এবং রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য যে সুন্নাত রেখে গেছেন, আমরা মানুষের কাছে তা নির্ভয়ে বর্ণনা করতে চাই।

একই সময়ে আমরা ঐসব নব্য মূর্তিপূজা, নতুন নতুন শিরক ও সকল প্রকার অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এবং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশ বিধ্বংসী বিজাতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চাই, যা নাস্তিক ও মুশরিকদের অন্ধ অনুসরণ করে আমাদের দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা কুরআনের পক্ষে কথা বলতে চাই। মুসলিমদের সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষা করতে চাই।

এ মুহূর্তে প্রত্যেক মুমিন নর-নারী, আলেম ও দাঈদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করা উচিৎ। আমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের দিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবো না। সত্য বললেই জান মালের ক্ষতি হবে এবং পার্থিব স্বার্থ নষ্ট হবে, এ ভয়ে আমরা সত্য বলা হতে মোটেই পিছপা হতে পারি না। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের সবকিছুই আল্লাহর হাতে।

আলেমগণ বলেছেন, শারীরিক ও মানসিক সামান্য কষ্ট এবং পার্থিব ভোগবিলাস ও স্বার্থ ছুটে যাওয়ার সন্দেহ হলেই সত্য বলা পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ। হত্যার আশঙ্কার বিষয়টি ভিন্ন। তাও আবার সাধারণ মুসলিমদের ক্ষেত্রে। তবে যারা জাতীয় পর্যায়ের আলেম ও দাঈ তাদের জন্য কোনো অবস্থাতেই সত্য গোপন করা জায়েন নেই। আল্লাহর জন্য তারা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করবেন। আমাদের সামনে চার মাযহাবের চারজন বিজ্ঞ ইমাম, ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এবং ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবসহ আরো বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তারা সত্য বলার ক্ষেত্রে জান-মালসহ কোনো কিছুরই ভয় করেননি। আল্লাহর রহমতে অতঃপর তাদের ত্যাগের কারণে ইসলাম আজ পর্যন্ত টিকে রয়েছে। আশা করি আমাদের আলেমগণ সালাফে ছ্বলেহীনদের পথেই চলবেন।

সুতরাং মুসলিম যুবক-যুবতীদের বিবেক-বুদ্ধি ও অন্তরকে শিরক, কুফরী এবং ইউরোপ-আমেরিকা ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের অপসংস্কৃতি, নোংরামি ও কুসংস্কার থেকে পবিত্র রেখে তাতে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে রাখার গুরু দায়িত্ব পালন করতে আলেমদের অবহেলা, জান-মাল ও ইজ্জতের ভয়ে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে যখন হত্যা করার জন্য তারতুসে অবস্থানরত খলীফা মামুনের দরবারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন ইমাম আহমাদের অন্যতম সাথী আবু জা'ফর আলআম্বারী ফুরাত নদী পার হয়ে ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। ইমাম তাকে দেখে বললেন: হে আবু জা'ফর! এত কষ্ট করে আমার সাথে দেখা করতে আসার কী প্রয়োজন ছিল? জবাবে আবু জা'ফর বললেন: ওহে আহমাদ! শুন! তুমি আজ মানুষের নয়ন মনি, তুমি সকলের মাথা! মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা তোমার অনুসরণ করবে। আল্লাহর কসম! তুমি যদি কুরআকে মাখলুক বলো, তাহলে আল্লাহর বান্দারা তাই বলবে। আর তুমি যদি তা বলতে অস্বীকার করো, তাহলে অগণিত মানুষ কুরআনকে মাখলুক বলা হতে বিরত থাকবে। হে বন্ধু! ভাল করে শুন। খলীফা যদি তোমাকে এইবার

তৃতীয় প্রকার ভয়: আরেক প্রকার ভয় রয়েছে, যা সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত ভয়। শত্রুর ভয়, হিংস্র জীব-জন্তুর ভয় এবং এ ধরনের অন্যান্য ভয়। এ জাতীয় ভয় দোষনীয় নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস সালামের ঘটনাতে বলেন,

﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

"এ খবর শুনতেই মূসা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শহর থেকে বেরিয়ে পড়লো এবং সে বললো, হে আমার রব! আমাকে যালেমদের হাত থেকে বাঁচাও"। (সূরা আল ক্বছাছ:২১)

উপরোক্ত তিন প্রকার ভয়ের মধ্যে প্রথমটি তথা গোপন ভয় সর্ববৃহৎ একটি ইবাদত। সুতরাং ইখলাছের সাথে এ শ্রেণির ভয় কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। এমনি দ্বিতীয় প্রকার ভয় ইবাদতের অন্যতম হক এবং সেটার পরিপূরক। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾

"এ হলো শয়তান, সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। (সূরা আলে ইমরান: ১৭৫) অর্থাৎ সে তার বন্ধুদের দ্বারা ভয় দেখায়।

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ﴾ **"সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না; বরং আমাকেই ভয় করো।"** সূরা আলে ইমরান: ১৭৫

আল্লাহ তা'আলা এখানে মুমিনদেরকে তাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের ভয়কে কেবল আল্লাহর সাথেই সীমিত রাখার আদেশ করেছেন। সুতরাং তারা যখন ইখলাছের সাথে আল্লাহকেই ভয় করবে এবং সকল প্রকার ইবাদত কেবল তার জন্যই সম্পন্ন করবে, তখন তিনি উদ্দেশ্য পূরণ করবেন এবং তাদেরকে ভয়-ভীতি হতে নিরাপত্তা দান করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾

"আল্লাহ্ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? এসব লোক তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের ভয় দেখায়"। (সূরা আয যুমার: ৩৬)

হত্যা নাও করে, তাহলে তুমি একদিন মৃত্যু বরণ করবে। মরণ একদিন আসবেই। সুতরাং তুমি আল্লাহকে ভয় করো। খলীফার কথায় তুমি কুরআনকে সৃষ্টি বলতে যেয়ো না।

কথাগুলো শুনে ইমাম আহমাদ কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন: ما شاء الله আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই হবে। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবু জা'ফর! কথাগুলো তুমি আরেকবার বলো। আবু জা'ফর কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন। এবারও ইমাম কাঁদলেন এবং বললেন, ما شاء الله।

আমরা আশা করি বিলম্বে হলেও সত্যের এ দুর্বল আওয়াজ প্রতিটি মুসলিমের কানে পৌঁছবে এবং তাদেরকে জাগ্রত করবে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর দুশমন ইবলীসের অন্যতম কৌশল হচ্ছে, সে মুমিন বান্দাদেরকে তার সৈনিক ও বন্ধুদের দ্বারা ভয় দেখায়। এভাবে ভয় দেখায়, তারা যেন তার দোসরদের বিরুদ্ধে জিহাদ না করে, তাদেরকে সুপথে আসার আদেশ না দেয় এবং অন্যায় কাজের প্রতিবাদ না করে। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, এটি হচ্ছে শয়তানের কলাকৌশল। সে মুমিনদেরকে তার বন্ধুদের দ্বারা ভয় দেখায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার বন্ধুদেরকে ভয় করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যখন বান্দার ঈমান শক্তিশালী হবে, তখন তার অন্তর থেকে শয়তানের বন্ধুদের ভয় দূর হয়ে যাবে। অপর দিকে যখনই তার ঈমান দুর্বল হবে, তখনই শয়তানের বন্ধুদের ভয় তার অন্তরে বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾

"তারাই হতে পারে আল্লাহর মাসজিদ রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সেবক, যারা আল্লাহর প্রতি ও পরকালে প্রতি ঈমান আনে, ছ্বলাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। তাদেরই ব্যাপারে আশা করা যেতে পারে যে, তারা সঠিক সোজা পথে চলবে"। (সূরা আত তাওবা: ১৮)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহর ঘর মাসজিদসমূহ কেবল তারাই আবাদ করবে, যারা অন্তর দিয়ে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান আনয়নের সাথে সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমল করে এবং ইখলাছের সাথে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই ভয় করে। মাসজিদসমূহের তত্ত্বাবধানে মুশরিকদের অধিকার খর্ব করার পর আল্লাহ তা'আলা সেটা মুমিনদের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। কেননা মসজিদের তত্ত্বাবধান করার বিষয়টি এমন যে, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা ও সৎকাজে আত্মনিয়োগ করা ব্যতীত তা সম্পন্ন হয় না।

মুশরিকরা যদিও ভালো আমল করে, কিন্তু তাদের আমলগুলোর উপমা হলো পানিহীন মরু প্রান্তরের মরীচিকার মতো। তৃষ্ণার্ত পথিক তাকে পানি মনে করেছিল, কিন্তু ওখানে পৌঁছে সে কিছুই পেলো না অথবা তাদের আমলগুলো ঠিক ছাই এর মতো, যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তারা নিজেদের কৃতকর্মের কোনই ফল লাভ করতে পারবে না।

যে আমলের অবস্থা ঠিক এ রকমই, সেটা থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। ইখলাছের উপর ভিত্তিশীল সৎআমল ও তাওহীদ ব্যতীত এবং শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার মুক্ত ছ্বহীহ আক্বীদা ব্যতীত মাসজিদগুলোর সঠিক আবাদ হয় না। ইট, টালি ইত্যাদি দিয়ে জাঁকজমক ও সুসজ্জিত করে বড় আকারের মাসজিদ বানালেই সেটা আবাদ হয়ে যায় না অথবা কবরের উপর মজবুতভাবে মাসজিদ তৈরী করার মাধ্যমেই সেটা আবাদ হয় না। যারা এ কাজ করে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর লা'নত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾ **"আল্লাহ কে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না"** (সূরা আত তাওবা: ১৮)

ইবনে আতীয়া এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে তা'যীম, ইবাদত এবং আনুগত্যের ভয় উদ্দেশ্য। তবে মানুষ দুনিয়ার ক্ষয়-ক্ষতির যেসব আশঙ্কা করে তাতে কোনো দোষ নেই।

আমীর মুআবীয়া আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর কাছে একটি বার্তা লিখে তাতে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করলেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখলেন, তিনি যেন তার জন্য কিছু উপদেশ লিখে পাঠান এবং বেশী দীর্ঘ না করেন। সুতরাং তিনি এই চিঠি লিখলেন,

«إِلَى مُعَاوِيَةَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَالسَّلَامُ»

"মুআবীয়ার আমার এ পত্র। আপনার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষকে রাগান্বিত করে হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করে, তার জন্য মানুষের মুকাবেলায় আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের কাছে সোপর্দ করে দেন। আপনার প্রতি সালাম"। আবু নুআইম হিলইয়াতুল আওলীয়ায় এবং ইবনে হিব্বান তার ছ্বহীহ গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে হিব্বান ও আবু নুআইমের শব্দগুলো এ রকম,

«مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ»

"যে ব্যক্তি মানুষকে নারাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন, আর মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে নারাজ করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন"।[৩৯]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মুআবীয়ার নিকট যে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন, তা মারফু হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। মারফু বর্ণনার শব্দগুলো ঠিক এ রকম,

[৩৯] ইমাম আলবানী হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন, ছ্বহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২২৫০।

مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاس كَفَاهُ مَؤُنَةَ النَّاسَ ومَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ لَمْ يَغْنُوا عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

"যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, তার জন্য মানুষের মুকাবেলায় আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করে মানুষেরা আল্লাহর মুকাবেলায় তার কোনো উপকারে আসবে না"। আর মাউকুফ বর্ণনার শব্দগুলো হচ্ছে এ রকম,

«من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما»

"যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন, আর মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, মানুষের মধ্য হতে তার প্রশংসাকারীরাই নিন্দুকে পরিণত হয়"।

এটি দীনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে, সে মুত্তাকী এবং আল্লাহর সৎ বান্দা হতে পারবে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। বান্দার জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

"আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্‌ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক প্রদান করেন"। (সূরা আত তালাক: ২-৩)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার উপর থেকে মানুষের কষ্ট দূর করবেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর যারা আল্লাহকে নারাজ করে মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন করতে যায়, তাদের মনে রাখা উচিত যে সমস্ত মানুষ তার উপর সন্তুষ্ট নাও হতে পারে। তবে তারা যখন তার পক্ষ হতে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে, কোনো প্রকার অসুবিধা অনুভব করবে না এবং নিশ্চিতভাবে তার পক্ষ থেকে শুভ পরিণাম আশা করবে, তখন কেবল তারা সন্তুষ্ট থাকবে। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই তারা অসন্তুষ্ট হবে ও বিদ্রোহ করবে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী,

«ومَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ لَمْ يَغْنُوا عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»

"যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, তার জন্য মানুষের মুকাবেলায় আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করে

মানুষেরা আল্লাহর মুকাবেলায় তার কোনে উপকারে আসবে না” ।[৪০]

ক্বিয়ামতের দিন যালেমরা রাগে-গোস্বায় তাদের হস্তদ্বয় কামড়াতে থাকবে। তারা বলবে, হায় আফসোস আমরা যদি রসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায় আফসোস! আমরা যদি অমুককে বন্ধু না বানাতাম!

যে ব্যক্তি আল্লাহকে নারাজ করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, মানুষের মধ্য হতে তার প্রশংসাকারীরাই তার নিন্দুকে পরিণত হয়। এ রকমই হয়ে থাকে। কেননা যা আল্লাহর জন্য করা হয় সেটা স্থায়ী হয় আর যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য করা হয় তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই হয়ে থাকে। কিন্তু প্রথমেই সেটা তাদের মর্জি মোতাবেক অর্জিত হয় না। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার কথা এখানেই শেষ।

বিভিন্নভাবে বর্ণিত এ হাদীছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল, যে ব্যক্তি তার কাজের মাধ্যমে মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করবে সে দু'টি বড় ধরনের কল্যাণ অর্জন করবে। একটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং অন্যটি মানুষের সন্তুষ্টি। বিপরীত পক্ষে যে ব্যক্তি তার কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে নাখোশ করে মানুষের সন্তুষ্টি তালাশ করবে, সে দু'টি ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং মানুষের অসন্তুষ্টি। এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্টি করতে পারলেই সমস্ত কল্যাণ অর্জিত হয়। আল্লাহকে নাখোশ করে মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন করতে গেলেই সব ধরনের অকল্যাণ হয়। আমরা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও শান্তি কামনা করছি।

এখানে জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলার ভয়ের সাথে আশা-আকাঙ্খা ও ভালোবাসা মিশ্রিত হওয়া চাই। ভয় যেন এমন না হয়, বান্দা আল্লাহর রহমত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হবে। মুমিন বান্দা ভয় ও আশা-আকাঙ্খা নিয়ে আল্লাহর কাছে যাবে। সবসময় তার মনে আল্লাহর আযাবের ভয় এবং তার রহমতের আশা রাখবে। শুধু এমন ভয় নিয়ে আল্লাহর দিকে যাবে না যে, নিজেকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করবে। শুধু এমন আশা-আকাঙ্খা নিয়েও যাবে না যে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করবে। কেননা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং তার পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা তাওহীদের পরিপন্থি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾

তারা কি আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে কেউ নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবতে পারে না। (সূরা আল আরাফ: ৯৯)

[৪০] ছ্বহীহ: সুনানে তিরমিযী হা/২৪১৪

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾

"আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। তার রহমত থেকে তো একমাত্র কাফেররাই নিরাশ হয়"। (সূরা ইউসুফ: ৮৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾

"একমাত্র পথভ্রষ্ট লোকেরা ব্যতীত স্বীয় রবের রহমত থেকে আর কে নিরাশ হতে পারে"? (সূরা আল হিজর: ৫৬)

ইসমাঈল ইবনে রাফে (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বান্দা পাপ কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেও আল্লাহর ক্ষমার আশা করা তার পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করার আলামত। আলেমগণ বলেন, القنوط অর্থ হলো দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ দূর হওয়া অসম্ভব মনে করা। এটি আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করার বিপরীত। এই উভয় অবস্থাতেই বিরাট গুনাহ রয়েছে।

মুমিনদের জন্য শুধু ভয়ের উপর বিদ্যমান থাকা জায়েয নয়। এতে করে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমনি শুধু আশা-আকাঙ্খার উপরও বিদ্যমান থাকা জায়েয নয়। এতে আল্লাহর আযাব হতে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে। সুতরাং বান্দা একই সঙ্গে ভীত-সন্ত্রস্ত ও আশাবাদী থাকবে। আল্লাহর আযাবের ভয় করবে, তার আনুগত্য করবে এবং আল্লাহর রহমতের আশা করবে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আম্বীয়ার ৯০ নং আয়াতে বলেন,

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾

"তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা-আকাঙ্খা ও ভয়-ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত"। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾

"এ সব লোকেরা যাদেরকে ডাকে তারা নিজেরাই তাদের রবের নৈকট্য লাভের আশায় উসীলার অনুসন্ধান করে, তাদের মধ্য হতে কে সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী? তারা তার রহমতের আশা করে এবং তার শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ"। (সূরা আল ইসরা: ৫৭)

সুতরাং ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা যখন একত্রিত হবে, তখন ভয় মিশ্রিত আশা বান্দাকে আমলের দিকে ধাবিত করে এবং উপকারী মাধ্যম গ্রহণ করার প্রতি উৎসাহ যোগায়। কেননা বান্দা আল্লাহর রহমত ও ছাওয়াবের আশা নিয়ে সৎকাজ সম্পন্ন করে এবং আল্লাহর আযাবের ভয়ের কারণেই বান্দা পাপাচার ও নাফরমানী ছেড়ে দেয়। কিন্তু বান্দা যখন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবে, তখন সৎ আমল ছেড়ে দিবে আর যখন আল্লাহর আযাব ও শাস্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করবে, তখন পাপাচারের দিকে ধাবিত হবে। কোনো কোনো আলেম বলেন, যে ব্যক্তি শুধু ভালোবাসা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে, সে ছূফী বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি শুধু ভয় নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে, সে খারেজী। যে শুধু আশা-আকাঙ্খা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে, সে মুর্জীয়া। আর যে ভালোবাসা, ভয়-ভীতি, এবং আশা-আকাঙ্খা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে, সেই প্রকৃত মুমিন।

আল্লাহ তা'আলা তার সর্বোত্তম বান্দাকে উপরোক্ত বিশেষণে বিশেষিত করেছেন,

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾

"এ সব লোক যাদেরকে ডাকে তারা নিজেরাই তাদের রবের নৈকট্য লাভের আশায় উসীলার অনুসন্ধান করে, তাদের মধ্য হতে কে সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী? তারা তার রহমতের আশা করে এবং তার শাস্তিকে ভয় করে"। (সূরা আল ইসরা: ৫৭)

যারা ভয়ের দিকটির প্রতি অবহেলা করে পাপাচারের দিকে ধাবিত হয় এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এভাবে বিশেষিত করেছেন যে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾

"জনপদের লোকেরা কি ভয় করে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে রাত্রিকালে যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন? অথবা জনপদবাসী কি নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আমার শাস্তি তাদের উপর এসে পড়বে দিনের প্রথম ভাগে, যখন তারা খেলা ধুলায় মেতে থাকবে? তারা কি আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ্রায় ছাড়া আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে কেউ নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবতে পারে না"। (সূরা আল আরাফ: ৯৭-৯৯)

আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তা'আলা রসূলদের প্রতি অবিশ্বাসী, কুফুরী ও পাপাচারে সীমালঙ্ঘনকারী জনপদবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর বলেছেন যে, আল্লাহর ধরপাকড় থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করা এবং তার শাস্তির ভয় না করাই তাদেরকে উপরোক্ত পাপাচারের দিকে ধাবিত করেছে। আল্লাহ তা'আলার কৌশল হলো, বান্দা যখন তার অবাধ্য হয় ও তাকে ক্রোধান্বিত করে তিনি তখন বান্দাকে অনেক নিয়ামত দান করেন। বান্দা এতে মনে করে আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। অথচ এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে তাকে অবকাশ দেয়া মাত্র। কাফেররা যখন আল্লাহর নিয়ামত ও সুখ-

শান্তি পেয়ে নিজেদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদ মনে করেছে এবং তাদের কাছে প্রেরিত রসূলদের অবাধ্য হয়েছে ও পাপাচারে সীমালঙ্ঘন করেছে তখন তিনি তাদেরকে ধ্বংস করেছেন।

তাদের পরে আগমনকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করেছেন। তারা যেন পূর্বেকার সীমালঙ্ঘনকারী জাতির মত অপরাধ করে তাদের মতো আযাবের কবলে না পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾

"পৃথিবীর কোনো অংশের অধিবাসীদের ধ্বংসের পর যারা তার উত্তরাধিকারী হয়েছে, তাদের নিকট এটা কি প্রতিয়মান হয়নি যে, আমি চাইলে তাদের অপরাধের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করতে পারি এবং আমি তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিতে পারি। ফলে তারা কিছুই শুনবে না"। (সূরা আল আরাফ: ১০০)

কতিপয় আলেম বলেন, নিম্নের বিষয়গুলো বান্দার অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করে।

(১) অপরাধ ও সেটার কদর্যতা সম্পর্কে জানা।

(২) পাপাচারীদের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত শাস্তির প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং এটি অবগত হওয়া যে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পাপাচারের শাস্তি নির্ধারণ করেছেন।

(৩) বান্দার অন্তরে এ অনুভূতি জাগ্রত হওয়া যে, পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির তাওবা করার সুযোগ নাও হতে পারে এবং পাপাচারে লিপ্ত হলে তার মাঝে ও তাওবার মাঝে আবরণ পড়ে যেতে পারে। পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে এ তিনটি বিষয় বান্দার অন্তরে ভয় ঢুকায়। আর পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার পর এ তিনটি বিষয় বান্দার অন্তরে আরো প্রবলভাবে ভয়ের সঞ্চার করে।

নাবী-রসূলদের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা কখনো আল্লাহর উপর আশা-ভরসা বর্জন করতেন না এবং কোনো অবস্থাতেই তারা তার রহমত ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হতেন না। বিপদাপদ যতই প্রকট আকার ধারণ করতো এবং উপায়-উপকরণ যতই দুর্বল হতো কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর প্রতি আশা-আকাঙ্খা ছেড়ে দিতেন না।

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হওয়া এবং তার স্ত্রী সন্তান প্রসবের বয়স পার হয়ে যাওয়ার পর তাকে যখন ফেরেশতারা সন্তানের সুখবর দিল তখন তিনি বলেছিলেন,

﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾

“একমাত্র পথভ্রষ্ট লোকেরা ব্যতীত স্বীয় রবের রহমত থেকে আর কে নিরাশ হতে পারে?” (সূরা আল হিজরঃ ৫৬)

কেননা তিনি আল্লাহ তা‘আলার কুদরত ও রহমত সম্পর্কে অবগত ছিলেন, যা বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দেয়ার চেয়ে অধিক পূর্ণাঙ্গ। তবে ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন,

﴿أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ﴾

“তোমরা কি বৃদ্ধ অবস্থায় আমাকে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছো? অতএব আমাকে তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছো?। (সূরা আল হিজরঃ ৫৪)

বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে এবং আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমতা ও রহমতের বিশালতায় চিন্তামগ্ন হয়েই তিনি একথা বলেছিলেন।

আল্লাহর নাবী ইয়াকুব ‘আলাইহিস সালাম যখন দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত হলেন এবং পুত্রের বিচ্ছেদে যখন তার অবস্থা সঙ্কটময় হলো, তখনো তিনি আল্লাহর প্রতি বড় আশা পোষণ করতেন এবং রহমত পাওয়ার কামনা করতেন। তিনি তার নিকট পুত্রদেরকে এনে বললেন,

﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾

“হে আমার ছেলেরা! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাও। আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। তার রহমত থেকে তো একমাত্র কাফেররাই নিরাশ হয়”। (সূরা ইউসুফঃ ৮৭)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾

“পূর্ণ ছ্ববরই শ্রেয়। হয়তো আল্লাহ ওদের সবাইকে আমার কাছে এনে দিবেন”। (সূরা ইউসুফঃ ৮৩)

আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

“যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তাহলে মনে রেখো আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল। তিনি ছিলেন দু’জনের একজন, যখন

তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেনঃ বিষন্ন হয়ো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। (সূরা আত তাওবাঃ ৪০)

সুতরাং কঠিন বিপদের সময় তিনি আল্লাহর কাছেই আশা পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, اعلم أن الفرج مع الكرب "জেনে রেখো, সংকীর্ণতার পরেই প্রশস্ততা"।

আল্লাহ তা'আলার যেসব বান্দা অনেক গুনাহ করেছে এবং যারা ভয়াবহ অপরাধ করেছে তিনি তাদেরকে নিষেধ করেছেন যে, তাদের গুনাহ ও অপরাধসমূহ যেন তাদেরকে আল্লাহর রহম থেকে নিরাশ না করে এবং তাওবা পরিত্যাগ করার প্ররোচনা না দেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾

"হে নাবী! বলে দাও, হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তোমরা ফিরে এসো তোমাদের রবের দিকে এবং তার অনুগত হয়ে যাও তোমাদের উপর আযাব আসার পূর্বেই। অতঃপর তা এসে গেলে তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না"। (সূরা আয যুমারঃ ৫৩-৫৪)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে নিষেধ করেছেন, তার গুনাহর বোঝা তাদেরকে যেন তাওবা পরিত্যাগ না করায় এবং আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্তির আশা থেকে নিরাশ না করে।

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবীরা গুনাহর মধ্যে গণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সালামকে কাবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, কাবীরা গুনাহ হচ্ছে,

«الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ»

"আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর দয়া থেকে নিজেকে দূরে মনে করা এবং তার পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা"।[৪১]

[৪১] আল মু'জামুল কাবির, ত্বারানী ৮৭৮৩।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন,

«أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَالأَمْنُ لِمَكْرِ اللَّهِ وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ»

সবচেয় বড় কাবীরাহ গুনাহ হচ্ছে, আল্লাহর শাস্তি হতে নিরাপদ মনে করা, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর করুণা থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে করা।[৪২]

কেননা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া তার সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা এবং তার রহমতের প্রশস্ততা ও তার ক্ষমার বিশালতা সম্পর্কে অজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে বান্দার অজ্ঞতার প্রমাণ। সেই সঙ্গে তার নফসের উপর নির্ভর করা অহংকারের মধ্যে শামিল।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছগুলোর মাধ্যমে সতর্ক করা হয়েছে যে, বান্দা সবসময় ভয় ও আশার মধ্যে থাকবে। সে যখন আল্লাহকে ভয় করবে, তখন তার ভয় যেন তাকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না করে এবং সে যেন হতাশাগ্রস্ত না হয়। বরং ভয় করার সাথে সাথে আল্লাহর রহমত কামনা করবে। আর যখন সে আল্লাহর রহমতের আশা করবে, তখন সে যেন তাতে এভাবে সীমালঙ্ঘন না করে যে সে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করে।

কোনো কোনো সালাফ সুস্থ ও সুখে থাকা অবস্থায় বান্দার মধ্যে ভয়ের দিকটা বেশি থাকা পছন্দ করতেন। আর অসুস্থ অবস্থায় এবং মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের আশা-আকাঙ্খার দিকটাকে প্রাধান্য দেয়া মুস্তাহাব মনে করতেন।

সুতরাং অন্তরের মধ্যে ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খার ভারসাম্য বজায় থাকা মানুষকে আমলের প্রতি উৎসাহিত করে, পাপাচার থেকে দূরে রাখে এবং তাওবার দিকে ধাবিত করে। আর যখন অন্তরের মধ্যে উপরোক্ত দু'টি বিষয়ের মধ্যকার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, তখন অন্তর একদিকে ঝুকে পড়ে। আর এটি আমলের প্রতি অন্তরের আগ্রহকে অকেজো করে দেয়, তাওবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং বান্দাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

পূর্ববর্তী যেসব জাতি তাদের অন্তর থেকে আল্লাহর ভয়-ভীতি মুছে ফেলার কারণে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল, তাতে ঈমানদারদের জন্য সর্বোত্তম উপদেশ রয়েছে।

---

[৪২] হাদীছটি মাওকুফ সূত্রে ছ্বহীহ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে হাদীছটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন: মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক (১০/৪৫৯), তাফসীরে তাবারী, হা/৬১৯১ এবং তাবরানী আল কাবীর হা/৮৭৮৩ এবং অন্যান্য।

আল্লাহ তাদের ঘটনাবলী কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করেছেন। হুদ ‘আলাইহিস সালামের জাতি হুদকে বলেছিল,

﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ﴾

তুমি উপদেশ দাও অথবা না দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান। এ ব্যাপারগুলো তো পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি মাত্র। আমরা আযাবের শিকার হবো না। শেষ পর্যন্ত তারা তাকে মিথ্যা জ্ঞান করলো এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। নিশ্চয় এর মধ্যে আছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না”। (সূরা শুআরা: ১৩৬-১৪৯)

সুতরাং ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা ইবাদতের বিরাট একটি প্রকার। অতএব এ দু'টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার জন্য ইখলাছ-একনিষ্ঠতা থাকা জরুরী। এতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তাওহীদ ত্রুটিযুক্ত হবে এবং ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে।[৪৩]

[৪৩] ইমাম আবু আলী রুযবারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর আযাবের ভয় করা এবং তার রহমতের আশা রাখা একটি পাখির দু'টি ডানার ন্যায়। যখন পাখা দু'টি এক সমান থাকে তখন পাখি আকাশে স্থির থাকে এবং পাখিটি সোজাভাবে চলতে পারে। একটি পাখা ত্রুটিযুক্ত হলে পাখির চলার মধ্যে ত্রুটি চলে আসে। আর যখন উভয় পাখাই চলে যায়, তখন পাখিটি মারা যায়। যারা আল্লাহর আযাবের ভয় করে এবং তার রহমতের আশা রাখে তাদের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾

“যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের ভয় করে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না? (সূরা আয যুমার: ৯)

২) الشرك في المحبة ভালোবাসার মধ্যে শিরক

ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, বান্দার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যে ভয়-ভীতি বিদ্যমান থাকে সেটার সাথে তার ভালোবাসা মিশ্রিত হওয়া চাই। কেননা শুধু ভয় নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা খারেজীদের দীনের মূল বিষয়।

সুতরাং ভালোবাসা হলো ইসলামের মূল বিষয়। এটিই ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু। অতএব আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসার পূর্ণতা অনুপাতেই তার দীন পরিপূর্ণ হয়ে থাকে এবং ভালোবাসার ঘাটতি অনুযায়ীই মানুষের তাওহীদ ক্রটিযুক্ত হয়।

ভালোবাসা বলতে এখানে ইবাদতের ভালোবাসা উদ্দেশ্য, যা নত হওয়া, বিনয়ী হওয়া এবং পরিপূর্ণ আনুগত্যের দাবি করার সাথে সাথে স্বীয় প্রিয়পাত্রকে অন্যের উপর প্রাধান্য দেয়ারও দাবি জানায়। এ ভালোবাসাটি আল্লাহ তা'আলার জন্য খালেছ বা নির্দিষ্ট হওয়া চাই। এতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা জায়েয নয়। কেননা ভালোবাসা দু'প্রকার।

(ক) একক ও খাছ ভালোবাসা: এটি হচ্ছে ইবাদতের ভালোবাসা, যা পরিপূর্ণরূপে নত হওয়া এবং পরিপূর্ণরূপে মাহবুবের অনুগত থাকার দাবি করে। এ শ্রেণির ভালোবাসা কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট।

(খ) সাধারণ ও যৌথ ভালোবাসা: এটি তিন প্রকার।

প্রথমটি হচ্ছে স্বভাবগত ও সৃষ্টিগত ভালোবাসা। যেমন খাবারের প্রতি ক্ষুধার্ত লোকের ভালোবাসা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে মায়া-মমতার ভালোবাসা। যেমন সন্তানের প্রতি পিতার ভালোবাসা। তৃতীয়টি হচ্ছে, পরিচিতি ও সাহচর্যের ভালোবাসা। যেমন এক অংশীদার অন্য অংশীদারকে এবং এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে ভালোবাসে।

এ তিন প্রকার ভালোবাসার মধ্যে সম্মান প্রদর্শন করা ও নত হওয়া আবশ্যক নয় এবং এর জন্য কাউকে পাকড়াও করা হবে না। তা ছাড়া এটি খাছ ভালোবাসার সাথে সাংঘর্ষিকও নয়। সেগুলো কারো মধ্যে থাকলে শিরকও হয় না। কিন্তু খাছ বা একক ভালোবাসাকে এগুলোর উপর অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। একক ও খাছ ভালোবাসা দ্বারা ইবাদতের ভালোবাসা উদ্দেশ্য। এ ভালোবাসার কথা নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল বাকারার ১৬৫ নং আয়াতে বলেন,

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾

“মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আল্লাহর অংশীদার বা সমতুল্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাদেরকে এমন ভালোবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। যালেমরা যখন কোনো শাস্তি প্রত্যক্ষ করে তখন যদি অনুধাবন করতো যে, সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর এবং শাস্তি দানে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর তাহলে কতই না ভালো হতো”।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা‘আলা এখানে সংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে আল্লাহর ভালোবাসার মতই ভালোবাসবে, সে ঐ ব্যক্তির মতো হবে, যে ভালোবাসা ও তা‘যীমের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্যদেরকে তার শরীক হিসাবে গ্রহণ করেছে।

ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা এখানে মুশরিকদের দুনিয়ার অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং আখিরাতে তাদের যে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি রয়েছে তাও উল্লেখ করেছেন। কেননা তারা আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করেছে। তারা তাদের সাথে ঐরূপ ভালোবাসা পোষণ করে, যেরূপ ভালোবাসা আল্লাহর সাথে হওয়া উচিত। অর্থাৎ তারা ভালোবাসা ও সম্মানের ক্ষেত্রে তাদেরকে আল্লাহর সমান করে ফেলে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) এর উপরোক্ত কথাকে সমর্থন করেছেন। ভালোবাসা ও সম্মানের ক্ষেত্রে তারা যে তাদের মাবুদদেরকে আল্লাহর সমান করে ফেলতো, সে কথা আল্লাহ তা‘আলা তার নিম্নের বাণীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

“আল্লাহর কসম আমরা তো স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টিজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম”। (সূরা শুআরা: ৯৭-৯৮)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾

অতঃপর কাফেররা অন্যদেরকে তাদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছে। সূরা আল আনআম:১

আল্লাহ তা‘আলার বাণী, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ “যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী”।

অর্থাৎ মুশরিকরা আল্লাহকে যে পরিমাণ ভালোবাসে, মুমিনগণ তাকে তাদের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। অথবা মুশরিকরা তাদের শরীকদেরকে যে পরিমাণ ভালোবাসে, মুমিনগণ আল্লাহ তা‘আলাকে তারচেয়ে বহুগুণ বেশি ভালোবাসে। সুতরাং আয়াতটি প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি কোনো কিছুর প্রতি ঐরূপ ভালোবাসা পোষণ করে, যেরূপ ভালোবাসা

আল্লাহর জন্য হওয়া বাঞ্ছনীয় সে সেটাকে ভালোবাসা ও সম্মানের ক্ষেত্রে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করলো।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো শরীক গ্রহণ করলো এবং সেটাকে আল্লাহর ভালোবাসার সমান ভালোবাসল, এ ক্ষেত্রে সে আল্লাহর সাথে বড় শিরকে লিপ্ত হলো।

আমাদের কথাও শাইখের কথার কাছাকাছি। আল্লাহ তা'আলার প্রতি ইবাদতের যে ভালোবাসা পোষণ করা আবশ্যক, তাকে ঐসব ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দেয়া উচিত, যা ইবাদতের ভালোবাসা নয়। সেগুলো হচ্ছে সাধারণ ভালোবাসা যেমন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার পারস্পরিক ভালোবাসা, ধন-সম্পদের ভালোবাসা ইত্যাদি। যারা এসব কিছুর ভালোবাসাকে আল্লাহর ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দিবে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কঠিন শাস্তির ধমক দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

"বলো, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা, যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করো এবং তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পছন্দ করো, এসব কিছু আল্লাহ, তার রসূল ও তার পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না"। সূরা আত তাওবার ৯:২৪

এ আটটি প্রিয় বস্তুকে যারা আল্লাহর ভালোবাসা, রসূলের ভালোবাসা এবং আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় আমলের উপর প্রাধান্য দিবে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভয়াবহ শাস্তির ধমক দিয়েছেন। এসব জিনিসকে গ্রহণ করার কারণেই তিনি ধমক দেননি। কেননা এগুলো এমন জিনিস, যার প্রতি ভালোবাসা দিয়েই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলো মানুষ স্বীয় ইচ্ছায় নির্বাচন করে না।

আল্লাহ তা'আলা কেবল ঐসব লোককেই ধমক দিয়েছেন, যারা আল্লাহর ভালোবাসা, রসূলের ভালোবাসা এবং আল্লাহ ও তার রসূলের পছন্দনীয় আমলের উপর এগুলোর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দা থেকে যেসব আমল পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন সেটাকে বান্দার প্রিয় ও পছন্দনীয় জিনিসের উপর প্রাধান্য দেয়া আবশ্যক।

আল্লাহকে ভালোবাসার আলামতসমূহ

(১) যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসে সে অবশ্যই নিজের নফসের প্রবৃত্তি, চাহিদা, প্রিয় বস্তু, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং জন্মভূমির ভালোবাসার উপর আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় আমলকে প্রাধান্য দিবে।

(২) যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসে সে অবশ্যই তার রসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করবে। রসূল যা আদেশ করেন, সে তা বাস্তবায়ন করবে এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন, সেটা বর্জন করবে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

"বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। বলো, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হও। কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না"। *(সূরা আলে-ইমরান: ৩১-৩২)*

কতিপয় সালাফ থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদল লোক দাবি করলো যে, তারা আল্লাহকে ভালোবাসে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

"বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু"। *(সূরা আলে-ইমরান: ৩১)*

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসার দলীল-প্রমাণ, ফলাফল এবং উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসার দলীল-প্রমাণ ও আলামত হলো রসূলের অনুসরণ করা এবং তার ফলাফল ও উপকারিতা হলো আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ও তার ক্ষমা পাওয়া।

(৩) আল্লাহ তা'আলার প্রতি বান্দার ভালোবাসা সত্য হওয়ার আলামত সম্পর্কে তিনি বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি তার দীন থেকে ফিরে যায়, তাহলে আল্লাহ আরো এমন বহু লোক সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে, যারা মুমিনদের ব্যাপারে কোমল ও কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর হবে, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি সেটা দান করেন। বস্তুত আল্লাহ প্রাচুর্যময় এবং সর্ব বিষয়ে অবগত"। (সূরা আল মায়িদা ৫: ৫৪)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসার চারটি আলামত উল্লেখ করেছেন।

প্রথম আলামত: যারা আল্লাহকে ভালোবাসে তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও দয়ালু হবে। তারা তাদের মুমিন ভাইদের প্রতি কোমল হবে, তাদের উপর দয়া করবে এবং তাদের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করবে। আতা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, পিতা যেমন পুত্রের প্রতি স্নেহশীল হয়, তারা মুমিনদের প্রতিও অনুরূপ হবে।

দ্বিতীয় আলামত: তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর হবে। অর্থাৎ তারা কাফেরদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবে এবং তারা নিজেদেরকে কাফেরদের উর্ধ্বে মনে করবে। তারা কোনোভাবেই কাফেরদের প্রতি নতি স্বীকার করবে না এবং তাদের কাছে দুর্বলতাও দেখাবে না।

তৃতীয় আলামত: তারা জান-মাল, হাতের শক্তি ও জবান দিয়ে আল্লাহর পথে ও আল্লাহর দীনকে শক্তিশালী করা এবং শত্রুদের মূলোৎপাটন করার জন্য যে কোনো উপায়ে জিহাদ করবে।

চতুর্থ আলামত: তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে এবং সত্যের বিজয় আনতে গিয়ে জান-মাল খরচ করার পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। সত্যের সাহায্যার্থে তারা নিজেদের জান-মাল খরচ করার সময় মানুষের তিরস্কার ও দোষারোপ তাদের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না। কেননা তারা যে দীনের উপর রয়েছে, তা সত্য হওয়ার ব্যাপারে তাদের পরিপূর্ণ প্রত্যয় রয়েছে এবং তাদের ঈমান ও ইয়াকীন খুবই শক্তিশালী। নিন্দুকের নিন্দার কারণে যদি ভালোবাসা পোষণকারীর ভালোবাসায় ভাটা পড়ে অতঃপর সে যদি তার হাবীবের সাহায্য করতে দুর্বলতা দেখায়, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসা পোষণকারী নয়।

আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা পাওয়ার উপায়

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার দশটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

(১) গভীর মনোযোগ সহকারে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করা এবং কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝার চেষ্টা করা।

(২) ফরয ছ্বলাত শেষে নফল ছ্বলাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিল করার চেষ্টা করা।

(৩) জবান, অন্তর ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে সবসময় ও সকল অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার যিকির করা।

(৪) বান্দা যা ভালোবাসে এবং আল্লাহ যা ভালোবাসেন, এ দু'টি ভালোবাসা সাংঘর্ষিক হলে আল্লাহর ভালোবাসাকেই প্রাধান্য দেয়া।

(৫) আল্লাহর অতি সুন্দর নামসমূহ, তার সুউচ্চ গুণাবলিসমূহ এবং সেটার কামালিয়াত, বড়ত্ব, মর্যাদা ও প্রশংসনীয় ফলাফল নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা।

(৬) আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নিয়ামতগুলো নিয়ে চিন্তা-গবষেণা করা এবং বান্দাদের উপর তার দয়া, অনুগ্রহ ও নিয়ামতগুলো গভীর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা।

(৭) মন-প্রাণ উজাড় করে আল্লাহর সামনে কাকুতি-মিনতি করা এবং নিজের সকল প্রয়োজন আল্লাহর কাছে তুলে ধরা।

(৮) রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে যখন দুনিয়ার আসমানে নুযুলে এলাহীর সময় হয় তখন নির্জনে আল্লাহ তা'আলার নিকট কান্না-কাটি করা, দু'আ করা এবং কুরআন তেলওয়াত করা। ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবার মাধ্যমে শেষ রাতের আমলের সমাপ্তি করা।

(৯) আল্লাহর প্রিয় বান্দা-সৎলোকদের সাথে উঠা-বসা করা এবং তাদের উপদেশ-নছীহত ও কথা-বার্তা থেকে উপকৃত হওয়া।

(১০) আল্লাহর মাঝে ও বান্দার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক জিনিস থেকে দূরে থাকা।

আল্লাহর ভালোবাসার অন্যতম দাবি হলো তার রসূলকে ভালোবাসা। ইমাম বুখারী ও মুসলিম আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

“তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি এমনকি দুনিয়ার সকল মানুষ হতেও অধিক প্রিয় হই”।[৪৪]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের নাফ্স এবং তার সর্বাধিক ঘনিষ্ট লোক থেকে বেশি ভালো না বাসবে ততক্ষণ কেউ প্রকৃত ও পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।

রসূলের ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার অনুগামী এবং আল্লাহ তা‘আলাকে ভালোবাসার দাবিই হলো তার রসূলকে ভালোবাসা। আর যে ব্যক্তি রসূলকে ভালোবাসবে, সে অবশ্যই রসূলের অনুসরণ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসার দাবি করবে, অথচ সে রসূলের আনীত দীন ও সুন্নাতের বিরোধীতা করবে এবং তাকে বাদ দিয়ে ভ্রান্ত, বিদ‘আতী ও কুসংস্কারচ্ছন্ন লোকদের অনুসরণ করবে, সুন্নাত পরিহার করে বিদ‘আতকে পুনরুজ্জীবিত করবে, সে তার দাবিতে মিথ্যুক। যদিও সে দাবি করে যে, সে রসূলকে ভালোবাসে। কেননা যে মানুষ কাউকে ভালোবাসে সে অবশ্যই তার মাহবুবের আনুগত্য করে।

যারা রসূলের সুন্নাত বিরোধী নতুন নতুন বিদ‘আত তৈরী করে এবং তার জন্মদিবস উপলক্ষে মীলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন করাসহ অন্যান্য বিদ‘আত পুনরুজ্জীবিত করে অথবা নাবীজির প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করে এবং আল্লাহ ব্যতীত তার নিকট দু‘আ করে, তার কাছে মদদ চায় এবং তার কাছে ফরিয়াদ করার পরও রসূলকে ভালোবাসার দাবি করে, তারা সবচেয়ে বড় মিথ্যুক। তারা আসলে ঐসব লোকের মতোই যাদের ব্যাপারে-

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾

“তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি কিন্তু এরপর তাদের মধ্য থেকে একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ ধরনের লোকেরা কখনোই মুমিন নয়”। (সূরা আন নূর ২৪: ৪৭)

কেননা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত কাজগুলো থেকে নিষেধ করেছেন। তারা তার নিষেধের বিরোধীতা করেছে এবং তার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছে। অথচ তারা দাবি করে যে, তারা রসূলকে ভালোবাসে। সুতরাং তারা মিথ্যা বলেছে। আমরা আল্লাহর কাছে এগুলো থেকে নিরাপত্তা কামনা করছি।

[৪৪] ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৫।

৩) الشرك في التوكل। ভরসার মধ্যে শিরক

التوكل। শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, নির্ভর করা ও সোপর্দ করে দেয়া। এটি অন্তরের কাজ। যেমন বলা হয়ে থাকে, توكل في الأمر। "সে কাজটি বুঝে নিল"। এ কথা ঠিক ঐ সময় বলা হয়, যখন সে কাজটি করার দায়িত্ব বুঝে নেয়। আরো বলা হয়, ووكلت أمري إلى فلان "আমি আমার কাজটি অমুকের নিকট সোপর্দ করলাম। এ কথা ঠিক ঐ সময় বলা হয়, যখন সে কাজটি সম্পাদন করার ব্যাপারে তার উপর নির্ভর করে।

যেসব ইবাদত ইখলাছের সাথে কেবল আল্লাহর জন্যই সম্পন্ন করা আবশ্যক, তার প্রকারসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা বিরাট একটি ইবাদত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক, তাহলে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করো"। (সূরা মায়িদাঃ ২৩)

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের উপর ভরসা করার প্রকারসমূহ

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর التوكل। বা ভরসা করার প্রথম প্রকার হলো, যেসব বিষয়ের উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ক্ষমতা রাখে না ঐসব বিষয়ের উপর ভরসা করা। যেমন সাহায্য, বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা, রিযিক, শাফা'আত ইত্যাদি উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মৃত ব্যক্তি, অনুপস্থিত অথবা ত্বগূতের উপর ভরসা করা বড় শিরক।

দ্বিতীয় প্রকার التوكل। হলো, বাহ্যিক উপায়-উপকরণের উপর নির্ভর করা। যেমন কেউ রাজা-বাদশাহর উপর নির্ভর করলো অথবা শাসকদের উপর নির্ভর করলো অথবা অন্য কোনো জীবিত ক্ষমতাবান ব্যক্তির ঐসব ক্ষমতার উপর নির্ভর করলো, যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। যেমন দান করা কিংবা দুঃখ-কষ্ট দূর করা অথবা অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে বাহ্যিক উপকরণের উপর নির্ভর করলো। এ ধরনের নির্ভর করা ছোট শিরক। কেননা এতে আল্লাহর পরিবর্তে ব্যক্তি বিশেষের উপর ভরসা করা হয়।

তৃতীয় প্রকার التوكل। হলো, যেমন মানুষ এমন কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করলো, যে তার কাজ-কর্মগুলো করে দিবে। যেমন ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। এটি জায়েয। তবে যে জন্য তাকে উকীল নিযুক্ত করা হলো, তা অর্জনের ব্যাপারে তার উপর ভরসা করা যাবে না।

বরং আল্লাহর উপরই ভরসা করবে। তিনি যেন তার ঐসব কাজ সহজ করে দেন, যা তিনি নিজে অর্জন করতে চাচ্ছেন অথবা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে অর্জন করতে চাচ্ছেন। কেননা বৈধ বিষয়াদি অর্জনের ক্ষেত্রে কাউকে উকীল বানানো উপায়-উপকরণ গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত। উপায়-উপকরণের উপর নির্ভর করা যাবে না। বরং কেবল আল্লাহ তা'আলার উপরই নির্ভর করতে হবে। তিনিই সকল উপায় উপকরণের স্রষ্টা, তিনি উপায়-উকরণ এবং সেটা গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলেরও স্রষ্টা।

অকল্যাণ প্রতিরোধ করা, রিযিক লাভ করা এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ দিতে পারে না, তা পাওয়ার জন্য কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করা বিরাট একটি ইবাদত। সুতরাং এসব বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর নির্ভর করা বড় শিরক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক, তাহলে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করো"। *সূরা আল মায়িদা: ২৩।*

আল্লাহ এখানে কেবল তার উপরই ভরসা করার আদেশ দিয়েছেন। কেননা বাক্যের মধ্যে معمول কে عامل এর পূর্বে উল্লেখ করা হলে সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রদান করে। আর এখানে আল্লাহর উপর ভরসা করাকে ঈমান ছ্বহীহ হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা কারো ইসলাম ছ্বহীহ হওয়ার জন্যও তার উপর ভরসা করার শর্তারোপ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ﴾

" মূসা তার কওমকে বলল, হে লোকেরা! যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে থাকো তাহলে কেবল তার উপর ভরসা করো, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো"। (সূরা ইউনুস: ৮৪)

উপরের আয়াত দু'টি প্রমাণ করে যে, যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে না অথবা তাকে ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করে তাদের ঈমান বা ইসলাম কোনোটিই সঠিক নয়। যেসব বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনো ক্ষমতা নেই তাতে কবরবাসী ও সমাধিস্থ ব্যক্তিগণ এবং মূর্তিদের উপর নির্ভর করা হলে ঈমান ও ইসলাম উভয়টি ভঙ্গ হয়ে যাবে।

সুতরাং আল্লাহর উপর ভরসা করা ফরয। তাই ইখলাছের সাথে তার উপর ভরসা করা আবশ্যক। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর উপর ভরসা সমস্ত ইবাদতের মূল, তাওহীদের সর্বোচ্চ স্তর। কেননা এ থেকেই অন্যান্য সৎ আমলের উৎপত্তি হয়। কেননা বান্দা যখন তার দুনিয়া-আখিরাতের সমস্ত কাজে কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করবে এবং তিনি ব্যতীত

অন্যান্য জিনিসের উপর ভরসা করা বাদ দিবে, তখনই তার ইখলাছ বিশুদ্ধ হবে এবং আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কও ঠিক হবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহ.) বলেন, যখন কেউ কোনো সৃষ্টির কাছে আশা-আকাঙ্খা করেছে এবং তার উপর ভরসা করেছে, তখন সেই সৃষ্টির ব্যাপারে তার ধারণা ব্যর্থ হয়েছে। শাইখুল ইসলামের উক্তি এখানেই শেষ।

সূরা ফাতিহার আয়াত ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি ও শুধু তোমার কাছেই সাহায্য চাই"

এর সর্বোচ্চ স্তর হলো আল্লাহর উপর ভরসা করা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার উপর পরিপূর্ণরূপে ভরসা করা ব্যতীত তাওহীদের তিনটি প্রকার কেউ পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾

"তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। তাই তাকে নিজের উকীল হিসাবে গ্রহণ করো"। *সূরা আল মুযযাম্মিল:৯।* আল্লাহর উপর ভরসা করার আদেশ সম্বলিত অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই"। (সূরা আত তালাক: ৩)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো, তাহলে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করো"। সূরা আল মায়িদা: ২৩

এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ এখানে ঈমানদার হওয়ার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করার শর্তারোপ করেছেন। এতে বুঝা গেলো আল্লাহর উপর ভরসা না থাকলে ঈমান থাকে না। বান্দার ঈমান যতই বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহর উপর তার ভরসাও ততো মজবুত হবে। ঈমান যখন দুর্বল হবে, তখন ভরসাও দুর্বল হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসার দুর্বলতা বান্দার ঈমান দুর্বল হওয়ার প্রমাণ। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবের অনেক জায়গায় তাওয়াক্কুল (ভরসা) ও ইবাদতকে একসাথে উল্লেখ করেছেন, কোথাও তাওয়াক্কুল ও ঈমানকে একসাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন, কোথাও তাওয়াক্কুল এবং তাকওয়াকে একসাথে মিলিয়ে, কোথাও তাওয়াক্কুল এবং ইসলামকে একসাথে মিলিয়ে আবার কোথাও তাওয়াক্কুল এবং হিদায়াতকে একসাথে

মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা গেলো, ঈমানের সকল স্তরের মধ্যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল হলো মূল আর ইহসান বা ইখলাছ হলো ইসলামের সমস্ত আমলের মূল। আর ঈমানের মধ্যে তাওয়াক্কুলের মর্যাদা দেহের মধ্যে মাথার মর্যাদার মতোই। দেহ ছাড়া যেমন মাথার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি তাওয়াক্কুলের ভিত্তি ছাড়া অন্য কিছুর উপর ঈমান, ঈমানের শাখাসমূহ ও ঈমানের আমলসমূহ ঠিক হয় না।

আল্লাহ তা'আলা তার উপর ভরসা ও নির্ভর করাকে মুমিনদের সর্বাধিক সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

"মুমিন তো তারাই, যাদের অন্তরসমূহ আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। আর যখন তার আয়াত তাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন সেটা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে। আর তারা তাদের প্রভুর উপর ভরসা রাখে"। সূরা আল আনফালের ৮:২

অর্থাৎ তারা অন্তর-মন দিয়ে আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করে। তাকে ছাড়া তারা অন্য কারো কাছে কিছুই কামনা করে না। উপরোক্ত আয়াতে প্রকৃত মুমিনদেরকে ইহসানের তিনটি গুণে বিশেষিত করেছেন।

(১) তারা আল্লাহকে ভয় করে।

(২) আল্লাহর আয়াত শুনে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং

(৩) তারা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে।

আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার চেষ্টা করার পরিপন্থি নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাক্বদীরে নির্ধারিত জিনিসগুলো উপায়-উপকরণের সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি তার উপর ভরসা করার সাথে সাথে উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং উপায়-উপকরণ গ্রহণ করাও আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে গণ্য। কেননা তিনি তা গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন। উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মধ্যে গণ্য। আর আল্লাহর উপর ভরসা করা অন্তরের আমল। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! সতর্কতা অবলম্বন করো। অতঃপর পৃথক পৃথক বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে বের হয়ে পড়ো অথবা এক সাথে বের হয়ে পড়ো"। (সূরা আন নিসা ৪: ৭১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾

"আর তোমরা তাদের যথাসাধ্য শক্তি ও সুসজ্জিত ঘোড়া যোগাড় করে রাখো। এর মাধ্যমে তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে"। (সূরা আল আনফাল ৮: ৬০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

"অতঃপর যখন ছ্বলাত শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। যাতে তোমরা সফলকাম হও"। (সূরা জুম'আ ৬২: ১০)

কোনো কোনো সালাফ বলেছেন, যে ব্যক্তি চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, উপার্জন করা এবং উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা বর্জন করলো, সে রসূলের সুন্নাতের মধ্যে আঘাত করলো এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা বর্জন করলো, সে তার ঈমান নষ্ট করে ফেললো। ইমাম ইবনে রজব হাম্বালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বান্দার আমল মোট তিন প্রকার।

(১) এমন আনুগত্যের আমল, যা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে সম্পাদন করার আদেশ দিয়েছেন, সেটাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়-উপকরণ ও জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম বানিয়েছেন। আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং তার কাছে সাহায্য চাওয়ার সাথে সাথে এ আমলগুলো সম্পাদন করা জরুরী। কেননা আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয় এবং তার শক্তি ব্যতীত ভালো কাজ সম্পন্ন করাও অসম্ভব। তিনি যা চান, তাই হয় এবং তিনি যা চান না, তা হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি এ কাজগুলো থেকে কোনো একটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ত্রুটি করবে, সে তাক্বদীরের নির্ধারণ ও শরী'আতের হুকুম অনুযায়ী দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতে শাস্তির হকদার হবে।

ইউসুফ ইবনে আসবাত (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বলা হয়ে থাকে যে, তুমি ঐ ব্যক্তির ন্যায় আমল করো, যাকে তার আমল ব্যতীত অন্য কিছু নাজাত দিবে না। আর ঐ ব্যক্তির ন্যায় ভরসা করো, যে তার ভাগ্যে নির্ধারিত জিনিস ব্যতীত অন্য কিছুই অর্জন করার আশা করে না।

(২) আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সকল সৃষ্টির মধ্যে স্বভাব ও সৃষ্টিগত যেসব রীতিনীতি চালু করেছেন বান্দাদেরকে তা গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন। যেমন ক্ষুধা লাগলে খাবার গ্রহণ করা, পিপাসা লাগলে পান করা, রোদ্রের তাপ লাগলে ছায়া গ্রহণ করা, শীত লাগলে উত্তাপ গ্রহণ করা ইত্যাদির উপকরণ গ্রহণ করা বান্দার উপর ওয়াজিব। যার এগুলো ব্যবহার করার ক্ষমতা রয়েছে, সে যদি অবহেলা বশত এগুলো ব্যবহার বর্জন করে ক্ষতিগ্রস্ত

হয়, তাহলে অবহেলা করার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। তবে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের কাউকে পানাহার বর্জন কিংবা গরম-ঠান্ডা সহ্য করার ক্ষেত্রে এত শক্তিশালী করেন, যতটা অন্যদেরকে করেন না। যে বান্দাকে খাছ করে অন্যের তুলনায় অতিরিক্ত শক্তি দেয়া হয়েছে, সে যদি তার শক্তি অনুপাতে কাজ করে, তাহলে তার কোনো দোষ নেই। তাই তো নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাগাতার একদিন বা দুই দিন পর্যন্ত না খেয়ে ছ্বিয়াম রাখতেন। অথচ তিনি তার ছাহাবীদেরকে তা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলতেন, আমি তোমাদের মতো নই। আমাকে আল্লাহর পক্ষ হতে খাওয়ানো হয় ও পান করানো হয়। পানাহার বর্জনে সালাফদের অনেকেরই এমন শক্তি ছিল, যা অন্যদের ছিল না। সুতরাং যার শক্তি আছে, সে যদি শক্তি অনুসারে পানাহার ছেড়ে দিয়েও আল্লাহর আনুগত্য করতে দুর্বল না হয়, তাহলে তার কোনো অপরাধ হবে না। আর যে নিজের নফস্কে কষ্ট দিতে গিয়ে ফরয ইবাদত করতে দুর্বল হয়ে যায়, তার কাজের প্রতিবাদ করা হবে।

(৩) আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার অধিকাংশ সৃষ্টির মধ্যে স্বভাবগত ও সৃষ্টিগত যেসব রীতিনীতি ও প্রথা চালু করেছেন বান্দাদেরকে তা গ্রহণ করার আদেশ করেছেন। তিনি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যার জন্য ইচ্ছা করেন, তার ব্যাপারে উক্ত সাধারণ রীতিনীতির ব্যতিক্রম করেন। যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»

"তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলার উপর পরিপূর্ণরূপে ভরসা করতে, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সেভাবেই রিযিক দিতেন, যেভাবে তিনি পাখিদেরকে রিযিক দিয়ে থাকেন। পাখি খালি পেটে সকালে বাসা থেকে বের হয় আর বিকালে ভরা পেটে ফিরে"।[৪৫]

এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সামান্য তাওয়াক্কুলের কারণে এবং বাহ্যিক উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার কারণে রিযিক দিয়ে থাকেন। তারা যদি অন্তর দিয়ে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণরূপে ভরসা করতো, তাহলে তাদেরকে সামান্য পরিশ্রমের মাধ্যমেই প্রচুর পরিমাণ রিযিক দিতেন। যেমন তিনি সকাল-বিকাল বাসা থেকে শুধু বের হওয়ার কারণেই পক্ষীকূলকে রিযিক দিয়ে থাকেন। এটিও এক প্রকার অন্বেষণ। তবে তা খুবই সামান্য। পরিশেষে ইবনে রজব (রাহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা হজ্জে আসতো। কিন্তু পাথেয় সাথে আনতো না। তারা বলতো, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা ও নির্ভরকারী। সুতরাং তারা মক্কায় এসে হজ্জ করার সময় মানুষের কাছে হাত পাততো। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন,

﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾

[৪৫] ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ, হা/৩৭০, সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/৪১৬৪।

“আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো। তাকওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকেই ভয় করো”। (সূরা আল বাকারা ২: ১৯৭)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে ব্যক্তি বসে থাকে, জীবিকার জন্য চেষ্টা করে না এবং বলে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, তার ব্যাপারে আপনার মত কী? জবাবে তিনি বললেন, সমস্ত মানুষেরই আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত, একই সঙ্গে জীবিকা অর্জনের জন্য নিজেকে অভ্যস্ত করা উচিত। নাবী-রসূলগণ অন্যদের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মানুষের কাজ করে দিতেন। তারা বলেননি যে, আমরা বসে থাকবো। আল্লাহ আমাদেরকে বিনা পরিশ্রমেই রিযিক দিবেন। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ﴾

তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো। *(সূরা জুমু‘আ ৬২: ১০)*

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন যে, এক লোক নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো,

«يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ قَالَ اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ»

“ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কি উট বাঁধবো এবং আল্লাহর উপর ভরসা করবো? না কি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করবো? তিনি বললেন, বাধোঁ এবং ভরসা করো”।[৪৬]

উপরে যেসব আয়াত ও হাদীছ উল্লেখ করা হলো, তা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর উপর ভরসা করা বৈধ উপায়-উপকরণ অন্বেষণ করার প্রতিবন্ধক নয়। বরং উভয়টি একসাথে গ্রহণ করাই উত্তম। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইয়ামানের একদল লোকের সাক্ষাৎ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন গোত্রের লোক? তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর ভরসাকারী। তিনি বললেন, তা নয়; বরং তোমরা লোভী এবং অন্যের খাবারে অংশগ্রহণকারী। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা‘আলার উপর ভরসাকারী হলো ঐ ব্যক্তি, যে যমীনে বীজ বপন করে অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা করে।

[৪৬] হাসান: সুনানে তিরমিযী, হা/২৫১৭।

৪) الشرك في الطاعة আনুগত্যের মধ্যে শিরক

আল্লাহ আমাকে এবং আপনাদেরকে তাওফীক দিন! জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করার ক্ষেত্রে অথবা তিনি যা হালাল করেছেন, তা হারাম করার ক্ষেত্রে আলেম ও শাসকদের আনুগত্য করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"তারা আল্লাহকে পরিহার করে তাদের পণ্ডিত ও পুরোহিতদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদেরকে শুধু এ আদেশ করা হয়েছিল যে, তোমরা শুধু এক মাবুদের ইবাদত করবে। তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই। তিনি তাদের অংশী স্থির করা থেকে পবিত্র"। (সূরা আত তাওবা ৯: ৩১)

ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, আদী ইবনে হাতিম আত-তায়ী যখন মুসলিম হয়ে নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলেন, তখন তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করেছিলেন। আদী ইবনে হাতিম তখন বললেন,

«يارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ قَالَ: أَلَيْسَ يحلون لكم مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتَسْتَحِلُّونَه ويُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ قال: بَلَى قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: فَتِلْكَ عِبَادَتُهُم»

"হে আল্লাহর রসূল! আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তারা তাদের ইবাদতই করে। কেননা আহলে কিতাবদের আলেমরা যখন আল্লাহর হারাম করা বস্তুকে তোমাদের জন্য হালাল করতো, তখন তোমরা কি তা হালাল মনে করতেনা? এমনি তারা যখন আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে তোমাদের জন্য হারাম করতো, তখন তোমরা কি আলেমদের অনুসরণ করে তাকে হারাম মনে করতে না? আদী বললেন, হ্যাঁ। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটিই হচ্ছে তাদের ইবাদত"। ইমাম তিরমিযী এবং অন্যান্য ইমামগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[৪৭]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীছে ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের পণ্ডিত ও পুরোহিতদেরকে আল্লাহর বদলে প্রভু হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এর অর্থ এ নয় যে, তারা তাদের পণ্ডিত ও পুরোহিতদেরকে রুকু ও সিজদাহ করতো। বরং তারা কেবল হারামকে

[৪৭] হাসান: তিরমিযী হা/৩০৯৫, মুসনাদে আহমাদ। ইমাম তিরমিযী, হাদীছটি বর্ণনা করার পর হাসান বলেছেন। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। ইমাম তাবারানীও বিভিন্ন সনদে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন: গায়াতুল মুরাম, হা/৬।

হালাল আর হালালকে হারাম করার মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম পরিবর্তন ও রদবদল করার ক্ষেত্রে তাদের পণ্ডিতদের অনুসরণ করতো। আর এটিকেই আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ইবাদত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কেননা তারা শরী'আত প্রবর্তনের ব্যাপারে আল্লাহর স্থানে নিজেদেরকে বসিয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যারা তাদের অনুসরণ করবে, তারা শরী'আত প্রবর্তন এবং হালাল ও হারাম করার ক্ষেত্রে তাদেরকে আল্লাহর শরীক হিসাবে গ্রহণ করলো। আর এটি বড় শিরকের পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهاً وَاحِداً لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"অথচ তাদেরকে শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তোমরা শুধু এক মাবুদের ইবাদত করবে। তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই। তিনি তাদের অংশী স্থির করা থেকে পবিত্র"। (সূরা আত তাওবা ৯: ৩১) অনুরূপ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾

"যেসব জন্তুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এগুলো ভক্ষণ করা গুনাহ্। আর নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়। কিন্তু যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশরিক হবে"। (সূরা আল আনআম ৬: ১২১)

শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ হারামকে হালাল করার ক্ষেত্রে শরী'আতের হুকুম-আহকাম বিরোধী সমাজে প্রচলিত যেসব আইনের আশ্রয় নেয়, তাতে শাসকদের আনুগত্য করাও বড় শিরক। যেমন-সুদের বৈধতা দেয়া, যেনা-ব্যভিচারের অনুমোদন দেয়া, মদ্যপান অনুমোদন করা, উত্তরাধিকার সূত্রে নারী-পুরুষকে সমান করে দেয়া, নারীদেরকে বেপর্দা হওয়ার অনুমতি দেয়া, সহশিক্ষা চালু ও কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার পরিবেশ তৈরী করা, কিংবা হালালকে হারাম করা যেমন পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ হারাম করা অনুরূপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমকে পরিবর্তন করা এবং শয়তানের প্রচলিত আইন-কানুন দ্বারা আল্লাহর হুকুমকে বদলানোর ক্ষেত্রে শাসকদের আনুগত্য করাও বড় শিরক।

সুতরাং যারা এসব ক্ষেত্রে শাসকদের আনুগত্য করবে, তাতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং তাদের অনৈসলামিক কাজগুলোকে ভালো মনে করবে সে মুশরিক ও কাফির হিসাবে গণ্য হবে। আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এমনি ফিক্বহ শাস্ত্রের আলিমদের যেসব কথা কুরআন ও হাদীছের সুস্পষ্ট দলীলের বিপরীত ঐসব কথাতে তাদের অনুসরণ করাও বড় শিরক। বিশেষ করে যখন জানা যাবে যে, কিছু লোকের প্রবৃত্তি ও মনোবাসনা পূরণ করতে গিয়েই আলিমগণ ঐসব কথা

বলেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে সুযোগের সন্ধানী অর্ধশিক্ষিত কতিপয় লোককে এমনই করতে দেখা যায়।

মোটকথা মুজতাহিদদের ঐসব কথাই গ্রহণ করা আবশ্যক, যার পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর দলীল রয়েছে। তাদের যেসব কথা দলীল বিরোধী তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

ইমামগণ বলেছেন, **كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم** "প্রত্যেকের কথা থেকে গ্রহণ করা হবে এবং কিছু বর্জনও করা হবে। একমাত্র রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব কথাই গ্রহণ করা হবে। ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো হাদীছ আসলে তা আমরা মাথা পেতে মেনে নিবো এবং চোখ বন্ধ করে সেটা কবুল করবো, ছাহাবীদের থেকে কোনো হাদীছ আসলে তা আমরা মাথা পেতে মেনে নিবো এবং চোখ বন্ধ করে সেটা কবুল করবো। আর তাবেঈদের থেকে যখন কোনো হাদীছ আসবে, সে ব্যাপারে কথা হলো তারাও পুরুষ এবং আমরা পুরুষ। অর্থাৎ তা আমরা চোখ বন্ধ করে মানতে বাধ্য নই। তাদের কথা ভুলের উর্ধ্বে নয়। ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) তার কথা দ্বারা তার অনুরূপ অন্যান্য আলেম ও বড় ইমামদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন।

ইমাম আবু হানীফার শেষোক্ত কথাটিকে কতিপয় আধা শিক্ষিত লোক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে নিজেদেরকে মুজতাহিদদের কাতারে দাঁড় করিয়েছে। অথচ তারা এখনো মূর্খই রয়ে গেছে। ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) তার কথা দ্বারা আলেমদেরকে জাহেলদের বরাবর করতে চান নি। ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

كلنا رادٌ ومردود عليه؛ إلا صاحب هذا القبر ... "؛ يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"এ কবরের অধিবাসী ব্যতীত আমাদের প্রত্যেকের কথাই কখনো গ্রহণযোগ্য হয় আবার কখনো অগ্রহযোগ্য হয়। কেবল এ কবরবাসী ব্যতীত। এ কথা বলে তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

إذا صح الحديث فهو مذهبي

ছ্বহীহ হাদীছই আমার মাযহাব। তিনি আরো বলেন,

إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط

আমরা কথা যখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার বিপরীত হবে, তখন আমার কথাকে দেয়ালে নিক্ষেপ করবে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

عجب لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان

ঐসব লোকের জন্য আফসোস! যারা হাদীছের সনদ এবং সেটার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জেনেও সুফিয়ান ছাওরীর মতামত গ্রহণ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

“যারা রসূলের আদেশের বিরোধিতা করে, তাদের এ ভয় করা উচিত যে, তাদের উপর কোনো ফিতনা কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এসে পড়তে পারে”। (সূরা আন নূর: ৮৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমাদের উপর আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষিত হবে। আমি বলছি, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আর তোমরা বলছো যে, আবু বকর বলেছেন এবং উমার বলেছেন।[৪৮]

---

[৪৮] ছহীহ ও যঈফ সনদে এবং বিভিন্ন শব্দে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ আছারটি আলেমদের নিকট খুবই প্রসিদ্ধ। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার উপরে অন্য কারো কথাকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর আছারটি এ কথাকেই শক্তিশালী করছে। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লোকদেরকে তামাত্তো হজ্জকে উত্তম বলতেন। কেননা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের বছর ছাহাবীদেরকে জোর দিয়ে তা করতে বলেছেন। তাকে যখন ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কি আমাদের জন্য খাছ? না কি ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য? তিনি বললেন, বরং সকল মানুষের জন্য। সুতরাং ইবনে আব্বাস এ ফতোয়াই প্রদান করতেন। ঐ দিকে আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) চাইতেন যে, লোকেরা হজ্জ এবং উমরা আলাদাভাবে করুক। এতে করে আল্লাহর ঘর আবাদ হবে বেশি এবং সবসময়ই কাবা ঘরে লোকের ভিড় থাকবে। সবসময়ই আল্লাহর ইবাদত হবে। আর একই সফরে হজ্জের মৌসুমে দু’টি একসাথে করে ফেললে কাবাঘর খালি থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এ বিষয়ে আবু বকর ও উমারের খেলাফ করতেন এবং তাদের কথা গ্রহণ করতে লোকদেরকে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন হজ্জ ও উমরা একসাথে করাই উত্তম। লোকেরা তাকে বললো, আপনি লোকদেরকে এমন কাজের আদেশ দিচ্ছেন, যা থেকে আবু বকর ও উমার নিষেধ করছেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমাদের উপর আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষিত হবে। আমি বলছি, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আর তোমরা বলছো, আবু বকর বলেছেন এবং উমার বলেছেন

এখানে জেনে রাখা আবশ্যক যে, এ উম্মতের কেউই জ্ঞান-বুদ্ধিতে আবু বকর ও উমারের সমান নয়। তারা হজ্জ ও উমরা একসাথে করতে লোকদেরকে কেন মানা করতেন, তা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, লোকেরা এক সাথে হজ্জ ও উমরা করে নিলে অন্য সময় কাবা ঘরে লোকদের ভিড় থাকবে না। তাই হজ্জের মাসসমূহে যদি শুধু হজ্জ করা হয় এবং বছরের অন্যান্য সময় উমরা করা হয় তাহলে সারা বছরই কাবা আবাদ হবে এবং তাতে সবসময় লোকদের ভিড় থাকবে। লোকদেরকে তামাত্তো হজ্জ করতে নিষেধ করার মাধ্যমে তা হারাম করেননি। বরং তারা কেবল উত্তম মনে করতেন এবং মানুষের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতেন। এতেই ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, আমার আশঙ্কা হয় তোমাদের উপর আল্লাহর তরফ থেকে পাথর বর্ষণ করা হবে। কেননা তোমরা এমন কথা বলছো এবং

শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে হাসান (রহিমাহুল্লাহ) কিতাবুত তাওহীদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল মাজীদে বলেন, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর আবশ্যক হলো, তার কাছে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের দলীল পৌঁছার পর যখন সে সেটার অর্থ ভালোভাবে বুঝবে, তখন সেটাকেই যথেষ্ট মনে করবে ও সে অনুযায়ী আমল করবে। যদিও এতে বিরোধীরা তার বিরোধীতা করে। তিনি আরো বলেন, নিজের কল্যাণকামী কোনো লোক যখন আলেমদের কিতাব পড়বে, তাতে নযর দিবে এবং তাদের কথা বুঝতে পারবে তখন সে যেন আলেমদের কথাগুলোকে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের সাথে মিলিয়ে দেখে। কেননা প্রত্যেক মুজতাহিদ আলেম, তার অনুসারী এবং তার দিকে নিজেকে সম্বন্ধকারী মতভেদপূর্ণ মাসআলায় নিজেদের মতো ও তার পক্ষে দলীল উল্লেখ করে থাকে। আর উক্ত মাসআলাতে একজনের কথাই সত্য হয়। ইমামগণ তাদের ইজতেহাদের কারণে ছাওয়াবপ্রাপ্ত হবেন।

এ ক্ষেত্রে সঠিক পথ অবলম্বনকারী হবে ঐ ব্যক্তি, যিনি আলেমদের কথায় দৃষ্টি দেয়, তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার মাধ্যমে বিভিন্ন মাসআলা জানা ও মুখস্থ করার চেষ্টা করে এবং তারা যেসব দলীল উল্লেখ করেছেন, তার মাধ্যমে ভুল মাসআলা থেকে সঠিক মাসআলা আলাদা করে। এর মাধ্যমেই দলীলের ভিত্তিতে আলেমদের কথা থেকে বাছাই করে সঠিক কথাটির উপর আমল করে সৌভাগ্যবান হতে পারবে। শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে হাসান আল্লাহ তা'আলার এ বাণী,

﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾

"কিন্তু যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশরিক হবে"। **সূরা আল আনআম ৬: ১২১।**

এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, মুকাল্লিদ এবং যারা তাদের তাক্বলীদ করে, তাদের অনেকেই এ ফিতনায় পড়েছেন। মুকাল্লাদ বা যার তাক্বলীদ করা হয়, তিনি দলীলের বিপরীত করলেও মুকাল্লিদরা দলীলের মূল্যায়ন না করার কারণেই ফিতনায় পড়েছে। আর এটি বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

মুকাল্লিদদের কেউ কেউ তাক্বলীদ করতে গিয়ে এতে বাড়াবাড়ি করে এবং বিশ্বাস করে যে, এ অবস্থায় দলীলের অনুসরণ করতে যাওয়া মাকরুহ অথবা হারাম। মুকাল্লিদরা আরো

এমন কাজ করছো যাতে তোমরা আসমান থেকে পাথর বর্ষণের শাস্তির যোগ্য হয়েছো। আমি বলছি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ ও উমরা একসাথে করার আদেশ দিয়েছেন, আর তোমরা আবু বকর ও উমারের কথা টেনে এনে আমার কথার বিরোধীতা করছো।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ কথা থেকে বুঝা গেলো যে, কোনো মানুষের কথাকে আল্লাহর কথা কিংবা রাসূলের কথার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যাবে না। সে যত বড় আলেমই হোক না কেন। ইবনে আব্বাসের কথাই সঠিক। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সীরাত ও সুন্নাত প্রমাণ করে যে, কোনো মানুষের কথা মানতে গিয়ে আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশের বিরুদ্বাচরণ করা যাবে না।

বলে, আমাদের ইমামগণই দলীল সম্পর্কে অধিক অবগত রয়েছেন। এরা এক বিরাট ফিতনায় পড়েছে। শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে হাসানের কথা এখানেই শেষ।

আমাদের সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব কিতাবুত তাওহীদের ৩৭ম অধ্যায়ের ৫নং মাসআলায় বলেছেন: অবস্থা এ পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, অধিকাংশের নিকট পাদ্রী ও পীর-মাশায়েখদের ইবাদত করাই সর্বাধিক উত্তম আমলে পরিণত হয়েছে। লোকেরা এটিকে 'বেলায়াত' হিসাবে নামকরণ করছে। পাদ্রীদের ইবাদতই বর্তমানে ইলম ও ফিক্বহ হিসাবে গণ্য হচ্ছে। পরবর্তীতে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এবং খারাপ লোকদেরও ইবাদত শুরু হয়। অর্থাৎ জাহেল ও মূর্খদেরও ইবাদত শুরু হয়। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহুর কথা এখানেই শেষ।

গোমরাহ আলেমরা আল্লাহর দীনের মধ্যে যেসব বিদ'আত, কুসংস্কার এবং গোমরাহী উদ্ভাবন করেছে, তাতে তাদের আনুগত্য করা এবং ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের দ্বারা তাদের পণ্ডিত ও পুরোহিতদেরকে প্রভু বানিয়ে নেয়া একই কথা। যেমন মীলাদ অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করা, ছূফী তরীকাসমূহ, মৃতদের মধ্যস্থতা দেয়া এবং আল্লাহ তা'আলার বদলে তাদের কাছে দু'আ করা ইত্যাদি। পরিস্থিতি এতদূর গিয়ে পৌঁছেছে যে, গোমরাহ আলেমগণ এমন এমন শরী'আত তৈরি করেছে, যা আল্লাহ তা'আলা অনুমোদন করেননি। সহজ-সরল মূর্খ লোকেরা তাদের তাক্বলীদ করে এগুলোকেই দীন মনে করছে। এখন সমস্যা হলো, যে এ শিরক-বিদ'আতগুলোর প্রতিবাদ করে এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করার আহবান জানায় তাকে ইসলামের বাইরে গণ্য করা হয় অথবা তার নামে অপবাদ দেয়া হয় যে, সে আলেম ও সৎ লোকদেরকে ঘৃণা করে। এতে ভালো কাজ খারাপ এবং খারাপ কাজ ভালো রূপ ধারণ করছে। সুন্নাতকে বিদ'আত এবং বিদ'আতকে সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। এর উপরই শিশুরা যুবক হচ্ছে এবং যুবকরা বৃদ্ধ হচ্ছে। এঅবস্থা দীনের অনুসারী কম হওয়ার প্রমাণ এবং দীনকে সংস্কারকারী দাঈদের সংখ্যাও কম হওয়ার প্রমাণ। মহান আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত অন্যায় থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই এবং তার শক্তি ও সাহায্য ব্যতীত সৎকাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

মুজতাহিদ ইমামগণ যেসব ইজতেহাদী মাসআলায় ভুল করেছেন, তাদের ভুলগুলো মার্জনীয় এবং অনিচ্ছকৃত ভুলের কারণে তারা ছাওয়াবও পাবেন। তাদের ভুলগুলোর ক্ষেত্রে যদি তাদের অনুসরণ করা হারাম হয়, তাহলে কবর এবং ওলী-আওলীয়ার পূজায় লিপ্ত গোমরাহ-মিথ্যুক দাজ্জালদের তাক্বলীদ কীভাবে বৈধ হতে পারে? এরা এমন মাসআলায় ভুল করেছে, যাতে ইজতেহাদ করা জায়েয নেই। আর এটি হলো আক্বীদার মাসআলা। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের ভিত্তিতেই আক্বীদা সাব্যস্ত করতে হবে। তবে যাদের অন্তর অন্ধ তারা তো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আক্বীদা গ্রহণ করবে না। যেমন-আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾

“আমি তো মানুষের জন্য এ কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে দিয়েছি। তুমি যে কোনো নিদর্শনই আনো না কেন, অবিশ্বাসীরা এ কথাই বলবে, তোমরা মিথ্যাশ্রয়ী। এভাবে জ্ঞানহীনদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দেন। কাজেই তুমি ছ্বর করো, অবশ্যই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং যারা বিশ্বাস করে না তারা যেন কখনোই তোমাকে গুরুত্বহীন মনে না করে”। (সূরা আর রূমঃ ৫৮-৬০)

এসব লোক দীনের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখাগুলোর ব্যাপারে তাদের শাইখদের অন্ধ তাক্বলীদে ডুবে রয়েছে। আরেক দল লোক তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা সবাইকে মুজতাহিদ মনে করে। যেসব মূর্খ নিজে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে না এবং ইলমের ক্ষেত্রে যাদের বেশি একটা দখল নেই। তারা ফিকহার কিতাবসমূহ পড়া হারাম মনে করে। তারা চায় মূর্খরাও মুজতাহিদ হয়ে যাক এবং ইজতেহাদ করে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নিজেরাই হুকুম বের করুক। এটি খুবই ঘৃণ্য বাড়াবাড়ি। উম্মতের উপর এদের ক্ষতির আশঙ্কা বেশি না হলেও কোনো অংশেই প্রথমোক্ত দলের চেয়ে কম নয়।

দীনের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই সর্বাধিক নিরাপদ। আমরা ফকীহদের অন্ধ তাক্বলীদ করবো না। তবে তাদের ইলমকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখবো না এবং কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের ভিত্তিতে তারা যেসব কথা বলেছেন, তা আমরা মোটেই বর্জন করবো না। বরং আমরা তাদের কথা দ্বারা উপকৃত হবো এবং কুরআন ও সুন্নাহ বুঝতে তাদের বক্তব্যগুলোর সাহায্য নিবো। কেননা দীন ইলমের ক্ষেত্রে এগুলো আমাদের জন্য বিরাট সম্পদ এবং ইলমে ফিকহার বিরাট এক ভান্ডার। এগুলো থেকে যা দলীল মোতাবেক হয়, তা আমরা গ্রহণ করবো এবং যা দলীল বিরোধী হয়, তা বর্জন করবো। সালাফে ছ্বলেহীনগণ তাই করতেন। বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালে ইলম অর্জনে যেখানে মানুষের আগ্রহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়েছে, মূর্খতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা জরুরী। কড়াকড়ি ও শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে না এবং বাড়াবাড়ি ও ঢিলামি করা যাবে না। আমরা আল্লাহর কাছে দু‘আ করি তিনি যেন, পথভ্রষ্ট মুসলিমদেরকে সঠিক পথ দেখান, তাদের ইমাম ও নেতাদেরকে হকের উপর দৃঢ়পদ রাখুন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও বান্দার আহবানে সাড়া দানকারী।

হারামকে হালাল করার ক্ষেত্রে এবং হালালকে হারাম করার ক্ষেত্রে আলেমদের আনুগত্য করা যেমন জায়েয নেই, তেমনি ইসলামী শরী‘আত বর্জন করে অন্য কিছু দিয়ে যেসব আমীর-উমারা ও শাসকগোষ্ঠি মানুষকে শাসন করে তাদের আনুগত্য করাও বৈধ নয়। সকল দ্বন্দ্ব-কলহ, ঝগড়া-বিবাদ, পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তি করতে এমনকি মানব জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের স্মরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক।

এটিই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত ও তাওহীদের দাবি। কেননা হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান দেয়া একমাত্র আল্লাহর অধিকার। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾

"জেনে রাখো, সৃষ্টি তারই এবং নির্দেশও তার"। সূরা আল আরাফ:৫৪

অর্থাৎ আল্লাহই হুকুমকারী এবং হুকুম করার একমাত্র অধিকার তারই। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾

"তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করো, তার ফায়ছালা আল্লাহর নিকটেই"। (সূরা আশ শূরা ৪২: ১০) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

"তোমরা যদি কেনো বিষয়ে মতবিরোধ করো, তাহলে বিতর্কিত বিষয়টি আল্লাহ এবং রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম"। (সূরা আন নিসা ৪: ৫৯)

সুতরাং শুধু ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই নয়; বরং আল্লাহর শরী'আত দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করা একদিক থেকে যেমন প্রথম শ্রেণির ইবাদত, অন্যদিকে এটি আল্লাহ তা'আলার অধিকার এবং ইসলামী আক্বীদারও অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যারা আল্লাহর শরী'আত বাদ দিয়ে অন্যান্য রীতি-নীতি এবং মানুষের তৈরী প্রচলিত প্রথা ও আইন-কানুনের স্মরণাপন্ন হয়, তারা উপরোক্ত প্রচলিত প্রথা-রীতি-নীতি ও তা দিয়ে শাসনকারীদেরকে শরী'আত প্রবর্তন ও হুকুম-আহকাম প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীক নির্ধারণ করলো।[৪৯]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾

[৪৯] তবে সাধারণ মুসলিমদের উপর জোর পূর্বক মানব রচিত আইন চাপিয়ে দেয়া হলে তারা যদি অন্তর দিয়ে সেটাকে অপছন্দ ও ঘৃণা করে, চাপের মুখে তা মানতে বাধ্য হয় এবং না মানলে যুলুম-নির্যাতন ও জান-মাল, মান-ইজ্জত ইত্যাদির ক্ষতির আশঙ্কা করে তাহলে ঘৃণাসহকারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা মেনে নিলে কাফের হবে না।

"এদের কি এমন কিছু শরীক রয়েছে, যারা এদের জন্য দীনের এমন বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছে আল্লাহ যার অনুমতি দেন নি?" (সূরা আশ শূরা ৪২:২১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾

"কিন্তু যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশরিক হবে"। (সূরা আল আনআম: ১২১)

যারা আল্লাহর শরী'আত বাদ দিয়ে অন্যান্য আইন-কানুনের কাছে বিচার-ফায়ছালা নিয়ে যায়, তাদের থেকে আল্লাহ তা'আলা ঈমান নাকোচ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তারা সে সমস্ত বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে। তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো সমাধানের জন্য ত্বগূতের কাছে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। আর যখন তুমি তাদেরকে বলবে, তোমরা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এবং তার রসূলের দিকে এসো তখন তুমি মুনাফেকদিগকে দেখবে, ওরা তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদ আরোপিত হয়, তখন কেমন হবে? অতঃপর তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে ফিরে আসবে যে, কল্যাণ ও সমঝোতা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অবগত। অতএব, তুমি ওদেরকে উপেক্ষা করো এবং ওদেরকে সদোপদেশ দিয়ে এমন কথা বলো, যা তাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন

করেছিল, তখন যদি তারা তোমার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রসূলও যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতো, অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও মেহেরবান রূপে পেত। অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কেনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে নিবে"। (সূরা আন নিসা ৪: ৬০-৬৫)

সুতরাং যারা মানুষের তৈরী আইন-কানুনের দিকে আহবান জানায়, তারা আনুগত্য এবং শরী'আত প্রবর্তনের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করলো। আর যে ব্যক্তি এই মনে করে আল্লাহর নাযিল করা শরী'আত পরিত্যাগ করে অন্যান্য আইন-কানুন দিয়ে শাসন করে যে, আল্লাহ তা'আলার নাযিল করা শরী'আতের চেয়ে এগুলোই ভালো অথবা মানুষের তৈরী আইন-কানুন ও রীতিনীতি আল্লাহর শরী'আতের সমমর্যাদা সম্পন্ন অথবা আল্লাহর শরী'আত বাদ দিয়ে অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা জায়েয আছে, তাহলে সে কাফের হিসাবে গণ্য হবে। যদিও সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে।

কেননা যারা আল্লাহ তা'আলার শরী'আত বর্জন করে অন্যান্য আইন-কানুনের কাছে বিচার-ফায়ছালা নিয়ে যায় এবং নিজেদেরকে মুমিন বলে দাবি করে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানের দাবিতে তাদেরকে মিথ্যুক বলেছেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী, **يزعمون** তাদের ঈমান নাকোচ হওয়ার দাবি করে। কেননা এ শব্দটি ঐ ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধ করে বলা হয়, যে কোনো জিনিস দাবি করে, অথচ সে সেটাতে মিথ্যাবাদী। আর প্রচলিত আইন-কানুন দ্বারা বিচার-ফায়ছালা ও শাসন করা এবং ত্বগূতের কাছে বিচার-ফায়ছালার জন্য যাওয়া একই কথা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"যে ব্যক্তি ত্বগূতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল, যা বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা আল বাকারা ২: ২৫৬)[৫০]

---

[৫০] মোটকথা ত্বগূতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কারো ইসলাম পরিশুদ্ধ হবে না। কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর মর্মার্থ এটিই। সুতরাং لا إله এ কথার মাধ্যমে আল্লাহর পরিবর্তে প্রত্যেক ত্বগূতের ইবাদত করাকে অস্বীকার করা হয়েছে। আর إلا الله কালেমার এ অংশের মাধ্যমে ইবাদতের ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহর তাওহীদকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। তাঁর মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়েছি যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, আর ত্বগূতকে বর্জন করো"। সুতরাং আল্লাহর ইবাদতকে একটি বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আর ত্বগূতের ইবাদতকে অন্য একটি বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং একজন

সুতরাং যারা মানুষের প্রচলিত আইন-কানুন দিয়ে শাসন করবে আর যারা মন খুলে খুশি হয়ে উত্তম মনে করে তার প্রতি অনুগত থাকবে তাদের কেউই তাওহীদপন্থি নয়। কেননা তারা শরী'আত প্রবর্তন ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে এবং যে ত্বগূতকে অস্বীকার করতে বলা হয়েছে, তা বর্জন করেনি। বরং সে শয়তানের আনুগত্য করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

"পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে বহুদূরের গোমরাহীতে নিক্ষেপ করতে চায়"। (সূরা আন নিসা:৬০)

আল্লাহ তা'আলা এখানে সংবাদ দিয়েছেন যে, মুনাফিকদেরকে যখন আল্লাহ তা'আলার শরী'আতের কাছে বিচার-ফায়ছালা নিয়ে যাওয়ার জন্য আহবান করা হয়, তখন তারা এদিকে আসতে অস্বীকার করে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। এমনি তাদের বিকৃত স্বভাব এবং অন্তর নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে তারা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করাকেই সংস্কার হিসাবে দেখে।

মানুষ কেবল তখনই মুসলিম বলে গণ্য হবে, যখন সে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং একই সাথে ত্বগূত থেকে দূরে থাকবে।

আর طاغوت শব্দের উৎপত্তি হয়েছে الطغيان থেকে। ত্বগূত বলা হয় এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যে অন্যায় ও বিদ্রোহে সীমালঙ্ঘন করে। আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

﴿ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾

"এখন তুমি যাও ফেরাউনের কাছে। কেননা সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে"। (সূরা তোহা: ২৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾

"যখন পানি সীমা অতিক্রম করলো তখন আমি তোমাদেরকে জাহাজে আরোহন করিয়েছিলাম"। (সূরা আল-হাক্কাহ: ১১) অর্থাৎ পানি যখন অত্যন্ত বেড়ে গেল।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴾

"তাই সামূদ জাতিকে একটি সীমাহীন বিপদ দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে"। (সূরা আলহাক্কাহ: ৫) অর্থাৎ বিকট ও ভয়াবহ একটি চিৎকারের মাধ্যমে।

সুতরাং যে ব্যক্তি বা বিষয় সীমা অতিক্রম করে, তাকেই ত্বগূত বলা হয়। শয়তানকে আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার কারণে ও সীমালঙ্ঘন করার কারণে ত্বগূত বলা হয়। আল্লাহ ব্যতীত অন্য যেসব মাবুদের ইবাদত করা হয়, সেসব মাবুদ যদি উক্ত ইবাদতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে ওগুলোকে ত্বগূত বলা হয়। যাদুকর এবং গণক উভয়ই ত্বগূত। এমনি আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক মাবুদই ত্বগূত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾

"তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, মূলত আমরাই সংশোধনকারী। সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, তবে তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয়"। (সূরা আল বাকারা ২: ১১)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের নিকট বিচার-ফায়ছালা নিয়ে যাওয়া মুনাফেকদের কাজ। এটি পৃথিবীতে বিপর্যয়ের অন্যতম বড় কারণ।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মুফাস্সির বলেন, রসূল প্রেরণ, শরী'আতের হুকুম-আহকাম বর্ণনা এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমে পৃথিবীকে পরিশুদ্ধ করার পর তোমরা পাপাচার, সীমালঙ্ঘন, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের আনুগত্যের দিকে মানুষকে আহবান করার মাধ্যমে সেটাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দিকে আহবান করা এবং তার সাথে শিরক করা পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ ফাসাদ সৃষ্টি করার নামান্তর। প্রকৃতপক্ষে শিরক এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণেই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সুতরাং আল্লাহর সাথে শিরক করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দিকে দাওয়াত দেয়া, আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে মাবুদ হিসাবে দাঁড় করানো এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কাউকে আনুগত্য ও অনুসরণ করার জন্য নির্ধারণ করাই পৃথিবীতে ফাসাদ ও ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার কারণ। আল্লাহ তা'আলাকে যতক্ষণ না একমাত্র মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করা হবে, তার দিকেই কেবল আহ্বান না করা হবে এবং আনুগত্য ও অনুসরণ যখন একমাত্র রসূলের জন্যই না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবী এবং এর অধিবাসীগণ পরিশুদ্ধ হবে না।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্যদের আনুগত্য করা কেবল তখনই ওয়াজিব হবে, যখন তারা রসূলের আনুগত্যের আদেশ দিবে। আর যখন তারা রসূলের নাফরমানী করা এবং তার শরী'আতের বিরোধীতা করার আদেশ দিবে তখন তাদের কথা শ্রবণ করা যাবে না এবং তাদের আনুগত্যও করা যাবে না।

যে ব্যক্তি পৃথিবীর অবস্থা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, সে দেখতে পাবে যে, আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ, তার ইবাদত এবং তার রসূলের ইবাদতের কারণেই তা সংশোধন হয়েছে। আর সৃষ্টিজগতে যত অকল্যাণ, ফিতনা, বালা- মুছীবত, অনাবৃষ্টি, শত্রুদের বাড়াবাড়ি যুলুম ইত্যাদি রয়েছে তা রসূলের বিরুদ্ধচারণ, আল্লাহ এবং তার রসূল ব্যতীত অন্যের দিকে আহ্বান করার কারণেই হয়ে থাকে।

যেসব হুকুম-আহকাম ও বিচার-ফায়ছালা আল্লাহ তা'আলার হুকুমের পরিপন্থি ও বিরোধী তাকে তিনি জাহেলীয়াতের হুকুম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

"তারা কি জাহেলী যুগের ফায়ছালা কামনা করে? বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ অপেক্ষা উত্তম ফায়ছালাকারী আর কে আছে?" (সূরা আল মায়েদা ৫: ৫০)

ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও বিধানের মধ্যেই রয়েছে সমস্ত কল্যাণ এবং তাতেই রয়েছে সমস্ত অকল্যাণ থেকে নিরাপত্তা। যারা আল্লাহ তা'আলার এসব কল্যাণকর হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধ থেকে সরে এসে বিভিন্ন মত, প্রবৃত্তি এবং আল্লাহর শরী'আতের দলীল ছাড়াই মানুষের তৈরী বিভিন্ন পরিভাষার অনুসরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাদের নিন্দা করেছেন। জাহেলী যুগের লোকেরা এসব অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভ্রান্ত মতবাদগুলো দিয়েই বিচার-ফায়ছালা করতো।

তাতারীরা চেঙ্গিস খানের তৈরী যেসব রীতিনীতি ও আইন-কানুন দ্বারা মুসলিম জনগণকে শাসন করেছিল, তাও জাহেলী যুগের রীতিনীতির মতোই ছিল। চেঙ্গিস খান তাতারীদের জন্য 'আল-ইয়াসিক' নামক একটি সংবিধান রচনা করেন। এটি হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুন সম্বলিত এমন একটি কিতাব, যা বিভিন্ন শরী'আত যেমন ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন কিতাব থেকে কিছু কিছু বিষয় গ্রহণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে চেঙ্গিস খান নিজের নিজস্ব চিন্তা-গবেষণা এবং প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করেও তাতে অনেক আইন-কানুন যুক্ত করেছে। এ কিতাবটি তার ছেলেরা শরী'আত হিসাবে গ্রহণ করে এবং সেটাকে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের উপর প্রাধান্য দেয়। যে ব্যক্তি চেঙ্গিস খানের মতো কাজ করবে, সে কাফের বলে গণ্য হবে। এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। যতক্ষণ না সে আল্লাহ এবং তার রসূলের হুকুমের দিকে ফিরে আসে এবং কম-বেশি সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত দ্বারা বিচার-ফায়ছালা ও শাসন কার্য পরিচলনা করে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের উক্তি এখানেই শেষ।

বর্তমানে অনেক মুসলিম দেশই প্রচলিত মানব রচিত রীতিনীতি, বিধি-বিধান ও প্রথাকেই আইনের উৎস হিসাবে নির্ধারণ করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শুধু পারিবারিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিধি-বিধান বাকী রেখে ইসলামী শরী'আতের বাকি সব হুকুম-আহকাম বাতিল করে দিয়েছে। এদের কাজ-কর্ম তাতারীদের মতোই। কুরআনের অনেক আয়াত এদের কাজকে কুফুরী প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ﴾

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা কাফের। (সূরা আল মায়েদা ৫: ৪৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾

"অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম! সে লোক ঈমানদার হবে না, যতোক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে নেবে"। (সূরা আন নিসা ৪: ৬৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

"তাহলে কি তোমরা কিতাবের একটি অংশের উপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশের সাথে কুফরী করছো? তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এমনটি করবে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হবে এবং আখিরাতে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে? তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন"। (সূরা আল বাকারা ২: ৮৫)

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আক্বীদা ও দীন হিসাবে ইসলামী শরী'আতকেই কবুল করে নেয়া আবশ্যক। মানব সমাজে শুধু ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার ইবাদত মনে করেও কুরআন ও সুন্নাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

সুতরাং বান্দার উপর আল্লাহর বিধান কবুল করে নেয়া অপরিহার্য। এটি তার পক্ষে যাক অথবা বিপক্ষে যাক। এতে তার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ হোক বা না হোক।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾

"অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম! সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে নেবে"। সূরা আন নিসা ৪: ৬৫ আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

"আল্লাহ এবং তার রসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার অধিকার নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রসূলের বিরোধীতা করবে, সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হবে"। (সূরা আল আহযাব ৩৩: ৩৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

"এখন যদি তারা তোমার ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রেখো, তারা আসলে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হিদায়াত ছাড়াই নিছক নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হবে? আল্লাহ এ ধরনের যালেমদেরকে কখনো সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না"। (সূরা আল কাসাস ২৮: ৫০)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»

"তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত আদর্শের অধীন হয়"।[৫১]

ইমাম ইবনে রজব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীছের অর্থ হলো, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ হতে যেসব আদেশ-নিষেধ এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি বান্দার পছন্দ ও ভালোবাসা অনুগত না হলে সে কখনো পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না।

সুতরাং বান্দার উপর আবশ্যক হলো, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করার আদেশ করেছেন, তাকে ভালোবাসবে এবং রসূল যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তাকে অপছন্দ করবে। এ অর্থে কুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা ঐসব লোকের নিন্দা করেছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় বিষয়কে অপছন্দ করে এবং তার অপছন্দনীয় জিনিসগুলোকে পছন্দ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

"এটি এ জন্য যে, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে তারা তার অনুসরণ করেছে এবং তার সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে। এ কারণে তিনি তাদের সব কাজ-কর্ম বরবাদ করে দিয়েছেন"। (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: ২৮)

---

[৫১] ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। তবে তার মর্মার্থ সঠিক। দেখুন: শাইখের তাহকীকসহ 'মিশকাতুল মাসাবীহ', হা/১৬৭।

ইবনে রজব (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের একাধিক স্থানে মুশরিকদেরকে প্রবৃত্তির অনুসরণকারী হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

"এখন তারা যদি তোমার ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রেখো, তারা আসলে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হিদায়াত ছাড়াই নিছক নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হবে? নিশ্চয় আল্লাহ যালেমদেরকে কখনো হিদায়াত করেন না"। (সূরা কাসাস ২৮: ৫০)

শরী'আতের উপর নিজস্ব প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয়া থেকেই যেহেতু বিদ'আতের সূচনা হয়, তাই বিদ'আতীদেরকেও আহলুল আহওয়া তথা প্রবৃত্তির পূজারী বলা হয়। ঠিক এমনি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ও তিনি যা ভালোবাসেন তার উপর প্রবৃত্তির চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়া থেকেও পাপাচারের উৎপত্তি হয়।

অতএব মানুষকে ভালোবাসার ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন রসূলের আনীত দীন ও সুন্নাতের অনুগামী হয়। সুতরাং মুমিনদের উপর আবশ্যক হলো, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ভালোবাসেন, তারা যেন তাদেরকে ভালোবাসে। তারা যেন ফেরেশতা, নাবী-রসূল, সিদ্দীকীন, শহীদগণ এবং সকল সৎকর্মশীল ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসে। ইবনে রজব (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা এখানেই শেষ।

أشياء تنافي التوحيد وتقتضي الردة عن الإسلام

তাওহীদ পরিপন্থি কতিপয় বিষয় যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে মুরতাদ বানিয়ে ফেলে

(১) سوء الظن بالله আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা:

আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা মারাত্মক অপরাধ। কেননা আল্লাহর উপর ভালো ধারণা রাখা তাওহীদের দাবি আর তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা সেটার পরিপন্থি। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের স্বভাব সম্পর্কে বলেন যে, তারা তার সম্পর্কে অসত্য ধারণা পোষণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾

"তারা জাহেলী যুগের ধারণার মতো আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য ধারণা পোষণ করে। তারা বলে, আমাদের জন্য কিছু করণীয় আছে কি? হে রসূল! তুমি বলো, সব বিষয় আল্লাহর হাতে"। (সূরা আলে-ইমরান: ১৫৪)

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন, তারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

"আর যেসব মুনাফিক নারী-পুরুষ এবং মুশরিক নারী-পুরুষ আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন। তারা নিজেরই অকল্যাণের চক্রে পড়ে গেছে। আল্লাহর গযব পড়েছে তাদের উপর, তিনি তাদেরকে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল অত্যন্ত মন্দ"। (সূরা ফাতাহ: ৬)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) প্রথমোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাদের ধারণা এই যে, তিনি তার রসূলকে সাহায্য করবেন না এবং তার দাওয়াত অচিরেই মিটে যাবে। আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণার ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে যে, উহুদ যুদ্ধে তিনি যে কষ্ট পেয়েছেন, তা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণ ও হিকমত অনুযায়ী ছিল না। আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও তাক্বদীরকে অস্বীকার করার দ্বারাও খারাপ ধারণার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মন্দ ধারণার ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার রসূলের কাজ-কর্মকে পরিপূর্ণ করবেন না এবং তার দীনকে সকল দীনের উপর বিজয় দান করবেন না। এটিই ছিল সূরা আলফাতাহয় উল্লেখিত মুনাফেক ও মুশরেকদের খারাপ ধারণা। এ

ধারণাকে খারাপ ধারণা এ জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা, তার হিকমত, তার প্রশংসা এবং তার সত্য ওয়াদা-অঙ্গীকারের প্রতি এরূপ ধারণা পোষণ শোভনীয় নয়।

যে ব্যক্তি ধারণা করলো যে, আল্লাহ তা'আলা বাতিলকে সবসময় সত্যের বিরুদ্ধে এমনভাবে বিজয়ী রাখবেন যে, সত্যের দাওয়াত একদম মিটে যাবে অথবা উহুদ যুদ্ধে যা হয়েছিল, তা আল্লাহ তা'আলার ফায়ছালা ও তাক্বদীর অনুযায়ী হয়নি অথবা তার ফায়ছালা ও নির্ধারণ এমন পরিপূর্ণ হিকমতপূর্ণ নয় যে, তিনি এর জন্য প্রশংসার যোগ্য; এমনকি তারা ধারণা করেছিল যে, আল্লাহর তাক্বদীর বলতে শুধু তার ইচ্ছা ছাড়া অন্যকিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে এটিই ছিল কাফেরদের ধারণা। সুতরাং কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আগুন ছাড়া অন্য কিছু নেই।

অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে থাকে। বিশেষ করে ঐ সমস্ত বিষয়ে, যা তাদের নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত অথবা যা অন্যদের সাথে সম্পৃক্ত। যারা আল্লাহর পবিত্র সত্তা, তার পবিত্র নামসমূহ, তার ত্রুটিমুক্ত ছিফাতসমূহ এবং তার হিকমত সম্পর্কে ও তিনি যথাযথ প্রশংসার হকদার- এ সম্পর্কে অবগত, তারাই কেবল তার প্রতি মন্দ ধারণা থেকে মুক্ত।

সুতরাং জ্ঞানী, বুদ্ধিমান এবং নিজের কল্যাণকামী ব্যক্তির উচিত এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা। পক্ষান্তরে মহান প্রভুর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণকারীগণ যেন তার নিকট তাওবা করে এবং ক্ষমা চায়।

হে প্রিয় পাঠক! আপনি মানুষের মাঝে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখতে পারেন। দেখবেন অনেক মানুষই তাক্বদীরের উপর অসন্তুষ্ট এবং তাক্বদীরকে দোষারোপকারী। তারা বলে থাকে এ রকম হওয়া উচিত ছিল না, এমন হওয়া ঠিক ছিল না। এ রকম অভিযোগ কেউ কম করে আবার কেউ বেশি করে। আপনি আপনার নিজের মধ্যেই অনুসন্ধান করুন। আপনি কি তাক্বদীরের উপর আপত্তি করা হতে মুক্ত? কবি বলেছেন,

فإن تنجُ منها تنجُ من ذي عظيمة + وإلا فإني لا إخالك ناجيا

"হে বন্ধু! তুমি যদি তাক্বদীরের উপর আপত্তি করা থেকে মুক্ত হয়ে থাক তাহলে জেনে রাখো যে, তুমি একটি বিরাট মুছীবত থেকে বেঁচে গেলে। আর এ থেকে মুক্তি না পেলে তুমি নাজাত পাবে বলে আমার মনে হয় না"।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করলো যে, আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকে সাহায্য করবেন না, তার কাজকে পরিপূর্ণ করবেন না, তাকে শক্তিশালী করবেন না, তার দলকেও শক্তিশালী করবেন না, তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন না এবং তাদের শত্রুদের উপর তাদেরকে বিজয়ী করবেন না এবং তিনি তার দীন ও কিতাবকে বিজয়ী করবেন না, শিরককে তাওহীদের উপর বিজয়ী রাখবেন ও বাতিলকে হকের উপর এভাবে চিরস্থায়ী করবেন যে, তাওহীদ ও সত্যের দাওয়াত মিটে যাবে, অতঃপর সেটা আর কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে না, সে আল্লাহ

তা'আলার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করলো এবং তার বড়ত্ব, পূর্ণতা, সুউচ্চ ও প্রশংসার গুণাবলির বিপরীত বিশেষণের দিকে তাকে সম্বন্ধ করলো। কেননা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, ক্ষমতা, হিকমত এবং উলূহীয়াত তার দিকে উপরোক্ত বিষয়ের সম্বন্ধ হওয়াকে অস্বীকার করে। তার দল ও সৈনিকগণের অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হওয়াকেও অস্বীকার করে। তার হিকমত এটিও অস্বীকার করে যে, স্থায়ী সাহায্য, সার্বক্ষণিক বিজয় আল্লাহর শত্রু, তার সাথে অংশীদার সাব্যস্তকারী ও তার সমকক্ষ নির্ধারণকারীদের জন্যই হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এরূপ ধারণা পোষণ করে সে আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে পারেনি, তার অতি সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণনাবলী সম্পর্কেও পরিচয় লাভ করতে পারেনি।

যে ব্যক্তি উহুদ যুদ্ধে নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদের পরাজয় বরণ আল্লাহর ফায়ছালা অনুযায়ী হয়নি বলে ধারণা করে সে আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে পারেনি, তার প্রভুত্ব, রাজত্ব ও বড়ত্ব সম্পর্কে জানতে পারেনি। যে ব্যক্তি মনে করে ঐ পরাজয় এবং অন্যান্য ক্ষতি আল্লাহর নির্ধারিত তাক্বদীর অনুযায়ী পরিপূর্ণ হিকমত এবং এমন প্রশংসিত উদ্দেশ্যে হয়নি, যার জন্য তার প্রশংসা করা আবশ্যক, সে আল্লাহ তা'আলার রুবূবীয়াত, রাজত্ব ও বড়ত্ব সম্পর্কে অবগত নয়। আর যে ব্যক্তি এ ধারণা করলো যে, উহুদ যুদ্ধে মুমিনদের যা হয়েছে, তা আল্লাহর নিছক ইচ্ছায় হয়েছে তার পিছনে কোনো হিকমত ছিল না, তার ধারণা সঠিক নয়। অনুরূপ যে ব্যক্তি ধারণা করলো, উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের যে কষ্ট হয়েছে আর যে বিজয় ছুটে গেছে, -এ দু'টির মধ্যে প্রথমটিই আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয় এবং মূল উদ্দেশ্য ছিল, সেও তার প্রভুত্ব, রাজত্ব ও বড়ত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারেনি।

আসল কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা যেসব অপছন্দনীয় জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তা যেসব সৃষ্টি অপ্রীতিকর ফলাফল প্রদান করে, তাও তিনি বিনা হিকমতে নির্ধারণ করেননি। কেননা এগুলোও ভালো ফলাফল প্রদান করে। যদিও আল্লাহ তা'আলার নিকট সেটা অপছন্দনীয়। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে অকল্যাণকর সৃষ্টিগুলো তিনি অযথা নির্ধারণ করেননি অযথা এগুলোর ইচ্ছা করেননি এবং বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ **"এটিই ছিল কাফেরদের ধারণা। সুতরাং কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আগুনের দুর্ভোগ ছাড়া অন্য কিছু নেই"।** (সূরা সোয়াদঃ ২৭)

অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ্ সম্পর্কে অসত্য ধারণা পোষণ করে। বিশেষ করে ঐ সমস্ত বিষয়ে, যা তাদের নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত অথবা যা অন্যদের সাথে সম্পৃক্ত। যারা আল্লাহর পবিত্র সত্তা, তার অতিসুন্দর নামসমূহ, তার ত্রুটিমুক্ত সুউচ্চ ছিফাতসমূহ এবং তার হিকমত সম্পর্কে ও তিনি যথাযথ প্রশংসার যোগ্য হওয়া সম্পর্কে তারাই কেবল তার সম্পর্কে অসত্য ধারণা থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

যে মুমিন আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হলো, সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করল। যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সৎ বান্দাদেরকে শাস্তি

দিবেন এবং তার বন্ধু ও শত্রুদের সাথে একই আচরণ করবেন, সেও আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করলো।

যে ব্যক্তি মনে করলো যে, আল্লাহ তার বান্দাদেরকে আদেশ-নিষেধ না করেই বেকার ছেড়ে দেন, তিনি তাদের নিকট রসূল প্রেরণ করেন না, তাদের নিকট কিতাব প্রেরণ করেন না; বরং পশুর ন্যায় অযথা ছেড়ে দেন, সেও আল্লাহ তা'আলার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করলো।

এমনি যে ব্যক্তি কল্পনা করল যে, আল্লাহ তা'আলা ভালো কাজের বিনিময়ে ছাওয়াব ও খারাপ কাজের শাস্তি দেয়ার জন্য তার বান্দাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করবেন না, সেখানে সৎকর্মশীলের সৎকর্মের বদলা ও যালেমদের যুলুমের বদলা দিবেন না এবং যে বিষয়ে মানুষেরা মতভেদ করছে, তাতে তিনি ফায়ছালা প্রদান করবেন না, সমস্ত সৃষ্টির সামনে তার সত্যতা ও রসূলদের সত্যতা তুলে ধরবেন না এবং এটিও বর্ণনা করবেন না যে, কাফেররাই ছিল মিথ্যুক, সেও আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করলো।

এমনি যারা ধারণা পোষণ করে যে, বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ বাস্তবায়ন করে তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যেসব সৎ আমল কেরেছে সেটা নষ্ট করে দিবেন, বিনা কারণেই সেটা বাতিল করে দিবেন এবং যেই কর্মে বান্দার কোনো হাত নেই, তার কোনো এখতিয়ার, ক্ষমতা ও তা অর্জনে তার কোনো ইচ্ছাও নেই, তাতে আল্লাহ শাস্তি দিবেন, সে আল্লাহ তা'আলার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করলো।

যে ব্যক্তি ধারণা করলো যে, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু অন্যায় কর্ম সৃষ্টি করেছেন এ কারণেই অন্যায় কাজ করার কারণে বান্দাকে শাস্তি দিবেন, বান্দা স্বীয় ইচ্ছা, শক্তি ও স্বাধীনতা দিয়ে অন্যায় করে নেই অথবা আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা করলো যে, তিনি সেই সমস্ত মুজিযা দ্বারা তার শত্রুদেরকে শক্তিশালী করবেন যা দ্বারা তিনি তার নাবী-রসূলদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তার মুমিন বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শত্রুদের মাধ্যমে তা প্রকাশ করবেন সে আল্লাহ তা'আলার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করলো।

যে মনে করবে যে, আল্লাহ্ থেকে যা আসবে তা সব এক রকমই ভালো, এমন কি যে ব্যক্তি সারা জীবন আল্লাহর আনুগত্যে কাটিয়েছে, তাকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে পাঠানো এবং যে ব্যক্তি সারা জীবন আল্লাহর প্রতি, তার রসূলদের প্রতি ও তার দীনের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে কাটিয়েছে তাকে ইলদীয়ীনের সর্বোচ্চ স্থানে পাঠানোও আল্লাহর জন্য একই রকম উত্তম এবং উভয়টি একই রকম সুন্দর, যে ব্যক্তি ধারণা করল, ভালো-মন্দ-এ দু'টির মাঝে ওহীর মাধ্যম ছাড়া পার্থক্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, কারণ মানুষের বিবেক কোনোটিকে মন্দ ও কোনোটিকে সুন্দর সাব্যস্ত করতে সক্ষম নয়, সেও আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করলো।

এমনি যে ব্যক্তি বিশ্বাস করলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের সত্তা ও গুণাবলি এবং তার কর্মসমূহ সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছেন, তার প্রকাশ্য অর্থ বাতিল এবং তা কেবল উপমা স্বরূপ, এ সম্পর্কে মূল সত্যকে সুস্পষ্ট করে উল্লেখ না করে শুধু সংকেত ব্যবহার করেছেন

এবং তার দিকে ইশারা করে ধাঁধায় ফেলে রেখেছেন, সে আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করলো ।

এমনি যে ব্যক্তি মনে করলো যে, কুরআন মাজীদে সর্বদা উপমা, উদাহরণ এবং বাতিল বিষয়গুলো পেশ করা হয়েছে, সেও আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করল। এমনি যারা মনে করলো, আল্লাহ চেয়েছেন যে তার বান্দারা স্বীয় কালামের অর্থ পরিবর্তন করার জন্য তাদের মন-মস্তিষ্ক, বোধশক্তি ও চিন্তা-গবেষণার অনুসরণ করুক, কুরআনের আসল ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে অন্য ব্যাখ্যা বের করুক, কুরআনের ব্যাখ্যার জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি অন্বেষণ করুক, অপছন্দনীয় ব্যাখ্যা বের করুক, এমন তাবীল আবিষ্কার করুক যা কেবল ধাঁধায় নিক্ষেপকারী ও যুক্তি-তর্কের মতোই এবং যা কেবল কাশফ ও বয়ানের মতই সে তার প্রতি খুব নিকৃষ্ট ধারণা পোষণ করলো।

যে ব্যক্তি ধারণা করলো যে, তিনি তার অতি সুন্দর নামসমূহ এবং সুউচ্চ গুণাবলি জানার জন্য তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি ও নিজস্ব মতামতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন; তার কিতাবের উপর নির্ভর করতে বলেননি, যে মনে করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে চেয়েছেন যে, তারা তার কালামের সেই অর্থ গ্রহণ না করুক, যা তাদের পরস্পরের সম্বোধন ও আরবী ভাষা থেকে তারা জানতে পেরেছে, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা খোলাখুলিভাবে তাদের জন্য ঐ সত্যকে প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও তা করেন, যা প্রকাশ করে দেয়াই উচিত ছিল এবং যেসব শব্দ তাদেরকে বাতিল আক্বীদার দিকে নিয়ে যায় ঐসব শব্দের সমস্যা থেকে তাদেরকে বাঁচাতে সক্ষম থাকার পরও আল্লাহ তা'আলা তা না করে হিদায়াত ও সঠিক পথের বিপরীত দিকে তাদেরকে নিয়ে গেছেন, তারাও আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করল।

কোনো ব্যক্তি যদি মনে করে, আল্লাহ ব্যতীত সে এবং তার উস্তাদই সত্যকে সুস্পষ্ট শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম সে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার সাথে অপারগতার ধারণা করলো। আর যে ব্যক্তি মনে করে তিনি সত্যকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করতে সক্ষম ঠিকই, কিন্তু তা বর্ণনা না করে এবং সত্যকে সুস্পষ্ট না করে অস্পষ্ট রেখেছেন। শুধু তাই নয়; বরং বাতিল, অসম্ভব এবং ভ্রান্ত আক্বীদার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন, সে আল্লাহ তা'আলার হিকমত এবং রহমত সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করলো।

আর যে ব্যক্তি ধারণা করলো, আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল ব্যতীত সে এবং তার উস্তাদরাই সত্যকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছে এবং হিদায়াত ও সত্য কেবল তাদের কালামের মধ্যেই আর আল্লাহর বাহ্যিক কালাম থেকে কেবল তুলনা, উপমা এবং গোমরাহী ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করার সুযোগ নেই এবং মুশরিক ও দিশেহারা লোকদের কালামের মধ্যে রয়েছে হিদায়াত ও সত্য, তাদের ধারণা আল্লাহর প্রতি খুবই মন্দ।

এরা সকলেই আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণকারী এবং আল্লাহর ব্যাপারে অসত্য ও জাহেলিয়াতের ধারণা পোষণকারী।

যারা আল্লাহর প্রতি অসত্য ও জাহেলিয়াতের ধারণা পোষণ করে, তাদের ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের কথা এখানেই শেষ হলো। যে এর চেয়ে বেশি জানতে চায় সে যেন ইমামের অন্যতম কিতাব যাদুল মাআদ অধ্যয়ন করে। আল্লাহ সহায়।

(২) الاستهزاء بشيئ فيه ذكر الله। আল্লাহর যিকির সম্বলিত বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা

প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক হলো, আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং মুসলিমদের আলেমদেরকে সম্মান করা এবং যারা আল্লাহর যিকির সম্বলিত কোনো জিনিস নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে অথবা কুরআন নিয়ে বিদ্রুপ করে অথবা রসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে তাদের হুকুম সম্পর্কে অবগত হওয়া। এসব বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা সম্পর্কে মুসলিমদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির সম্বলিত কোনো বিষয়, কুরআন অথবা রসূল কিংবা কোনো একটি সুন্নাত নিয়ে বিদ্রুপ করলো সে আল্লাহর সাথে কুফুরী করলো। কেননা সে আল্লাহ তা'আলার রুবূবীয়াত ও রিসালাতকে অবজ্ঞা করেছে। আর এটি তাওহীদের পরিপন্থি এবং আলেমদের ইজমা অনুযায়ী কুফুরী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা কেবল আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাসা করছিলাম। বলো: তোমরা কি আল্লাহ, তার আয়াতসমূহ এবং তার রসূলকে নিয়ে উপহাস করছিলে? তোমরা এখন ওযর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফুরী করেছো। তোমাদের মধ্যে কোনো কোনো লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেই, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দিবো। কারণ তারা ছিল অপরাধী "। (সূরা আত তাওবা: ৬৫-৬৬)

কোনো কোনো যুদ্ধে মুনাফেকরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিল। তাদের সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াত দু'টি নাযিল হয়। ইমাম ইবনে জারীর এবং অন্যান্য আলেমগণ ইবনে উমার, মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে আসলাম এবং কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মুনাফেক তাবুক যুদ্ধের দিন বললো, এসব কারীর চেয়ে অধিক পেটুক, কথায় এদের চেয়ে অধিক মিথ্যুক এবং যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সাক্ষাতে এদের চেয়ে অধিক ভীরু আর কাউকে দেখিনি। অর্থাৎ লোকটি তার কথা দ্বারা মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার কারী ছাহাবায়ে কেরামের দিকে ইঙ্গিত করছিল।

আওফ ইবনে মালেক লোকটিকে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো এবং তুমি একজন পাক্কা মুনাফিক। আমি অবশ্যই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ খবর জানাবো। আওফ

তখন এ খবর জানানোর জন্য রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন কুরআন তার চেয়েও অগ্রগামী অর্থাৎ আওফ পৌঁছার পূর্বেই ওহীর মাধ্যমে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপারটি জেনেছেন। এরই মধ্যে মুনাফিক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে আসল। লোকটি এমন সময় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হল, যখন তিনি সফরের উদ্দেশ্যে উটনীর উপর আরোহণ করে রওয়ানা দিচ্ছিলেন। তারপর সে বললো, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা হাসি-তামাশা করছিলাম এবং চলার পথে আরোহীদের মতোই পরস্পর আলাপ-আলোচনা করছিলাম। যাতে করে আমাদের পথ চলার কষ্ট লাঘব হয়। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন,

﴿أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

“তোমরা কি আল্লাহ, তার আয়াতসমূহ এবং তার রসূলকে নিয়ে উপহাস করছিলে? তোমরা এখন ওযর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফুরী করেছো”।[৫২] **(সূরা আত তাওবা: ৬৫-৬৬)**

উপরোক্ত আয়াত দু’টি এবং তার শানে নুযুলের মধ্যে সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা‘আলা, তার রসূল, তার নিদর্শন, রসূলের সুন্নাত এবং রসূলের ছাহাবীদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীরা কাফের হয়ে যাবে। কেননা যে এমনটি করলো, সে আল্লাহ তা‘আলার রুবূবীয়াত এবং তার রসূলের রিসালাতকে খাটো করলো। আর এটি তাওহীদ ও আক্বীদা পরিপন্থি কাজ। যদিও সে প্রকৃত পক্ষে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার ইচ্ছা করেনি।

দীনি ইলম ও আলেম সম্প্রদায়কে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা, আলেমদেরকে সম্মান না করা অথবা তারা যে ইলমকে ধারণ করে রেখেছেন, তার কারণে তাদের কুৎসা বর্ণনা করাও কুফুরী। তারা প্রকৃতপক্ষে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করার ইচ্ছা করার উদ্দেশ্য না করে থাকলেও এ কাজটি কুফুরী। কারণ যাদের ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াত দু’টি নাযিল হয়েছে, তারা নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে অযুহাত পেশ করেছিল যে, তাদের কাছ থেকে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ প্রকাশিত হয়েছে, আসলে তারা তা অনিচ্ছা সত্বেই করেছে।

তাদের কথা: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ “আমরা কেবল হাসি-তামাসা উপহাস-পরিহাস করছিলাম”। অর্থাৎ আমরা আসলে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করার ইচ্ছা পোষণ করিনি। আমরা শুধু খেল-তামাশা করছিলাম। আন্তরিক ইচ্ছার বিপরীত কাজ-কর্মকে খেল-তামাশা বলা হয়। আল্লাহ তা‘আলা তার রসূলের মাধ্যমে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের এ অযুহাত আল্লাহর নিকট কোনো কাজে আসবে না। এ কথার কারণে তারা ঈমান আনয়নের পর কুফুরী করেছে। যার মাধ্যমে তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিল। তাদের অযুহাত কবুল করা হয়নি যে,

[৫২] ঘটনাটি ছ্বহীহ। দেখুন: তাফসীরে ইবনে কাছীর, (৪/১৭১)।

তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের ক্ষেত্রে আন্তরিক ছিল না। তারা কেবল খেল-তামাশার ইচ্ছা করেছিল। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলার কালাম তিলাওয়াত করা ছাড়া আর কোনো কথাই বলেননি। তিনি শুধু বলে যাচ্ছিলেন,

﴿أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

"তোমরা কি আল্লাহ, তার আয়াতসমূহ এবং তার রসূলকে নিয়ে উপহাস করছিলে? তোমরা এখন ওযর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফুরী করেছ"। (সূরা আত তাওবা: ৬৫-৬৬)

কেননা এ বিষয়গুলো এমন যে, তা নিয়ে হাসি-তামাশা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ চলে না। এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক। আল্লাহর আয়াতগুলো তিলওয়াতের সময় আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও তার রসূলের প্রতি ঈমান রেখে এবং তার আয়াতের প্রতি সম্মান রেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া আবশ্যক। যারা এগুলো নিয়ে খেল-তামাশা করে, তারা এগুলোর মর্যাদা নষ্ট করে।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের যেসব সুস্পষ্ট বাক্য উপরোক্ত হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা এবং তার অনুরূপ বাক্যের মাধ্যমে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ হয়ে থাকে। আর যেসব সুস্পষ্ট কথা ও আচরণ দ্বারা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ হয়ে থাকে তা হচ্ছে, যেমন ঠোঁট লম্বা করা, জিহবা বের করা, চোখ দ্বারা ইঙ্গিত করা। এমনি লোকদেরকে যখন ছ্বলাত আদায় ও যাকাত প্রদানের আদেশ করা হয়, তখন তাদের থেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আরো অনেক কথা ও আচরণ প্রকাশ পায়। উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করার কারণে যেখানে মানুষ কাফের হয়ে যায়, তাহলে তাওহীদ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলে কেমন হবে! শাইখের কথা এখানেই শেষ।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সুসাব্যস্ত ও সুপ্রমাণিত সুন্নাত নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করাও অনুরূপ। যেমন কেউ লম্বা দাঁড়ি নিয়ে বিদ্রুপ করলো, মোচ খাটো করা নিয়ে বিদ্রুপ করলো অথবা মেসওয়াক নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করলো অথবা অনুরূপ অন্যান্য বিষয় যেমন সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ নিয়ে বিদ্রুপ করলো।

ইবনে ইসহাক বলেছেন, উমাইয়্যা ইবনে যায়েদ ইবনে আমর গোত্রের বন্ধু ওয়াদীয়া ইবনে ছাবেত এবং বনু সালামার বন্ধু আশজা গোত্রের মাখশী ইবনে হিময়ার নামক জনৈক ব্যক্তিসহ একদল মুনাফেক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ইঙ্গিত করে বিদ্রুপ করলো। তিনি তখন তাবুক যুদ্ধে যাচ্ছিলেন। মুনাফেকরা পরস্পর বলাবলি করলো, তোমরা কি মনে করো, রোমকদের বীরত্ব ও যুদ্ধ আরবদের পারস্পরিক যুদ্ধের মতোই? আল্লাহর কসম! আমরা যেন দেখতে পাচ্ছি, আগামীকাল তোমাদেরকে ধুলোমাখা অবস্থায় রশী দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। গুজব রটানোর জন্য এবং মুমিনদেরকে ভয় দেখিয়ে দুর্বল করে দেয়ার জন্য তারা এসব কথা বলেছিল।

মাখশী ইবনে হিময়ার তখন বললো, আল্লাহর কসম! আমি এ মর্মে মুকাদ্দমা পেশ করতে চাই যে, তোমাদের এ কথার কারণে আমাদের ব্যাপারে কুরআন নাযিল হওয়ার বদলে আমাদের প্রত্যেককেই ১০০টি করে বেত্রাঘাত করা হোক। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যতদূর জানতে পেরেছি, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে বলেছিলেন, তুমি তাড়াতাড়ি ঐসব লোকের কাছে যাও। তারা তো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তারা যা বলেছে, তা সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো। তারা যদি অস্বীকার করে, তাহলে বলো, তোমরা অবশ্যই এসব কথা বলেছো।

আম্মার তাদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন। এরই মধ্যে তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে অযুহাত পেশ করলো। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাহনের পাশে দাঁড়ানো ছিলেন। এমন সময় ওয়াদীয়া ইবনে ছাবিত এসে তার উটের রশি ধরে বলতে লাগলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কেবল হাসি-তামাশা করছিলাম। মাখশী ইবনে হিময়ার তখন বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার সুনাম ও আমার পিতার সুনাম-সুখ্যাতি আমাকে তাদের থেকে আলাদা রেখেছে। সম্ভবত তিনি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী,

﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً﴾

"তোমাদের মধ্যে কোনো কোনো লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেই, তাহলে অবশ্যই কিছু লোককে আযাবও দিবো" দ্বারা মাখশী ইবনে হিময়ারকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ এ আয়াতে যাকে ক্ষমা করা হয়েছে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তিনি হলেন, মাখশী ইবনে হিময়ার। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তার নাম রাখলেন আব্দুর রাহমান। তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, তিনি যেন তাকে এমন স্থানে শহীদ হিসাবে মৃত্যু দান করেন, যা কেউ জানতে না পারে। পরবর্তীতে তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন। তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুনাফেকদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা ঈমান আনয়ন করার পর কুফুরী করেছে। অথচ তারা বলেছিল, আমরা আন্তরিকভাবে কুফুরী আক্বীদা পোষণ করে কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করিনি। বরং আমরা কেবল হাসি-তামাশা ও খেলা করছিলাম। আল্লাহ তা'আলা এখানে বর্ণনা করেছেন যে, তার আয়াত নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা কুফুরী। যে ব্যক্তি অন্তর খুলে এসব কথা বলার জন্য প্রস্তুত হয় সে ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ হতে এ কথা বের হওয়ার কল্পনা করা যায় না। তাদের অন্তরে যদি ঈমান থাকতো, তাহলে তাদের ঈমান তাদেরকে এ কথা বলা থেকে বারণ করতো। কুরআন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে যে, অন্তরের ঈমান অনুপাতেই বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (٤٧) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (٤٨) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ

يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (٤٩) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٥٠) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি এবং আমরা আনুগত্য করেছি কিন্তু এরপর তাদের মধ্য থেকে একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ ধরনের লোকেরা কখনোই মুমিন নয়। যখন তাদেরকে ডাকা হয় আল্লাহ ও তার রসূলের দিকে, যাতে রসূল তাদের পরস্পরের মধ্যে ফায়ছালা করে দেন তখন তাদের মধ্যকার একটি দল পাশ কাটিয়ে যায়। তবে যদি সত্য তাদের অনুকূল থাকে, তাহলে বড়ই বিনীত হয়ে রসূলের কাছে আসে। তাদের মনে কি রোগ আছে? না তারা সন্দেহের শিকার হয়েছে? না তারা ভয় করছে যে, আল্লাহ ও তার রসূল তাদের প্রতি যুলুম করবেন? আসলে তারা নিজেরাই যালেম। মুমিনদের কথা হচ্ছে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রসূল তাদের মধ্যে ফায়ছালা করেন, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। এরাই সফলকাম হবে"। (সূরা আন নূর: ৪৭-৫১)

যারা রসূলের আনুগত্য করা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে ঈমান নাকোচ করে দিয়েছেন। তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, মুমিনদেরকে তাদের পারস্পরিক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আল্লাহ ও তার রসূলের দিকে আহবান করা হলে তারা শ্রবণ করে এবং আনুগত্য করে। আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, এটি ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার বক্তব্য এখানেই শেষ।

এতে করে জানা গেলো যে, যারা ইসলামী শরী'আতকে দোষারোপ করে, যারা বলে বর্তমান বিশ্বের জন্য ইসলামী শরী'আত উপযোগী নয়, যারা বলে ইসলামী শরী'আতের দণ্ডবিধির মধ্যে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা রয়েছে, যারা বলে ইসলাম নারীদের উপর যুলুম করেছে এবং যারা এ জাতীয় অন্যান্য কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করে, তারা কাফের। এসব কথা থেকে বাঁচার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ ও নিরাপত্তা কামনা করছি।

أمور يفعلها بعض الناس وهي من الشرك أو من وسائله

মানুষ এমন কাজ করে, যা সরাসরি শিরক কিংবা শিরকের মাধ্যম

মানব সমাজে এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা কখনো বড় শিরক আবার কখনো ছোট শিরকে পরিণত হয়। মানুষের অন্তরের অবস্থা ভেদে তা থেকে যেসব কথা ও কাজ প্রকাশিত হয়, সে অনুপাতেই এগুলো কখনো বড় শিরক আবার কখনো ছোট শিরকে পরিণত হয়। অনেক মানুষ এতে আক্রান্ত হচ্ছে। এগুলো কখনো আক্বীদার পরিপন্থি হয় আবার কখনো আক্বীদার পরিচ্ছন্নতাকে ঘোলাটে করে ফেলে। সাধারণ জনগণের মধ্যে এগুলোর চর্চা ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। মূর্খ লোকেরা মিথ্যুক, চালবাজ, ফাঁকিবাজ ও ভেলকিবাজদের খপ্পরে পড়ে এসবের শিকার হয়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলো থেকে মুসলিমদেরকে সাবধান করেছেন।

أولا: لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه

প্রথমত: রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে আংটি, তাগা, সূতা ইত্যাদি পরিধান করা:

এগুলো জাহেলী যুগের কাজ। এগুলো পরিধান করা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। তবে এগুলো পরিধানকারীদের অন্তরের অবস্থা ও আক্বীদা অনুপাতে বড় শিরকের স্তরে পৌঁছতে পারে। ছাহাবী ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«أن النبي صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ قَالَ هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا»

"নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে পিতলের একটি বালা দেখলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি?" লোকটি বললো, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য পরিধান করা হয়েছে। তিনি বললেন, এটা খুলে ফেল। কারণ এটা তোমার দুর্বলতাকে আরো বৃদ্ধি করবে। আর এটা তোমার সাথে থাকা অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে তুমি কখনো সফলকাম হতে পারবে না"।[৫৩] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) ক্রুটিমুক্ত সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান ও হাকেম ছ্বহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী হাকেমের কথাতে সহমত পোষণ করেছেন।

[৫৩] যঈফ: ইবনে মাজাহ হা/৩৫৩১। ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। দেখুন: সিলসিলা যঈফা, হা/২১৯৫।

ثانيا: تعليق التمائم

দ্বিতীয়তঃ তাবিজ-কবচ ঝুলানো

ছিদ্রবিশিষ্ট এক শ্রেণির পুঁতি বা দানাকে التميمة বা তাবিজ বলা হয়। বদনযর থেকে বাঁচার জন্য প্রাচীন আরবরা শিশুদের গলায় তাবিজ ঝুলাতো এবং تميمة নামের মাধ্যমে তারা এভাবে বরকতের আশা করতো যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করেন। তাবিজ কখনো হাড্ডী দিয়ে, কখনো পুঁতি বা দানা দিয়ে, কখনো কাগজে লিখে এবং অন্যান্য জিনিস দিয়েও তৈরী হয়। কোনো অবস্থাতেই এগুলো পরিধান করা বৈধ নয়।

কখনো কুরআন দিয়ে তাবিজ তৈরী করেও ঝুলানো হয়ে থাকে। সুতরাং কুরআন দিয়ে তাবিজ লেখা হলে তা জায়েয হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের কিছু মতভেদ রয়েছে। তবে শিরকের দরজা বন্ধ করার জন্য আলেমদের দুই মতের মধ্যে প্রাধান্যযোগ্য মতে কুরআন দিয়ে তাবিজ লিখে ঝুলানো বৈধ নয়। কেননা কুরআন দিয়ে ঝুলানো জায়েয বলা হলে লোকেরা কুরআন ছাড়া অন্যান্য জিনিস দিয়ে তাবিজ বানিয়ে ঝুলানোর সুযোগ পেয়ে যাবে। আর সকল প্রকার তাবিজ ঝুলানো থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তাবিজ ঝুলানোর এই নিষেধাজ্ঞা থেকে কোনো কিছুকেই আলাদা বা খাছ করা হয়নি। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ»

"ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবচ ঝুলানো শিরক"।[৫৪] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ও আবু দাউদ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

উকবা ইবনে আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, من علق تميمة فقد أشرك "যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করলো"। তাবিজ লাগানো নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে এ দলীলগুলো ব্যাপক অর্থবোধক। তা থেকে কোনো কিছুকেই খাছ করা হয়নি। অর্থাৎ এগুলো কুরআন দিয়ে তৈরী কিংবা কুরআন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তৈরী সকল প্রকার তাবিজকেই হারাম করেছে।

---

[৫৪] হাসানঃ মুসনাদে আহমাদ হা/৩৬১৫ ও সুনানে আবু দাউদ হা/৩৮৮৩, ইবনে মাজাহ হা/৩৫৩০। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন, দেখুনঃ সিলসিলা ছ্বহীহা, হা/৩৩১।

ثالثا: التبرك بالأشجار والأحجار والآثار والبنايات

তৃতীয়তঃ গাছ, পাথর, স্মৃতিচিহ্ন এবং কবরের উপর নির্মিত প্রাচীর, গ্রীল ইত্যাদি দ্বারা বরকত[৫৫] হাসিল করাঃ

[৫৫] البركة বরকত শব্দটির অর্থ হচ্ছে কল্যাণকর বস্তুসমূহ এক স্থানে একত্রিত ও স্থায়ী হওয়া এবং বৃদ্ধি হওয়া। আর التبرك তাবাররুক অর্থ হলো প্রচুর কল্যাণ অনুসন্ধান করা এবং বরকত স্থায়ী হওয়ার প্রার্থনা করা। সে হিসাবে تبرك অর্থ হচ্ছে সে বরকত তালাশ করলো।

কুরআন ও ছ্বহীহ হাদীছের অনেক দলীল প্রমাণ করে যে, বরকত কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলাই বরকত প্রদান করেন। কোন মানুষ অন্য কোনো মানুষকে বরকত দান করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾

"বরকতের অধিকারী তিনি যিনি তার বান্দার প্রতি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়"। (সূরা ফুরকান: ১) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"বরকতের মালিক তিনি, যার হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান"। (সূরা মূলক: ১) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾

"তাকে এবং ইসহাককে আমি বরকত দান করেছি। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মী এবং কতক নিজেদের উপর স্পষ্ট যুলুমকারী"। (সূরা আস্ সাফ্ফাত: ১১৩) আল্লাহ তা'আলা ঈসা আলাইহিস সালাম এর উক্তি উল্লেখ করে আরো বলেন,

﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾

"সে বললো, আমি তো আল্লাহ্র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততোদিন ছ্বলাত ও যাকাত আদায় করতে"। (সূরা মারইয়াম: ৩০-৩১) সুতরাং বরকত দানকারী একমাত্র আল্লাহ। কোনো সৃষ্টির জন্য জায়েয নয় যে, সে বলবে, আমি এ জিনিসকে বরকতময় করেছি কিংবা তাতে বরকত দিয়েছি। বরকত অর্থ হচ্ছে কল্যাণ ছড়িয়ে পড়া ও তা স্থায়ী হওয়া।

কুরআন মজীদ ও পবিত্র সুন্নাত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বেশ কিছু বস্তুকে বরকতময় করেছেন। সেগুলো ব্যতীত বিনা দলীলে অন্য কোনো বস্তুকে বরকতময় মনে করা অন্যায় এবং তা থেকে বরকত তালাশ করা অবৈধ। নিম্নে কতিপয় বরকতময় বিষয়ের বিবরণ পেশ করা হলো।

(১) বরকতময় স্থানসমূহ: বরকতময় স্থানসমূহের অন্যতম হলো, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, মাসজিদুল আকসা, মক্কা মুকাররামাহ, মদীনা মুনাওয়ারা, সিরিয়া, ইয়ামান এবং হজ্জের পবিত্র স্থান সমূহ

যেমন আরাফাহ্, মুযদালিফাহ্, মিনা ইত্যাদী। তা ছাড়া পৃথিবীর সকল মাসজিদই বরকতময়। এ সমস্ত স্থান থেকে শরী'আত সম্মত পদ্ধতিতে বরকত হাসিলের চেষ্টা করতে হবে। খালেছ নিয়্যাতে এবং রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমেই এ সকল পবিত্র ও বরকতময় স্থান থেকে বরকত লাভের আশা করতে হবে। বরকতপূর্ণ স্থান দ্বারা শরী'আত সম্মত নিয়মের পরিপন্থি পদ্ধতিতে বরকত হাসিলের চেষ্টা করা সম্পূর্ণ নিষেধ। সুতরাং বরকতের আশায় মাসজিদ সমূহের দরজা গুলোকে চুম্বন করা, সেটার মাটি দ্বারা রোগ মুক্তির আশা করা, কাবা ঘরে দেয়াল অথবা মাকামে ইবরাহীম ইত্যাদিকে স্পর্শ করা নিষেধ।

(২) কতিপয় বরকতময় সময়: আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত স্থানকে বরকতময় করেছেন তার মধ্যে লাইলাতুল ক্বদরসহ রামাযানের শেষ দিনগুলো, দশই যুল হাজ্জ জুমআর দিন, প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ। এ সকল ক্ষেত্রে বরকতের অনুসন্ধান হতে হবে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত পন্থার অনুসরণ করে এবং তাতে ইবাদত-বন্দেগী করার মাধ্যমে। এ সমস্ত সময়ে ইবাদত করে যে পরিমাণ ছাওয়াব পাওয়া যাবে, অন্যান্য সময়ে ইবাদত করে তা পাওয়া যাবে না।

(৩) বনী আদমের বরকতময় সন্তানসমূহ: আল্লাহ্ তা'আলা আদমের সন্তানদের থেকে মুমিনদেরকে বরকত দান করেছেন। এ ক্ষেত্রে মুমিনদের সরদার নবী-রাসূলগণ সকলের উর্দ্ধে। তাদের শরীর বরকতময়। আল্লাহ তা'আলা আদমের শরীরকে বরকতময় করেছেন এবং ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর শরীরে বরকত দান করেছেন। এমনিভাবে নূহ, ঈসা, মূসা এবং অন্যান্য সকল নবী-রাসূলের দেহকে বরকতময় করেছেন। সুতরাং নবী-রাসূলদের সম্প্রদায়ের কোনো লোক কিংবা তাদের কোন অনুসারী যদি তাদের শরীর থেকে বরকত হাসিল করে তাহলে তা জায়েয হবে। তাদের শরীর স্পর্শ করা, শরীরের ঘাম সংগ্রহ করা, তাদের চুল অথবা তাদের ব্যবহৃত অন্য যে কোনো জিনিস দিয়ে বরকত গ্রহণ করা জায়েয। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শরীরকে বরকতময় করেছেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর পবিত্র শরীরও বরকতময়। ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, ছাহাবীগণ তার শরীরের ঘাম ও তার মাথার চুল দিয়ে বরকত গ্রহণ করতেন। তিনি যখন অযু করতেন, তখন অযুর অতিরিক্ত পানি নিয়ে তারা কাড়াকাড়ি শুরু করতেন। এমনটি আরো অনেক কথাই ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবীদের শরীরে এমন বরকত দান করেছেন, যার প্রভাব অন্যদের প্রতিও স্থানান্তরিত হয়। আর এটি নবী-রাসূলদের সাথেই নির্দিষ্ট। নবী-রাসূলদের ব্যক্তিসত্তাই বরকতময়।

নবী-রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কারো ব্যক্তিসত্তা বরকতময় নয়। নবী-রাসূলদের কোন সাথীর ব্যক্তিগত বরকত ছিল বলে কোন দলীল পাওয়া যায় না। এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি আবু বকর ও উমারের বেলায়ও এমনটি বর্ণিত হয়নি। তাদের ব্যক্তিসত্তাও বরকতময় ছিল বলে কোন দলীল পাওয়া যায় না। এ বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, ছাহাবী ও তাবেঈগণ আবু বকর, উমার, উছমান আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কিংবা অন্য কোন ছাহাবী থেকে বরকত গ্রহণ করতেন না। অথচ তারা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল, অযুর পানি, থুথু, ঘাম, ব্যবহৃত পোশাক এবং অন্যান্য বস্তু দিয়ে বরকত গ্রহণ করতেন। এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, ছাহাবীদের বরকত ছিল আমলের বরকত। তাদের ব্যক্তিসত্তার সাথে সম্পৃক্ত কোনো বরকত ছিল না, যা অন্যের প্রতি স্থানান্তরিত হতে পারে। যেমন ছিল নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকত। ছ্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ»

"একটি বৃক্ষ এমন রয়েছে, যার বরকত মুসলিমের বরকতের মতই"। এই হাদীছ থেকে জানা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলিমের মধ্যেই বরকত রয়েছে। বুখারীতে বর্ণিত উসাইদ ইবনে হুযায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কথাও

তাই প্রমাণ করে। তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

«مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ»

"হে আবু বকরের বংশধর! এটি তোমাদের প্রথম বরকত নয়"। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আমি কোন এক সফরে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হলাম। আমরা যখন 'বায়দা' অথবা 'যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমার গলার হার ছিড়ে গেল। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা তালাশ করার জন্য তথায় অপেক্ষা করলেন। লোকেরাও অপেক্ষা করল। সেখানে পানির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। লোকেরা আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট এসে বলতে লাগলো, আপনি কি দেখছেন না আয়েশা কী করেছেন? আল্লাহর রাসূল এবং সমস্ত লোককে এমন স্থানে আটকিয়ে দিয়েছেন যেখানে পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। এমনকি তাঁদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমার নিকট আগমন করলেন। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আমার রানের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আল্লাহর রাসূল এবং সমস্ত লোককে এমন স্থানে আটকিয়ে দিয়েছ যেখানে পানির কোন ব্যবস্থা নেই। এমনকি তাঁদের সাথেও কোন পানি নেই। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আবু বকর আমাকে দোষারোপ করলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি এ ধরনের আরো অনেক কথা বললেন। অতঃপর তিনি আমার কোমরে আঘাত করতে লাগলেন। আঘাত করা সত্ত্বেও আমি নড়াচড়া করতে পারলাম না। কারণ রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার রানের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। প্রাতঃকালে যখন তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন তখন সেখানে কোনো পানি ছিল না। এখানেই আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন। উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হে আবু বকরের বংশধর! এটি তোমাদের প্রথম বরকত নয়। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি যে উটে আরোহন করেছিলাম সেটি যখন উঠালাম তখন দেখতে পেলাম হারটি তার নিচে পড়ে আছে।

সুতরাং এটি হচ্ছে, সেই বরকত যা প্রত্যেক মুমিনকেই দেয়া হয়েছে। আবু বকরের পরিবারকেও তা দেয়া হয়েছে। এটি হচ্ছে আমলের বরকত। তারা যেই সৎ আমল করেছেন, তার কারণেই এটি তারা পেয়েছেন। নবী-রাসূলদের বরকতের ন্যায় এটি তাদের সত্তাগত নয়। ঈমান-ইল্‌ম অর্জন, তার প্রচার এবং তদোনুযায়ী আমল করার কারণেই তারা বরকতপ্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের মধ্যেই কম বা বেশি বরকত রয়েছে। আর এই বরকত তার ব্যক্তিগত ও নিজস্ব বরকত নয়। এটি হচ্ছে সৎ আমলের বরকত। তার মধ্যে যে পরিমাণ ঈমান ও ইসলাম রয়েছে এবং তার অন্তরে যে পরিমাণ ইয়াকীন, আল্লাহর ভালোবাসা, সম্মান এবং তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য রয়েছে, তার মধ্যে সে পরিমাণ বরকতই রয়েছে। সুতরাং বান্দার ইলম, ঈমান ও সৎ আমলের মধ্যে যেই বরকত রয়েছে, তা একজন থেকে অন্যজনের কাছে স্থানান্তর হয় না।

সুতরাং আলেম ও সৎ লোকদের থেকে বরকত নেওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাদের ইল্‌ম থেকে উপকৃত হওয়া, তাদের থেকে দীনি জ্ঞান অর্জন করা এবং তাদের পথ অনুসরণ করা। কিন্তু তাদের দ্বারা বরকত গ্রহণ করা ঠিক নয়। অর্থাৎ তাদের শরীর স্পর্শ করে, তাদের থুথু কিংবা অযুর পানি বা তাদের উচ্ছিষ্ট অন্যান্য বস্তু দ্বারা বরকত গ্রহণ করা হারাম। এ ব্যাপারে সর্বাধিক শক্তিশালী দলীল হচ্ছে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর এ উম্মতের আবু বকর উমার, উছমান ও আলী সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য ছাহাবী ও তাবেঈগণ তাদের দ্বারা বরকত গ্রহণ করার চেষ্টা করেননি।

সুতরাং বর্তমান যুগের যে সমস্ত লোক দাবি করে যে, সৎ লোকদের আছার তথা ব্যবহৃত ও উচ্ছিষ্ট বস্তু দ্বারা বরকত হাসিল করা জায়েয, একাধিক কারণে তা সঠিক নয়।

التبرك। অর্থ হলো বরকত অন্বেষণ করা, বরকত কামনা করা এবং উপরোক্ত জিনিসগুলোতে বরক আছে বলে বিশ্বাস করা। উপরোক্ত জিনিসগুলো থেকে বরকত অন্বেষণ করা বড় শিরক। কেননা এর মাধ্যমে বরকত হাসিলের জন্য আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য জিনিসের উপর ভরসা করা হয়ে থাকে। মূর্তিপূজকরা উপরোক্ত জিনিসগুলো থেকে বরকত অন্বেষণ করতো। সৎ লোকদের কবর থেকে বরকত হাসিল করাও বড় শিরক। যেমন লাত নামক মূর্তি থেকে বরকত লাভ করা, গাছ ও পাথর থেকে বরকত হাসিল করা এবং উয্যা ও মানাত নামক মূর্তি থেকে বরকত লাভ করা সৎ লোকদের কবর থেকে বরকতের আশা করার মতোই।

আবু ওয়াকিদ আল-লাইছী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«خَرَجَنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر لِلْمُشْرِكِينَ سدرة يعكفون عندها و يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَمررنا بسدرة فقلنا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اللَّهُ أَكْبَرُ إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل لموسى ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»

"আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হুনাইন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি। এক স্থানে মুশরিকদের একটি বড়ইগাছ ছিল। তারা সেটার পাশে অবস্থান করতো এবং তাদের সমরাস্ত্র তাতে ঝুলিয়ে রাখতো। গাছটিকে তারা ذات أنواط 'যাতু আনওয়াত' বা বরকত ওয়ালা গাছ বলতো। আমরা একদিন একটি বড়ই গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! মুশরিকদের যেমন 'যাতু আনওয়াত'

---

(১) ইসলামের প্রথম যুগের সৎকাজে অগ্রগামী ছাহাবী ও তাবেঈগণ রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো আছার দ্বারা বরকত গ্রহণ করেননি। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর জীবদ্দশাতেও না, তাঁর মৃত্যুর পরেও না। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা বরকত গ্রহণ করা জায়েয হলে এবং তা কল্যাণের কাজ হলে অবশ্যই তারা তা করতেন। ছাহাবীদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন আবু বকর, উমার, উছমান ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। কোনো ছাহাবী অথবা কোনো তাবেঈ এই সমস্ত নেতৃস্থানীয় ছাহাবী থেকে বরকত গ্রহণ করার চেষ্টা করেননি। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কাউকে তুলনা করা বৈধ নয়। নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত থাকা কালে তাঁর অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সাথে সাথে সেগুলোর ধারাও চিরবিদায় নিয়েছে। আর যা তাঁর জীবদ্দশায় যা ছিল তাতে অন্য কারো শরীক হওয়া অশোভনীয়।

(২) শিরকের দরজা বন্ধ করার জন্য সৎ লোকের উচ্ছিষ্ট বস্তু দ্বারা বরকত হাসিল করা নিষিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছণীয়।

আছে আমাদের জন্যও অনুরূপ 'যাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহু আকবার! এটি পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি ছাড়া আর কিছু নয়। যার হাতে আমার জীবন তার শপথ! তোমরা এমন কথাই বলেছ, যা বনী ইসরাঈলের লোকেরা মূসা (আলাইহিস সালাম) কে বলেছিল। তারা বলেছিল, "হে মূসা! মুশরিকদের যেমন মাবুদ আছে আমাদের জন্য তেমনি একটি মাবুদ নির্ধারণ করে দাও। মূসা (আলাইহিস সালাম) তখন বললেন: তোমরা একটি মূর্খ জাতি। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতিই অবলম্বন করছো।[৫৬] ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং ছ্বহীহ বলেছেন।

رابعا: السحر

চতুর্থত: যাদু করা

যাদু ঐ জিনিসকে বলা হয়, যার উপাদান খুব গোপন ও সূক্ষ্ম। যাদুকে সিহ্র হিসাবে নামকরণ করার কারণ হলো, এমন গোপন জিনিস দ্বারা সেটার চর্চা করা হয়, যা চোখ দ্বারা দেখা যায় না। গিরা-বন্ধন, ঝাড়-ফুঁক ও বিশেষ এক ধরনের কথা এবং ধূম্রময় বিশেষ এক ধরনের বস্তুকে যাদু নামে আখ্যায়িত করা হয়। যাদুর ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা মানুষের অন্তর ও শরীরে প্রভাব ফেলে। তা কখনো মানুষের মন ও শরীরকে অসুস্থ করে ফেলে। কখনো এটি মানুষকে হত্যাও করে ফেলে এবং কখনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। তবে বিশ্বাস রাখতে হবে যাদুর ক্রিয়া ও প্রভাব আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগত ইচ্ছা ও অনুমতির বাইরে নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা না হলে এটি কারো ক্ষতি করতে পারে না।

যাদু শয়তানের কাজ। অনেক যাদু এমন রয়েছে যা শিরকের আশ্রয় নেয়া এবং পাপাত্মার নৈকট্য অর্জন করা ব্যতীত কার্যকর হয় না। শয়তান ও পাপাত্মা যা পছন্দ করে সেটা থেকে কিছু উৎসর্গ করার মাধ্যমে, ফন্দি ও চাতুরির আশ্রয় নিয়ে পাপাত্মাগুলো ব্যবহার করে যাদু করা হয়। এ জন্যই শরী'আতে যাদুকে শিরকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুই দিক থেকে যাদু শিরকের মধ্যে পড়ে।

(১) যাদুর মধ্যে শয়তানদেরকে ব্যবহার করা হয় এবং তাদের উপর নির্ভর করা হয়। কখনো কখনো শয়তানেরা যা পছন্দ করে যাদুর মধ্যে সেটা তাদের জন্য উৎসর্গ করা হয়। এতে করে শয়তানেরা যাদুকরের খেদমত করে।

---

[৫৬] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২১৮০, ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং ছ্বহীহ বলেছেন।

(২) যাদুতে ইলমুল গায়েবের দাবি করা হয় এবং তাতে আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করা হয়। আর এটি হচ্ছে কুফুরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾

"তারা অবশ্যই অবগত আছে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করে নিয়েছে, পরকালে তার কোনো অংশ নেই"। (সূরা আল বাকারা: ১০২)

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»

"তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে দূরে থাক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, সেগুলো কী কী? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

(১) আল্লাহর সাথে শিরক করা

(২) যাদু করা

(৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন

(৪) সুদ খাওয়া

(৫) ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা

(৬) যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং

(৭) সতী-সাধ্বী মুমিন মহিলার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া"।[৫৭]

[৫৭] ছ্বহীহ বুখারী, হা/২৭৬৬, ৬৮৫৭।

خامسا: الكهانة

পঞ্চমত: ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী করা

এতেও ইলমুল গায়েবের দাবি করা হয়। যেমন আকাশের কথা চুরি করে শ্রবণকারীর উপর নির্ভর করে যমীনে ভবিষ্যতে যা ঘটবে সে সম্পর্কে খবর দেয়া। জিনেরা চুপেচাপে আসমানের ফেরেশতাদের কথা থেকে মাঝে মাঝে দু'একটি কথা শুনে ফেলে। তারা এ কথাটি গণকের কানে ঢেলে দেয়। গণক তার সাথে একশটি মিথ্যা কথা মিশায়। আর মূর্খ লোকেরা আসমানের ফেরেশতাদের থেকে চুপিসারে জিনদের শ্রুত একটি কথা সত্য হওয়ার কারণে বাকিসব মিথ্যা কথা বিশ্বাস করে।

আল্লাহ তা'আলা একমাত্র গায়েবের খবর জানেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ বাণী করা কিংবা অন্য কোনোভাবে ইলমুল গায়েবের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার অংশীদার হওয়ার দাবি করলো অথবা ইলমুল গায়েবের দাবিদারকে সত্যায়ন করলো, সে আল্লাহ তা'আলার খাছ বিশেষণের মধ্যে অন্যকে শরীক নির্ধারণ করলো। সেই সঙ্গে সে আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূলের প্রতি মিথ্যারোপও করলো।

গণক ও ভাগ্য গণনাকারীদের অনেক শয়তানী কাজ-কর্মই শিরক থেকে মুক্ত নয়। ইলমুল গায়েবের দাবি করার জন্য যেসব মাধ্যম যেমন জিন-শয়তান, পাপাত্মা ইত্যাদির সাহায্য নেয়া হয়, তারা ঐসব মাধ্যমের ইবাদতও করে থাকে। সুতরাং ইলমুল গায়েবের দাবি করা, ভাগ্য গণনা করা এবং ভবিষ্যৎ বাণী করা শিরক। কেননা এতে আল্লাহ তা'আলার খাছ ইলমের মধ্যে অংশীদারিত্বের দাবি করা হয়। এদিক থেকে এটি বড় শিরক। সেই সঙ্গে এতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নৈকিট্য লাভের চেষ্টা করা হয় এবং অন্যের ইবাদতও করা হয়।

ছ্বহীহ মুসলিমে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতিপয় স্ত্রী থেকে বর্ণিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَتَى عَرَّافاً فسأله عن شيئ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً»

"যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে গেল, অতঃপর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল এবং গণকের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার ছ্বলাত কবুল হবে না"।[৫৮]

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»

[৫৮] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২২৩০. অধ্যায়: গণকের কাজ নিষিদ্ধ এবং গণকের কাছে যাওয়াও নিষিদ্ধ।

“যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসল, অতঃপর গণক যা বলল তা সত্য বলে বিশ্বাস করল সে মূলত মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা অস্বীকার করল। ইমাম আবু দাউদ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন”।[৫৯]

মুসলিমদেরকে যেসব বিষয় থেকে সতর্ক করা আবশ্যক, তার মধ্যে যাদুকর, গণক এবং ভেলকিবাজ, ফাঁকিবাজ ও ধোঁকাবাজদের বিষয়টি অন্যতম। সংশোধন করার বদলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাদের কেউ কেউ নিজেকে মানুষের সামনে রোগ-ব্যাধির ডাক্তার হিসাবে প্রকাশ করে। মূলত সে মানুষের ঈমান-আক্বীদা বরবাদ করে দেয়। কেননা সে রোগীকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হাস-মুরগী-কবুতর, গরু-খাসী ইত্যাদি যবেহ করার আদেশ করে অথবা তার জন্য শিরকী যাদুমন্ত্র, তেলেসমাতি, শয়তানের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা সম্বলিত তাবিজ লিখে দেয়।

যাদুকর ও গণকদের আরেকটি শ্রেণি ভবিষ্যৎ বক্তার পোশাকে মানব সমাজে আত্মপ্রকাশ করে। ভাগ্য গণনা করা, গায়েবী বিষয়ের খবর এবং হারানো বস্তুর স্থানের সন্ধান দেয়ার জন্য মূর্খরা তাদের কাছে এসে হারানো বস্তুর স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। গণকরা তাদেরকে সেটার স্থান সম্পর্কে খবর দেয় অথবা শয়তানের সাহায্যে তাদের হারানো বস্তু এনে দেয়।

তাদের কেউ আবার ওলীর আকৃতিতে মানুষের সামনে উপস্থিত হয় এবং অলৌকিক জিনিস এবং কারামত দেখায়। যেমন তারা আগুনে ঝাপ দেয়, অস্ত্র দিয়ে নিজের শরীরে আঘাত করে, সাপ ধরে ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে এরা মিথ্যুক, ভেলকিবাজ এবং শয়তানের দোসর। এদের প্রত্যেকেই ফন্দিবাজি, ধোঁকাবাজি ও ফাঁকিবাজির মাধ্যমে মানুষের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করতে চায়। সেই সঙ্গে তারা মানুষের ঈমান- আক্বীদাও নষ্ট করে।

সুতরাং এদের ধোঁকাবাজি, ফাঁকিবাজি ও ভেলকিবাজি থেকে মুসলিমদের সাবধান থাকা আবশ্যক। তাদের খপ্পরে পড়া থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা জরুরী। মুসলিম শাসকদের উচিত তাদেরকে ধরে তাওবা করানো। তাওবা করলে তো ভালো অন্যথায় এদেরকে হত্যা করা আবশ্যক। এতেই মুসলিমগণ তাদের ক্ষতি, ফিতনা ও ফাসাদ থেকে নিরাপদ থাকবে। সেই সঙ্গে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমু বাস্তবায়ন হবে।

ছ্বহীহ বুখারীতে বাজালা ইবনে আবাদাহ থেকে বর্ণিত আছে, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিম গভর্ণরদের কাছে পাঠানো নির্দেশনামায় লিখেছেন,

«أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ»

“তোমরা প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ এবং যাদুকর নারীকে হত্যা করো। বাজালা বলেন, এ নির্দেশের পর আমরা তিনজন যাদুকর মহিলাকে হত্যা করেছি”।[৬০]

---

[৫৯] ইমাম আলবানীও হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন, দেখুন: সিলসিলা ছ্বহীহা, হা/৩৩৮৭।

জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে 'মারফু' হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ»

"যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে তলোয়ারের এক আঘাতে গর্দান উড়িয়ে দেয়া"।[৬১] ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

سادسا: التطير

ষষ্ঠ: কোনো কোনো সৃষ্টিকে অশুভ মনে করা

বিভিন্ন পাখি, বিভিন্ন নাম, ভিন্ন শব্দ, বিভিন্ন স্থান, বিভিন্ন লোক এবং অন্যান্য সৃষ্টিকে কুলক্ষণ মনে করাকে التطير বলা হয়। কোনো মানুষ যখন দীন বা দুনিয়ার কোনো কাজের সুদৃঢ় ইচ্ছা করার পর অপছন্দনীয় কিছু দেখে বা শুনে, তাহলে সেটা তার মধ্যে নিম্নোক্ত দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটির প্রভাব পড়তে পারে।

(১) সে যা শুনে বা দেখে তাকে কুলক্ষণ মনে করে সেটা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বীয় ইচ্ছা পুরণ করা থেকে ফিরে আসলে উপরোক্ত অপ্রিয় জিনিস থেকে তার অন্তরে ঢুকে যেতে পারে। কুলক্ষণের এ ধারণা তার ঈমানের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তার তাওহীদের মধ্যে ঘাটতি আসে এবং আল্লাহর উপর ভরসাও কমে যায়।

(২) অথবা সে যদি তার উদ্দেশ্য পুরণ করার জন্য অগ্রসর হওয়া থেকে ফিরে নাও আসে, কিন্তু তার অন্তরে কুলক্ষণের ধারণার কুপ্রভাব থেকেই যায়। সে দুঃশ্চিন্তা, ব্যথা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং মানসিক দুর্বলতা নিয়েই কাজের প্রতি অগ্রসর হয়।

সুতরাং কেউ যখন তার অন্তরে কোনো কিছু থেকে অকল্যাণ-অশুভ হওয়ার ধারণা অনুভব করে, তখন সেটা প্রতিরোধ করার পচেষ্টা চালাবে, সেটা ঠেকাতে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইবে, তার উপর ভরসা করবে এবং দৃঢ়তার সাথে স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণে অগ্রসর হবে। মোটকথা কেউ যদি অপছন্দনীয় কিছু প্রত্যক্ষ করে তখন যেন বলে,

---

[৬০] সুনানে বায়হাকী, অধ্যায়: যাদুকরকে কাফের বলা এবং তাকে হত্যা করা।

[৬১] তিরমিযী, অধ্যায়: যাদুকরের শাস্তি। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছকে ছ্বহীহ বলেছেন, দেখুন: সিলসিলা যঈফা, হা/১৪৪৬।

«اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِى بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ»

“হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া অন্য কেউ কল্যাণ দিতে পারে না। তুমি ছাড়া কেউ অকল্যাণ প্রতিহত করতে সক্ষম নয়। তোমার সাহায্য ব্যতীত কেউ অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না এবং তোমার তাওফীক ও শক্তি ব্যতীত সৎ আমল করাও সম্ভব নয়।[৬২]

সৃষ্টি থেকে অশুভ-অকল্যাণ হওয়ার আশঙ্কা করা অতি প্রাচীন একটি ব্যাধি। পূর্বেকার অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ও এমনটি করতো বলে আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়; আল্লাহ তা‘আলার সর্বোত্তম সৃষ্টি নাবী-রসূল ও তাদের মুমিন অনুসারীদের থেকেও তারা অশুভ-অকল্যাণের ধারণা করতো।

আল্লাহ তা‘আলা ফেরাআউন ও তার সম্প্রদায় সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে,

﴿وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ﴾

তারা যখন মুছীবতে পড়তো, তখন তারা মূসা এবং তার সঙ্গীদের অশুভ কারণ মনে করতো”। (সূরা আল আরাফ ৭:১৩১)

আল্লাহ তা‘আলা সালেহ ‘আলাইহিস সালামের গোত্র সম্পর্কে বলেন,

﴿قَالُواْ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَۚ قَالَ طَٰٓئِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾

“তারা বললো, তোমাকে এবং তোমার সাথীদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি। সালেহ জবাব দিলেন, তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণ আল্লাহর নিকটেই। বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে”। (সূরা আন নামল ২৭:৪৭)

এমনি জনপদবাসীদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, তারা আল্লাহর নাবী-রসূলদেরকে বলেছিল,

﴿إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

“ওরা বললো, আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তারাঘাতে নিহত করবো এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে”। (সূরা ইয়াসীন: ১৮)

আল্লাহ তা‘আলা মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমঙ্গলের কারণ মনে করতো। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

---

[৬২] আবু দাউদ, অধ্যায়: তিয়ারাহ। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: সিলসিলা ছ্বহীহা, হা/১৬১৯।

﴿وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾

"যদি তাদের কোনো কল্যাণ হয় তাহলে তারা বলে, এতো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর কোনো ক্ষতি হলে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ হতে। বলে দাও, সবকিছুই হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। লোকদের কী হয়েছে, কোনো কথাই তারা বুঝতে চেষ্টা করে না"। (সূরা আন নিসা: ৭৮)

এমনি সকল যুগেই মুশরিকদের দীন একই রকম। তাদের অন্তর ও মন উল্টে গেছে। ফলে যারা কল্যাণের উৎস, তাদেরকেই খারাপ মনে করছে। নাবী-রসূলগণ কল্যাণের পথনির্দেশক হওয়া সত্ত্বেও তরা তাদেরকে অকল্যাণের কারণ মনে করেছে। তাদের ভিতরে গোমরাহী চেপে বসা তাদের সৃষ্টিগত স্বভাব নষ্ট হয়ে যওয়ার কারণেই এমনটি হয়েছে। অন্যথায় কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়টিই আল্লাহর ফায়ছালা ও নির্ধারণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও ইলম অনুযায়ী উভয়টি হয়ে থাকে। অকল্যাণ হয়ে থাকে তার হিকমতের দাবি অনুসারে এবং কল্যাণ হয়ে থাকে তার অনুগ্রহে। তার অপার অনুগ্রহ এবং আনুগত্যের বিনিময় স্বরূপ তিনি কল্যাণ দান করেন। তার আদল-ইনসাফের কারণেই তার থেকে অকল্যাণ ও পাপাচারের বিনিময় স্বরূপ শাস্তি এসে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾

"হে মুহাম্মাদ! যে কল্যাণই তুমি লাভ করে থাকো না কেন, তা আল্লাহর দান এবং যে বিপদ তোমার উপর আপতিত হয় তা তোমার নিকট থেকেই"।[৬৩] (সূরা আন নিসা: ৭৯)

التطير শিরক হওয়ার আরেকটি কারণ হলো এতে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের প্রতি কল্যাণ-অকল্যাণের সম্বন্ধ করা হয় এবং এমন সৃষ্টি থেকে ক্ষতি হওয়ার আক্বীদা পোষণ করা হয়, যে নিজেই নিজের কল্যাণ কিংবা ক্ষতি করার মালিক নয়। এটি শিরক হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, শয়তানই মানুষের অন্তরে এ ধরনের আক্বীদা, আশঙ্কা ও কুমন্ত্রণা ঢেলে দেয়। আর শুভাশুভ ও কল্যাণ-অকল্যাণের ধারণা যেহেতু অন্তরের ভয়-ভীতির কারণেই হয়ে থাকে, তাই এটি আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থি।

প্রিয় মুসলিম ভাইগণ! রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম التطير বা কুলক্ষণের ধারণা করা থেকে সতর্ক করতে গিয়ে যা বলেছেন, তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন! ইমাম বুখারী আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

[৬৩] কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হতে। কিন্তু এরা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির স্বল্পতা, মূর্খতা এবং যুলুম-অত্যাচারের আধিক্যের কারণে তা বুঝে না। আর এখানে অকল্যাণকে বান্দার প্রতি সম্বন্ধ করার কারণ হলো বান্দার ভুলের কারণেই শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ সেটা তার উপর নির্ধারণ করেন।

«لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامَةَ وَلا صَفَر»

"রোগের কোনো সংক্রমণ শক্তি নেই, পাখি উঁড়িয়ে কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করারও কোনো ভিত্তি নেই। 'হামাহ' তথা হুতুম পেচাঁর ডাক শুনে অশুভ নির্ধারণ করা ভিত্তিহীন। সফর মাসের বিশেষ কোনো প্রভাব নেই"।[৬৪]

বুখারী ও মুসলিমে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا ومَاالفَالُ؟ قال الْكَلِمَةُ الْطَّيِّبَةُ»

"সংক্রামক ব্যাধি আর কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে আমি 'ফাল' পছন্দ করি। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফাল' কী? তিনি বললেন, 'উত্তম কথা'।[৬৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে 'মারফু' হাদীছে বর্ণিত আছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ»

"তিয়ারাহ' বা পাখি উঁড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা শিরক"।[৬৬]

ছ্বহীহ মুসলিমে মুআবীয়া ইবনুল হাকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন,

ومنا أناس يتطيرون؟ فقال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنه

"আমাদের মধ্যে কি এমন লোক আছে, যারা কোনো সৃষ্টিকে কুলক্ষণ মনে করে? অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যখন তার মনে এ ধরনের কিছু অনুভব করে, তখন এমন ধারণা যেন তাকে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে বাধাগ্রস্ত না করে"।[৬৭]

এখানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, তিয়ারার মাধ্যমে যে লোক কষ্ট পায় এবং যাকে সে কুলক্ষণ মনে করে, এটি তার মন ও আক্বীদার মধ্যকার ধারণা মাত্র; যে জিনিসকে সে কুলক্ষণ মনে করছে, আসলে তাতে কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। সুতরাং তার ধারণা, ভয়-ভীতি এবং শিরকই কেবল তার মধ্যে কুলক্ষণের ধারণা ঢুকিয়ে দেয় ও তাকে প্রয়োজন পূরণে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখে। ফলে সে অপছন্দনীয় যা দেখে কিংবা শুনে তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রয়োজন পুরণে অগ্রসর হওয়া থেকে ফিরে আসে।

---

[৬৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৭০৭, অধ্যায়: কুষ্ঠরোগ, ইবনে মাজাহ হা/৩৫৩৯।

[৬৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২২৪।

[৬৬] ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৩৫৩৮, আবূ দাউদ হা/৩৯১০।

[৬৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৩৭।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতের জন্য দীনের সমস্ত বিষয় সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তিয়ারা বা কোনো কিছু থেকে অকল্যাণ হওয়ার ধারণা সম্পুর্ণ বাতিল হওয়ার কথাও বর্ণনা করেছেন। যাতে তারা জানতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলা কোনো জিনিসের মধ্যেই তাদের জন্য অশুভ রাখেন নি কিংবা তাদের জন্য সেটাতে অকল্যাণের কোনো নির্দেশনা দেন নি অথবা তারা যাকে ভয় করছে করছে তাকে আল্লাহ তা‘আলা ভয়ের কারণ হিসাবেও নির্ধারণ করেননি।

তিনি সৃষ্টি থেকে অশুভ ও অকল্যাণ হওয়ার ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে নাকোচ করেছেন, যাতে করে আল্লাহ তা‘আলা যে তাওহীদ দিয়ে নাবী-রসূলদের পাঠিয়েছেন, যে তাওহীদসহ আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করেছন এবং যার জন্য আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, তা বাস্তবায়ন করে মানুষের অন্তর শান্ত হয় এবং তাদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। সুতরাং তিনি তাদের অন্তর থেকে শিরকের মূলোৎপাটন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাওহীদের মজবুত হাতলকে আঁকড়ে ধরবে, সেটার শক্ত রশি ধারণ করবে এবং আল্লাহ তা‘আলার উপর ভরসা করবে, তার অন্তরে তিয়ারার ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার আগেই সেটা কেটে ফেলতে পারবে এবং সেটা পূর্ণতায় পৌঁছার আগেই মন থেকে তার জল্পনা-কল্পনা উচ্ছেদ করতে পারবে। ইকরিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

«كُنَّا جلوسا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَمَرَّ طائر يَصِيحُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: خَيْرٌ خَيْرٌ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا خَيْرَ وَلَا شَرَّ» المجالسة وجواهر العلم

“একদা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় একটি পাখি ডাকাডাকি করতে করতে অতিক্রম করছিল। তখন এক লোক বললো, ভাল হোক! ভালো হোক! আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তখন বললেন, ভালো বা খারাপ কোনটাই না হোক।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাদের কথার দ্রুত প্রতিবাদ করলেন। যাতে করে কল্যাণ ও অকল্যাণের ব্যাপারে ঐ পাখির কোনো প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস না করা হয়। সমস্ত মাখলুকের ক্ষেত্রে কথা একই। কোনো মাখলুকই মানুষের জন্য কল্যাণ আনয়ন করতে পারে না কিংবা অকল্যাণ প্রতিরোধ করতে পারে না।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَيُعْجِبُنِى الْفَأْلُ

“তবে আমি ‘ফাল’ পছন্দ করি” (ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৭৫৬)।

অতঃপর ফালের ব্যাখ্যায় বললেন যে, সেটা হলো উত্তম কথা। ফালকে পছন্দ করার কারণ হলো, তাতে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করা হয়। আর বান্দাকে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আর তিয়ারার

মধ্যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা হয় এবং বালা-মুছীবতের কারণ মনে করা হয়। এ জন্যই উভয়ের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে কল্যাণের আশা করবে, তখন অন্তর দিয়ে তার সাথে সম্পর্ক কায়েম করবে এবং তার উপরই ভরসা করবে। আর যখন তারা আল্লাহ তা'আলার উপর আশা-ভরসা ছেড়ে দিবে, তখন এটাই তাদেরকে শিরক এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের উপর ভরসা করার দিকে নিয়ে যাবে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ফাল পছন্দ করা ও সেটাকে ভালোবাসার মধ্যে শিরকের কিছু নেই; বরং এটি মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের দাবির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সেই সঙ্গে এটি মানুষের ফিতরাতেরও দাবি, যা সবসময় তার অনুকূল ও উপযোগী জিনিসের দিকে ধাবিত হয়। যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবীদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রী থেকে তার কাছে নারী ও সুঘ্রাণ সর্বাধিক পছন্দনীয় করে দেয়া হয়েছে। তিনি মিষ্টি ও মধুও পছন্দ করতেন। তিনি সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত এবং মধুর সুরে আযান দেয়া পছন্দ করতেন। তিনি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি এবং সুমহান বৈশিষ্ট্যগুলো পছন্দ করতেন।

মোটকথা, তিনি পূর্ণতার গুণাবলি পছন্দ করতেন। এমনি যেসব বৈশিষ্ট্য মানুষকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যায় তিনি তাও পছন্দ করতেন। আল্লাহ তা'আলা মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভালো নাম শুনে খুশি হওয়া, ভালো নাম পছন্দ করা এবং ভালো নামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার স্বভাব স্থাপন করেছেন।

মানুষ الفلاح 'ফালাহ' (সফলতা), السلام 'সালাম' (শান্তি-নিরাপত্তা), النجاح 'নাজাহ' (কৃতকার্যতা) التهنئة 'তাহনিআহ' (মুবারকবাদ), البشرى 'বুশরাহ' (সুখবর), الفوز ফাউয, (বিজয়), الظفر যাফ্‌র (ধন্য হওয়া) ইত্যাদি নাম শুনে খুশী হয় এবং আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করে। এ শব্দগুলো উচ্চারণের আওয়াজ মানুষের কানে পৌঁছার সাথে সাথেই তার অন্তর খুশি হয়, বক্ষ প্রশস্ত হয় এবং হৃদয় শক্তিশালী হয়। আর যখন এগুলোর বিপরীত শুনে, তখন তার অন্তরে বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং সেটাকে চিন্তিত করে তুলে এবং তাতে ভয়-ভীতি, অশুভ ধারণা, সংকোচন, বিষন্নতা ইত্যাদির সৃষ্টি করে। ফলে সে তার প্রয়োজন পূরণের ইচ্ছা পরিহার করে এবং ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তার ঈমানে ঘাটতি আসে এবং কখনো শিরকের লিপ্ত হয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের কথা এখানেই শেষ।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

«مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ»

"কুলক্ষণের ধারণা যাকে প্রয়োজন পুরণে বাধা দিল সে শিরক করল। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, এর কাফ্‌ফারা কী? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা এ দু'আ পড়বে,

«اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

"হে আল্লাহ! তোমার কল্যাণ ব্যতীত অন্য কোনো কল্যাণ নেই। তোমার অমঙ্গল ছাড়া কোনো অমঙ্গল নেই।[৬৮] আর তুমি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই"।[৬৯]

সুতরাং এ হাদীছ থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে তিয়ারাকে অপছন্দ করে এবং আপন কাজে দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হয় সেটা তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু যে ইখলাছের সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করে না; বরং শয়তানের পথে চলে, সে অপছন্দনীয় কাজের শিকার হয়। কেননা সে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের দাবি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

তিয়ারা সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনাটি ভালোভাবে বুঝা উচিত। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তার প্রতি পূর্ণ ঈমান ও তার উপর পরিপূর্ণ ভরসা দান করেন এবং অকল্যাণের সকল পথ ও শিরক থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা এবং সাড়াদানকারী।

سابعا: التنجيم

সপ্তমত: জ্যোতির্বিদ্যা

কোনো কোনো গবেষক বলেছেন, মহাশূণ্যের বিভিন্ন অবস্থার মাধ্যমে যমীনের ঘটনাসমূহের উপর দলীল গ্রহণ করাকে التنجيم বা জ্যোতির্বিদ্যা বলা হয়। যেমন জ্যোতিষীরা দাবি করে যে, তারা বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময়, ঝড় ও অন্যান্য দূর্যোগ

---

[৬৮] প্রাচীন আরবদের মধ্যে একটি বদ অভ্যাস ছিল যে, তারা যখন সফরে বের হত অথবা কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য ঘর থেকে বের হত, তখন পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতো এবং যাত্রা শুভ হবে কি না তা যাচাই করত। পাখিটি যদি ডান দিকে উড়ে যেত, তাহলে তারা শুভ লক্ষণ মনে করত এবং যাত্রা অব্যাহত রাখত। আর যদি পাখি বাম দিকে উড়ে যেত, তাহলে কুলক্ষণ মনে করত এবং সফরে অমঙ্গল হবে মনে করে বাড়ীতে ফিরে আসত। এই কাজকে তিয়ারা বলা হয়। 'তিয়ারাহ' শব্দটি طير থেকে। طير অর্থ পাখি। পাখি উড়িয়ে যেহেতু তারা ভাগ্য পরীক্ষা করতো, তাই তাদের এই কাজকে তিয়ারাহ বলা হয়েছে। পরবর্তীতে যে কোনো বস্তুর মাধ্যমে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করার প্রচেষ্টাকেই তিয়ারা হিসাবে নাম করণ করা হয়েছে। ইসলাম এই ধারণার মূলোৎপাটন করেছে। ইসলাম সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে, পাখির ডান দিকে অথবা বাম দিকে চলাচলের মধ্যে কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ নেই। কল্যাণ এবং অকল্যাণের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

[৬৯]. মুসনাদে আহমাদ। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: হা/১০৬৫।

শুরু হওয়ার সময়, বৃষ্টি হওয়ার সময়[৭০], গরম বা ঠান্ডা শুরু হওয়ার সময়, দ্রব্যমূল্য পরিবর্তন হওয়ার সময়, রোগ-ব্যাধি, মহামারি ও মৃত্যুর সময় এবং শুভ সময় কিংবা অশুভ সময় ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত রয়েছে। এটাকে علم التأثير বা প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত বিদ্যাও বলা হয়। এটি দুই প্রকার।

(১) জ্যোতিষীরা দাবি করে যে, আসমানের তারকাগুলো নিজস্ব ইচ্ছাতেই ক্রিয়াশীল। এগুলোর প্রভাবের ফলেই পৃথিবীর কার্যাবলী পরিচালিত হয়। মুসলিমদের ঐক্যমতে এটি কুফুরী। কেননা এতে বিশ্বাস করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আরো স্রষ্টা রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার সাম্রাজ্যের মধ্যে তার ইচ্ছা ব্যতিরেকেই অন্যরা কর্তৃত্ব করে থাকে।

(২) তারা বলে থাকে, তারকার চলাচল, এগুলো একত্রিত হওয়া এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া যমীনের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের প্রমাণ করে। এ রকম বিশ্বাস পোষণ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা এতে ইলমুল গায়েবের দাবি করা হয়। অন্যদিক থেকে এটি যাদুও বটে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ»

"যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কিছু অংশ শিখল, সে যাদু বিদ্যারই একটি শাখা শিখলো। জ্যোতির্বিদ্যা যে যত বেশি শিখলো, সে যাদুও তত বেশি শিখলো"।[৭১] হাদীছের সনদ ছ্বহীহ। ইমাম নববী ও যাহাবী ছ্বহীহ বলেছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং অন্যরাও হাদিছটি বর্ণনা করেছেন।

কুরআন, হাদীছ এবং মুসলিমদের ঐক্যমতে যাদু করা, যাদু শিক্ষা করা এবং সেটা শিক্ষা দেয়া হারাম। তারকার চলাচলকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কে খবর দেয়ার মধ্যে গায়েবের এমন খবর জানার দাবি করা হয়, যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিশেষিত করেছেন। এখানে আল্লাহ তা'আলার খাছ ইলমের মধ্যে অংশীদারিত্বের দাবি করা হয় অথবা যারা এটি দাবি করে তাদেরকে সত্যায়ন করা হয়। এটি তাওহীদের পরিপন্থি। কারণ এতে রয়েছে একটি অন্যায় দাবি।

---

[৭০] তবে আবহাওয়া অফিস ঝড়-বৃষ্টি হওয়া বা শৈত প্রবাহের যেই পূর্বাভাস দেয়, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা আকাশে মেঘের লক্ষণ দেখে অথবা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বৃষ্টি বা ঝড়ো হাওয়ার আলামত পেয়েই আবহাওয়া অফিস পূর্বাভাস দেয়। তাই এটি গায়েবের অন্তর্ভুক্ত নয়।

[৭১] আবু দাউদ, অধ্যায়: জ্যোতির্বিদ্যা। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) ছ্বহীহ বলেছেন, দেখুন: ছ্বহীহুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, হা/৩০৫১।

ইমাম খাত্তাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, সৃষ্টির মধ্যে ভবিষ্যতে যেসব ঘটনা ঘটবে বলে জ্যোতিষীরা দাবি করে, আলেমদের নিকট সেটা নিষিদ্ধ ইলমুত তানজীম হিসাবে প্রসিদ্ধ। যেমন তারা বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময় জানার দাবি করে, বৃষ্টি বর্ষণের সময় ও স্থানসমূহ জানার দাবি করে, দ্রব্যমূল্য পরিবর্তন হওয়ার দাবি করে এবং তারা এমনি আরো অনেক বিষয়ের দাবি করে। তারা দাবি করে যে, কক্ষপথে গ্রহ-নক্ষত্র ও তারকার চলাচল, সেটা একসাথে মিলিত হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারলে উপরোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়। তারা দাবি করে যে, পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহে আসমানের গ্রহ-নক্ষত্র ও তারকারাজির প্রভাব রয়েছে। এটি তাদের গায়েবের খবর দাবি এবং এমন ইলমের দাবি করার শামিল, যা কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্যই খাছ। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না।

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তার ছ্বহীহ গ্রন্থে বলেন, কাতাদাহ বলেছেন,

«خَلَقَ اللهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلاَثٍ جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَعَلاَمَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ»

"আল্লাহ তা'আলা এসব নক্ষত্র তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, আকাশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য, শয়তানকে বিতাড়িত করার জন্য এবং পথিকদের দিশা পাওয়ার জন্য। যে ব্যক্তি এসব উদ্দেশ্য ছাড়া ভিন্ন ব্যাখ্যা করলো সে ভুল করলো, তার ভাগ্য নষ্ট করলো এবং যে বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই, তা জানার চেষ্টা করলো।

খতীব বাগদাদী (রহিমাহুল্লাহ) কাতাদাহ থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলার শরী'আত সম্পর্কে বেশ কিছু অজ্ঞ লোক আসমানের তারকাগুলো থেকে জ্যোতির্বিদ্যা তৈরী করেছে। তারা বলে অমুক অমুক তারকা উদিত হওয়ার পর বাসর করলে এমন এমন হবে এবং অমুক অমুক তারকা উদিত হওয়ার পর ভ্রমণ করলে এমন এমন হবে।

আমার জীবনের শপথ![৭২] তারা আরো বলে যে, এমন কোনো তারকা নেই, যার কারণে কোনো না কোনো লাল, কালো, লম্বা, খাটো, সুদর্শন কিংবা কুৎসিত মানুষ জন্ম গ্রহণ করে না। অথচ এ তারকাগুলো, কিংবা এ প্রাণীগুলো অথবা এ পাখিগুলো গায়েবের কোনো খবর জানে না। কেউ যদি গায়েবের খবর জানতো, তাহলে আদম 'আলাইহিস সালাম জানতেন। আল্লাহ তাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, ফেরেশতাদেরকে তার উদ্দেশ্যে সেজদা করিয়েছেন এবং তাকে প্রত্যেক জিনিসের নাম শিখিয়েছেন।

শাইখ বলেন, আমি বলছি, এমনি আরো অনেক কুসংস্কার রয়েছে, যা মিথ্যুকরা পত্র-পত্রিকায় প্রচার করে থাকে। যেমন রাশিচক্র ও নক্ষত্রের হিসাব করে তারা সুখ-দুঃখ,

[৭২] এই বাক্যটি আরবদের জবানে উচ্চারিত হলেও এর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম উদ্দেশ্য নয়। এটি ভাষাগত রীতি মাত্র। সাধারণত তাদের ভাষায় এ জাতীয় কথার প্রচলন রয়েছে। এতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কসমের সন্দেহ থাকায় অনেক আলেমই এই রীতিকে অপছন্দ করেছেন।

দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য ইত্যাদি সম্পর্কে খবর দিয়ে থাকে। কতিপয় সহজ-সরল মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করে থাকে।

শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে হাসান (রহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল মাজীদে বলেন, যদি বলা হয় যে, জ্যোতিষীদের কথা তো মাঝে মাঝে সত্য হয়। এর জবাব হলো তাদের কথা সত্য হওয়া গণকের কথা সত্য হওয়ার মতোই। তার একটি কথা সত্য হলেও ১০০টি মিথ্যা হয়। একটি কথা সত্য হওয়া ইলমুল গায়েব জানার কারণে নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণ অনুপাতেই হয়ে থাকে; তার সাথে গণকের কথা মিলে যায় মাত্র।[৭৩] এতে করে যে ব্যক্তি তার কথায় বিশ্বাস করে তার জন্য এটি ফিতনার কারণ হয়।

শাইখ আরো বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত একাধিক হাদীছ ইলমুত তানজীম তথা জ্যোতির্বিদ্যাকে বাতিল করে দিয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন,

«مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ»

"যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কিছু অংশ শিখল, সে যাদু বিদ্যারই একটি শাখা শিখলো। জ্যোতির্বিদ্যা যে যত বেশি শিখলো, সে যাদুও বেশি শিখলো"।[৭৪] ইমাম ইবনে মাজাহ, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং অন্যরা হাদিছটি বর্ণনা করেছেন।

রাজা ইবনে হাইওয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের উপর যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তা হলো যমীনের ঘটনাসমূহে আকাশের তারকার প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস, তাক্বদীর অস্বীকার এবং শাসকদের যুলুম-নির্যাতন। ইবনে হুমায়েদ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে জলে ও স্থলে ভ্রমণ করার সময় দিক নির্দেশনার জন্য তারকার সাহায্য নেয়া জায়েয আছে। এটি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের মধ্যে গণ্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾

"তিনি তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃজন করেছেন- যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথপ্রাপ্ত হও। (সূরা আন আনআম: ৯৭)

অর্থাৎ সেগুলো দ্বারা তোমরা যেন ভ্রমণের দিক নির্ণয় করতে পারো। উদ্দেশ্য এ নয় যে, এগুলো দ্বারা ইলমুল গায়েব অনুসন্ধান করবো। যেমন ধারণা করে থাকে জ্যোতিষীরা।

---

[৭৩] কথায় বলে, ঝড়ে বক মরে ফকীরের কারামতি বাড়ে।

[৭৪] আবু দাউদ, অধ্যায়: জ্যোতির্বিদ্যা। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) ছ্বহীহ বলেছেন, দেখুন: ছ্বহীহুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, হা/৩০৫১।

ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, কিবলার দিক নির্ধারণ করার জন্য তারকা দ্বারা নির্দেশনা গ্রহণ করা বৈধ। কেননা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আলেমগণ গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে এ তারকাগুলোকে কিবলার দিক নির্ধারণের জন্য ঠিক করেছেন।

তারকা সম্পর্কিত বিদ্যার মাধ্যমে কিবলার দিক নির্ধারণ করা হয়, সেটি হচ্ছে ঐ সমস্ত অভিজ্ঞ ইমামদের কাজ, যাদের দীনী খেদমতে আমরা কোনো প্রকার সন্দেহ করি না এবং তারকার চলাচল ও গতি সম্পর্কে তারা যে সংবাদ দেন তার সত্যতা অস্বীকার করি না। তারা কিবলার দিক কাবার কাছে থাকা অবস্থায় যেভাবে দেখেন, দূরে থাকা অবস্থায় ঠিক সেভাবেই দেখেন।

সুতরাং দূর থেকে কিবলা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অর্জন করা কাবাকে দেখার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের মতোই। আর তাদের খবরকে গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরাও কিবলার দিক জানতে পারি। কেননা দীনের বিষয়াদিতে আমাদের কাছে তাদের খেদমত প্রশ্নবিদ্ধ নয় এবং তারা আকাশের তারকা ও নক্ষত্ররাজি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রেও কোনো প্রকার ত্রুটি করেননি।

ইমাম ইবনে রজব বলেন, তারকাসমূহের চলাচল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু যে ইলমের মধ্যে দাবি করা হয় যে, পৃথিবীর ঘটনাবলীতে তারকার প্রভাব রয়েছে, তা শিক্ষা করার অনুমতি নেই। যেমন বর্তমানের জ্যোতিষীরা দাবী করে থাকে। এ ধরনের ইলম অর্জন করা নিষেধ। তা কম হোক বা বেশি হোক। কিন্তু অন্ধকার রাতে পথ চলার জন্য, কিবলা নির্ধারণ করার জন্য এবং রাস্তা চেনার জন্য প্রয়োজন অনুপাতে ইলমুত্ তাস্য়ীর তথা তারকা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা অধিকাংশ আলেমের নিকট জায়েয।

ঠিক তেমনি কিবলা, ছ্বলাতের সময়সূচি, বিভিন্ন ঋতু, পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলার সময় সম্পর্কে জানার জন্য চন্দ্র-সূর্যের মঞ্জিল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা জায়েয আছে। ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, চোখ দিয়ে দেখে ইলমুন নুজুম সম্পর্কে যে বিদ্যা অর্জন করা হয়, যার মাধ্যমে পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে যাওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় এবং কিবলার দিক জানা যায়, তা নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। ছায়া পর্যবেক্ষণ করে যা জানা যায়, তা হলো সকাল বেলা কোনো কিছুর ছায়া ধীরে ধীরে ছোট হওয়ার অর্থ হলো পূর্ব দিগন্ত হতে সূর্য আসমানের মধ্যভাগে উঠছে। এক পর্যায়ে ছায়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন পুনরায় বৃদ্ধি হওয়া শুরু করে, তখন সূর্য মধ্য আকাশ থেকে পশ্চিম দিগন্তের দিকে নামতে শুরু করে। এ প্রকার ইলম তো চোখে দেখেও অর্জন করা যায়। তবে লোকেরা এ ইলমটি এখন যন্ত্রপাতির সাহায্যে অর্জন করছে। এতে দৃষ্টি দেয়ার মাধ্যমেই এখন সূর্যের অবস্থান, ছ্বলাতের সময়সূচী ও ছায়ার লম্বা-খাটো, সূর্য ঠিক মাথার উপরে, না কি পূর্বাকাশে না কি পশ্চিমাকাশে তা বুঝা যায়।

ইমাম ইবনুল মুনযির মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি চন্দ্রের মঞ্জিল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করাকে দোষণীয় মনে করতেন না।

পরিশেষে বলতে চাই যে, মুসলিমদের আক্বীদা হলো তাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এর মাধ্যমেই তাদের নাজাত ও সৌভাগ্যের ফায়ছালা হবে। সুতরাং যেসব বিষয় আক্বীদাকে নষ্ট করে দেয় কিংবা তাতে শিরক, কুসংস্কার ও বিদ'আত ঢুকিয়ে দেয়, তা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। এতে করে তার আক্বীদা পরিষ্কার ও উজ্জ্বল থাকবে। আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং সালাফদের মানহাজ আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই আক্বীদা সংরক্ষণ করা সম্ভব। সঠিক আক্বীদা শিক্ষা করা এবং সেটার পরিপন্থি ভ্রান্ত আক্বীদাগুলো জানা ব্যতীত কেউ ছ্বহীহ আক্বীদার উপর থাকতে পারবে না। বিশেষ করে বর্তমানে মুসলিমদের কাতারে এমন অনেক লোক ঢুকে পড়েছে, যারা প্রয়োজন পূরণের আবেদন নিয়ে এবং বিপদাপদ দূর করার জন্য মিথ্যুক, ভেলকিবাজ ও ফাঁকিবাজদের কাছে যায়। তারা কবর ও সমাধিস্থলের উপরও ভরসা করে। পূর্বযুগের মুশরিকরা যেমন শিরকের উপর ছিল, সাম্প্রতিক কালের নামধারী মুসলিমগণ অনুরূপ শিরকের চর্চায় লিপ্ত। এমনকি তাদের চেয়ে এক শ্রেণির মুসলিমদের শিরক অধিক ভয়াবহ। সেই সঙ্গে তারা নেতা, আলেম এবং ছূফী তরীকার পীরদেরকে আল্লাহর বদলে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে। এরা তাদের অনুসারীদের জন্য এমন দীন তৈরী করে, যার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা দেননি।

ثامنا: الاستسقاء بالأنواء

অষ্টমতঃ তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা

তারকা উদিত হওয়া কিংবা অস্ত যাওয়ার দিকে বৃষ্টি বর্ষণের সম্বন্ধ করাকে, الاستسقاء بالأنواء বলা হয়। অন্ধকার যুগের মুশরিকরা বিশ্বাস করতো যে, তারকা উদিত হওয়া কিংবা অদৃশ্য হওয়ার কারণে বৃষ্টি হয়। তারা বলতো, 'অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে আমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি। نوء শব্দের মাধ্যমে তারা তারকা উদ্দেশ্য করতো। তারকাকে তারা نوء দ্বারা ব্যাখ্যা করতো। মূলত এর অর্থ হলো তারকা উদিত হওয়া। যেমন বলা হয় ناء ينوء উদিত হলো। এ কথা ঠিক ঐ সময় বলা হয়, যখন উঠে দাঁড়ায় এবং ছুটে যায়। তারা বলতো, যখন অমুক তারকা উদিত হবে, তখন বৃষ্টি হবে।

আরবরা أنواء দ্বারা চন্দ্রের ২৮টি মঞ্জিল উদ্দেশ্য করতো। প্রত্যেক তের রাতে ফজরের সময় একটি করে মঞ্জিল লোপ পায় এবং তার বদলে আরেকটি উদিত হয়। চন্দ্র বছরের শেষে সবগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়। জাহেলী যুগে আরবরা ধারণা করতো ফজরের সময় যখন একটি উদিত হয় এবং অন্য একটি অস্ত যায়, তখনই বৃষ্টি হয়। একেই তারা বলতো,

তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা। এর অর্থ হলো তারা বৃষ্টিকে এসব উদীয়মান তারকার প্রতি সম্বন্ধ করতো। এটি ছিল জাহেলী যুগের আরবদের বিশ্বাস। ইসলাম এসে এ বিশ্বাসকে বাতিল করে দিয়েছে এবং তা থেকে নিষেধ করেছে। কেননা বৃষ্টি অবতীর্ণ হওয়া কিংবা না হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, নির্ধারণ ও হিকমতের উপর নির্ভরশীল। এতে তারকা উদয়ের কোনো প্রভাব নেই।

আল্লাহ তা'আলা আয়াতগুলো নাযিল করেন,

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠) أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (٨١) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾

"অতএব, আমি তারকারাজির ভ্রমণ পথের শপথ করছি, নিশ্চয় এটি বড় শপথ যদি তোমরা জানতে পারো। নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন, যা সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। পবিত্রগণ ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করতে পারে না। এটি বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তবুও কি তোমরা এ বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করছো? এ নিয়ামতে তোমরা নিজেদের অংশ এই রেখেছো যে, তোমরা তা অস্বীকার করছো। (সূরা ওয়াকিয়া: ৭৫-৮২)

আল্লাহ তা'আলার বাণী, "এ নেয়ামতে তোমরা নিজেদের অংশ এ রেখেছো যে, তোমরা তা অস্বীকার করছো" -এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ বৃষ্টির সম্বন্ধ তারকার দিকে এভাবে করা যে, مطرنا بنوء كذا وكذا আমরা অমুক অমুক তারকার কারণে বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি। এটি সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও অপবাদের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, তিরমিযী হাসান সূত্রে, ইবনে জারীর, আবু হাতিম এবং ইমাম যিয়াউদ্দীন মাকদেসী স্বীয় কিতাব মুখতারায় আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর বাণী,تجعلون رزقكم তোমাদের নিয়ামতের অংশকে অর্থাৎ আল্লাহর শুকরিয়াকে তোমরা এই করেছ যে, তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো। তোমরা বলে থাক যে, অমুক অমুক তারকার কারণে আমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি।

শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে, তাই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। আলী, ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, যাহ্হাক, আতা আল-খোরাসানী এবং অন্যান্য আলেম থেকে উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। এটিই অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতো। শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে হাসানের কথা এখানেই শেষ।

আবু মালেক আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ»

“জাহেলী যুগের চারটি কু-স্বভাব আমার উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, যা তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারবে না। (এক) আভিজাত্যের অহংকার করা। (দুই) বংশের বদনাম করা। (তিন) নক্ষত্ররাজির মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা এবং (চার) মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা। তিনি আরও বলেন, ‘মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিনী মৃত্যুর পূর্বে যদি তাওবা না করে, তাহলে ক্বিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে, তার পরনে থাকবে আলকাতরার প্রলেপযুক্ত লম্বা পায়জামা এবং খোস-পাঁচড়াযুক্ত কোর্তা।[৭৫]

জাহেলী যুগ বলতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বের যুগ উদ্দেশ্য। তার আনীত দীনের পরিপন্থি প্রত্যেক বিষয়ই জাহেলীয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, মানুষ জাহেলীয়াতের কতক স্বভাব ছাড়তে পারবে না। যারা তা ছাড়তে পারবে না, তাদের নিন্দাবাদ বর্ণনা করতে গিয়েই তিনি এ কথা বলেছেন। হাদীছের দাবি হলো, জাহেলীয়াতের প্রত্যেক কথা ও কাজই দীন ইসলামের মধ্যে নিন্দিত। তা না হলে এগুলোকে জাহেলীয়াতের দিকে সম্বন্ধ করে নিন্দা করা হতোনা। সুতরাং জানা গেলো, নিন্দা করণার্থেই উপরোক্ত কাজগুলোর সম্বন্ধ জাহেলীয়াতের দিকে করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

“তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না”। (সূরা আল আহযাব: ৩৩)

এখানে জাহেলী যামানার নারীদের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করে বের হওয়ার নিন্দা করা হয়েছে এবং জাহেলী যুগের লোকদেরও নিন্দা করা হয়েছে। এ নিন্দার দাবী হচ্ছে জাহেলী যুগের লোকদের সাদৃশ্য করা নিষিদ্ধ। শাইখুল ইসলামের বক্তব্য এখানেই শেষ।

الاستسقاء بالأنواء। তারকাজির মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা: এর অর্থ হলো তারকার দিকে বৃষ্টির সম্বন্ধ করা। نوء অর্থ হলো তারকা অস্তমিত হওয়া। যেমন কোনো মানুষ বললো, আমরা অমুক অমুক তারকা অস্তমিত হওয়ার মাধ্যমে বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি।

[৭৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৩৪, অধ্যায়: বিলাপ করার ভয়াবহতা।

الاستسقاء بالأنواء। তারকাজির মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করার হুকুম: যদি বিশ্বাস করা হয় যে, বৃষ্টি বর্ষণে নক্ষত্রের প্রভাব রয়েছে তাহলে এমন বিশ্বাস কুফুরী ও বড় শিরক। জাহেলী যামানার মুশরিকরা এ বিশ্বাসই করতো। আর যদি বিশ্বাস করা হয় যে, বৃষ্টি বর্ষণে তারকার নিজস্ব কোনো প্রভাব নেই; বরং আল্লাহই একমাত্র বৃষ্টি বর্ষণকারী, তবে আল্লাহ তা'আলা একটি নিয়ম করেছেন যে, অমুক তারকা অস্তমিত হবার সময় বৃষ্টি হবেই তাহলে এ বিশ্বাস বড় শিরক পর্যন্ত পৌঁছবে না। কিন্তু ছোট শিরকের পর্যায়ে পড়বে। কেননা তারকার দিকে বৃষ্টি বর্ষণের সম্বন্ধ করা হারাম। শিরকের দরজা বন্ধ করণার্থে রূপকার্থেও এটি নিষিদ্ধ।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম যায়েদ ইবনে খালেদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

«صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ « هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ » قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ « أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِى وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِى وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِى وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ»

"রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়াতে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের ছ্বলাত পড়লেন। সে রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। ছ্বলাত শেষে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কি জানো তোমাদের প্রভু আজ রাতে কী বলেছেন? লোকেরা বললো আল্লাহ ও তার রসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, আজ সকালে আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমানদার হয়েছে আবার কেউ কাফের হয়েছে। যে ব্যক্তি বলেছে, 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর বৃষ্টি বর্ষণে নক্ষত্রের প্রভাবকে অস্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলেছে, 'অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমাকে অস্বীকার করেছে আর নক্ষত্রের প্রতি ঈমান এনেছে"।[৭৬]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি, আল্লাহ বলেছেন, আজ সকালে আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমানদার হয়েছে আবার কেউ কাফের হয়েছে। এখানে মুমিনের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বৃষ্টি বর্ষণকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের দিকে সম্বন্ধ করে, সে মুমিন। আর যে বৃষ্টিকে তারকার দিকে সম্বন্ধ করে তাকে কাফের হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এতে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহর কাজকে অন্যের দিকে সম্বন্ধ করা জায়েয নয়। এটি নিঃসন্দেহে কুফুরী। মানুষ যদি বিশ্বাস করে, বৃষ্টি বর্ষণে তারকার প্রভাব রয়েছে, তাহলে এটি বড় কুফুরী। কেননা এতে আল্লাহর রুবূবীয়াতে শিরক করা হয়। মুশরিকও কাফেরের অন্তর্ভুক্ত।

---

[৭৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৪৬, অধ্যায়: হুদায়বিয়ার যুদ্ধ।

আর যদি বিশ্বাস করা হয় যে, বৃষ্টি বর্ষণে তারকার কোনো প্রভাব ও ক্ষমতা নেই, বৃষ্টিকে তারকার দিকে কেবল রূপকার্থে সম্বন্ধ করা হয়েছে, তাহলে এটিও হারাম হবে এবং ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা সে আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের সম্বন্ধ অন্যের দিকে করেছে।

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, পূর্বাকাশে যখন একটি তারকা উদিত হতো এবং পশ্চিমাকাশে অন্য একটি তারকা অস্তমিত হতো, তখন বৃষ্টিপাত হলে কিংবা বাতাস প্রবাহিত হলে প্রাচীন আরবদের কেউ কেউ উদিত তারকার দিকে আবার কেউ কেউ অস্তমিত তারকার দিকে বৃষ্টিপাতের সম্বন্ধ করতো। এভাবে সম্বন্ধ করতো যে, এগুলোই বৃষ্টি তৈরী, উদ্ভাবন ও বর্ষণ করে। তারা হাদীছে উল্লেখিত কথাটি ব্যবহার করে থাকে। তাই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত বাক্য প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছেন। যাতে করে কেউ জাহেলী যুগের লোকদের অনুরূপ আক্বীদা পোষণ না করে এবং কথা-বার্তায় তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ না করে। ইমাম কুরতুবীর বক্তব্য এখানেই শেষ।

ইমাম মুসলিম আল্লাহ তা'আলার বাণী উল্লেখ করে বলেন:

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠) أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (٨١) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾

"অতএব, আমি তারকারাজির ভ্রমণ পথের শপথ করছি, নিশ্চয় এটি বড় শপথ যদি তোমরা জানতে পারো। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। পবিত্রগণ ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করতে পারে না। এটি বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করছো? এ নেয়ামতে তোমরা নিজেদের অংশ এ রেখেছো যে, তোমরা তা অস্বীকার করছো। (সূরা ওয়াকিয়া: ৭৫-৮২)

এ আয়াতগুলোর শানে নুযুল সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, অমুক অমুক তারকার প্রভাব সত্য হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতগুলো নাযিল করেন।

সুতরাং বৃষ্টি বর্ষণ করা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাজ, তার শক্তি ও ক্ষমতাধীন। এতে কোনো সৃষ্টির প্রভাব নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ﴾

"তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করেছো কি? তোমরা কি তা মেঘ হতে বর্ষণ কর, না আমি বর্ষণ করি?" (সূরা আল ওয়াকিয়া: ৬৮-৬৯)

সুতরাং যে ব্যক্তি তারকাসমূহ কিংবা প্রাকৃতিক কারণ যেমন পৃথিবীর পরিবেশগত কারণ ও বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ সৃষ্টি হয় বলে ধারণা করে তারা মিথ্যা বলে এবং অপবাদ রটায়। এসব ধারণা বড় শিরক। আর যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলাই বৃষ্টি বর্ষণকারী, কিন্তু রূপকার্থে বৃষ্টির সম্বন্ধ এগুলোর প্রতি করে, তাহলে এটিও হারাম এবং ছোট কুফুরী। কেননা এতেও আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে নিয়ামতের সম্বন্ধ করা হয়। যেমন কেউ কেউ বলে থাকে অমুক অমুক তারকার মাধ্যমে আমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি।

এ বিষয়ে কতক সাংবাদিক এবং মিডিয়া কর্মীদের যথেষ্ট শৈথিল্য প্রদর্শন করতে দেখা যায়। মুসলিমদের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলাই তাওফীক দানকারী।

تاسعا: نسبة النعم إلى غير الله

নবম: আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দিকে নিয়ামতের সম্বন্ধ করা

ইতিপূর্বে তারকার প্রতি বৃষ্টির সম্বন্ধ করা এবং সেটার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করার হুকুম আলোচিত হয়েছে। এখন অন্যান্য নিয়ামত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দিকে সম্বন্ধ করার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করা এবং সেটার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আক্বীদার গভীরতম বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত প্রদানকারী। তাকে বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি অন্য কারো দিকে নিয়ামতের সম্বন্ধ করলো, সে কুফুরী করলো অথবা নিয়ামতকে গাইরুল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করার কারণে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾

"তারা আল্লাহর নিয়ামত চিনে, অতঃপর তা অস্বীকার করে তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ"। (সূরা আন নাহল: ৮৩)

কতিপয় মুফাস্‌সির এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা জানে যে, সমস্ত নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ হতে। আল্লাহ তা'আলাই তা দিয়ে তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। তারপরও তারা এটি অস্বীকার করে। তারা ধারণা করে যে, তারা তাদের বাপ-দাদাদের কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে এসব পেয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলে, অমুক না থাকলে এমন হতো না। কেউ কেউ বলে, এটি আমরা আমাদের মাবুদসমূহের সুপারিশের কারণে পেয়েছি। এভাবে যে যাকে সম্মান করে, সে তার দিকেই নিয়ামতের সম্বন্ধ করে। কেউ করে বাপ-দাদার দিকে, কেউ করে তাদের বাতিল মাবুদগুলোর দিকে এবং কেউ করে থাকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের দিকে। তারা ভুলে যায় নিয়ামতের প্রকৃত উৎস এবং সেটার প্রকৃত দাতা আল্লাহ তা'আলার কথা।

কিছু মানুষ আছে, যারা সাগর পথে ভ্রমণকালে নানা ঝুকি ও বিপদাপদ মুক্ত নিরাপদ ভ্রমণের নিয়ামতকে অনুকূল বাতাস এবং মাঝি-মাল্লার দক্ষতার দিকে সম্বন্ধ করে। তারা বলে বাতাস ছিল খুব ভালো এবং মাঝি-মাল্লারা ছিল খুব সুদক্ষ-অভিজ্ঞ। বর্তমানেও অনেক লোকের মুখে শুনা যায় যে, রাষ্ট্রীয় শান্তি-শৃঙ্খলা, সুখ-শান্তি ও জান-মালের নিরাপত্তাজনিত নিয়ামত বজায় থাকা এবং দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন-দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দূরিভুত হওয়াকে তারা সরকারের প্রচেষ্টা ও ব্যক্তি বিশেষের অবদান অথবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি-উন্নতি ইত্যাদির প্রতি সম্বন্ধ করে। যেমন তারা বলে থাকে, মেডিকেল সাইন্স অনেক উন্নতি লাভ করার কারণেই রোগ-ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে কিংবা তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছে। সরকারের অমুক অমুক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী দারিদ্র ও মূর্খতা দূর করেছে। অনুরূপ অন্যান্য বাক্য উচ্চারণ করা থেকে মুসলিমদের দূরে থাকা আবশ্যক এবং তা থেকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা চাই। সমস্ত নিয়ামতকে একমাত্র আল্লাহর দিকেই সম্বন্ধ করা উচিত এবং তার প্রশংসা করা চাই। কিছু কিছু সৃষ্টি যেমন ব্যক্তি বিশেষ, সংগঠন বা সরকারের প্রচেষ্টায় যেসব নিয়ামত আসে, তা ঐসব উপায়-উপকরণের অন্তর্ভুক্ত যা কখনো ফল দান করে আবার কখনো নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়। তাদের প্রচেষ্টা মাধ্যমে ভালো কিছু অর্জিত হলে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাবে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টার কারণে যে ফলাফল অর্জিত হয়, তার সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো দিকে করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা তার সম্মানিত কিতাবে এমন অনেক গোত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা তাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করেছিল এবং তারা ধন-সম্পদ এবং অন্যান্য যেসব নিয়ামত লাভ করেছিল, তা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের প্রতি সম্বন্ধ করেছিল। তারা বলেছিল যে, তারা এগুলোর হকদার ছিল বলেই পেয়েছে অথবা তারা তাদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও যোগ্যতার বদৌলতেই অর্জন করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٠) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾

"কিন্তু কঠিন সময় কেটে যাওয়ার পর যেই মাত্র আমি তাকে আমার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, সে বলতে থাকে, এটা তো আমার যোগ্য প্রাপ্য; আমি মনে করি না যে, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। তবে সত্যিই যদি আমাকে আমার পালনকর্তার কাছে হাজির করা হয়, তবে অবশ্যই তার কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতএব আমি কাফেরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করবো এবং তাদেরকে অবশ্যই আস্বাদন করাবো কঠিন শাস্তি"। (সূরা ফুস্সিলাত: ৫০)

এটা তো আমার যোগ্য প্রাপ্য; এর অর্থ হলো আমি এটি আমার জ্ঞান দ্বারা অর্জন করেছি এবং আমি এর ন্যায্য হকদার। আসল কথা হলো, এটি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকেই,

এ নিয়ামত মানুষের প্রচেষ্টার ফলাফল নয় এবং তা মানুষ স্বীয় ক্ষমতা বলেও কামাই করেনি।

যে কারুনকে আল্লাহ তা'আলা বিরাট ধনভাণ্ডার দিয়েছিলেন, সে তার গোত্রীয় লোকদের উপর সীমাহীন যুলুম করেছিল। উপদেশ দানকারীগণ তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং আল্লাহর নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করার এবং সেটার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আদেশ করেছিলেন। কিন্তু সে অহংকার করেছিল। আল্লাহ তা'আলার তার সম্পর্কে কুরআনে বলেন যে, সে তখন বলেছিল, ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ "নিশ্চয় এ নিয়ামত জ্ঞানের জন্য আমাকে দেয়া হয়েছে"। (সূরা কাসাস: ৭৮)

অর্থাৎ আমার পারদর্শিতা ও উপার্জনের বিভিন্ন পন্থা সম্পর্কিত জ্ঞান থাকার কারণেই আমি এ ধন-ভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়েছি। এটি নয় যে আল্লাহর অনুগ্রহে আমি তা প্রাপ্ত হয়েছি। এ জন্যই সে ভয়াবহ ও নিকৃষ্ট পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল। তার শাস্তি হয়েছিল খুব কঠোর। আল্লাহ তা'আলা তাকে তার বাড়ি-ঘরসহ যমীনে দাবিয়ে দিয়েছেন। কেননা সে আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করেছিল এবং সেটাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে সম্বন্ধ করে বলেছিল যে, সে নিজস্ব কলাকৌশল ও শক্তির বলে সেটা অর্জন করেছিল।

বর্তমান কালের অনেক লোক নতুন নতুন বস্তু আবিষ্কার করতে পেরে অহমিকা প্রদর্শন করছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যেসব বিষয়ের ক্ষমতা দিয়েছেন, তা পেয়ে আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে নিজেদের বড়ত্ব প্রকাশ করছে, তাদের কলাকৌশল ও শক্তি-সামর্থ নিয়ে গর্ব করছে। সেই সঙ্গে তারা আল্লাহর যমীনে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করছে এবং আল্লাহর বান্দাদের উপর যুলুম করছে। কারুনের মতোই এরা শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত। এদের পূর্বে আদ জাতিও নিজেদের শক্তির বড়াই করে ধোঁকায় পড়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (١٥) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ﴾

"তাদের অবস্থা ছিল এই যে, পৃথিবীতে তারা অন্যায়ভাবে নিজেদেরকে বড় মনে করেছিলো এবং বলতে শুরু করেছিল, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? তারা কি বুঝলো না, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। অবশেষে আমি কতিপয় অমঙ্গলকর দিনে তাদের উপর প্রবল ঝড়ো হাওয়া পাঠালাম যেন পার্থিব জীবনেই তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনাকর আযাবের মজা আস্বাদন করাতে পারি। আখিরাতের আযাব তো এর চেয়েও অধিক অপমানকর। সেখানে কেউ তাদের সাহায্যকারী থাকবে না"। (সূরা ফুস্সিলাত: ১৫-১৬)

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বকালের একদল লোকের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি শুনুন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিয়ামত প্রদান করে পরীক্ষা করেছেন। তাদের কেউ আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করেছে এবং প্রাপ্ত নিয়ামতকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। এতে আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তাদের কেউ কেউ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। এতে আল্লাহ তা'আলা তার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। এবার মূল ঘটনাটি শুনুন।

"নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। যাদের একজন ছিল কুষ্ঠরোগী, আরেক জনের ছিল মাথায় টাক, অপরজন ছিল অন্ধ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাদের কাছে তিনি একজন ফেরেশতা পাঠালেন।

সর্বপ্রথম কুষ্ঠরোগীর কাছে ফেরেশতা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কী? সে বললো সুন্দর রং এবং ভালো চামড়া। আর যে রোগের কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে তা থেকে মুক্তি আমার কাম্য। তখন ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে তার রোগ দূর হয়ে গেলো তাকে সুন্দর রং আর ভালো চামড়া দেয়া হলো। তারপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার প্রিয় সম্পদ কী? সে বললো, উট অথবা গরু। হাদীছ বর্ণনাকারী ইসহাক উট কিংবা গরু এ দু'য়ের মধ্যে সন্দেহ করেছেন। তখন তাকে একটি গর্ভবতী উট দেয়া হলো। ফেরেশতা তার জন্য এই বলে দু'আ করলেন, আল্লাহ তোমাকে এ সম্পদে বরকত দান করুন।

অতঃপর ফেরেশতা টাক ওয়ালা লোকটির কাছে গিয়ে বললেন, তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কী? লোকটি বলল, আমার প্রিয় জিনিস হচ্ছে সুন্দর চুল। লোকজন আমাকে যে কারণে ঘৃণা করে তা থেকে মুক্ত হতে চাই। ফেরেশতা তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে করে তার মাথার টাক দূর হয়ে গেল। তাকে সুন্দর চুল দেয়া হলো। অতঃপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়? সে বললো উট অথবা গরু। তখন তাকে গর্ভবতী একটি গাভী দেয়া হলো। ফেরেশতা তার জন্য এই বলে দু'আ করলেন আল্লাহ এ সম্পদে তোমাকে বরকত দান করুন।

তারপর ফেরেশতা অন্ধ লোকটির কাছে গিয়ে বললেন, তোমার কাছে সবচেয় প্রিয় সম্পদ কী? লোকটি বলল, আল্লাহ যেন আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। যার ফলে আমি লোকজনকে দেখতে পাবো। ফেরেশতা তখন তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে আল্লাহ তা'আলা লোকটির দৃষ্টিশক্তি ফিরেয়ে দিলেন। এবার ফেরেশতা তাকে বললেন, কী সম্পদ তোমার কাছে সব চেয়ে বেশি প্রিয়? সে বলল, ছাগল আমার বেশি প্রিয়। তখন তাকে একটি গর্ভবতী ছাগল দেয়া হলো। আল্লাহর অনুগ্রহে উট ও গরু বংশ বৃদ্ধি করতে লাগলো এবং ছাগলও বংশ বৃদ্ধি করতে লাগলো। অবশেষে অবস্থা এ দাঁড়ালো যে,

একজনের উটে মাঠ ভরে গেলো, আরেকজনের গরুতে মাঠ পূর্ণ হয়ে গেলো এবং আরেক জনের ছাগলে মাঠ ভর্তি হয়ে গেলো।

অতঃপর নির্দিষ্ট একটি সময় পার হওয়ার পর একদিন ফেরেশতা তার পূর্ব আকৃতিতেই কুষ্ঠ রোগীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি একজন মিসকীন। আমার পথের সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য আল্লাহর সাহায্য অতঃপর আপনার সাহায্য দরকার। যে আল্লাহ আপনাকে এত সুন্দর রং এবং ভালো চামড়া দান করেছেন, তার নামে আমি আপনার কাছে একটা উট সাহায্য চাই, যাতে আমি নিজ দেশে পৌঁছাতে পারি। তখন লোকটি বললো, দেখুন: আমার অনেক দায়-দায়িত্ব আছে, হকদার আছে। ফেরেশতা বললেন, আমার মনে হয়, আপনাকে চিনি। আপনি কি কুষ্ঠ রোগী ছিলেন না? মানুষ কি আপনাকে ঘৃণা করতো না? আপনি খুব গরীব ছিলেন না? অতঃপর আল্লাহ আপনাকে এ সম্পদ দান করেছেন? তখন লোকটি বললো এ সম্পদ আমার পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। ফেরেশতা তখন বললো, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহ যেন তোমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

অতঃপর ফেরেশতা মাথায় টাক ওয়ালা লোকটির কাছে গেলেন এবং ইতিপূর্বে কুষ্ঠরোগীর সাথে যে ধরনের কথা বলেছিল টাক ওয়ালা লোকটির সাথেও অনুরূপ কথা বললেন। উত্তরে কুষ্ঠরোগী যে জবাব দিয়েছিল, এ লোকটিও একই জবাব দিলো। ফেরেশতাও আগের মতই বললো যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

অতঃপর ফেরেশতা একই আকৃতিতে অন্ধ লোকটির কাছে গিয়ে বললেন, আমি এক গরীব মুসাফির। আমার পথের সম্বল নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি আল্লাহর সাহায্য অতঃপর আপনার সাহায্য কামনা করছি। যিনি আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, তার নামে একটি ছাগল আপনার কাছে সাহায্য চাই, যাতে আমার সফরে নিজ গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পারি। লোকটি তখন বললো আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনার যা খুশি নিয়ে যান। আর যা খুশি রেখে যান। আল্লাহর কসম, আল্লাহর নামে আপনি আজ যা নিয়ে যাবেন, তাতে আমি মোটেই বাধা দেবোনা। তখন ফেরেশতা বললেন, আপনার মাল আপনি রাখুন। আপনাদেরকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করা হলো। আপনার আচরণে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনার সঙ্গীদ্বয়ের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন"।[৭৭]

এটি একটি বিরাট হাদীছ। তাতে রয়েছে বিরাট শিক্ষা। এ ঘটনাতে উল্লেখিত প্রথম দু'জন লোক আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করেছিল। নিয়ামতের সম্বন্ধ তারা আল্লাহর দিকে করেনি এবং তাদের সম্পদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যে হক ছিল তাও আদায় করেনি। ফলে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ নেমে আসলো এবং তাদের থেকে নিয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হলো। সর্বশেষ ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করলো, নিয়ামতের

[৭৭] বুখারী, অধ্যায়: বনী ইসরাঈলের খবর থেকে যা বর্ণিত হয়েছে।

সম্বন্ধ তার দিকেই করলো এবং তাতে আল্লাহ তা'আলার যে হক রয়েছে তাও প্রদান করলো। এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে নিলো। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদ আরো বাড়িয়ে দিলেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, الشكر শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে বিনয়, নম্রতা ও ভালোবাসার সাথে নিয়ামত প্রদানকারীর নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করা। সুতরাং যে ব্যক্তি নিয়ামতের কদর জানে না; বরং সেটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতেও জানে না। আর যে ব্যক্তি নিয়ামতের কদর জানে, কিন্তু নিয়ামত প্রদানকারীকে চিনতে পারে না, সেও নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে জানে না। আর যে ব্যক্তি নিয়ামতের কদর জানতে পারলো এবং নিয়ামত প্রদানকারীকেও চিনতে পারলো, কিন্তু নিয়ামত এবং নিয়ামত প্রদানকারীর প্রতি অবিশ্বাসীর মতোই নিয়ামতকে অস্বীকার করলো সে মূলত নিয়ামতের প্রতি কুফুরী করলো।

আর যে ব্যক্তি নিয়ামত এবং নিয়ামত প্রদানকারীকে চিনতে পারলো, নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করলো, অস্বীকৃতি প্রদান করলো না, কিন্তু নিয়ামত প্রদানকারীর জন্য বিনীত হলো না, তাকে ভালোবাসলো না, তার প্রতি সন্তুষ্ট হলো না সেও নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করলো না। আর যে ব্যক্তি নিয়ামতকে চিনতে পারলো, নিয়ামত প্রদানকারীকেও চিনতে পারলো, নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করলো, নিয়ামত প্রদানকারীর জন্য বিনীত হলো, তাকে ভালোবাসলো, তার প্রতি সন্তুষ্ট হলো, নিয়ামতকে আল্লাহর প্রিয় ও তার আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করলো, সেই নিয়ামতের প্রকৃত শুকরিয়া জ্ঞাপন করলো।

সুতরাং নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য বান্দার অন্তরে নিয়ামত সম্পর্কে ইলম থাকা জরুরী এবং সেই ইলম অনুযায়ী অন্তরের আমলও থাকা আবশ্যক। অন্তরের আমল হলো নিয়ামত প্রদানকারীর প্রতি ঝুকে পড়া, তাকে ভালোবাসা এবং তার জন্য বিনীত হওয়া। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের বক্তব্য এখানেই শেষ।

الشرك الأصغر বা ছোট শিরক

ছোট শিরক তাওহীদের মধ্যে ঘাটতি আনয়ন করে এবং সেটাকে ত্রুটিযুক্ত করে দেয়। মানুষের মধ্যে এমন অনেক ছোট শিরক রয়েছে, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। যাতে করে আক্বীদার সংরক্ষণ করা যায় এবং তাওহীদের হেফাযত করা হয়। কেননা এ ছোট শিরকগুলো তাওহীদে ঘাটতি আনয়ন করে। কখনো কখনো এগুলো বড় শিরকের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"অতএব তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থাপন করো না"। (সূরা আল বাকারা: ২২)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, অত্র আয়াতে الأنداد বলতে এমন শিরক উদ্দেশ্য, যা আঁধার রাতে কালো পাথরের উপর দিয়ে পীপড়ার চলাচলের অপেক্ষা অধিক গোপনে সংঘটিত হয়। যেমন লোকেরা বলে থাকে আল্লাহর শপথ এবং তোমার জীবনের শপথ, হে অমুক! আমার জীবনের শপথ! এ ছোট্ট কুকুরটি ঘেউ ঘেউ না করলে আমাদের ঘরে চোর প্রবেশ করতো, ঘরে হাঁসগুলো তই তই না করলে আজ রাতে চোর আসতো, কেউ তার সাথীকে বলে থাকে, তুমি যা চাও এবং আল্লাহ তা'আলা যা চান এবং কোনো কোনো মানুষ বলে থাকে আল্লাহ না থাকলে এবং অমুক না থাকলে এমন হতো না। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, তুমি কোনো ব্যাপারে অমুক অমুক বলবে না। এসবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনে আবী হাতিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাসের মতে উপরোক্ত বিষয়গুলো শিরকের মধ্যে গণ্য। আর শিরক বলতে ছোট শিরক উদ্দেশ্য। তবে আয়াত ছোট ও বড় উভয় প্রকার শিরকেই শামিল করে। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এসব বিষয় থেকে সর্বাধিক ছোট শিরক সম্পর্কে সতর্ক করার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় শিরক থেকে সতর্ক করেছেন। কেননা এ শব্দগুলো অনেক মানুষের জবানে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। তাদের কেউ অজ্ঞতাবশত আবার কেউ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এগুলো উচ্চারণ করে থাকে। এ ছোট শিরকগুলোর মধ্যে রয়েছে,

(১) الحلف بغير الله عز وجل। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা:

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা শিরক। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْكَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল, সে কুফুরী করলো অথবা শিরক করল”। ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করার পর হাসান বলেছেন এবং আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকেম এটিকে ছ্বহীহ বলেছেন।

“সে কুফুরী করলো অথবা শিরক করলো”: এখানে বর্ণনাকারী সন্দেহ পোষণ করেছেন। অথবা শব্দটি এবং অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। তখন অর্থ হবে সে কুফুরী করলো এবং শিরক করলো। তবে এটি বড় কুফুরীর চেয়ে কম মানের কুফুরী। এটি ছোট শিরকও বটে।

বর্তমান সময়ের অনেক মানুষই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করে। তারা আমানতের নামে কসম খায়, নাবীর নামে শপথ করে, কেউ কেউ বলে আমার জীবনের কসম, হে অমুক! তোমার জীবনের শপথ! এ ধরনের আরো অনেক শব্দ তারা ব্যবহার করে। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, আমরা তা শুনলাম। আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করাকে কুফুরী অথবা শিরক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কেননা কোনো জিনিসের শপথ করার অর্থ হলো উক্ত জিনিসকে সম্মান করা। সুতরাং যাকে সম্মান করা আবশ্যক এবং যার নামে শপথ করা যায় তিনি হলেন আল্লাহ তা‘আলা। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা শিরক এবং বিরাট অপরাধ।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন,

«لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا»

“আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করা আমার কাছে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে সত্য কসম করার চেয়ে বেশী পছন্দনীয়। এটা জানা কথা যে, আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করা কাবীরা গুনাহ। কিন্তু শিরক করা যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা সমস্ত কাবীরা গুনাহর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ কাবীরা গুনাহ। যদিও তা শিরকে আছগার বা ছোট শিরক হয়।

সুতরাং মুসলিমদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। জাহেলী যুগের অভ্যাস যেন পুনরায় তাদের কাছে ফিরে না আসে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম বলেন,

«لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» “তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করো না”। এ ছাড়া আরো অনেক দলীল রয়েছে। যা আমাদেরকে আদেশ করে যে, আমরা যখন শপথ করার

ইচ্ছা করবো, তখন যেন একমাত্র আল্লাহর নামের সাথেই কসমকে সীমিত রাখি এবং তিনি ছাড়া অন্যের নামে শপথ না করি।

যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করার পরও সন্তুষ্ট হয় না, তার ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন,

«مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করে, সে যেন সত্য বলে। আর যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নামে কসম করা হবে, সে যেন উক্ত কসমে সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহর কসমে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হলো না, তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই”। ইমাম ইবনে মাজাহ হাসান সনদে এটি বর্ণনা করেছেন।[৭৮]

(২) শব্দের মাধ্যমে ছোট শিরক হয়ে থাকে:

যেমন কেউ বললো, ماشاء الله وشئت “আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন”। ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ কুতাইলা হতে বর্ণনা করেন যে, এক ইয়াহূদী নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সালাম এর কাছে এসে বললো, “আপনারাও আল্লাহর সাথে শিরক করে থাকেন। কারণ আপনারা বলে থাকেন,ماشاء الله وشئت “আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন”। আপনারা আরো বলে থাকেন, والكعبة অর্থাৎ কাবার কসম। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সালাম তখন ছাহাবীদেরকে আদেশ করলেন, তারা যখন কসম করতে চায়, তখন তারা যেন বলে, ورب الكعبة ‘কাবার রবের কসম। আর যেন এ কথা বলে, ماشاء الله ثم شئت আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন।

ইমাম নাসাঈ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম এর উদ্দেশ্যে বললো ماشاء الله وشئت “আপনি এবং আল্লাহ

---

[৭৮] এ হাদীছের সনদে দুর্বলতা থাকলেও তার মর্মার্থ গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে এ বিষয়ে একাধিক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَلا مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلا يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللَّهِ فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ:«لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»

“খবরদার যে ব্যক্তি শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ না করে। কুরাইশরা তাদের বাপদাদার নামে শপথ করতো। নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথার প্রতিবাদ করে বললেন, তোমরা তোমাদের বাপদাদাদের নামে শপথ করো না”। (ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৮৩৬)

যা ইচ্ছা করেছেন”। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, أجعلتنى لله ندا؟ “তুমি কি আল্লাহর সাথে আমাকে শরীক বানিয়ে ফেললে? বরং তুমি বলো, আল্লাহ একাই যা ইচ্ছা করেছেন, তাই হয়েছে”।[৭৯]

উপরোক্ত হাদীছ দু’টি এবং এ মর্মে বর্ণিত অন্যান্য হাদীছগুলো প্রমাণ করে যে, ماشاء الله وشئت “আপনি এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন বলা এবং অনুরূপ অন্যান্য বাক্য উচ্চারণ করা নিষেধ। যেমন লোকেরা বলে থাকে, لولا الله وأنت আপনি এবং আল্লাহ না থাকলে এমন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, مالي إلا الله وأنت আমার জন্য আল্লাহ এবং আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। কেননা واو দ্বারা একটি বিষয়কে অন্য বিষয়ের উপর আতফ করলে তথা দু’টি শব্দের মধ্যে واو আনয়ন করলে এর দ্বারা দু’টি বস্তুকে সমান করে দেয়া উদ্দেশ্য হয়। আর واوএর মাধ্যমে কোনো বিষয়ে স্রষ্টাকে সৃষ্টির সমান করে দেয়া শিরক। তবে এটি এবং অনুরূপ বিষয় ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে واوএর বদলে ثم দিয়ে আতফ করা আবশ্যক। সুতরাং এভাবে বলা উচিত যে ما شاء الله ثم شئت আল্লাহ্ যা চান অতঃপর আপনি যা চান, আল্লাহ যা চান অতঃপর অমুক যা চায়, আল্লাহ না থাকলে অতঃপর আপনি না থাকলে, আল্লাহ না থাকলে অতঃপর অমুক না থাকলে, আমার জন্য আল্লাহ অতঃপর আপনি ছাড়া আর কেই নেই। কেননা ثم দ্বারা এক শব্দকে অন্য শব্দের উপর আত্ফ করা হলে সেটা ধারাবাহিকতা ও বিলম্ব অর্থ প্রদান করে। আর বান্দার ইচ্ছা কেবল আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী ও পরেই হয়ে থাকে এবং কেবল আল্লাহর ইচ্ছার পরেই কার্যকরী হয়। এতে করে আল্লাহর ইচ্ছা এবং বান্দার ইচ্ছা বরাবর হয়ে যায় না।

আল্লাহ্ তা‘আলা সূরা তাকবীরের ২৯ আয়াতে বলেন, ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ “তোমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছার বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না”।

সুতরাং বান্দার ইচ্ছা আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার অধীনস্থ। বান্দার যদিও ইচ্ছা রয়েছে, কিন্তু তার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী। বান্দা কোনো কিছুর ইচ্ছাই করতে পারে না, তবে আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন, তখনই কেবল বান্দার ইচ্ছা কার্যকর হয়। জাবরীয়ারা এ মতের বিরোধিতা করেছে। তারা বলে বান্দার কোনো ইচ্ছা ও স্বাধীনতা নেই।

ঐদিকে কাদারীয়া সম্প্রদায় এবং অন্যান্য লোকেরাও এ মাসআলায় আহলে সুন্নাত

[৭৯] হাদীছটির একাধিক শাওয়াহেদ থাকার কারণে ছ্বহীহ। দেখুন: কুররাতুল উয়ুন, পৃষ্ঠা নং- ৩৪৭।

ওয়াল জামা'আতের বিরোধিতা করেছে। কাদারীয়ারা বান্দার জন্য এমন ইচ্ছা সাব্যস্ত করে, যারা আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত। আল্লাহ তাদের কথার বহু উর্ধ্বে।

(৩) নিয়্যাত ও উদ্দেশ্যের মধ্যে ছোট শিরক:

নিয়্যাত ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যে শিরক হয়, সেটাকে গোপন শিরক বলা হয়। যেমন الرياء বা লোক দেখানো আমল। গোপন শিরক দুই প্রকার।

ক) الرياء বা লোক দেখানো আমল: الرياء শব্দটি الرؤية শব্দ থেকে বের হয়েছে। মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত প্রকাশ করাকে রিয়া বলা হয়। যাতে করে লোকেরা ইবাদতকারী লোকটির প্রশংসা করে। الرياء এবং السمعة এর মধ্যে পার্থক্য হলো মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে যে আমল করা হয় এবং যা চোখ দিয়ে দেখা যায় তাকে الرياء বলা হয় যেমন ছ্বলাত দান-খয়রাত ইত্যাদি এবং যে আমল মানুষকে শুনানোর উদ্দেশ্যে করা হয় এবং যা কান দিয়ে শুনা যায়, তাকে السمعة বলা হয় যেমন কুরআন পাঠ করা, ওয়ায করা যিকির-আযকার করা ইত্যাদি। যেসব আমল মানুষ তাদের কথা-বার্তায় উল্লেখ করে এবং অন্যদেরকে জানায় তাও السمعة-এর মধ্যে গণ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

"হে নাবী! বলোঃ আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী পাঠানো হয় এই মর্মে যে, তোমাদের ইলাহ মাত্র এক। অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎ আমল করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে"। (সূরা কাহাফ: ১১০)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেমন এক, তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই, ঠিক তেমনি ইবাদত একমাত্র তার জন্যই হওয়া চাই, তিনি এক এবং তার কোনো শরীক নেই। সুতরাং তিনিই যেহেতু একমাত্র ইলাহ তাই একমাত্র তারই ইবাদত করা উচিত। রিয়া থেকে যে আমল মুক্ত হয় এবং যা সুন্নাত মোতাবেক হয়, সেটাকেই সৎ আমল হিসাবে গণ্য করা হয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা এখানেই শেষ।

যারা লোকদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾

"ধ্বংস ঐ সমস্ত ছ্বলাত আদায়কারীদের জন্য যারা ছ্বলাতের ব্যাপারে উদাসীন। যারা লোকদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ছ্বলাত পড়ে এবং যারা গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটখাটো জিনিস সাহায্য দেয়া থেকে বিরত থাকে"। (সূরা আল মাউন: ৪-৫) আল্লাহ তা'আলা আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, রিয়া হলো মুনাফেকদের লক্ষণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

"অবশ্যই মুনাফেকরা ধোঁকাবাজি করছে আল্লাহ্‌র সাথে, অথচ আল্লাহই তাদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখেছেন। তারা যখন ছ্বলাতে দাঁড়ায় তখন একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্যই দাঁড়ায়। আর তারা আল্লাহ্‌কে অল্পই স্মরণ করে"। (সূরা আন নিসা: ১৪২)

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

«أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»

"যেসব মাবুদকে আমার সাথে শরীক ধারণা করা হয়, আমি তাদের সকলের শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোনো আমল করে এবং ঐ আমলে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি ঐ ব্যক্তিকে এবং তার শিরককে প্রত্যাখ্যান করি"।[৮০]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার আমলের মাধ্যমে আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো সৃষ্টির সন্তুষ্টি তালাশ করবে, আমি তাকে বর্জন করি এবং শিরককেও বর্জন করি। ইবনে মাজার অন্য বর্ণনায় এসেছে, সে আমলের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে সে আমার সাথে শরীক করেছে, সেটা তার জন্যই।

ইমাম ইবনে রজব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে কৃত আমলগুলো কয়েক প্রকার। কখনো কখনো আমলের মধ্যে শুধু রিয়াই থাকে। এ রকমই হলো মুনাফেকদের অবস্থা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

"তারা যখন ছ্বলাতে দাঁড়ায় তখন একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্যই দাঁড়ায়। আর তারা আল্লাহ্‌কে অল্পই স্মরণ করে"। (সূরা আন নিসা: ১৪২)

এ ধরনের রিয়া মুমিনদের থেকে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিশেষ করে ফরয ছ্বলাত ও ফরয ছ্বিয়ামের মধ্যে এ ধরনের রিয়া মুমিনদের থেকে হওয়ার আশঙ্কা নেই। তবে সাদকা, ফরয হজ্জ ইত্যাদি প্রকাশ্য আমলের মধ্যে কিংবা যেসব আমল দ্বারা অন্য লোক

[৮০] ছ্বহীহ মুসলিম ২৯৮৫, অধ্যায়: যে ব্যক্তি আমলে শিরক করলো।

উপকৃত হয়, তাতে কখনো কখনো মুমিনদের থেকে এ ধরনের আমলের মধ্যে রিয়া আসতে পারে। এতে ইখলাছ ধরে রাখা কঠিন। এ জাতীয় আমল বাতিল হওয়ার ব্যাপারে কোনো মুসলিম সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। রিয়াকারীগণ আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং শাস্তি পাওয়ার হকদার।

কখনো কখনো আল্লাহর জন্যই আমল শুরু করা হয়, কিন্তু পরবর্তীতে তার মধ্যে রিয়া প্রবেশ করে। আমলের শুরুতেই যদি রিয়া প্রবেশ করে, তাহলে কুরআন-সুন্নাহর দলীলসমূহ প্রমাণ করে যে, সে আমলটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল হবে। আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমল শুরু করা হয়, অতঃপর তাতে রিয়া প্রবেশ করে, তাহলে রিয়াটি যদি মনের কল্পনার মধ্যেই সীমিত থাকে এবং আমলকারী সেটাকে প্রতিহত করে ফেলে, তাহলে আলেমদের ঐক্যমতে এ রিয়া ক্ষতিকর নয়। আর আমলের সাথে সাথে যদি রিয়া অব্যাহত থাকে, তাহলে তার আমলটি বাতিল হয়ে যাবে কি না এবং বাতিল না হলে শুরুতে নিয়্যাত বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে বিনিময় দেয়া হবে কি না, সে ব্যাপারে সালাফদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইবনে জারীর রাহিমাহুমাল্লাহ আলেমদের মতভেদ উল্লেখ করার পর প্রাধান্য দিয়েছেন যে, তার আমল বাতিল হবে না। শুরুতে নিয়্যাত বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে সে আমলের ছাওয়াবও প্রাপ্ত হবে। হাসান বাছরী এবং অন্যান্য আলেম থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনে রজব (রহিমাহুল্লাহ) এর বক্তব্য এখানেই শেষ।

প্রিয় দীনি ভাইগণ! শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের জান হেফাযত করা এবং চোরদের কবল থেকে নিজেদের মাল হেফাযত করার চেয়ে শিরক থেকে আমল হেফাযত করার গুরুত্ব অনেক বেশী। কেননা শিরকের পরিণাম খুবই ভয়াবহ। আমরা আমাদের নিজেদের জন্য এবং আপনাদের সকলের জন্য আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা এবং কথায় ও কাজে ইখলাছ প্রার্থনা করছি।

খ) মানুষের নেক আমল দ্বারা নিছক পার্থিব স্বার্থ হাসিলের নিয়্যাত করা ছোট শিরক:

নেক আমলের মাধ্যমে পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের নিয়্যাত করা এক প্রকার শিরক। নিয়্যাত ও উদ্দেশ্যের মধ্যে এ প্রকার শিরক হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে এবং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সুন্নাতে এ প্রকার শিরক থেকে সতর্ক করেছেন। যেমন কেউ দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের লোভে এমন নেক আমল করলো, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করা হয়। এটি এমন শিরক, যা তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থি। সেই সঙ্গে এটা মানুষের সৎ আমলগুলোকেও বরবাদ করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"যারা শুধু দুনিয়ার জীবন এবং এর চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদের সব কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে থাকি এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হলো সেসব লোক আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া অন্য কিছু নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ হয়েছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল"। (সূরা হুদ: ১৫-১৬)

আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে সংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার আমলের মাধ্যমে শুধু পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের নিয়্যাত করবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তার আমলের ছাওয়াব পরিপূর্ণরূপে দান করবেন। তাকে সুস্বাস্থ্য এবং ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে প্রচুর সুখ-শান্তি দান করবেন। আর এটিও আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা দুনিয়ার নিয়ামত দান করেন। যেমন তিনি অন্য আয়াতে বলেন,

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾

"যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সত্তর দিয়ে দেই। অতঃপর তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে"। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১৮)

যারা দুনিয়ার নিয়ামত হাসিলের উদ্দেশ্যে সৎ আমল করবে, তারা জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছুই পাবে না। কেননা তারা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে সৎ আমল করেনি। সুতরাং আখিরাতে তাদের আমলগুলো বাতিল হবে এবং এর কোনো ছাওয়াব পাবে না। কেননা তারা আখিরাতের উদ্দেশ্যে আমল করেনি।

প্রখ্যাত তাবেঈ কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেছেন, দুনিয়া হাসিল করা যার উদ্দেশ্য হয় এবং দুনিয়া কামাই করার জন্য যে আমল করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতেই তার সৎ আমলের বিনিময় প্রদান করবেন। অতঃপর সে আখিরাতে গিয়ে এমন কোনো সৎ আমল খুঁজে পাবে না, যার বিনিময় দেয়া যেতে পারে। আর মুমিন ব্যক্তির ব্যাপারে কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতে সৎ আমলের ছাওয়াব প্রদান করবেন এবং আখিরাতেও তাকে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সালাফদের থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেক আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আজকাল মানুষ এগুলো করে থাকে, কিন্তু তারা এগুলোর অর্থ বুঝে না। তার মধ্যে,

(ক) অনেক মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সৎ কাজ করে থাকে। যেমন তারা দান-সাদকা করে, ছ্বলাত কায়েম করে, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদাচরণ করে, মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে, যুলুম-অত্যাচার পরিহার করে এবং অনুরূপ অন্যান্য যেসব সৎ আমল মানুষ করে থাকে কিংবা যেসব অন্যায় কাজ আল্লাহর জন্য পরিহার করে থাকে তাতে যদি তারা আখিরাতে ছাওয়াবের নিয়্যাত না করে; বরং এ নিয়্যাত করে যে, আল্লাহ তা'আলা

যেন এর বিনিময়ে তাদের ধন-সম্পদ হেফাযত করেন, সেটা আরো বাড়িয়ে দেন, তাদের পরিবার-পরিজনের হেফাযত করেন অথবা তাদের পার্থিব নিয়ামত দীর্ঘস্থায়ী করেন, তাহলে তারা দুনিয়াতেই মিনিময় পেয়ে যাবে। আখিরাতে জান্নাত লাভ কিংবা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার কোনো চিন্তাই যেহেতু তাদের মাথায় থাকে না, তাই এ শ্রেণির লোকদের সৎ আমলের ছাওয়াব দুনিয়াতেই প্রদান করা হয়। আখিরাতের নিয়ামত ও সুখ-শান্তিতে তাদের কোনো হিস্সা থাকবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এ শ্রেণির মানুষ থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।

(খ) এটি প্রথমটির চেয়ে গুরুতর এবং ভয়ানক। ইমাম মুজাহিদ উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, একে কেন্দ্র করেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তা হলো কিছু মানুষ এমন সৎ আমল করে থাকে, যাতে তার নিয়্যাত হলো মানুষকে দেখানো; আখিরাতে ছাওয়াব অর্জন করার নিয়্যাত তার মধ্যে মোটেই থাকে না।

(গ) কিছুলোক রয়েছে, যারা ধন-সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যে সৎ আমল করে। যেমন সম্পদ কামানোর উদ্দেশ্যে হজ্জে যায়, দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে অথবা বিবাহ করার জন্য হিজরত করে কিংবা গণীমতের মাল লাভ করার জন্য জিহাদ করে। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এ শ্রেণির আমলের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপ মানুষ নিজের পরিবারকে শিক্ষা দেয়ার জন্য অথবা তাদের জন্য জীবিকা উপার্জন করার উদ্দেশ্যে কিংবা নেতৃত্ব হাসিল করার জন্য ইলম অর্জন করে থাকে। এমনি কোনো কোনো মানুষ ইমামতি করার জন্য কুরআন শিক্ষা করে এবং যথাসময়ে মসজিদে গিয়ে ছ্বলাত কায়েম করে। এ রকম উদাহরণ অনেক রয়েছে।

(ঘ) এমন লোকও রয়েছে, যারা নিষ্ঠাবান হয়ে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করে যে, তার কোনো শরীক নেই। কিন্তু আল্লাহর আনুগত্য করার সাথে সাথে এমন আমলও করে, যা তাদেরকে কাফের বানিয়ে ফেলে এবং ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয়। যেমন ইয়াহূদী-নাসারাগণ যখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের আশা এবং আখিরাতের কল্যাণের আশায় তার ইবাদত করে, দান-সাদকা করে এবং ছ্বিয়াম রাখে তেমনি এ উম্মতের মধ্যেও অনেক লোক রয়েছে, যারা খালেছভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আখিরাতে ছাওয়াব কামনা করে, কিন্তু তাদের মধ্যে শিরক ও কুফুরী রয়েছে, যা তাদেরকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বের করে দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তারা একদিকে যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সৎ আমল করে অন্যদিকে তারা এমন আমলও করে যা তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং তাদের সৎ আমলগুলো কবুলের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং অন্যান্য ছাহাবী থেকে এ শ্রেণির লোক ও তাদের আমলের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সালাফগণ এ শ্রেনীর আমলের ভয় করতেন। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা এখানেই শেষ।

উপরোক্ত আয়াত দু'টি এ চার শ্রেণির মানুষ ও তাদের আচরণকে শামিল করেছে। কেননা তাতে উল্লেখিত শব্দগুলো ব্যাপকার্থবোধক। বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত আখিরাতের আমলের মাধ্যমে দুনিয়ার লোভ-লালসা বাস্তবায়ন করা থেকে সতর্ক হওয়া।

ছ্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে আমল করবে, সে তার সকল প্রচেষ্টাসহ দুনিয়ার পিছনেই ছুটবে। এমনকি সে দুনিয়ার গোলামে পরিণত হবে।

ছ্বহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلا انْتَقَشَ طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ»

"ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, ধ্বংস হোক দিরহামের গোলাম, ধ্বংস হোক উত্তম চাদরের দাস, ধ্বংস হোক নরম পোশাকের গোলাম! তাকে কিছু দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক, উল্টে পড়ুক। সে যখন কাঁটাবিদ্ধ হবে তখন তা খুলতে না পারুক। সুখবর ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। তার মাথা ধুলোমলিন এবং পা দু'টি ধূলোয় ধুসরিত। তাকে সেনাবাহিনীর পাহারায় নিয়োজিত করা হলে সেখানেই নিয়োজিত থাকে। আর তাকে সেনাবাহিনীর পশ্চাতে রাখা হলে সে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। সে অনুমতি প্রার্থনা করলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। কারো জন্য সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না"।[৮১]

تعِس শব্দের অর্থ সে হুচট খেয়ে পড়ে গেল। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে ধ্বংস হলো। এখানে সৎ কাজের মাধ্যমে দুনিয়ার সম্পদ উপার্জনে আগ্রহীকে দিনার ও দিরহামের গোলাম বলার কারণ হচ্ছে, পার্থিব স্বার্থ হাসিল করা ছাড়া সে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমল করে না। তাই সে অর্থের গোলামে পরিণত হয়েছে। কেননা সে আমলের মাধ্যমে অর্থেরই ইবাদত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে উদ্দেশ্য করবে, সে আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শরীক সাব্যস্ত করলো। অধিকাংশ মানুষের অবস্থা ঠিক এরকমই। যে ব্যক্তি তার চিন্তা-চেতনা ও প্রচেষ্টাকে দুনিয়া উপার্জন করার পথে ব্যয় করবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত হাদীছে তার উপর বদ দু'আ করেছেন সে যেন দুর্ভাগ্যবান হয়, দুর্দশাগ্রস্ত হয়, পতনমুখী হয় এবং সে যেন কাঁটাবিদ্ধ

[৮১] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮৮৭।

হওয়ার পর সেটা বের করতে অক্ষম হয় অর্থাৎ দুনিয়ার ফিতনায় আক্রান্ত হলে সে যেন তা থেকে পরিত্রাণ না পায়। মোটকথা হাদীছে বর্ণিত নিকৃষ্ট স্বভাবগুলো যার মধ্যে থাকবে তার উপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বদ দু'আর প্রভাব অবশ্যই পড়বে। ফলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীছে দুনিয়া লিপ্সু ব্যক্তিকে দীনার, দিরহাম ও পোশাক পরিচ্ছদের গোলাম বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং সংবাদ প্রদানের শব্দ ব্যবহার করে বদ দু'আর উদ্দেশ্য করেছেন। শব্দগুলো হলো, تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلا انْتَقَشَ। যারা নিজস্ব উদ্যোগে অকল্যাণ ও ফিতনার দিকে অগ্রসর হয়, তারা তাতে আক্রান্ত হয়। তাদের অবস্থা ঠিক এ রকমই। তারা তাতে আক্রান্ত হলে তা থেকে বের হতে পারে না। কেননা সে ব্যর্থ হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মূলত সে উদ্দেশ্য হাসিল তো করতে পারেই না; বরং তা হাসিল করতে গিয়ে যে বিপদে পড়ে, তা থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ পায় না। যারা ধন-সম্পদের মোহে পড়ে তাদের অবস্থা ঠিক এ রকমই। দুনিয়া পূজারীর অবস্থা হলো, তাকে যখন দেয়া হয় তখন খুশি হয় এবং দেয়া না হলে অসন্তুষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾

"হে নাবী! তাদের কেউ কেউ সাদকাহ বণ্টনের ব্যাপারে তোমার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাচ্ছে। এ সম্পদ থেকে যদি তাদের কিছু দেয়া হয় তাহলে তারা খুশি হয়, আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়"। (সূরা আত তাওবা: ৫৮)

সুতরাং তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য সন্তুষ্ট হয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য অসন্তুষ্ট হয়। এমনি যারা কোনো পদমর্যাদা কিংবা প্রশংসা অর্জনের পিছনে লেগে থাকে অথবা অনুরূপ প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে ব্যস্ত থাকে, তাদের অবস্থা হলো তারা যদি উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে, তাহলে তারা সন্তুষ্ট হয় এবং উদ্দেশ্য হাসিল না হলে অসন্তুষ্ট হয়। উপরোক্ত জিনিসগুলো থেকে এদের নফ্স যা চায়, তারা তার গোলামী করে এবং তারই ক্রীতদাসে পরিণত হয়। কেননা অন্তর-মন দিয়ে গোলামী করা এবং ইবাদত করাই প্রকৃত গোলামী ও ইবাদত। যে জিনিস কারো অন্তরকে গোলাম ও দাস বানিয়ে ফেলে অন্তর ওয়ালা তারই বান্দায় রূপান্তরিত হয়।

দুনিয়ার সম্পদ অন্বেষণকারীরা ঠিক এ রকমই। যে সবসময় মাল উপার্জনের পিছনে লেগে থাকে, মাল তাকে দাসে পরিণত করে এবং গোলাম বানিয়ে ফেলে। ধন-সম্পদ মূলত দুই প্রকার।

(ক) এমন সম্পদ, যার প্রতি বান্দার প্রয়োজন রয়েছে। পানাহার, বিবাহ-সাদি, বসতবাড়ী ইত্যাদির জন্য বান্দা মালের প্রতি মুখাপেক্ষী। এ জাতীয় প্রয়োজন মিটাতে বান্দার মালের প্রয়োজন হয়। সুতরাং সে আল্লাহর কাছে প্রয়োজন মোতাবেক মাল চাইবে এবং সেটা পাওয়ার জন্য আগ্রহী হবে। নিজের প্রয়োজন মোতাবেক মাল সংগ্রহ করার পর

বান্দা সেটাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। মালকে ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করবে, যেভাবে সে নিজের গাধাকে বশীভূত করে তার উপর আরোহণ করে এবং সেটাকে স্বীয় বিছানার মতো মনে করবে, যার উপর সে বসে। তবে মাল যেন তাকেই দাসে পরিণত না করে এবং মাল উপার্জনের জন্য সে যেন অস্থির না হয়।

(খ) আরেক প্রকার মাল হলো, যার প্রতি বান্দার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। এ শ্রেণির মালের প্রতি যেন বান্দার অন্তর ঝুকে না পড়ে। তার মন যখন এর প্রতি ঝুকে পড়ে, তখন সে মালের বান্দা হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এতে করে আল্লাহর ইবাদতের হাকীকত এবং তার উপর ভরসা করার হাকীকত তার সাথে বিদ্যমান থাকে না। বরং আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের একটি শাখা তার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করার একটি প্রবণতা তার মধ্যে এসে যায়।

এ শ্রেণির লোকের উপরই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের বাণীটি প্রযোজ্য হয়। তিনি বলেছেন,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيْلَةِ

"ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, ধ্বংস হোক দিরহামের গোলাম, ধ্বংস হোক উত্তম চাদরের দাস, ধ্বংস হোক নরম পোশাকের গোলাম!"

দুনিয়া লোভী লোকেরা উপরোক্ত জিনিসগুলোর বান্দায় পরিণত হয়। যদিও তারা এগুলো আল্লাহর কাছেই চায়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন এগুলো তাদেরকে দান করেন, তখন খুশি হয় আর না দিলে অসন্তুষ্ট হয়। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা যা পছন্দ করেন, তা পেয়েই যারা সন্তুষ্ট থাকে, তিনি যা অপছন্দ করেন, তারা তা অপছন্দ করে, তিনি ও তার রসূল যা ভালোবাসেন, যারা তা ভালোবাসে, তিনি ও তার রসূল যা ঘৃণা করেন, যারা তা ঘৃণা করে এবং তার বন্ধুদেরকে যারা বন্ধু বানায় তারাই আল্লাহর খাঁটি বান্দা। তারাই পরিপূর্ণ ঈমানদার। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার কথা এখানেই শেষ।

গ্রন্থকার বলেন, আমি বলছি, বর্তমান সময়ে যারা ধন-সম্পদের মোহে পড়ে হারাম লেন-দেন করে এবং অবৈধ ইনকামের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, তারা অর্থের গোলাম। যেমন সুদী ব্যাংক এবং সুদ ভিত্তিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যারা লেন-দেন করে, যারা ঘুষ, জুয়া খেলা, লেনদেনে প্রতারণা করে এবং মামলা-মুকাদ্দমায় মিথ্যা শপথ করার মাধ্যমে যারা অর্থ উপার্জন করে, তারাও অর্থের গোলাম। কেননা তারা জানে যে, এসব উপার্জন হারাম। কিন্তু অর্থের লোভ তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে এবং সেটা তাদেরকে দাসে পরিণত করেছে। এর ফলে তারা যে কোনো উপায়ে অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা করে।

আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের জন্য এবং আমাদের মুসলিম ভাইদের জন্য পার্থিব স্বার্থান্বেষণ, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং নিজস্ব মতকেই প্রাধান্য দেয়ার ফিতনা থেকে নিরাপত্তা কামনা করছি।

(৪) যামানা কিংবা অন্যান্য সৃষ্টিকে গালি দেয়াঃ

অভ্যাসগতভাবে কতিপয় মানুষ যেসব ভুল-ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়, আমরা তা থেকে আরো কতিপয় ভুল-ভ্রান্তি এখানে উল্লেখ করবো। এগুলো মানুষের তাওহীদকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয় এবং আক্বীদাকে নষ্ট করে ফেলে। যামানা, বাতাস এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিসকে গালি দেয়াও প্রচলিত ভুল-ত্রুটিগুলোর মধ্যে গণ্য। যেসব বিষয়ে সৃষ্টির কোনো ক্ষমতা নেই, ঐসব বিষয়ে সৃষ্টিকে দোষারোপ করা মানুষের অভ্যাসগত প্রচলিত ভুলের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এ দোষারোপ আল্লাহ তা'আলাকেই করা হয়। কেননা তিনিই এগুলোর একমাত্র স্রষ্টা এবং সবকিছুর পরিচালক। আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে বলেন,

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾

"অবিশ্বাসীরা বলে, 'শুধু দুনিয়ার জীবনই আমাদের আসল জীবন। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি। যামানা ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করে না। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে"। (সূরা জাসিয়াঃ ২৪)

যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছে তারা বলেছে, পার্থিব জীবনই আসল জীবন। আমরা বর্তমানে যে জীবনে আছি, তাই আসল জীবন। এ ছাড়া আর কোনো জীবন নেই। আমরা এতেই জীবিত থাকি এবং এতেই মৃত্যু বরণ করি। একদল লোক মৃত্যু বরণ করার পর আরেক দল লোক এখানে বসবাস করে। এ কথার মাধ্যমে তারা সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা ও পরিচালকের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে এবং মহাবিশ্বের সব ঘটনাকে তারা প্রকৃতির দিকে সম্বন্ধ করেছে। এ জন্যই তারা বলেছে, ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ "মহাকাল ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করে না"। দিবারাত্রির আবর্তন-বিবর্তনই আমাদেরকে নিঃশেষ করে ফেলে। তাই যামানাকে দোষারোপ করে তার দিকেই তারা নিজেদের ধ্বংসের সম্বন্ধ করেছিল। তারা মূর্খতাবশত অনুমান করে এ কথা বলেছিল। ইলম এবং দলীলের ভিত্তিতে তারা এটি বলেনি।

সুতরাং এটি একটি বাতিল কথা। দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত যে, সৃষ্টিজগতে যা কিছু ঘটে তার জন্য এক প্রজ্ঞাবান ও সক্ষম পরিচালক থাকা আবশ্যক। তিনি হলেন মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং যে ব্যক্তি যামানাকে গালি দিলো এবং সৃষ্টিজগতের কোনো কিছু তার দিকে সম্বন্ধ করলো, সে এ নিকৃষ্ট স্বভাবের ক্ষেত্রে মুশরিক ও বস্তুবাদীদের সাথে অংশগ্রহণ করলো। যদিও সে আক্বীদার মৌলিক বিষয়সমূহে তাদের অংশীদার নয়।

ছ্বহীহ বুখারী (হা/৪৮২৬), ছ্বহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য কিতাবে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

(يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»

“বনী আদম আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যামানাকে গালি দেয়। অথচ আমিই যামানা। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা। রাত-দিনকে আমিই পরিবর্তন করি”।[৮২] অন্য বর্ণনায় আছে, তোমরা যামানাকে গালি দিয়ো না। কারণ আল্লাহই হচ্ছেন যামানা।

হাদীছটি প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি যামানাকে গালি দিলো, সে আল্লাহ তা‘আলাকে কষ্ট দিলো। কেননা এতে করে সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপকের দিকেই গালি চলে যায়। যুগ কেবল সবকিছু ঘটার সময় এবং আজ্ঞাবহ সৃষ্টি মাত্র। পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় যামানার কোনো অংশ নেই। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, আমিই যামানা বা মহাকাল।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী, أنا الدهر “অথচ আমিই যামানা” -এ কথার ব্যাখ্যা হলো আমিই রাত ও দিন পরিবর্তন করি। فإن الله هو الدهر এ কথার অর্থও অনুরূপ। মোটকথা আল্লাহ তা‘আলাই যামানা এবং অন্যান্য সৃষ্টির পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। সুতরাং যে ব্যক্তি যামানাকে গালি দেয় সে মূলত যামানার স্রষ্টাকেই গালি দেয়। তিনি হলেন আল্লাহ তা‘আলা। কতিপয় সালাফ বলেছেন, জাহেলী যুগের আরবগণের অভ্যাস এই ছিল যে, তারা যামানাকে দোষারোপ করতো। বিভিন্ন রকম বিপদাপদের সময় যামানাকে গালি দিতো। তারা যখন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতো অথবা বালা মুছীবতে পড়তো, তখন বলতো যে, কালের দুর্বিপাক তাদেরকে মুছীবতে ফেলেছে এবং যামানা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা আরো বলতো, হে কালের ব্যর্থতা! এসব কথা কলে তারা নিজেদের ব্যর্থতাকে যামানার দিকে সম্বন্ধ করতো এবং যামানাকে গালি দিতো। অথচ যামানার স্রষ্টা কেবল আল্লাহ তা‘আলা। তাদের দুঃখ-কষ্টকে যখন তারা যামানার দিকে সম্বন্ধ করলো, তখন তারা মূলত আল্লাহ তা‘আলাকেই গালি দিলো। কেননা যামানার স্রষ্টা আল্লাহ তা‘আলা।

শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমাম ইবনে হায্ম এবং তার মতো যারা এ হাদীছের বাহ্যিক অর্থের উপর নির্ভর করে الدهرকে আল্লাহ তা‘আলার অতি সুন্দর নামের মধ্যে গণ্য করেছেন, তারা মারাত্মক ভুল করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা الدهر এর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমিই দিবারাত্রির পরিবর্তনকারী। দিবারাত্রি পরিবর্তন করার অর্থ হলো আল্লাহ তা‘আলা তাতে মানুষ যা পছন্দ করে কিংবা যা অপছন্দ করে, তা সবই তিনি ঘটিয়ে থাকেন। মুসলিমদের উচিত এ ধরনের শব্দ পরিহার করা। যদিও সে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তা‘আলাই একমাত্র সবকিছুর পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। কিন্তু এ ধরনের শব্দমালা ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমেই কাফেরদের সাদৃশ্য করা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। এর মাধ্যমেই আক্বীদা সংরক্ষণ করা এবং আল্লাহ তা‘আলার সাথে আদব রক্ষা

---

[৮২] আমিই যুগ বা মহাকাল- এ কথা থেকে বুঝা যায় না যে, الدهر দাহর আল্লাহর একটি নাম। কেননা হাদীছের শেষাংশে এর ব্যাখ্যা বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর হাতেই যুগের পরিবর্তনসহ সকল কিছুর ব্যবস্থাপনা, তিনিই দিন-রাত পরিবর্তন করেন।

করে চলা সম্ভব। বাতাসকে গালি দেয়াও যামানাকে গালি দেয়ার মতোই।

তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীছে বাতাসকে গালি দেয়ার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইমাম তিরমিযী উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করার পর সেটাকে ছ্বহীহ বলেছেন। উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। তোমরা যখন অপছন্দনীয় কিছু দেখবে, তখন বলবে,

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ»

"হে আল্লাহ! এ বাতাসের যা কল্যাণকর, এতে যে মঙ্গল নিহিত আছে এবং যতটুকু কল্যাণ করার জন্য সে অদিষ্ট হয়েছে ততটুকু কল্যাণ ও মঙ্গল আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আর এ বাতাসের যা অনিষ্টকর, তাতে যে অমঙ্গল লুকায়িত আছে এবং যতটুকু অনিষ্ট সাধনের ব্যাপারে সে আদিষ্ট হয়েছে তা থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি"।[৮৩]

বাতাসের কল্যাণ প্রার্থনা করা এবং বাতাসের অকল্যাণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার কারণ হলো, বাতাস আল্লাহর আদেশ এবং তারই ব্যবস্থাপনায় প্রবাহিত হয়। তিনি বাতাস সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই বাতাসকে প্রবাহিত হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং বাতাসকে গালি দেয়া এবং বাতাসের স্রষ্টাকে গালি দেয়া একই কথা। আল্লাহর আনুগত্য করা ও তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মাধ্যমেই নিয়ামত আগমন করে। আর আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া এবং তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার মাধ্যমে শাস্তি বিদূরিত হয়। এসব সৃষ্টিকে গালি দেয়ার মধ্যে অনেক ক্ষতি রয়েছে।

(ক) এতে করে যে গালির উপযুক্ত নয়, তাকে গালি দেয়া হয়ে থাকে। কেননা বাতাস সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর তা'আলার বশীভূত ও পরিচালনাধীন।

(খ) বাতাস বা অন্যান্য সৃষ্টিকে গালি দেয়ার মাধ্যমে শিরক হয়ে যায়। কারণ সে বাতাসকে এই মনে করে গালি দিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সেটা নিজস্ব ক্ষমতা বলে কারো ক্ষতি করতে পারে কিংবা উপকার করতে পারে।

(গ) সৃষ্টিকে গালি দেয়া হলে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, তার উপর গিয়েই গালি পতিত হয়। তিনি হলেন মহান আল্লাহ তা'আলা।

অপর দিকে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময় বান্দা যখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরামর্শ মেনে চলবে, যেখানে তিনি বলেছেন, তোমরা যখন বাতাস প্রবাহিত হতে দেখো, তখন বলবে,

[৮৩] ছ্বহীহ: তিরমিযী, অধ্যায়: বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ। হা/২২৫২।

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ»

"হে আল্লাহ! এ বাতাসের যা কল্যাণকর, এতে যে মঙ্গল নিহিত আছে এবং যতটুকু কল্যাণ করার জন্য সে অদিষ্ট হয়েছে ততটুকু কল্যাণ ও মঙ্গল আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আর এ বাতাসের যা ক্ষতিকর, তাতে যে অমঙ্গল নিহিত আছে এবং যতটুকু ক্ষতি সাধনের ব্যাপারে সে আদিষ্ট হয়েছে তা থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই"। বান্দা এভাবে বাতাসের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য তার স্রষ্টা, পরিচালক ও পরিবর্তনকারীর দিকে এভাবে আশ্রয় নিবে। এটিই হলো প্রকৃত তাওহীদ ও জাহেলী যামানার লোকদের আক্বীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থি সঠিক আক্বীদা।

সকল ক্ষেত্রেই সদাসর্বদা মুমিনের অবস্থা এমন হওয়া চাই। সবকিছুই সে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দিবে। আল্লাহর কাছে সে সেটার কল্যাণ চাইবে এবং সেটার অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য তার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কিন্তু বাতাসকে দোষারোপ করবে না, গালি দিবে না এবং বাতাসের সঠিক ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে অন্য কোনো ব্যাখ্যাও করবে না।

বান্দা জেনে রাখবে যে, সৃষ্টি থেকে সে অপ্রিয় যা কিছুর সম্মুখীন হয়, তা কেবল আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণ অনুযায়ী এবং বান্দার পাপ অনুযায়ী হয়ে থাকে। বান্দার পাপের কারণে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার উপর বিপদা-পদ ও মুছীবত চাপিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾

"তোমাদের উপর যে মসিবতই এসেছে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে এসেছে। বহু সংখ্যক অপরাধকে তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন" (সূরা শূরা: ৩০) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾

"আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন। ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর তিনি যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন। পরে একে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও তা থেকে বারিধারা নির্গত হয়"। (সূরা আর রূম: ৪৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾

"আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৪০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

"আল্লাহ দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটান। অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য এতে শিক্ষা রয়েছে"। (সূরা আন নূর: ৪৪)

আসলে ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে। সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর প্রশংসা করা, আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা রাখা এবং তাওবা করার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা আবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ "আমি ভালো ও খারাপ অবস্থায় নিক্ষেপ করার মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করতে থাকি, হয়তো তারা ফিরে আসবে"। (সূরা আল আরাফ: ১৬৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾

"ফেরাউনের লোকদেরকে আমি কয়েক বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও ফসল হানিতে আক্রান্ত করেছি। এ উদ্দেশ্যে যে, হয়তো তারা উপদেশ গ্রহণ করবে"। (সূরা আরাফ: ১৩০)

পৃথিবীতে অকল্যাণকর যা কিছু ঘটে, তার এটিই সঠিক ব্যাখ্যা। সুতরাং ভালোভাবে জেনে রাখবে, যেসব অপ্রিয় বস্তুর সম্মুখীন সে হয়ে থাকে, তা কেবল তার গুনাহর কারণেই। এতে তার নিজেকেই দোষারোপ করা উচিত। যামানাকে কিংবা বাতাসকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। অতঃপর আল্লাহর নিকট তাওবা করা আবশ্যক। কিন্তু কাফের, ফাসেক এবং মূর্খরা সৃষ্টিজগতের এসব বস্তুকে দোষারোপ করে থাকে। নিজের নাফ্সের হিসাব নেয় না এবং গুনাহ থেকে তাওবা করে না। যামানাকে দোষারোপ করে কোনো এক কবি বলেছেন,

يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولدا

ওহে মহাকাল! অকল্যাণ হোক তোমার! তুমি আমার স্বজনদের মধ্যে কাউকে অবশিষ্ট রাখোনি। তুমিই অকল্যাণের মূল। তুমি এমন নিকৃষ্ট পিতা, যে তার সন্তানকে খেয়ে ফেলে। আরেক কবি বলেন,

قبحا لوجهك يا زمان كأنه وجه له من كل قبح برقع

ওহে যামানা! বিভৎস হোক তোমার চেহারা। তোমার চেহারা এত কুৎসিত, যাকে সমস্ত কুৎসিৎ পর্দা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে।

আমরা আল্লাহর কাছে এ ধরনের কথা বলা থেকে নিরাপত্তা কামনা করছি এবং দীনের সঠিক জ্ঞান প্রার্থনা করছি।

(৫) কোনো কোনো অবস্থায় لو (যদি) শব্দ উচ্চারণ করা:

এমন কিছু শব্দ রয়েছে, যা উচ্চারণ করা মোটেই ঠিক নয়। কারণ এটি মানুষের আক্বীদা নষ্ট করে। বিশেষ করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে لَوْ শব্দটি ব্যবহার করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। মানুষ যখন অপ্রিয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় কিংবা মুছীবতে পড়ে তখন সে যেন এমন না বলে, আমি যদি এমন করতাম, তাহলে আমার এ বিপদ হতো না! আমি যদি এমন না করতাম, তাহলে আমার এমন হতো না। কেননা এ ধরনের কথার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বান্দার যা হাতছাড়া হলো এবং যা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় তাতে তার ধৈর্য নেই। সেই সঙ্গে যে ব্যক্তি لو শব্দটি উচ্চারণ করে, তার কথার মধ্যে আরো ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তাক্বদীর ও আল্লাহ তা'আলার ফায়ছালার প্রতি তার ঈমান নেই। এতে নিজের নফস্কে দোষারোপ করা এবং কুমন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তা প্রদানের জন্য শয়তানকে সুযোগ করে দেয়া হয়।

কোনো মুসলিমের উপর মুছীবত নেমে আসলে তাক্বদীরকে মেনে নেয়া এবং মুছীবতে ছ্বর করা আবশ্যক। তবে নিজের নফস্কে দোষারোপ না করে কল্যাণ আনয়নকারী উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা এবং অকল্যাণ প্রতিহতকারী ও অপ্রিয় বস্তু বিদূরিতকারী উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা জরুরী।

উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের উপর যে বিপদাপদ নেমে এসেছিল, তার কারণে যারা لو শব্দটি ব্যবহার করেছিল, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দোষারোপ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾

"তারা বলে, এ ব্যাপারে যদি আমাদের করণীয় কিছু থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না"। (সূরা আলে-ইমরান: ১৫৪)

উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলিমদের উপর যখন মুছীবত নেমে আসলো, তখন কতিপয় মুনাফেক তাক্বদীরের বিরোধীতা করে উপরোক্ত কথা বলেছে। শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য বের হওয়ার কারণে তারা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদেরকে দোষারোপ করছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন,

﴿قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾

"ওদেরকে বলে দাও, তোমরা যদি নিজেদের গৃহে অবস্থান করতে তাহলেও যাদের মৃত্যু লেখা হয়েছিল, তারা নিজেরাই নিজেদের বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে আসতো"। (সূরা আলে-ইমরান: ১৫৪) এটি হলো আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত তাক্বদীর, যা সংঘটিত হবেই। গৃহে অবস্থান করে এ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই।

মুছীবত আসার পর لو শব্দ ব্যবহার করলে আফসোস করলে দুঃশ্চিন্তা, নিজের নফ্সকে দোষারোপ করা এবং দুর্বলতা বৃদ্ধি করে। এতে করে মানুষের আক্বীদার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং তাদের মধ্যে তাক্বদীর না মানার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এসব মুনাফেকদের সম্পর্কে আরেকটি কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর মধ্যে তাদের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন,

﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ "এরা নিজেরা বসে থাকলো এবং এদের ভাই বন্ধুদের সম্পর্কে বললো, তারা যদি আমাদের কথা মেনে নিতো, তাহলে তারা নিহত হতো না"। (সূরা আলে ইমরান:১৬৮)

মুনাফেকরা উহুদ যুদ্ধের দিন এ কথা বলেছিল। বর্ণনা করা হয় যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাক্বদীরের উপর আপত্তি করে বলেছিল, তারা যদি আমাদের পরামর্শ মেনে নিয়ে নিজ নিজ গৃহে বসে থাকতো এবং উহুদের দিকে বেরিয়ে না যেতো, তাহলে তারা নিহত হতো না। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার প্রতিবাদ করে বলেছেন,

﴿قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

"তোমরা নিজেদের কথায় যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে তোমাদের নিজেদের মৃত্যু যখন আসবে তখন তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো"। (সূরা আলে ইমরান:১৬৮)

অর্থাৎ ঘরে বসে থাকা এবং যুদ্ধের ময়দানে না যাওয়াই যখন কারো মৃত্যু বরণ করা কিংবা নিহত হওয়া থেকে বেঁচে যাওয়ার কারণ, তাই তোমাদের মৃত্যু বরণ করা উচিত নয়। আসল কথা হলো তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের কাছে আসবেই। সুতরাং তোমাদের দাবিতে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো যে, যারা তোমাদের কথা মেনে নিবে, তারা মৃত্যু থেকে বেঁচে যাবে, তাহলে নিজেদের উপর থেকে মৃত্যু ঠেকিয়ে রাখো।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনে উবাই উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলিমদের জামা'আত থেকে কেটে পড়ার সময় বলল, মুহাম্মাদ আমার মত ও তার নিজের মত পরিহার করে শিশুদের মত গ্রহণ করে। এ কথা বলে সে নিজে কেটে পড়ল এবং তার সাথে আরো অনেকেই কেটে পড়ল। এসব মুনাফেকদের অনেকেই ইতিপূর্বে মুনাফেক ছিল না। তারা ছিল মুসলিম। তাদের ঈমানের আলো এত উজ্জ্বল ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তারা যদি উহুদ যুদ্ধের পূর্বে অথবা নিফাকী প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে মারা যেতো, তাহলে তারা ইসলামের উপরেই মৃত্যু বরণ করতো। আর এ মুনাফেকরা কখনো প্রকৃত মুমিন ছিল না। প্রকৃত মুমিনদেরকে পরীক্ষায় ফেলার পরও তারা ঈমানের উপর টিকে ছিল। তারা ঐসব মুনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যারা ফিতনায় নিপতিত হয়ে ঈমান ছেড়ে দিয়ে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। শাইখের কথা এখানেই শেষ।

মোটকথা মুছীবতের সময় لو শব্দ উচ্চারণ করা ঐসব মুনাফেকদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত, যারা তাক্বদীরের ফায়ছালার উপর ঈমান আনে না। মুসলিম যখন বিপদাপদ ও মুছীবতে আক্রান্ত হবে, তখন সে যেন এ শব্দটি উচ্চারণ করা থেকে দূরে থাকে। সে যেন এ শব্দের পরিবর্তে এমন ভালো শব্দ উচ্চারণ করে, যাতে আল্লাহর নির্ধারণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, ধৈর্য ধারণ করা ও ছাওয়াবের আশা করার অর্থ বিদ্যমান থাকে।

ছ্বহীহ মুসলিম আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের শব্দের প্রতিই নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন,

«الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»

“শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিনের চেয়ে অধিক ভালো ও প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। যে জিনিস তোমার উপকার সাধন করবে, তা অর্জন করার জন্য আগ্রহী হও এবং কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও। আর এ রকম যেন না হয় যে, তাক্বদীরের উপর ভরসা করে হাত গুটিয়ে অপারগ-অক্ষম হয়ে বসে থাকবে। কল্যাণকর ও উপকারী জিনিস অর্জনে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করার পরও যদি তোমার উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে, তবে কখনো এ কথা বলো না, যদি আমি এ রকম করতাম, তাহলে অবশ্যই এমন হতো; বরং তুমি বলো, আল্লাহ যা তাক্বদীরে রেখেছেন এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে। কেননা ‘যদি’ কথাটি শয়তানের কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয়”।[৮৪]

আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদের জন্য যেসব আমল ওয়াজিব, মুস্তাহাব কিংবা বৈধ করেছেন, তা থেকে যা করলে বান্দার দুনিয়া ও আখিরাতে উপকার হবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন। এসব কাজ করার সময় বান্দা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবে। যাতে করে আল্লাহ তা‘আলা বান্দার কাজ পূর্ণ করেন এবং তিনি তার মঙ্গল করেন। কেননা আল্লাহ তা‘আলাই বান্দার কর্মের স্রষ্টা এবং তিনি কর্মের ফলাফলেরও স্রষ্টা। উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে কর্ম সম্পাদন করা এবং আল্লাহ তা‘আলার উপর পূর্ণরূপে ভরসা করার মধ্যে রয়েছে তাওহীদের বাস্তবায়ন। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপারগ, অক্ষম ও দুর্বল হতে নিষেধ করেছেন। উপকারী আমল বর্জন করার মাধ্যমেই বান্দা অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করে থাকে। উপকারী আমলের বিপরীত করার নামই অপারগতা-অক্ষমতা। উপকারী আমল করতে আগ্রহী হওয়া এবং এর জন্য পরিশ্রম করার পরও যদি তার উদ্দেশ্যের বিপরীত হয় অথবা অপ্রিয় কিছু অর্জিত হয়, তাহলে সে যেন না বলে, আমি যদি এমন করতাম, তাহলে অবশ্যই এমন

[৮৪] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৬৪, অধ্যায়: শক্তিশালী হওয়া এবং অপারগতা প্রকাশ বর্জনের আদেশ।

হতো। কেননা এ ধরনের কথা কোনো উপকারে আসে না। এগুলো কেবল শয়তানের পথই সহজ করে দেয়। সেই সঙ্গে আফসোস করা এবং তাক্বদীরকে দোষারোপ করার প্রবণতা সৃষ্টি করে। আর এটি ধৈর্য ধারণ করা ও তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার পরিপন্থি।

মোটকথা মুছীবতে ছ্ববর করা ওয়াজিব। তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ফরয। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের প্রতি নির্দেশনা প্রদানকারী এবং উপকারী শব্দ উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন। বান্দা বলবে, قدر الله ما شاء فعل "এটিই আল্লাহর নির্ধারণ, তিনি যা ইচ্ছা করেছেন, তাই করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারণ করেছেন, তা হবেই। এ ক্ষেত্রে আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ফায়ছালা মেনে নেয়া। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা সম্পন্ন করেন। আর আল্লাহ তা'আলার কাজসমূহ হিকমত থেকে খালী নয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বান্দার কোনো জিনিস যখন হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন তার দু'টি অবস্থা হতে পারে।

(ক) দুর্বলতা, অসহায়ত্ব ও অপারগতা এবং অক্ষমতার প্রকাশ করার অবস্থা। এটি শয়তানের রাস্তা খুলে দেয়। দুর্বলতা, অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা-অপারগতা প্রকাশ করার কারণেই لو শব্দ উচ্চারিত হয়। আসলে لو শব্দ উচ্চারণে কোনো উপকারীতা নেই। বরং এটি দোষারোপের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

(খ) আর দ্বিতীয় অবস্থা হলো উদ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং তার প্রতি খেয়াল করা। কাম্য বস্তুটি যদি তার জন্য নির্ধারণ করা হতো, তাহলে তা কখনো তার হাতছাড়া হতো না এবং তাতে কেউ তাকে পরাভূত করতে পারতো না।

সুতরাং কাম্যবস্তু পাওয়া কিংবা না পাওয়ার অবস্থায় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বান্দাকে উপকারী কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি لو বলতে নিষেধ করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, সেটা শয়তানের পথ খুলে দেয়। সেই সঙ্গে তাতে রয়েছে হাত ছাড়া হওয়া জিনিসের জন্য অযথা আফসোস, দুঃখ-বেদনা, দুঃশ্চিন্তা-উদ্বেগ প্রকাশ করা এবং তাক্বদীরকে দোষারোপ করার প্রবণতা। এতে করে বান্দা গুনাহগার হয়। আর এটি শয়তানের কাজও বটে। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, শুধু لو শব্দ ব্যবহার করার কারণেই যে গুনাহগার হবে, তা নয়; বরং এর সাথে বান্দার অন্তরে ঈমানের পরিপন্থি যেসব বিষয় বিদ্যমান থাকে এবং যেসব বিষয় শয়তানের পথ উন্মুক্ত করে, তার কারণেই বান্দা গুনাহগার হয়।

যদি বলা হয়, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার ছাহাবীদেরকে বিদায় হজ্জের বছর হজ্জের ইহরাম ভঙ্গ করে উমরায় পরিণত করার আদেশ করেছিলেন, তখন তিনিও তো لو শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে ইহরাম ভঙ্গ করেননি। কারণ

তিনি কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে এসেছিলেন। এ কথার জবাব হলো, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ

“আমি এখন যা জানতে পেরেছি তা যদি পূর্বেই জানতে পারতাম তাহলে আমি কুরবানীর জন্তু সাথে আনতাম না”।[৮৫]

ভবিষ্যতে তিনি সুযোগ পেলে যা করবেন, সে সম্পর্কে এখানে একটি খবর দেয়া হয়েছে। তাক্বদীরের উপর কোনোভাবেই আপত্তি করা হয়নি। বরং এখানে তিনি তার সাথীদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি যদি আগে শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধতেন, তাহলে কুরবানীর জন্তু সাথে আনতেন না। বরং শুধু উমরার ইহরাম বাঁধতেন। তিনি যখন ছাহাবীদেরকে হজ্জের ইহরাম ভঙ্গ করে উমরা করার পর হালাল হয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে তারা এ নির্দেশ পালনে বিরত রয়েছে। তাই তিনি উৎসাহ দিয়ে তাদের মনকে খুশী করার জন্যই উপরোক্ত কথা বলেছেন।

সুতরাং এখানে لو শব্দ ব্যবহার করা মোটেই দোষণীয় ছিল না। বরং ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে যা করবেন, এখানে ছাহাবীদের জন্য তিনি তাই ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এ অর্থে لو ব্যবহার করা বৈধ হওয়াতে কোনো মতভেদ নেই। তাক্বদীরের প্রতি আপত্তি করতে গিয়েই কেবল لو ব্যবহার করার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

[৮৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬৫১, সুনানুল কুবরা বাইহাকী।

الصبر ومنزلته في العقيدة

আক্বীদার মধ্যে ছ্ববরের স্থান

ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম لو (যদি) শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন বিশেষ করে মানুষ যখন মুছীবতে আক্রান্ত হয়। মুছীবতের সময় মানুষের উপর আবশ্যক হলো ছ্ববর করা এবং এর বিনিময়ে ছাওয়াবের আশা করা।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা তার কিতাবের নব্বই স্থানে ছ্ববরের কথা উল্লেখ করেছেন। ছ্বহীহ হাদীছে এসেছে, الصَّبْرُ ضِيَاءٌ “ ছ্ববর জ্যোতিস্বরূপ”।[৮৬]

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ “ ছ্ববরের মাধ্যমেই আমরা সর্বোত্তম জীবন লাভ করেছি”।[৮৭]

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, দেহের মধ্যে মাথার মর্যাদা যেমন ঈমানের মধ্যে ছ্ববরের মর্যাদা ঠিক সেরকমই। অতঃপর তিনি আওয়াজ উঁচু করে বললেন, জেনে রাখো! যার ছ্ববর নেই, তার ঈমান নেই”। ইমাম বুখারী ও মুসলিম মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ছ্ববরের চেয়ে উত্তম অনুদান কাউকে প্রদান করা হয়নি।

الصبر শব্দটি صَبَرَ থেকে গৃহীত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ বাধা প্রদান করা ও বিরত রাখা। যখন বাধা প্রদান করা হয় ও বিরত রাখা হয় তখন আরবীতে বলা হয় صبر। অধৈর্যতা-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা থেকে নফ্সকে বিরত রাখা, অভিযোগ পেশ করা, বিরক্তি প্রকাশ করা থেকে জবানকে বিরত রাখা এবং মুছীবতে পড়ে গালে চপেটাঘাত করা এবং জামা ছিড়ে ফেলা থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে বিরত রাখাকে الصبر বলা হয়।

ছ্ববর তিন প্রকার:

১. আল্লাহ তা‘আলা যা আদেশ করেছেন তা পালন করতে গিয়ে ছ্ববর করা,
২. তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করার ক্ষেত্রে ছ্ববর করা এবং
৩. তাক্বদীর অনুযায়ী যেসব মুছীবত আসে তাতে ছ্ববর করা।

---

[৮৬] মুসনাদে আহমাদ, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৩।

[৮৭] ছ্বহীহ বুখারী, ৬৪৭০ নং হাদীছের অধ্যায়ে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত"। *(সূরা তাগাবুন: ১১)*

আলকামা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আয়াতে এমন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে মুছীবতের সময় বিশ্বাস করে, এটি আল্লাহর পক্ষ হতেই। অতঃপর তাতে সন্তুষ্ট থাকে এবং তাক্বদীরকে মেনে নেয়। অন্যরা আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুছীবতে আক্রান্ত হয়ে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, এটি আল্লাহ নির্ধারণ অনুযায়ী হয়েছে। অতঃপর সে ছ্বর করে, ছাওয়াব কামনা করে এবং আল্লাহর ফায়ছালার সামনে আত্মসমর্পন করে, আল্লাহ তার অন্তরকে হিদায়াত করেন। সেই সঙ্গে দুনিয়ার সম্পদ থেকে যা তার হাত ছাড়া হয়ে যায়, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে হিদায়াত এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস প্রদান করেন। কখনো কখনো তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া জিনিস ফেরত দেয়া হয়।

সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সুপথ প্রদর্শন করেন", এর অর্থ হলো হাতছাড়া হওয়া জিনিস কেবল সে আল্লাহ তা'আলার কাছেই ফেরত চায় এবং ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন পাঠ করে।

উপরোক্ত আয়াতে দলীল পাওয়া যায় যে, আমলসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং ধৈর্যধারণ করা অন্তরের হিদায়াত লাভের মাধ্যম। মুমিন ব্যক্তি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ছ্বরের প্রতি মুহতাজ। আল্লাহর আদেশগুলো বাস্তবায়ন করা এবং তার নিষেধগুলো থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে তার নফস্কে ধৈর্যধারণ করার উপর বাধ্য করা আবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে বান্দা যেসব কষ্টের সম্মুখীন হয়, তাতে সে ছ্বরের প্রতি মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

"হে নাবী! প্রজ্ঞা এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমার রবের পথে মানুষকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই অধিক জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং কারা সঠিক পথে রয়েছে, এ বিষয়ে তিনিই

সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তাহলে ঠিক ততটুকু গ্রহণ করবে যতটুকু অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো, তাহলে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের জন্য সেটিই উত্তম। তুমি ধৈর্যধারণ করো। তোমার ধৈর্যধারণ তো হবে আল্লাহর সাহায্যেই"। (সূরা আন নাহাল: ১২৫-১২৭)

সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মানুষের তরফ থেকে যেসব যুলুম-নির্যাতন আসে তাতেও ছ্ববর করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা লুকমান 'আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾

"হে বৎস! যথারীতি ছ্বলাত কায়েম করো। সৎকাজের নির্দেষ দাও, অসৎকাজে বাধা দান করো এবং আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় এটি দৃঢ় সংকল্পের কাজ"। *(সূরা লুকমান: ১৭)*

পার্থিব জগতে মুমিন বান্দা যেসব মুছীবতের সম্মুখীন হয়, তাতে সে ছ্ববরের মুখাপেক্ষী। এ ক্ষেত্রে তাকে জানতে হবে যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ হতেই। অতঃপর সে সন্তুষ্ট থাকবে ও তাক্বদীরকে মেনে নিবে। বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করা থেকে নিজের নফ্সকে বিরত রাখবে। বিশেষ করে যখন জবান ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হওয়ার উপক্রম হবে, তখন জবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

এটি আক্বীদার অন্যতম মূল বিষয়। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের ছয় রুকনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করা এর সুফল। মুছীবতে পড়ে বান্দার ধৈর্যধারণ করতে না পারা ঈমানের এ রুকনের প্রতি তার ঈমান না থাকার প্রমাণ কিংবা এর প্রতি তার ঈমানী দুর্বলতার পরিচয়। পরিণামে সে আপদে-বিপদে অধৈর্যতা, অস্থিরতা ও বিরক্তি প্রকাশ করবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এটি এমন কুফুরী, যা ইসলামী আক্বীদাকে নষ্ট করে ফেলে।

ছ্বহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«اِثْنَتَانِ فِيْ النَّاس هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ»

"মানুষের মধ্যে এমন দু'টি মন্দ স্বভাব রয়েছে যা দ্বারা তাদের কুফুরী প্রকাশ পায়। একটি হচ্ছে মানুষের বংশের মধ্যে দোষ লাগানো, অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা"।[৮৮]

[৮৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬৭, অধ্যায়: বিলাপ করার ভয়াবহতা।

এ দু'টি স্বভাব কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা তা জাহেলী যামানার লোকদের স্বভাব ছিল। তবে যার মধ্যে কুফুরীর কোনো স্বভাব পাওয়া যায় সে সম্পূর্ণরূপে কাফের হয়ে যায় না। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণী:ليس بين العبد وبين الكفر أوالشرك إلا ترك الصلاة এর মধ্যে আলিফ-লামযুক্ত মারেফা (নির্দিষ্ট) الكفر শব্দটি এবং আলিফ-লাম ছাড়া নাকেরা (অনির্দিষ্ট) كفر শব্দটির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেখানে كفر শব্দটির সাথে আলিফ-লাম যুক্ত হয়ে الكفر হবে, সেখানে উদ্দেশ্য হবে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যাওয়া। আর আলিফ-লাম ছাড়া আসলে সেরকম অর্থ হবে না এবং সেই কুফুরী মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।

বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»

"যে ব্যক্তি মুছীবতে পড়ে স্বীয় গালে চপেটাঘাত করে, বুকের জামা ছিড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"।[৮৯]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: «وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ » "জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার করে" এর ব্যাখ্যায় আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: জাহেলী যামানার চিৎকার বলতে এখানে জাতীয়তাবাদ এবং গোত্র প্রীতির দিকে আহবান করার কথা বলা হয়েছে। এমনি মাযহাব, দল এবং শাইখদের জন্য গোঁড়ামি করাও জাহেলিয়াতের আহবানের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ কোনো শাইখকে অন্য কারো উপর প্রাধান্য দিয়ে তার দিকে আহবান করা, এর উপর ভিত্তি করেই কাউকে বন্ধু বানানো, কাউকে শত্রু বানানো। এ সবগুলোই জাহেলিয়াতের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা এক মহান উদ্দেশ্যে তার বান্দাদেরকে বিভিন্ন আপদ-বিপদ ও মুছীবত দ্বারা আক্রান্ত করে থাকেন।

(১) এর মাধ্যমে মানুষের গুনাহ-খাতা মাফ হয়। আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَفَّى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"আল্লাহ তা'আলা যখন তার কোনো বান্দার মঙ্গল করতে চান, তখন দুনিয়াতেই তার অপরাধের শাস্তি দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন তার কোনো বান্দার অমঙ্গল করতে

[৮৯] বুখারী, অধ্যায়: যে ব্যক্তি মুছীবতে পড়ে গাল চাপড়ায় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

চান, তখন দুনিয়াতে তার পাপের শাস্তি দেয়া হতে বিরত থাকেন, যেন ক্বিয়ামতের দিন তাকে পূর্ণরূপে শাস্তি দেন"।[৯০] ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম হাসান বলেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বিপদ-আপদ এক প্রকার নিয়ামত। কেননা এটি বান্দার গুনাহসমূহ মোচন করে দেয়। আর এটি ছ্ববরের আহবান জানায়। ছ্ববর করলে ছাওয়াব প্রদান করা হয়। মুছীবত মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে, তার জন্য নতি স্বীকার করায় এবং সৃষ্টি থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে এনে আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত করে। এ ছাড়াও মুছীবতের মাধ্যমে আরো অনেক স্বার্থ হাসিল হয়। সুতরাং বালা-মুছীবতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা গুনাহ-খাতা ও ভুল-ভ্রান্তি মিটিয়ে দেন। এটি একটি বিরাট নিয়ামত। সুতরাং মুছীবত সমস্ত সৃষ্টির জন্যই বিরাট একটি রহমত ও নিয়ামত। কিন্তু বিপদগ্রস্ত বান্দা বিপদে পড়ে পূর্বের চেয়ে বড় গুনাহয় লিপ্ত হলে বান্দা দীনের দিক থেকে যে ক্ষতির মধ্যে পড়ে, সে কারণে আপদ-বিপদ তার জন্য ক্ষতিকর হয়। কেননা কতক মানুষ বালা- মুছীবতে পড়ে যখন ফকীর হয় অথবা অসুস্থ হয় কিংবা ব্যথিত হয়, তখন সে মুনাফেকী করে, অধৈর্য হয়, তার অন্তর অসুস্থ হয় এবং তার থেকে প্রকাশ্য কুফুরী দেখা দেয়। সেই সঙ্গে সে বেশ কিছু ওয়াজিব আমলও ছেড়ে দেয় এবং এমন কিছু হারাম কাজে লিপ্ত হয়, যা তার দীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মুছীবতের কারণে যে ফলাফল অর্জিত হয়, তা বান্দার জন্য ভালো হয়। বিশেষ করে যখন সে দীনের ব্যাপারে ফিতনায় পড়া থেকে নিরাপদ থাকে। কিন্তু নিছক মুছীবত ভালো নয়; বরং ভালো ফলাফল অর্জিত হওয়ার দিক থেকে ভালো। যেমন মুছীবতে পড়ে কেউ ধৈর্যধারণ করতে পারলে ও আনুগত্যের পথে অগ্রসর হতে পারলে তার জন্য মুছীবত দীনি নেয়ামতে পরিণত হয়। সুতরাং মুছীবত সৃষ্টি করা যেহেতু আল্লাহর কাজ সে হিসাবে সেটা সমস্ত মাখলুকের জন্য রহমত স্বরূপ। এর কারণে আল্লাহ তা'আলা প্রশংসিত হন। বালা- মুছীবতে পড়ে যে ধৈর্য ধারণ করতে পারে, তার জন্য তা দীনি নেয়ামতে পরিণত হয়। বালা-মুছীবত তার গুনাহর কাফফারা হওয়ার সাথে সাথে সেটা রহমত স্বরূপ হয় এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সে প্রশংসার পাত্র হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾

"তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ্র অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হিদায়াতপ্রাপ্ত"। (সূরা আল বাকারা: ১৫৭)

সুতরাং মুছীবত গুনাহ মাফের কারণ এবং বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম। যেসব ক্ষেত্রে ছ্ববর করা ওয়াজিব সেসব ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে তার জন্য উপরোক্ত ফযীলত

[৯০] তিরমিযী, ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীছকে হাসান বলেছেন। দেখুন: সিলসিলা ছ্বহীহা, হা/১২২০।

অর্জিত হয়। পৃথিবীতে বালা- মুছীবত ও আপদ-বিপদ প্রেরণের পিছনে আল্লাহ তা'আলার হিকমত হলো এগুলোর মাধ্যমে বান্দাদেরকে পরীক্ষা করা। তিনি দেখতে চান কে ছ্ববর করে এবং সন্তুষ্ট থাকে আর কে অসন্তুষ্ট হয় এবং বিরক্তি প্রকাশ করে।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

"পরীক্ষা যত কঠিন হয়, পুরস্কারও তত বড় হয়। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন। এতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার প্রতিও রয়েছে অসন্তুষ্টি"।[৯১] ইমাম তিরমিযী রহি. হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাসান বলেছেন।

মুছীবতে পড়ে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হলো বান্দা তার ব্যাপারটি আল্লাহর নিকট সোপর্দ করবে, আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করবে এবং তার নিকট ছাওয়াব কামনা করবে। আর তাতে অসন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ হলো কোনো জিনিসকে অপছন্দ করা এবং তাতে সন্তুষ্ট না থাকা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থা ও পরিচালনাধীন কোনো জিনিসের প্রতি অসন্তুষ্ট হলো, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অসন্তুষ্টি রয়েছে।

এ হাদীছে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বান্দার কর্ম যেমন হয়, ফলাফল তেমনই হয়ে থাকে। এতে আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতে অন্যান্য ছিফাতের মতই সন্তুষ্ট হওয়া বিশেষণ সাব্যস্ত। এখান থেকে বালা-মুছীবত ও আপদ-বিপদ আসার পিছনে আল্লাহ তা'আলার হিকমত থাকার কথাও জানা গেল। সে সঙ্গে ক্বদ্বা ও ক্বদর তথা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণ এবং ফায়ছালার কথাও জানা গেলো। তার নির্ধারণ অনুপাতেই বিপদ-আপদ ও মুছীবত আসে। মুছীবতের সময় ছ্বর করা, আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া, এবং তার উপর ভরসা করা আবশ্যক। মোটকথা সমস্ত বিপর্যয়, দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর বিষয় প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করা আবশ্যক। পার্থিব জীবনে মানুষ যেসব দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, তাতে আল্লাহ তা'আলা ছ্বর ও ছ্বলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করার আদেশ করেছেন। কেননা এর পিছনে শুভ পরিণাম রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছ্বলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন"। (সূরা আল বাকারা: ১৫৩)

---

[৯১] তিরমিযী, হা/২৩৯৬। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীছকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: সিলসিলা ছ্বহীহা, হা/১৪৬।

এ রকম আরো দলীল রয়েছে, যাতে ছ্ববরের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। মুমিন বান্দার রয়েছে এর বিশেষ প্রয়োজন। কেননা ছ্ববর মুমিনের আক্বীদাকে শক্তিশালী করে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ছ্ববর করা এবং আখিরাতে ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে আমল করার তাওফীক দেন।

بيان ألفاظ لايجوز أن تقال في حق الله تعالى تعظيما لشأنه

আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে তার জন্য অশোভনীয় শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নয়

আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে মহান ও সবচেয়ে বড়। তার প্রতি বড়ত্ব ও মর্যাদা প্রদর্শন করা আবশ্যক। এমন কিছু শব্দ আছে, যা তার প্রতি সম্মান, মর্যাদা ও বড়ত্ব প্রদর্শনের জন্যই তার শানে ব্যবহার করা বৈধ নয়। তাই আল্লাহ তা'আলার জন্য এসব শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

(১) এ কথা বলা যাবে না যে, السلام على الله "আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক"। কেননা সালাম দেয়ার মাধ্যমে একজন মুসলিম আরেক মুসলিমের জন্য দু'আ করে। সালামের মাধ্যমে মুসলিমের জন্য অকল্যাণ থেকে নিরাপত্তা কামনা করা হয়। আর আল্লাহর কাছেই এটা প্রার্থনা করা হয়; আল্লাহর জন্য নয়। আল্লাহর কাছে দু'আ করা হয়; আল্লাহর জন্য নয়। কেননা তিনিই সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণকারী, আসমান-যমীনের সবকিছুই তার হাতে। তিনি প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং শান্তি ও নিরাপত্তা দানকারী। তিনিই সালাম এবং তার নিকট থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা আগমন করে।

ছ্বহীহ বুখারীতে ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন,

«كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ»

"আমরা যখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছ্বলাতে থাকতাম, তখন বলতাম, আল্লাহর উপর তার বান্দাদের পক্ষ থেকে সালাম, অমুক অমুকের উপর সালাম এবং অমুক ব্যক্তির উপর সালাম। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর উপর সালাম, এমন কথা বলো না। কেননা আল্লাহ নিজেই সালাম।[৯২] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত।

আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, السلام শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যেসব শব্দের মাধ্যমে দু'আ করা হয়, السلام তার অন্তর্ভুক্ত। এতে দু'আ করা এবং সংবাদ প্রদান করা উভয় অর্থই বিদ্যমান রয়েছে। তবে সংবাদ প্রদান করা উদ্দেশ্য হলে কামনা করা অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সম্ভাষণ বিনিময় করার সময় এ শব্দ দ্বারা দু'আ করা ও নিরাপত্তা কামনা করা অর্থই উদ্দেশ্য হয়।

---

[৯২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৩২৮, অধ্যায়: ছ্বলাতে দু'আ করা।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আরো বলেন, সালাম দেয়ার সময় যেহেতু শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করা হয় এবং এদুটো বিষয়ই যেহেতু বান্দার নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এটা কামনা করার সময় আল্লাহ তা'আলার এমন একটি নাম বাছাই করা হয়েছে যাতে শান্তি ও নিরাপত্তার অর্থ বিদ্যমান। এটি হচ্ছে السلام। আমরা আল্লাহ তা'আলার এ অতি সুন্দর নামের মাধ্যমে নিরাপত্তা কামনা করি। এটি উচ্চারণ করার মাধ্যমে এক সঙ্গে দু'টি কাজ সম্পন্ন হয়। প্রথমত: আল্লাহর যিকির করা হয়, দ্বিতীয়ত: তার নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করা হয়। মুসলিমের এটিই কাম্য হওয়া চাই।

আরো যেসব শব্দ আল্লাহ তা'আলার শানে ব্যবহার করা জায়েয নয়, তা হলো এভাবে বলা যে, اللهم اغفر لي إن شئت "হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে মাফ করো"। সুতরাং আল্লাহর কাছে কোনো প্রয়োজন পূরণার্থে দু'আ করার সময় দু'আ কবুল হওয়ার বিষয়টি তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া যাবে না; বরং দৃঢ়তার সাথে দু'আ করতে হবে।

ছ্বহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ»

"তোমাদের কেউ যেন দু'আ করার সময় এভাবে না বলে, হে আল্লাহ্! তুমি যদি চাও তাহলে আমাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ্! তুমি যদি চাও তাহলে আমার উপর রহমত নাযিল করো; বরং সে যেন দৃঢ়তার সাথে দু'আ করে। কেননা আল্লাহ্কে বাধ্য করার কেউ নেই"।[৯৩] মুসলিমের উচিত, বড় আশা নিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া। কেননা আল্লাহ তা'আলা যা দেন তা কখনো তার নিকট বেশী বলে গণ্য হয় না। দুই কারণে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করার সময় উপরোক্ত কথা বলা নিষেধ।

(১) আল্লাহ তা'আলার কাজে তাকে বাধ্য করার কেউ নেই। বরং তিনি যা করেন, তার ইচ্ছাতেই করেন। তিনি বান্দার বিপরীত। কেননা বান্দারা কখনো অপছন্দ সত্ত্বেও কোনো কোনো কাজ করে। তারা কখনো অন্যের ক্ষতির আশঙ্কায় কিংবা অন্যের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় কাজ করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এমন নন।

(২) বান্দার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য দু'আ করতে গিয়ে আল্লাহর ইচ্ছার উপর কাম্যবস্তু ছেড়ে দেয়া প্রমাণ করে যে, আসলে কাম্যবস্তুটি চাওয়ার মধ্যে বান্দার দুর্বলতা রয়েছে এবং তাতে তার আগ্রহ কম। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, বান্দা যা চাচ্ছে, তা পেলে ভালো, অন্যথায় সেটাতে তার কোনো প্রয়োজন নেই। দু'আর মধ্যে এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করা প্রমাণ করে যে, বান্দা আল্লাহ থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী।

---

[৯৩] বুখারী, অধ্যায়: দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দুআ করবে, হা/৬৩৩৯।

উপরে অতিক্রান্ত ছ্বহীহ মুসলিমের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর কাছে বড় বড় জিনিস চাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। বান্দা যত জিনিসই প্রার্থনা করুক, আল্লাহ তা'আলার কাছে তা মোটেই বড় নয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে যাই দান করেন, তার কাছে সেটা বড় বলে গণ্য হয় না এবং সেটা দান করা তার উপর মোটেই কঠিন নয়। তার নিকট কোনো কিছুই বড় নয়। যদিও তা সৃষ্টির নিকট বড় বলে বিবেচিত হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দান পূর্ণতম এবং তার ধন-ভাণ্ডার অফুরন্ত। তিনি বড় বড় জিনিস বান্দাদেরকে দান করেন। কোনো কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

"তিনি যখন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন, হও তখনই তা হয়ে যায়"। (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৮২)

আরো যেসব শব্দ আল্লাহ তা'আলার শানে ব্যবহার করা ঠিক নয়, তা হলো আল্লাহর নামে এ বলে শপথ করা যে, তিনি অমুক ভালো কাজটি করবেন না কিংবা তিনি অমুক কাজটি করবেন না অথবা অমুক অপরাধীকে ক্ষমা করবেন না। এভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে তার অনুগ্রহকে সংকীর্ণ করে দেয়া বৈধ নয়।

জুনদুব ইবনে আব্দুলাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«قال رَجُلٌ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرِ اللَّهُ لِفُلَانٍ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَلَّا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ»

"এক ব্যক্তি বললো, আল্লাহর কসম, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, কে এ ব্যক্তি, যে আমার নামে কসম করে বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করবো না? আমি অমুককেই ক্ষমা করে দিলাম। আর তোমার আমল বাতিল করে দিলাম"। ইমাম মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[৯৪]

التَّأَلِّيْ শব্দটি الألية থেকে নেয়া হয়েছে। الألية এর 'ইয়া' বর্ণে তাক্বদীদ দিয়ে পড়া হয়েছে। এর অর্থ হলো শপথ করা। সুতরাং يتألَّى অর্থ يحلف (সে শপথ করে। আল্লাহ তা'আলার বাণী, من ذا الذي يتألَّى "কে এ ব্যক্তি, যে আমার নামে কসম করে?" এখানে প্রশ্নবোধক বাক্যের মাধ্যমে উপরোক্ত পদ্ধতিতে আল্লাহর নামে কসম করার দুঃসাহসিকতা দেখানোর প্রতিবাদ করা হয়েছে।

[৯৪] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬২১।

যে লোকটি আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছিল, অমুক ব্যক্তিকে তিনি ক্ষমা করবেন না, সে আল্লাহর সাথে বেয়াদবী করেছে। সে আল্লাহর উপর অকাট্যভাবে হুকুম লাগিয়ে দিয়েছে যে, তিনি অমুক অপরাধীকে ক্ষমা করবেন না। সে আল্লাহ তা'আলার রুবূবীয়াতের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা, নিজের নফ্সের প্ররোচনা, স্বীয় আমল নিয়ে গর্ব করার কারণেই এ কথা বলেছে। এ কারণে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত ফলাফল প্রদান করা হয়েছে এবং তার কথার কারণেই অপরাধী লোকটিকে ক্ষমা করা হয়েছে। ঐদিকে নিকৃষ্ট কথার কারণে তার আমল বরবাদ করে দেয়া হয়েছে। অথচ সে একজন ইবাদতকারী বান্দা ছিল।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সে এমন কথা বলেছে, যার কারণে তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টি নষ্ট হয়ে গেছে। উপরোক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কথায় ও কাজে আল্লাহ তা'আলার সাথে আদব রক্ষা করে চলা ওয়াজিব। হাদীছ থেকে আরো জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহর উপর বাহাদুরি করা, নফ্সের দাম্ভিকতা প্রদর্শন করা এবং অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করা হারাম।

আল্লাহ তা'আলার নামে কেবল তখনই কসম করা হারাম হবে, যখন কসমে তার উপর কোনো বিষয়কে হারাম ও সীমাদ্ধ করে দিয়ে এভাবে বলা হবে যে, তিনি তার অমুক বান্দার কল্যাণ করবেন না। তবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করে এবং তার নিকট থেকে কল্যাণের আশা করে যদি কসম করা হয়, তাহলে জায়েয আছে। হাদীছে এসেছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ»

"আল্লাহর কিছু বান্দা এমন আছে যে, তারা কেনো বিষয়ে আল্লাহর নামে শপথ করলে তিনি তা পূরণ করার ব্যবস্থা করেন"।[৯৫]

ঐদিকে জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছে জবানের ভয়াবহ আপদ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা থেকে জবানকে হেফাযত করার আদেশ এসেছে। মুআয ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ!

«وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»

"আমরা জবান দিয়ে যেসব কথা বলি, তার জন্যও কি আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, হে মুআয! আফসোস তোমার জন্য। লোকদের জবানের অসংযত কথা-বার্তাই তাদেরকে নাক এবং মুখের উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে"।[৯৬] ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করার পর সেটাকে ছ্বহীহ বলেছেন।

---

[৯৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭০৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৭৫, ইবনে মাজাহ হা/২৬৪৯

[৯৬] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২৬১৬।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, কথা-বার্তায় সংযমী হওয়া আবশ্যক এবং যেসব কথার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার শানে বেয়াদবী রয়েছে, তা থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব। কেননা এ জাতীয় কথা মানুষের আক্বীদা নষ্ট করে ফেলে এবং তাওহীদে ঘাটতি আনয়ন করে। সুতরাং السلام على الله বলা যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলাই সালাম। কেননা কাউকে সালাম দেয়া মানে তার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার দু'আ করা। আল্লাহর কাছেই দু'আ করা হয়, তার জন্য নয়। এ কথাও বলা যাবে না যে,

«اللهم اغفر لي وارحمني إن شئت»

"হে আল্লাহ তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার উপর রহম করো। অনুরূপ অন্যান্য বাক্যও ব্যবহার করা যাবে না"।

বরং প্রত্যেক দু'আ দৃঢ়তার সাথে কবুলের আশা নিয়ে করতে হবে। কবুল করা বা না করার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলে হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি কাজ নিজ ইচ্ছায় সম্পন্ন করেন। তার উপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সেই সঙ্গে আল্লাহর নামে শপথ করে বলা যাবে না যে, তিনি অমুকের উপর রহম করবেন না কিংবা অমুককে ক্ষমা করবেন না। কেননা এরূপ কথা বিপদজনক এবং আল্লাহর রহমতকে আটকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা ও তার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করার অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপ «ما شاء الله وشاء فلان» "যা আল্লাহ চান এবং অমুক যা চায়" বলাও বৈধ নয়। বরং বলা উচিত «ما شاء الله ثم شاء فلان» "আল্লাহ্ যা চান অতঃপর অমুক যা চায়"। কেননা واو দ্বারা একটি বিষয়কে অন্য একটি বিষয়ের উপর আতফ করলে তথা দু'টি শব্দের মাঝখানে واو আনয়ন করলে এর দ্বারা দু'টি বস্তুকে সমান করে দেয়া উদ্দেশ্য হয়।

আর কেউ কোনো বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে সমান নয় কিংবা তার সমকক্ষ কেউ নেই। واو এর বদলে ثم দ্বারা আতফ করা হলে কোনো দোষ নেই। কেননা ثم শব্দটি একই সঙ্গে ধারাবাহিকতা ও বিলম্বের অর্থ প্রদান করে। সুতরাং উপরোক্ত পদ্ধতি বর্জন করে যদি বলা হয়

«ماشاء الله ثم شاء فلان»

"আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছে", তাহলে বুঝা যাবে যে, আল্লাহর ইচ্ছার পর বান্দার ইচ্ছা হয়েছে। এভাবে বললে কোনো অসুবিধা নেই। এতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, বান্দার ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার অনুগামী এবং আল্লাহর ইচ্ছার পরেই বান্দার ইচ্ছা কার্যকর হয়ে থাকে।

বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে অংশগ্রহণকারী নয়। কেননা গঠণের দিক থেকে ثم শব্দটির মাধ্যমে দু'টি বিষয়কে একত্রিত করা উদ্দেশ্য হলেও তাতে সময়ের ব্যবধান থাকে। বান্দার ইচ্ছা আর আল্লাহর ইচ্ছা সমান হওয়া তো দূরের কথা; আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত বান্দার ইচ্ছার কল্পনাও করা যায় না।

উপরোক্ত বিষয় থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, মুসলিমদের ছ্বহীহ আক্বীদা জানা আবশ্যক। যেসব জিনিস আক্বীদাকে সংশোধন করে এবং যা আক্বীদা নষ্ট করে ফেলে তাও ভালোভাবে জানা আবশ্যক। এতে দীনের ব্যাপারে সে সুস্পষ্ট ধারণার উপর থাকতে পারবে এবং না জানার কারণে কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হবে না। হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে উপকারী ইলম এবং সৎ আমলের তাওফীক দাও।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

توحيد الأسماء والصفات

তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত

আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলি সম্পর্কিত তাওহীদ

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, তাওহীদ তিন প্রকার:

(১) তাওহীদুর রুবূবীয়া

(২) তাওহীদুল উলূহীয়া এবং

(৩) তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত।

উপরোক্ত তিন প্রকার তাওহীদের মধ্য থেকে প্রথম দুই প্রকারের আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি। তাওহীদুর রুবূবীয়া ও তাওহীদুল উলূহীয়া সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ দুই প্রকার তাওহীদের প্রত্যেক প্রকারকেই বনী আদমের কোনো কোনো সম্প্রদায় অস্বীকার করেছে।

নাস্তিকরা তাওহীদুর রুবূবীয়াকে অস্বীকার করেছে। মূলত তারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছে। যেমন বস্তুবাদী ও ধর্মত্যাগীরা স্রষ্টার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে। আমাদের বর্তমান সময়ে সাম্যবাদীরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত। যদিও তারা কেবল বাহ্যিকভাবেই অহংকার বশত অস্বীকার করেছে। অন্যথায় তারা গোপনে এবং মনের গহীনে স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে থাকে। কেননা স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা অকল্পনীয়।

তাওহীদের দ্বিতীয় প্রকার হলো তাওহীদুল উলূহীয়া। অধিকাংশ সৃষ্টিই এটিকে অস্বীকার করেছে। এ প্রকার তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা নাবী-রসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। প্রাচীন ও বর্তমানকালের মুশরিকরা এই প্রকার তাওহীদকে অস্বীকার করেছে। গাছ, পাথর, মূর্তি, কবর, সমাধি এবং ছূফী শাইখদের ইবাদতের মাধ্যমে তাদের তাওহীদুল উলূহীয়া অস্বীকারের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে। এক শ্রেণির নামধারী মিথ্যুক মুসলিম বিশ্বাস করে যে, ছূফীদের শাইখরা আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের উপকার করার ক্ষমতা রাখে।

তৃতীয় প্রকার তাওহীদ হচ্ছে তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত। আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তার জন্য অথবা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রবের জন্য পূর্ণতার যেসব গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন, তা সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তা থেকে অথবা তার রসূল তার থেকে অপূর্ণতার যেসব দোষ-ত্রুটি নাকোচ করেছেন, তা

নাকোচ করাকে তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত বলা হয়। পূর্ণতার ছিফাতগুলো সাব্যস্ত এবং অপূর্ণতার ছিফাতগুলো নাকোচ করার ক্ষেত্রে তাদের মূলনীতি হলো, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা আশ শূরা ৪২: ১১)

জাহমীয়া সম্প্রদায় এবং তাদের অনুসরণকারী মু'তাযিলা ও আশায়েরাগণ এ প্রকার তাওহীদ অস্বীকার করেছে। তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত তাওহীদুর রুবূবীয়াতেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এর অস্বীকারকারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং এ সম্পর্কে প্রচুর সন্দেহ ছড়ানোর কারণে স্বতন্ত্র একটি প্রকার হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে অনেক কিতাবও লেখা হয়েছে।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) তার প্রসিদ্ধ একটি কিতাবে জাহমীয়াদের প্রতিবাদ করেছেন। তার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ আস্ সুন্নাহ' নামে একটি কিতাব রচনা করেছেন, আব্দুল আযীয আলকিনানী লিখেছেন,الحيدة في الرد على بشر المريسي নামে একটি কিতাব, আবু আব্দুল্লাহ আলমিরওয়াযী লিখেছেন, السنة নামে একটি কিতাব, উছমান ইবনে সাঈদ আদ্দারামী লিখেছেন, الرد على بشر المريسي নামে একটি কিতাব এবং এ ব্যাপারে সকল ইমামের সরদার মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা লিখেছেন التوحيد নামে একটি কিতাব। উপরোক্ত ইমামগণ ছাড়াও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং তার সুযোগ্য ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) জাহমীয়াদের প্রতিবাদে কিতাব রচনা করেছেন। এসব ইমাম এবং তাদের পরবর্তীতে আগমনকারী ইমামগণ পূর্ববর্তী ইমামগণের পথ অবলম্বন করেছেন। সত্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হওয়া এবং বাতিল পরাভূত হওয়ার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করছি।

কতিপয় আরব মুশরিকদের থেকে সর্বপ্রথম আল্লাহর ছিফাত অস্বীকার করার বিষয়টি জানা যায়। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾

"এভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এমন এক জাতির প্রতি, যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে। যাতে আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি, তাদের নিকট তা পাঠ করতে পারো। তারা রাহমানকে তথা পরম দয়াময়কে অস্বীকার করে। বলো, তিনিই আমার

প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। আমি তার উপরই ভরসা করেছি এবং তার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন”। (সূরা আর রা’দ: ৩০)

এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ হলো কুরাইশরা যখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলার الرحمن নাম উচ্চারণ করতে শুনলো, তখন তারা সেটাকে অস্বীকার করলো। তাদের জবাবে আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেছেন,

﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾

“এবং তারা রহমানকে অস্বীকার করে” (সূরা আর রা‘দ ১৩:৩০)।

ইমাম ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন যে, এটি ছিল হুদায়বিয়ার ঘটনা। হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক যখন بسم الله الرحمن الرحيم লিখলেন, তখন কুরাইশরা বললো, আমরা রাহমানকে চিনি না”।

ইমাম ইবনে জারীর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণনা করেছেন যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় يا رحمن এবং يا رحيم বলে দু‘আ করতেন। মুশরিকরা এতে বলতে লাগলো, মুহাম্মাদ বলে যে, সে মাত্র এক মাবুদকে ডাকে। অথচ দেখছি সে দুই মাবুদকেই ডাকে। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾

“বলো, তোমরা আল্লাহ্‌কে ‘আল্লাহ’ নামে আহবান করো কিংবা ‘রাহমান’ নামে আহবান করো, তোমরা যে নামেই আহবান করো না কেন, তার রয়েছে অনেক অতি সুন্দর নাম”। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১১০) আল্লাহ তা‘আলা সূরা ফুরকানে বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾

“তোমরা যখন রাহমান বা পরম দয়াময়ের নামে সিজদাবনত হও, তখন ওরা বলে, রাহমান আবার কে?। (সূরা আল ফুরকান: ৬০)

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার অতি সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলি অস্বীকার করার ক্ষেত্রে মুশরেকরাই জাহমীয়া এবং আশায়েরাদের উস্তাদ। নিকৃষ্ট ছাত্রদের নিকৃষ্ট উস্তাদ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾

“তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে? অথচ তারা তোমাদের শত্রু? বড়ই খারাপ বিনিময় যালেমরা গ্রহণ করছে! (সূরা কাহাফ: ৫০)

আর নাবী-রসূলগণ এবং তাদের অনুসারীগণ বিশেষ করে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সম্মানিত ছাহাবীগণ ও উত্তমভাবে তাদের অনুসারীগণ আল্লাহ তা‘আলাকে ঐসব গুণে গুণান্বিত করেছেন, যা দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা নিজেকে গুণান্বিত করেছেন এবং তার থেকে ঐসব দোষ-ত্রুটি নাকোচ করেছেন, যা স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা নিজের সত্তা থেকে নাকোচ করেছেন। সেই সঙ্গে যারা এ মানহাজের বিরোধিতা করে তারা তাদেরও প্রতিবাদ করেছেন।

আব্দুর রাজ্জাক মা’মার থেকে, মা’মার তাউস থেকে, তাউস তার পিতা থেকে, তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি দেখলেন একজন লোক আল্লাহর ছিফাত সংক্রান্ত একটি হাদীছ শুনে কেঁপে উঠছে। সে এটিকে অপছন্দ করেই কেঁপে উঠছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তখন বললেন, এরা আল্লাহ তা‘আলাকে কেমন ভয় করে? কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত শুনে নরম হয়। আর যখন কোনো অস্পষ্ট আয়াত শুনে তখন ধ্বংস হয় এবং তা অস্বীকার করে?”

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মজলিসে যেসব সাধারণ লোক উপস্থিত হতো, এখানে তিনি তাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তারা যখন আল্লাহর ছিফাত সংক্রান্ত কোনো মুহকাম আয়াত শুনতো তখন তারা ভয় করতো এবং তারা আল্লাহর ছিফাতসমূহকে অস্বীকারকারীদের মতো কেঁপে উঠতো। তারা ঐসব লোকদের মতো যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

“যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সবসময় মুতাশাবিহার পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ করার চেষ্টা করে। অথচ সেগুলোর আসল অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। অপর পক্ষে পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরা বলে, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এসব আমাদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে। আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান লোকেরাই শিক্ষা গ্রহণ করে”। (সূরা আলে-ইমরান: ৭)

সুতরাং বাঁকা অন্তর বিশিষ্ট লোকেরা মুহকাম আয়াতগুলো বাদ দিয়ে মুতাশাবিহাতের পিছনে লেগে থাকে এবং তারা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করে এবং অপর অংশ অস্বীকার করে।

আর আল্লাহর ছিফাত সংক্রান্ত আয়াতগুলো মুহকামাতের অন্তর্ভুক্ত, মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। উম্মতের প্রথম সারির আনসার ও মুহাজির মুসলিমগণ, উত্তমভাবে তাদের অনুসরণকারী তাবেঈগণ এবং তাদের পরবর্তীকালের মুজতাহিদ ইমামগণ তা পড়েছেন এবং তার অর্থ বুঝেছেন। তারা এগুলোর প্রতিবাদ করেননি। বর্তমানেও উম্মতের বিজ্ঞ

আলেমগণ তা পড়ছেন, অনুধাবন করছেন এবং তা অন্যদেরকে পড়াচ্ছেন। এগুলো বুঝতে তাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

সুপ্রসিদ্ধ ইমাম অকী বলেন, আমরা আ'মাশ এবং সুফিয়ান (রাহিমাহুমাল্লাহ) কে পেয়েছি যে, তারা আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সংক্রান্ত হাদীছগুলো বর্ণনা করতেন। তারা এগুলো বর্ণনা করাকে অপছন্দ করতেন না কিংবা এগুলোর প্রতিবাদ করতেন না।

বিদ'আতী মু'তাযিলা, জাহমীয়া এবং আশায়েরা সম্প্রদায়ের লোকেরাই কেবল ছিফাত সংক্রান্ত হাদীছগুলো অস্বীকার করে। এ ক্ষেত্রে তারা কুরাইশদের ঐসব মুশরিকদের পথ অনুসরণ করেছে, যারা আল্লাহ তা'আলার রাহমান নামকে অস্বীকার করেছিল এবং আল্লাহ তা'আলার নামের বিকৃতি ঘটিয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-আরাফের ১৮০ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"আল্লাহ তা'আলার অনেকগুলো অতি সুন্দর নাম রয়েছে। সুতরাং তাকে সে নামেই ডাকো এবং তার নামসমূহের মধ্যে যারা বিকৃতি করে, তোমরা তাদেরকে বর্জন করো। তারা যা করে আসছে, তার ফল তারা অবশ্যই পাবে"।[৯৭]

---

[৯৭] إلحاد (ইলহাদ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাঁকা হওয়া, একদিকে ঝুকে পড়া, কোন জিনিস থেকে সরে আসা ইত্যাদি। এখান থেকেই কবরকে লাহাদ বলা হয়। কবরকে লাহাদ বলার কারণ হলো, সেটাকে খনন করার সময় গর্ত খননের সাধারণ রীতি ও পদ্ধতির ব্যতিক্রম করে কিবলার দিকে বাঁকা করে দেয়া হয়।

আর আল্লাহর অতি সুন্দর নাম, তাঁর সুউচ্চ গুণাবলি এবং আয়াতসমূহের মধ্যে ইলহাদ হচ্ছে সেটার প্রকৃত ও সঠিক অর্থ বাদ দিয়ে বাতিল অর্থের দিকে নিয়ে যাওয়া। আল্লাহর নাম ও গুণাবলি র মধ্যে ইলহাদ কয়েক প্রকার।

(১) আল্লাহর নামে দেবতার নাম রাখা: আল্লাহর অন্যতম নাম الإله থেকে মুশরেকরা তাদের এক দেবতার নাম রেখেছে اللات (লাত), আল্লাহর নাম العزيز থেকে তারা তাদের আরেক মূর্তির নাম রেখেছে العزى (উয্যা) এবং আল্লাহর নাম المنان থেকে তারা তাদের আরেক বাতিল মাবুদের নাম রেখেছে مناة (মানাত)।

(২) আল্লাহর এমন নাম রাখা, যা তার মর্যাদা ও বড়ত্বের শানে শোভনীয় নয়: যেমন খ্রিষ্টানরা আল্লাহকে أب (FATHER বা পিতা) বলে। দার্শনিকরা আল্লাহকে موجب (আসল সংঘটক) কিংবা علة فاعلة (সক্রিয় কারণ) বলে থাকে।

(৩) আল্লাহকে এমন ত্রুটিযুক্ত বিশেষণে বিশেষিত করা, যা থেকে তিনি নিজেকে পবিত্র রেখেছেন: যেমন অভিশপ্ত ইয়াহূদীরা বলে থাকে ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ "নিশ্চয়ই আল্লাহ গরীব আর আমরা ধনী"। তারা আরো বলে,

আল্লাহ তা'আলা এখানে নিজের জন্য অতি সুন্দর নাম সাব্যস্ত করেছেন এবং সেটার মাধ্যমে তাকে ডাকার আদেশ দিয়েছেন। এদের ধারণা মোতাবেক আল্লাহ তা'আলার যদি নামই না থাকে এবং নামগুলোর অর্থ বোধগম্য না হয় তাহলে তাকে কীভাবে ডাকা হবে? আল্লাহ তা'আলার নামের মধ্যে যারা বিকৃতি করে এবং তার নামগুলোকে নাকোচ করে অথবা সেটার সঠিক অর্থ বাদ দিয়ে এভাবে ব্যাখ্যা করে যে, শাস্তি ও আযাবের মাধ্যমে তিনি তাদের আমলের বদলা দিবেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

"আল্লাহর হাত বাঁধা। আসলে বাঁধা হয়েছে ওদেরই হাত এবং তারা যে কথা বলছে সে জন্য তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। আল্লাহর দুই হাত সদা প্রসারিত। যেভাবে চান তিনি খরচ করেন"। (সূরা আল মায়িদা: ৬৪)

তারা আরো বলে থাকে আল্লাহ তা'আলা ছয়দিনে আসমান-যমীন এবং সেটার মধ্যকার সকল বস্তু সৃষ্টি করার পর শনিবারে বিশ্রাম নিয়েছেন। মূলত আল্লাহ তাদের কথার অনেক উর্ধ্বে।

(৪) আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাতগুলোর অর্থ ও হাকীকত অস্বীকার করা: যেমন জাহমীয়ারা বলে আল্লাহর নামগুলো শুধু শব্দের মধ্যেই সীমিত। এগুলো কোনো গুণ বা অর্থকে নিজের মধ্যে শামিল করে না। তারা বলে আল্লাহর অন্যতম নাম হচ্ছে, السميع (সর্বশ্রোতা), কিন্তু এই নামটি প্রমাণ করে না যে, তিনি শুনেন কিংবা এটি প্রমাণ করে না যে, শ্রবণ করা তাঁর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর অন্যতম নাম হচ্ছে البصير (সর্বদ্রষ্টা), কিন্তু এই নামটি প্রমাণ করে না যে, তিনি দেখেন কিংবা দেখা তাঁর গুণ এবং আল্লাহ তা'আলার আরেকটি নাম হচ্ছে الحي (চিরজীবন্ত), কিন্তু এটা প্রমাণ করে না যে, তাঁর হায়াত বা জীবন আছে। আল্লাহর অন্যান্য নাম ও ছিফাতের ক্ষেত্রেও তারা একই রকম কথা বলে থাকে।

(৫) আল্লাহর ছিফাতসমূহকে মাখলুকের ছিফাতের সাথে তুলনা করা: যেমন মুশাব্বেহা (আল্লাহর ছিফাতকে সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তুলনাকারী) সম্প্রদায়ের লোকেরা করে থাকে। তারা বলে থাকে, আল্লাহর হাত আমার দুই হাতের মতোই। অন্যান্য ছিফাতের বেলাতেও তারা একই রকম কথা বলে। আল্লাহ তাদের এই ধরনের কথার অনেক উর্ধ্বে।

যারা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও আয়াতের মধ্যে ইলহাদ করে, তাদেরকে তিনি কঠোর আযাবের ধমক দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-আরাফের ১৮০ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"আল্লাহ তা'আলার অনেকগুলো সুন্দরতম নাম রয়েছে। সুতরাং তাঁকে সেই নামেই ডাকো এবং তাঁর নামসমূহের মধ্যে যারা বিকৃতি করে, তোমরা তাদেরকে বর্জন করো। তারা যা করে আসছে, তার ফল অবশ্যই তারা পাবে"। আল্লাহ তা'আলা সূরা ফুস্সিলাতের ৪০ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

"যারা আমার আয়াতসমূহের বিকৃতি (উল্টা অর্থ) করে, তারা আমার অগোচরে নয়। যাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে সে উত্তম? না যে ক্বিয়ামতের দিন নিরাপদ অবস্থায় হাজির হবে সে উত্তম? তোমরা যা চাও করতে থাকো, আল্লাহ তোমাদের সব কাজ দেখছেন"।

﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾

"এবং তারা রহমানকে অস্বীকার করে"। (সূরা আর রা'দ ১৩:৩০)

এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মক্কার কুরাইশদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার রাহমান নামকে অস্বীকার করেছিল। এ জন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনেক আলেম জাহমীয়াদেরকে কাফের বলেছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

عشر من العلماء في البلدان ... ولقد تقلد كفرهم خمسون في

بل قد حكاه قبله الطبراني ... واللالكائي الإمام حكاه عنهم

বিভিন্ন দেশের পাঁচশত আলেম জাহমীয়াদেরকে কাফের বলেছেন এবং তাদের কাফের হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। ইমাম লালকায়ী আলেমদের থেকে তাদের কাফের হওয়ার ফতোয়া উল্লেখ করেছেন এবং তার পূর্বে ইমাম তাবারানীও উল্লেখ করেছেন।[৯৮]

[৯৮] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) তার আক্বীদা বিষয়ক কাসিদাহ নুনিয়ার মধ্যে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে, জাহমিয়রা মুশরিকদের চেয়েও নিকৃষ্ট। নুনিয়ার অন্য একটি অনুচ্ছেদে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাদের বিদ'আতগুলো কুফুরী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। নিঃসন্দেহে তাদের আক্বীদা ও আমলগুলো প্রমাণ করে যে, তারা মুসলিমদের আলেমদের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছে। তাদের নিকৃষ্ট আক্বীদার মধ্যে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কথা বলেন না। আমাদের প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'আলা যদি কথা না বলেন, তাহলে কুরআন কার কালাম? জবাবে তারা বলেছে যে, কুরআন হলো অন্যান্য সৃষ্টির মতই একটি সৃষ্টি। যেমন মানুষ এক প্রকার সৃষ্টি। সুতরাং তারা আল্লাহ তা'আলার কথা বলা বিশেষণ নাকোচ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সমস্ত প্রত্যাদেশকে মাখলুক বলেছে।

প্রকৃত কথা হলো কুরআন-হাদীছের বহু দলীল এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমদের ঐক্যমতে কুরআন মাখলুক নয়; বরং তা আল্লাহর কালাম। আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে কথা বলেছেন। তার থেকেই কুরআন এসেছে এবং তার নিকটই ফিরে যাবে।

وجوب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى

আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-আরাফের ১৮০ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"আল্লাহ তা'আলার অনেক সুন্দর নাম রয়েছে। সুতরাং তাকে সেই নামেই ডাকো এবং তার নামসমূহের মধ্যে যারা বিকৃতি করে, তোমরা তাদেরকে বর্জন করো। তারা যা করে আসছে, তার ফল অবশ্যই পাবে"। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿اللَّهُ لَا لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾

"তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, তার জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ"। (সূরা তোহা: ৮) আল্লাহ তা'আলা আয়াতদ্বয়ে সংবাদ দিয়েছেন যে, তার অনেক নাম রয়েছে। নামগুলো অতি সুন্দর। অর্থাৎ তার নামগুলো সৌন্দর্যের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছে। তার নামগুলোর চেয়ে অধিক সুন্দর আর কোনো নাম নেই। এ নামগুলোই প্রমাণ করে যে, তার গুণাবলি পরিপূর্ণ এবং তার বিশেষণগুলো মহান। সুতরাং তার নামগুলো সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে পরিপূর্ণ।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলার নামগুলো তাওকীফী। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছের দলীলের নির্ভর করেই সেগুলো সাব্যস্ত করতে হবে। কিয়াস ও ইজতেহাদ করে আল্লাহ তা'আলার জন্য কোনো নাম নির্বাচন করা যাবে না। সুতরাং আমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তিনি নিজের সত্তাকে যেসব নামে নামকরণ করেছেন অথবা তার রসূল তাকে যেসব নামে নামকরণ করেছেন তা বাদ দিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবো। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা তাকে সেটার মাধ্যমে ডাকো। অর্থাৎ তার কাছে সেটার মাধ্যমে প্রার্থনা করো এবং তার উসীলা দাও। যেমন আপনি এভাবে বলবেন,

«اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার উপর রহম করো। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাকারী ও দয়াশীল।

আল্লাহ তা'আলার রয়েছে অনেক অতি সুন্দর নাম, যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। এগুলোর মধ্যে কিছু নাম রয়েছে, যা কেবল আল্লাহ তা'আলাই অবগত রয়েছেন। তা কোনো নৈকট্যশীল ফেরেশতা কিংবা কোনো প্রেরিত নাবীও অবগত নন।

ছ্বহীহ হাদীছে এসেছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু‘আয় বলেছেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابنُ عَبْدِكَ ابنُ أمتِكَ ناصِيَتِي بيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قضاؤكَ أَسْأَلُكَ أَللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ»

“হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা। আমি তোমার এক বান্দা ও এক বান্দীর পুত্র। আমার কপাল তোমার হাতে। আমার ব্যাপারে তোমার হুকুম কার্যকর হয়। আমার ব্যাপারে তোমার ফায়ছালা ইনসাফপূর্ণ হয়। আমি তোমার সেই প্রত্যেক নামের উসীলা দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, যে নামে তুমি নিজেকে নামকরণ করেছো বা তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছো অথবা তোমার কোনো বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছ অথবা যে নামগুলোকে তুমি নিজের জ্ঞান ভান্ডারে সংরক্ষিত করে রেখেছো”।[৯৯]

আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার অতি সুন্দর নামগুলোকে তিনভাগে ভাগ করেছেন।

(১) এক শ্রেণির নাম হলো যা দিয়ে তিনি নিজের নামকরণ করেছেন। অতঃপর তার ফেরেশতাগণ এবং অন্যান্য সৃষ্টিকে সেটা শিক্ষা দিয়েছেন। এ নামগুলো তিনি তার কোনো কিতাবে অবতীর্ণ করেননি।

(২) আরেক শ্রেণির নামগুলোকে তিনি তার কিতাবে নাযিল করেছেন এবং তার বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

(৩) আরেক শ্রেণির নাম তিনি তার ইলমুল গায়েবের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। তিনি তার কোনো সৃষ্টিকেই সেটা শিক্ষা দেন নি।[১০০]

আল্লাহ তা‘আলার বাণী, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ “তার নামসমূহের মধ্যে যারা বিকৃতি করে, তোমরা তাদেরকে বর্জন করো”। অর্থাৎ তাদের থেকে বিমুখ হও এবং তাদেরকে বর্জন করো। আল্লাহ তা‘আলা অচিরেই তাদেরকে উপযুক্ত সাজা দিবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “তার ফল অবশ্যই তারা পাবে”।

---

[৯৯] মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আলবানী হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন, সিলসিলা ছ্বহীহা, হা/ ১৯৯।

[১০০] সুতরাং আল্লাহর অতি সুন্দর নামগুলো নিরা নব্বইয়ের মধ্যে সীমিত নয়। হতে পারে শত শত, হাজার হাজার, হতে পারে লক্ষ লক্ষ, হতে পারে কোটি কোটি, হতে পারে আরো বেশী। তবে যে হাদীছে ৯৯টি নামের উল্লেখ আছে, তার অর্থ হলো, আল্লাহ তা‘আলার এমন নিরা নব্বইটি নাম আছে, যা মুখস্থ করলে, তার অর্থ ভালোভাবে বুঝলে এবং নামগুলোর দাবি অনুযায়ী আমল করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে। এতে তাঁর অন্য কোনো নাম থাকাকে নাকোচ করা হয়নি।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ "তার নামসমূহের মধ্যে যারা বিকৃতি সাধন করে"। অর্থাৎ তারা সেগুলোর প্রকৃত ও সঠিক অর্থ বাদ দিয়ে বাতিল অর্থের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলির মধ্যে ইলহাদ-বিকৃতি কয়েক প্রকার।

(১) আল্লাহর নামে দেবতার নাম রাখা: আল্লাহর অন্যতম নাম الإله থেকে মুশরেকরা তাদের এক দেবতার নাম রেখেছে اللات (লাত), আল্লাহর নাম العزيز থেকে তারা তাদের আরেক মূর্তির নাম রেখেছে العزى (উয্যা) এবং আল্লাহর নাম المنان থেকে তারা আরেক বাতিল মাবুদের নাম রেখেছে مناة (মানাত)। মূর্তির নাম মাবুদ রাখাও আল্লাহর নাম বিকৃতি করার মধ্যে গণ্য।

(২) আল্লাহর এমন নাম রাখা, যা তার মর্যাদা ও বড়ত্বের শানে শোভনীয় নয়: যেমন খ্রিষ্টানরা আল্লাহকে أب বা পিতা বলে। দার্শনিকরা আল্লাহকে موجب বা আসল সংঘটক কিংবা علة فاعلة (স্বভাবগত কার্যকর কারণ) বলে থাকে।

(৩) আল্লাহ তা'আলাকে এমন ত্রুটিযুক্ত বিশেষণে বিশেষিত করা, যা থেকে তিনি নিজেকে পবিত্র রেখেছেন: যেমন অভিশপ্ত ইয়াহূদীরা বলে থাকে আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করার পর শনিবারে বিশ্রাম নিয়েছেন। তারা আরো বলে ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ "নিশ্চয় আল্লাহ গরীব আর আমরা ধনী"। তারা আরো বলে,

﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

"আল্লাহর হাত বাঁধা। আসলে বাঁধা হয়েছে ওদের হাত এবং তারা যে কথা বলছে সে জন্য তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। আল্লাহর দুই হাত সদা প্রসারিত। যেভাবে চান তিনি খরচ করেন"। (সূরা আল মায়িদা: ৬৪) তারা আরো বলে থাকে আল্লাহ তা'আলা ছয়দিনে আসমান-যমীন এবং সেটার মধ্যকার সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করার পর শনিবারে বিশ্রাম নিয়েছেন। মূলত আল্লাহ তাদের কথার অনেক উর্ধ্বে।

(৪) আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাতগুলোর অর্থ অস্বীকার করা: যেমন জাহমীয়ারা বলে আল্লাহর নামগুলো শুধু শব্দের মধ্যেই সীমিত। এগুলো কোনো গুণ বা অর্থকে নিজের মধ্যে শামিল করে না। উদাহরণ স্বরূপ তারা আল্লাহর অন্যতম নাম السميع البصير (সর্বশ্রোতা- সর্বদ্রষ্টা) সম্পর্কে তারা বলে থাকে শ্রবণ করা বিশেষণ ছাড়াই তিনি শ্রবণকারী এবং দেখা বিশেষণ ছাড়াই তিনি দ্রষ্টা।[১০১]

---

[১০১] আশআরী ও মাতুরীদিগণ হুবহু উক্ত আক্বীদা পোষণ করেন। আশআরীগণ আল্লাহ তা'আলার মাত্র সাতটি ছিফাত এবং মাতুরীদিগণ মাত্র আটটি ছিফাত স্বীকার করে। বাকীগুলোর অপব্যাখ্যা করে। আশআরীগণ যেসব ছিফাত সাব্যস্ত করে, তা হলো, الحياة (জীবন) العلم (জ্ঞান), الإرادة (ইচ্ছা), القدرة

শরী'আত ও বিবেক-বুদ্ধির দলীল দ্বারা সাব্যস্ত যে, এটি আল্লাহর অতি সুন্দর নামসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ ইলহাদ বা বিকৃতি। এটি আরবের মুশরিকদের ইলহাদের বিপরীত। মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ ও গুণাবলিসমূহ তাদের মাবুদসমূহকে প্রদান করেছে। আর এসব জাহমীয়া আল্লাহ তা'আলাকে তার পূর্ণতার গুণাবলি থেকে খালি করে ফেলেছে এবং তার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলিকে বাতিল করে দিয়েছে।

আমাদের উপর আবশ্যক হলো, আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলি সাব্যস্ত করা এবং এগুলো যেসব পরিপূর্ণ বিশেষণ ও মর্যাদার প্রমাণ বহন করে তা পরিবর্তন, বাতিল, ধরন, কায়া কিংবা উপমা পেশ করা ছাড়াই বিশ্বাস করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা আশ শূরা ৪২: ১১)

সে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক। এ নামগুলোর মাধ্যমে অন্যকে নামকরণ করা আল্লাহ তা'আলার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের পরিপন্থি। আল্লাহর নামগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তাওহীদ বাস্তবায়নের অন্তর্ভুক্ত।

আবু শুরাইহ হতে বর্ণিত আছে যে, এক সময় তার কুনিয়াত ছিল আবুল হাকাম বা মহা বিচারক। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

---

(ক্ষমতা), السمع (শ্রবণ করা), البصر (দেখা) এবং الكلام (কথা বলা)। মাতুরীদিগণ অষ্টম যেই ছিফাতটি সাব্যস্ত করে, তা হলো, التكوين (আকৃতি দান করা বা গঠন করা)। তবে তারা এ ছিফাতগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের তরীকায় সাব্যস্ত করে না। তারা বলে তিনি সর্বশ্রোতা ঠিকই; কিন্তু শ্রবণ করা বিশেষণ ছাড়াই, সর্বদ্রষ্টা ঠিকই; কিন্তু দেখা বিশেষণ ছাড়াই। ঐদিকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এসব ছিফাতের প্রকৃত অর্থ সাব্যস্ত করেন। কিন্তু আশায়েরা সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে এগুলো আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে যুক্ত। তাঁর পবিত্র সত্তার বাইরে এগুলোর কোনো প্রভাব আসেনা। অর্থাৎ এমন নয় যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তা থেকে বহু কালাম নির্গত হয়েছে এবং তা জিবরীল আলাইহিস সালাম শুনেছেন। অতঃপর জিবরীল তা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং তিনিও তা শুনেছেন। বরং তারা বলে আল্লাহর সত্তার সাথে মাত্র একটি কালাম যুক্ত আছে,। অর্থাৎ তা অসংখ্য নয়। ঐদিকে তাদের মতে কুরআনের অক্ষর, শব্দ ও অর্থগুলোও আল্লাহর কালাম নয়; বরং সেটা আল্লাহ তা'আলার সেই একটি মাত্র কালামের ব্যাখ্যা। তাদের এই মত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। কুরআন-সুন্নাহর অনেক দলীল তাদের কথাকে প্রতিবাদ করে। আল্লাহ তা'আলার রয়েছে অসংখ্য ও সীমাহীন কালাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾

"হে মুহাম্মাদ! বলো, যদি আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র কালিতে পরিণত হয় তাহলে সেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমার রবের কালাম শেষ হবে না। বরং যদি এ পরিমাণ কালি আবারও আনয়ন করি তাহলে তাও যথেষ্ট হবে না"। (সূরা কাহাফ: ১০৯)

«إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ» فَقَالَ إِنَّ قَوْمِى إِذَا اخْتَلَفُوا فِى شَىْءٍ أَتَوْنِى فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِىَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ» قَالَ لِى شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ قَالَ « فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ» قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ « فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ»

"আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন হাকাম বা মহাবিচারক এবং ফায়ছালা একমাত্র তারই। সুতরাং তুমি আবুল হাকাম কুনিয়ত গ্রহণ করেছ কেন? তখন আবু শুরাইহ বললেন, আমার গোত্রের লোকেরা যখন কোনো বিষয়ে মতবিরোধ করে, তখন ফায়ছালার জন্য আমার কাছে চলে আসে। অতঃপর আমি তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেই। এতে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা কতই না ভালো! তোমার কি সন্তানাদি আছে? আবু শুরাইহ বললেন, শুরাইহ, মুসলিম এবং আবদুল্লাহ নামে আমার তিনটি ছেলে সন্তান আছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদের মধ্যে সবার বড় কে? আমি বললাম, শুরাইহ। তিনি বললেন তাহলে তুমি আবু শুরাইহ"। ইমাম আবু দাউদ এবং অন্যরা হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[১০২]

উপরোক্ত হাদীছের মাধ্যমে জানা গেলো যে, আল্লাহর অতি সুন্দর নামসমূহের সম্মানার্থে নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কুনিয়ত পালটিয়ে ফেলেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলাই হাকাম বা সর্ববিষয়ে মহা বিচারক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ "আল্লাহ আদেশ করেন। তার আদেশ প্রতিহত করার কেউ নেই"। (সূরা আর রা'দ: ৪১)

তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে হুকুমকারী। দুনিয়াতে তিনি তার বান্দাদের মধ্যে নাবী-রসূলদের নিকট প্রেরিত ওহীর মাধ্যমে হুকুম ও ফায়ছালা করেন। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছিল ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে সে বিষয়ে স্বীয় ইলম অনুযায়ী ফায়ছালা করবেন এবং যালেম থেকে মাযলুমের হক আদায় করবেন।

উপরোক্ত হাদীছে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট নামে কোনো মানুষের নাম রাখা নিষেধ। আল্লাহর নামের মর্যাদা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকার কারণেই নিষেধ করা হয়েছে। যেমন আবুল হাকাম কিংবা অনুরূপ নাম রাখা নিষেধ।

আল্লাহর নামের সম্মানার্থেই কোনো মানুষের জন্য তার ক্রীতদাসকে আমার বান্দা কিংবা আমার বান্দী বলা যাবে না। কেননা এতে আল্লাহর রুবূবীয়াতের ক্ষেত্রে মানুষের অংশগ্রহণের সন্দেহ রয়েছে। ছ্বহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

[১০২] আবু দাউদ, অধ্যায়: মন্দ নাম পরিবর্তন করা। ইমাম আলবানী হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: শাইখের তাহকীকসহ মিশকাতুল মাসাবীহ, হা/৪৭৬৬।

«لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ اسْقِ رَبَّكَ وَلْيَقُلْ سَيِّدِى مَوْلاَىَ وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِى وأَمَتِى وَلْيَقُلْ فَتَاىَ وَفَتَاتِى وَغُلاَمِى»

“তোমাদের কেউ যেন না বলে, তোমার প্রভুকে খাবার দাও, তোমার প্রভুকে অযু করাও, তোমার প্রভুকে পান করাও; বরং সে যেন বলে, আমার সরদার, আমার মনিব। তোমাদের কেউ যেন না বলে, আমার বান্দা, আমার বান্দী; বরং সে যেন বলে, আমার সেবক, আমার সেবিকা, আমার চাকর”।

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন অন্যজনকে উদ্দেশ্য করে তোমার প্রভু, আমার প্রভু, আমার বান্দা, তোমার বান্দা-বান্দী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এতে আল্লাহ তা‘আলার শরীক হওয়ার ধারণা রয়েছে। এ পথ বন্ধ করার জন্য এবং শিরকের মূলোৎপাটনের জন্য নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাকরের মনিবদেরকে আমার বান্দা বলার পরিবর্তে আমার সেবক, সেবিকা, খাদেম ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন। আর চাকর ও সেবকদেরকে তাদের মালিকদের উদ্দেশ্যে আমার প্রভু বলার পরিবর্তে আমার নেতা, অভিভাবক, মনিব ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করার আদেশ দিয়েছেন। আর আল্লাহর অতি সুন্দর নাম নিয়ে কেউ কিছু চাইলে তাকে খালি হাতে ফেরত না দেয়াও আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে গণ্য। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্নিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাকে তোমরা আশ্রয় দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে সাহায্য চায় তাকে দান করো। যে তোমাদেরকে ডাকে তার দাওয়াত কবুল করো। যে ব্যক্তি তোমাদের জন্য ভালো কাজ করে, তার প্রতিদান দাও। তার প্রতিদানের জন্য যদি তোমরা কিছুই না পাও, তাহলে তার জন্য দু‘আ করো, যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছো”। ইমাম আবু দাউদ ও নাসায়ী হাদীছটি ছ্বহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন”।[১০৩]

কেননা আল্লাহর নাম নিয়ে ভিক্ষারীকে মাহরুম করলে আল্লাহর নামের অবমাননা করা হয়। আর আল্লাহর নাম নিয়ে কেউ কিছু চাইলে তাকে দান করার মধ্যে আল্লাহ তা‘আলাকে তা‘যীম করার দলীল পাওয়া যায় এবং দানকারী এর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য অর্জন করতে পারে। আল্লাহর নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আরেকটি পদ্ধতি হলো, আল্লাহ তা‘আলার চেহারার উসীলা দিয়ে জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু চাওয়া যাবে না।

---

[১০৩] ছ্বহীহ: আবু দাউদ, অধ্যায়: সায়েলকে দান করা, হা/১৬৭২।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি বড়ত্ব, মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্যই তার নামের উসীলায় জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া উচিত নয়।

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلاَّ الْجَنَّةُ»

"আল্লাহর চেহারার উসীলা দিয়ে একমাত্র জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া যাবে না"। ইমাম আবু দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীছটি বর্ণনা করেছেন"।[১০৪]

সুতরাং আল্লাহর চেহারার উসীলায় দুনিয়ার নগণ্য কোনো জিনিস চাওয়া যাবে না। তার চেহারার উসীলা দিয়ে কেবল সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হাসিলের প্রার্থনা করা যাবে। আর তা হলো জান্নাত অথবা যা জান্নাতে যাওয়ার উপায়। যেমন ঐসব মৌখিক ও কর্মগত আমলের তাওফীক চাওয়া যাবে, যা মানুষকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আরেকটি পদ্ধতি হলো তার নামে বেশী বেশী কসম করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ "তোমরা তোমাদের শপথসমূহ সংরক্ষণ করো"। (সূরা আল মায়েদা: ৮৯)

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তোমরা শপথ করো না। কেননা বেশি বেশি শপথ করলে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অবজ্ঞা করা হয় এবং তাতে আল্লাহর প্রতি তা'যীম নষ্ট হয়। এটি তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থি।

সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَتَهُ و لا يَشْتَرِي إِلا بِيَمِينِهِ وَلا يَبِيعُ إِلا بِيَمِينِهِ»

"তিন শ্রেণির লোকদের সাথে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে গুনাহ হতে পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তারা হলো বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহংকারী গরীব, আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ব্যবসার পণ্য বানিয়েছে। আল্লাহর নামে কসম করা ব্যতীত সে পণ্য ক্রয় করে না, কসম করা ব্যতীত পণ্য বিক্রিও করে না"। ইমাম তাবারানী ছ্বহীহ সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন"।[১০৫]

আল্লাহকে ব্যবসার পণ্য বানিয়েছে: অর্থাৎ আল্লাহর নামে শপথ করাকে পণ্যের প্রসার ঘটানোর মাধ্যম বানিয়েছে। এখানে বেশি বেশি শপথ করার ব্যাপারে কঠিন শাস্তির ধমক

---

[১০৪] যঈফ: আবু দাউদ, হা/১৬৭১। ইমাম আলবানী হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন, দেখুন: শাইখের তাহকীকসহ মিশকাত, হা/১৯৪৪।

[১০৫] হাদীছের সনদ ছ্বহীহ, দেখুন: ছ্বহীহুত্ তারগীব ও তারহীব, হা/১৭৮৮।

এসেছে। কেননা বেশি বেশি শপথ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয় এবং তার অতি সুন্দর নামসমূহের সম্মান নষ্ট হয়। আল্লাহর প্রতি বড়ত্ব ও সম্মান প্রদর্শনের দাবি হলো আল্লাহর সুপারিশ পেশ করে কোনো মাখলুকের কাছে কিছু চাওয়া যাবে না। এতে আল্লাহ তা'আলার মান হানি হয়। সেই সঙ্গে এতে বুঝা যায়, যার নিকট আল্লাহর সুপারিশ পেশ করা হচ্ছে তিনি আল্লাহর তুলনায় বেশি মর্যাদাবান! নাউযুবিল্লাহ

ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কেননা সুপারিশকারী তার চেয়ে উচু মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির নিকটই সুপারিশ করে থাকে। সুতরাং আল্লাহ এত মহান যে, তার সুপারিশ অন্য কারো নিকট পেশ করা হবে, তিনি এর বহু উর্ধ্বে। এক গ্রাম্য লোক নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে অনাবৃষ্টি এবং ধন-সম্পদ ধ্বংস হওয়ার অভিযোগ করে তার কাছে আল্লাহর নিকট বৃষ্টির প্রার্থনার দু'আ করার আবেদন করলো। সে আরো বললো,

«فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ وَبِكَ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللَّهُ؟ إِنَّ شأْنَهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّهُ لا يُسْتَشْفَعُ بِالله عَلَى أَحَدٍ من خلقه»

"আমরা আপনার কাছে আল্লাহর সুপারিশ পেশ করছি এবং আল্লাহর কাছে আপনার সুপারিশ পেশ করছি। এ কথা শুনে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বার বার বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ্! সুবহানাল্লাহ্! এভাবে তিনি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করতেই থাকলেন। এতে তার ছাহাবীদের চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ দেখা গেল। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, আল্লাহর মর্যাদা কত বড় তা কি তুমি জানো? তুমি যা মনে করছো আল্লাহর মর্যাদা তার চেয়ে অনেক বেশি। কোনো সৃষ্টির কাছেই আল্লাহর সুপারিশ পেশ করা যায় না। ইমাম আবু দাউদ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[১০৬] সুতরাং আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা অনেক বড়। তার অনুমতিক্রমেই তার নিকট সুপারিশ করা হবে।

[১০৬] ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। দেখুন: শাইখের তাহকীকসহ মিশকাতুল মাসাবীহ, হা/৫৭২৭।

منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته

আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলির ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মানহাজ

আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলির ক্ষেত্রে নাজাতপ্রাপ্ত দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হলো কুরআন ও সুন্নাহয় সেগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবেই সাব্যস্ত করা। সেই সঙ্গে এগুলো যে অর্থ প্রদান করে তাও বিশ্বাস করা এবং তার বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা।

আল্লাহ তা'আলার জন্য অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাত সাব্যস্ত করলেই আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা হয়ে যায় না। কেননা স্রষ্টার ছিফাত তার জন্যই খাছ এবং তার জন্যই শোভনীয়। আর সৃষ্টির ছিফাত সৃষ্টির জন্যই শোভনীয় এবং তার জন্যই খাছ। স্রষ্টার ছিফাত ও সৃষ্টির ছিফাতের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। যেমন নেই আল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং সৃষ্টির সত্তার মধ্যে কোনো প্রকার সাদৃশ্য। আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলির ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব সঠিক মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ মূলনীতিগুলো হচ্ছে,

প্রথমত মূলনীতি: আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলি তাওকীফি। অর্থাৎ তিনি তার নিজের সত্তার জন্য পবিত্র কুরআনে যেসব অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন অথবা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বহীহ সুন্নাতে তার প্রভুর জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, আহলে সুন্নাতের লোকেরা আল্লাহর জন্য কেবল তাই সাব্যস্ত করেন। তারা তাদের বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-ভাবনা-অনুমানের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তা'আলার জন্য কিছুই সাব্যস্ত করেন না। সেই সঙ্গে তারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা থেকে কেবল সেটাই নাকোচ করেন যা আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে নাকোচ করেছেন অথবা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পবিত্র সুন্নাতে নাকোচ করেছেন। তারা তাদের বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-ভাবনা-অনুমানের উপর নির্ভর করে আল্লাহ তা'আলা থেকে কিছুই নাকোচ করেন না। তারা সাব্যস্ত করণ কিংবা নাকোচ করণ, কোনো ক্ষেত্রেই কুরআন-সুন্নাহর সীমালঙ্ঘন করেন না। আর আল্লাহ তা'আলার কিতাব যা নাকোচ কিংবা সাব্যস্ত কোনোটাই করেনি, তারা উপরোক্ত মূলনীতির উপর নির্ভর করে নীরবতা অবলম্বন করেন। যেমন যুক্তিবাদী ও দার্শনিকদের পরিভাষা জিসিম, আরয, জাওহার ইত্যাদি সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কিছুই বলেন না। কারণ কুরআন ও সুন্নাহয় আল্লাহ তা'আলার সত্তার জন্য এগুলো সাব্যস্ত করা হয়নি এবং নাকোচও করা হয়নি।

দ্বিতীয় মূলনীতিঃ আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তাকে যেসব পূর্ণতার বিশেষণ দিয়ে বিশেষিত করেছেন অথবা তার রসূল তাকে যে বিশেষণে বিশেষিত করেছেন তা সত্য এবং তা বাহ্যিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো অনর্থক উল্লেখ করা হয়নি এবং এর মাধ্যমে মানুষকে ধাঁধায় ফেলা হয়নি; বরং মানুষ সাধারণ কথা বললে যেমন তার কথা বুঝা যায়, এগুলোর অর্থও সেরকম বুঝা যায়।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সমূহের শব্দ এবং সেটার অর্থ উভয়টিই সাব্যস্ত করেন। আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যা দ্বারা বিশেষিত করেছেন অথবা তার রসূল তাকে যা দ্বারা বিশেষিত করেছেন, তা ঐসব মুতাশাবেহ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যার শব্দগুলো সাব্যস্ত করে সেটার অর্থ আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিতে হবে। কেননা আল্লাহর ছিফাত সংক্রান্ত আয়াতগুলোকে অবোধগম্য বক্তব্য হিসাবে গণ্য করা হলে আল্লাহর কালামকে অনারবদের ঐসব দুর্বোধ্য বক্তব্যের পর্যায়ে রাখা হয়ে যায়, যার অর্থ বুঝা যায় না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সমগ্র কুরআনের মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করার আদেশ দিয়েছেন এবং তা ভালোভাবে উপলব্ধি করা ও বুঝার উৎসাহ দিয়েছেন। যদি বলা হয় যে, ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো বোধগম্য নয়, তাহলে এমন ধারণার আশঙ্কা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআনে এমন বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করার আদেশ দিয়েছেন, যা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা সম্ভব নয় এবং এমন কিছু বুঝার উপদেশ দিয়েছেন, যা বুঝা অসম্ভব। সেই সঙ্গে আরো আবশ্যক হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন, যা তিনি আমাদেরকে খোলাসা করে বলেননি। তিনি এমন করার বহু উর্ধ্বে।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ছিফাতসমূহের অর্থ একটি জ্ঞাত বিষয় এবং তাতে বিশ্বাস করা আবশ্যক। কিন্তু এর কোনো চিত্র আমাদের জানা নেই। আল্লাহ ছাড়া তার ছিফাতের ধরন অন্য কেউ জানে না। এ জন্যই ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) কে যখন ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ "দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন"- এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো كيف استوى আল্লাহ তা'আলা কীভাবে আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন? তখন জবাবে ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 'আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া একটি জানা বিষয়। এর পদ্ধতি কেউ অবগত নয়। তার উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। তবে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা বিদ্আত।[১০৭]

[১০৭] অতঃপর সেই বিদ'আতী লোককে ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) এর নির্দেশে তাঁর মজলিস থেকে বের করে দেয়া হলো। কেননা এটি এমন প্রশ্ন, যা সালাফে সালেহীনের কোনো লোক নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করেননি।

ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) এর এই কথা আল্লাহ তা'আলার সমস্ত ছিফাতের ক্ষেত্রেই একটি মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের লোকদের বক্তব্য এটিই। সুতরাং যে ব্যক্তি সালাফদের প্রতি এই কথার সম্বন্ধ করলো যে, তারা আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলির কোনো অর্থ সাব্যস্ত না করে শুধু শব্দ সাব্যস্ত করে সেটার অর্থ আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতেন এবং তারা ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোকে ঐসব মুতাশাবেহ আয়াতের মধ্যে গণ্য করতেন, যার অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না, তারা সালাফদের নামে মিথ্যা রচনা করলো। কেননা সালাফদের কথা এই মিথ্যুকের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত।

তৃতীয় মূলনীতি: সালাফগণ সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তুলনা না করেই আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সাব্যস্ত করতেন। সুতরাং তারা আল্লাহ তা'আলার ছিফাতগুলো সৃষ্টির ছিফাতসমূহের সাথে তুলনা করতেন না। কেননা আল্লাহ তা'আলার সদৃশ আর কিছুই নেই। সুতরাং তার কোনো সমকক্ষ নেই, তার কোনো শরীক নেই এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। আল্লাহর ছিফাতের উপমা-উদাহরণ পেশ করা এবং সেগুলোকে সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তাশবীহ দেয়া তার ছিফাত সমূহের পদ্ধতি ও ধরন সম্পর্কে জ্ঞান রাখার দাবি করার অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তা'আলার ছিফাতসমূহের ধরন-পদ্ধতি ও কায়া আমাদের কাছে তার সত্তার কাইফিয়াতের মতোই অজানা। ছিফাতের কাইফিয়াত সম্পর্কে জ্ঞান রাখার জন্য মাওসুফ তথা বিশেষিত সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলার সত্তার ধরন সম্পর্কে তিনি ছাড়া অন্য কেউ জ্ঞান রাখে না। সুতরাং ছিফাত সম্পর্কে কথা বলা সত্তা সম্পর্কে কথা বলার শাখা বিশেষ। তাই বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তা যেহেতু কোনো সৃষ্টির সত্তার সদৃশ নয়, অনুরূপ তার ছিফাতও কোনো সৃষ্টির ছিফাতের সদৃশ নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ "তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। অর্থাৎ কেউ আল্লাহর সাদৃশ্য রাখে না। তার সত্তার সাথেও না, তার ছিফাতের সাথেও না এবং তার কোনো কর্মের সাথেও না।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তাকে যেসব ছিফাতের মাধ্যমে বিশেষিত করেছেন তার উপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেউ নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ﴾ "তোমরা অধিক জ্ঞানী না আল্লাহ?" সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সম্পর্কে এবং অন্যদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। অনুরূপ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যেসব গুণাবলির মাধ্যমে বিশেষিত করেছেন, তার উপরও ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। কেননা আল্লাহর পরে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী আর কেউ নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى﴾

"এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোনো কথা বলেন না। তা ওহী ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। (সূরা আন নাজমঃ ৩-৪)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তাকে যেসব গুণাবলিতে গুণান্বিত করেছেন এবং তার রসূল তাকে যেসব গুণাবলিতে বিশেষিত করেছেন প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক মুসলিমের তার উপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। অনুরূপ একই সঙ্গে মুসলিমের উপর আবশ্যক হলো আল্লাহ তা'আলার ছিফাতকে সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তাশবীহ তুলনা করা থেকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্রতা বজায় রাখা।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলের অগ্রণী হবে এবং আল্লাহ তা'আলার উপর দুঃসাহস দেখিয়ে তার সত্তা থেকে ঐসব মহৎ গুণাবলি নাকোচ করবে, যা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন অথবা তার রসূল যেসব গুণাবলি দ্বারা তার প্রভুকে বিশেষিত করেছেন, তা নাকোচ করবে সে কি আল্লাহর প্রতি, তার কিতাবের প্রতি এবং তার নাবীর সুন্নাতের প্রতি ঈমানদার বলে গণ্য হবে? অনুরূপ যে ব্যক্তি বলবে, হে আমার প্রভু! তুমি নিজেকে যেসব গুণাবলিতে গুণান্বিত করেছো অথবা তোমার রসূল তোমাকে যা দ্বারা বিশেষিত করেছেন, তা দ্বারা গুণান্বিত হওয়া তোমার জন্য শোভনীয় নয়! তাতে রয়েছে এই এই দোষ! সুতরাং আমি এগুলোর তাবীল করছি এবং তা বাতিল করে তার স্থলে আমার নিজের পক্ষ হতে অন্যান্য বিশেষণ সাব্যস্ত করছি, যে ব্যক্তি একথাগুলো বলবে, সে কি মুমিন হওয়ার আশা করতে পারে? কখনো নয়। যেমন মুতাযেলী কিংবা আশআরী মাযহাবের কোনো এক কবি বলেছেন,

وكُل نص أوهم التشبيها ... أَوَّله أو فوِّض وَرُم تَنزِيها

"হে বন্ধু! কুরআন ও সুন্নাহর যেসব উক্তিতে আল্লাহর সাথে সৃষ্টির তাশবীহ (তুলনা) হওয়ার সন্দেহ রয়েছে, তাকে তার বাহ্যিক অর্থ পরিহার করে অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করো অথবা কেবল উক্তির অর্থ বিহীন শব্দমালা সাব্যস্ত করো এবং সৃষ্টির সাথে আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্য হওয়ার ধারণা থেকে তাকে পবিত্র করো"।[১০৮]

---

[১০৮] আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলি সম্পর্কিত অধ্যায় ইলমের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখা। কেননা এ সম্পর্কে ইলম অর্জন করা ব্যতীত তাঁর মারেফত হাসিল করা অসম্ভব। এতে যদি আল্লাহ তা'আলার কথা এবং আল্লাহর রাসূলের কথা যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে কার উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে? ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী আল-জুওয়াইনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আমি দীর্ঘদিন আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সংক্রান্ত বিষয়ে অপব্যাখ্যা কারীদের মাযহাবের উপর ছিলাম। অতঃপর আমি এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করলাম। চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে পেলাম যে, নবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনসব কথা বলতেন, যাতে আল্লাহ তা'আলার ছিফাতসমূহের খবর রয়েছে। তিনি তাঁর মজলিসে, ভাষণে, ভ্রমণে এবং নিজ শহরে আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলতেন। তার

সুতরাং এ বিষয়ে আমি তোমার কিতাব এবং তোমার রসূলের সুন্নাতের স্মরণাপন্ন হবোনা। কেননা সৃষ্টির সাথে তোমার তাশবীহ বা সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সন্দেহ রয়েছে। বরং আমি তোমার নাম ও ছিফাতসমূহ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তর্কশাস্ত্রবিদদের মূলনীতি, জাহমীয়া, মু'তাযিলা, আশায়েরা এবং মাতুরীদিয়াদের মতবাদের স্মরণাপন্ন হবো। যে ব্যক্তি এরকম কথা বলবে, সে কি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী বলে গণ্য হবে? সে কি তার প্রভুকে সম্মানকারী হিসাবে গণ্য হবে? এটি নিঃসন্দেহে বিরাট এক অপবাদ! হে আল্লাহ! তারা তোমার প্রতি যেসব বাতিল কথার সম্বন্ধ করে, আমরা তা থেকে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

চতুর্থ মূলনীতিঃ আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব ছিফাত দ্বারা বিশেষিত করেছেন অথবা তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যেসব গুণাবলি দ্বারা গুণান্বিত করেছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা যেমন সেটা আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতে সাব্যস্ত করেন, ঠিক তেমনি তারা তাকে সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেন। তাকে দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করার দলীল পেশ করতে গিয়ে ছিফাত সংক্রান্ত উক্তিগুলোর এমন কোনো তাবীল (অপব্যাখ্যা) করেন না কিংবা সেটার শব্দগুলোকে তার আসল মর্মার্থ থেকে বিকৃত করেন না, যা তাদেরকে তা'তীল বা আল্লাহ তা'আলার ছিফাতগুলোকে বাতিল করার দিকে নিয়ে যায়; বরং তারা এ ব্যাপারে মুশাব্বেহা সম্প্রদায় এবং মুআত্তেলা সম্প্রদায়ের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছেন। তারা আল্লাহ তা'আলা থেকে অপূর্ণতার দোষ-ত্রুটি নাকোচ করতে গিয়ে পূণর্তার গুণাবলিকে অর্থহীন, অকেজো ও বাতিল করা থেকে দূরে থাকেন এবং পূর্ণতার বিশেষণ সাব্যস্ত করতে গিয়ে তার সাদৃশ্য প্রদান করা থেকেও বেঁচে থাকেন।

পঞ্চম মূলনীতিঃ আহলে সুন্নাতের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার জন্য যেসব পূর্ণতার গুণাবলি সাব্যস্ত করেন এবং যেসব অপূর্ণতার দোষ-ত্রুটি তার থেকে নাকোচ করেন, তাতে তারা কুরআন-সুন্নাহর পথ অবলম্বন করেন। আর তা এভাবে যে, তারা নাকোচ করতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত কথা বলেন এবং সাব্যস্ত করতে গিয়ে বিস্তারিতভাবে বলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

নিকট থেকে জ্ঞানী-মূর্খ, শহরবাসী ও গ্রাম্য লোক, আনসার-মুহাজির সকলেই সেটা শুনতেন। কিন্তু এ সম্পর্কিত কথা চলাকালে কেউ তাঁর কোনো প্রতিবাদ করেননি অথবা তিনি এ সম্পর্কিত কথা বলার পর এমন কিছু উল্লেখ করেননি, যাতে বুঝা যায় তাঁর কথার বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এ থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে, নবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সংক্রান্ত বিষয়ে অথবা অন্যান্য গায়েবী বিষয়ে সাধারণভাবে যা বলেছেন, তার বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইমামুল হারামাইন দীর্ঘদিন কালাম (তর্কশাস্ত্র) বিদদের মাযহাবের উপর থাকার পর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাবের দিকে ফিরে এসেছেন এবং এর উপরেই মৃত্যু বরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ﴾ "তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা আশ শূরা: ১১)

"তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই।" এ অংশের মাধ্যমে সংক্ষেপে সৃষ্টি থেকে কোনো কিছু আল্লাহর সদৃশ হওয়ার নাকোচ করা হয়েছে এবং "তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা" এ অংশের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে তার জন্য পূর্ণতার গুণাবলি সাব্যস্ত করা হয়েছে।

না বাচক বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা থেকে যা কিছুই নাকোচ করা হয়েছে, একই সঙ্গে তাতে আল্লাহ তা'আলার কামাল তথা পূর্ণতার বিশেষণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। নাকোচ সংক্রান্ত বক্তব্য দ্বারা শুধু নাকোচই উদ্দেশ্য নয়। কেননা শুধু না বাচক বাক্যের মধ্যে কোনো প্রশংসা থাকে না। শুধুমাত্র নাকোচের মাধ্যমে অস্তিত্বহীন বিষয় উদ্দেশ্য হয়। আর অস্তত্বহীনকে কোনো জিনিসই বলা হয় না।

আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ব্যাপারে নাকোচের মাধ্যমেও তার জন্য কামাল বা পূর্ণতার বিশেষণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَايَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ "তোমার রব কাউকে যুলুম করেন না"। (সূরা কাহাফ: ৪৯) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আদল বা ন্যায়বিচার যেহেতু সর্বোচ্চ, চূড়ান্ত ও পূর্ণতম, তাই তিনি কারো প্রতি অবিচার করেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ "আর আসমান ও যমীনকে ধারণ করা তার জন্য মোটেই কঠিন নয়"। তার শক্তি ও ক্ষমতা যেহেতু পরিপূর্ণ, তাই আসমান-যমীনের হেফাযত করা তার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ "তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না"। কেননা তার জীবন পরিপূর্ণ, তিনি চির জাগ্রত এবং তার ধারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষমতা অবিনশ্বর।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা থেকে যেখানেই কিছু নাকোচ করা হয়েছে, সেখানে নাকোচকৃত বিষয়ের বিপরীত পূর্ণতা ও মহত্ত্বের বিশেষণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে দীনের সঠিক জ্ঞান প্রার্থনা করছি, তার আনুগত্যমূলক কাজের তাওফীক চাচ্ছি এবং সত্য জানা ও সে অনুযায়ী আমল করার শক্তি প্রার্থনা করছি।

منهج الجهمية وتلاميذهم في أسماء الله وصفاته

আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও তার সুউচ্চ গুণাবলির ক্ষেত্রে জাহমীয়া ও তাদের শিষ্যদের নীতি-পদ্ধতি

আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলি যেভাবে এসেছে, মুসলিমদের উপর আবশ্যক হলো তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতে সেটা সাব্যস্ত করা। কেননা এটি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের অন্তর্ভুক্ত। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব। তারা এ ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতকে দলীল ও মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে তাদের মাযহাব জাহমীয়া এবং তাদের ছাত্র মু'তাযিলা ও আশায়েরাদের মাযহাবের বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তার জন্য যেসব অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন তারা তা নাকোচ করে অথবা নিজেদের মনমত তা থেকে কতিপয় ছিফাত নাকোচ করে এবং কতিপয় ছিফাত সাব্যস্ত করে। তাদের সীমিত বিবেক-বুদ্ধি অথবা গোমরাহ ইমামদেরকে এ ব্যাপারে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে তাদের মাযহাব রচনা করেছে। সুতরাং যারা কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলীল নিয়েছে এবং যারা চিন্তার ফসল ও মস্তিস্কের আবর্জনাকে দলীল বানিয়ে নিয়েছে, তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যেমন বিদ'আতীদের কোনো এক কবি বলেছেন,

وكُل نص أوهم التشبيها ... أَوِّله أو فوِّض وَرُم تَنزِيها

"হে বন্ধু! কুরআন ও সুন্নাহর যেসব উক্তিতে আল্লাহর সাথে সৃষ্টির তাশবীহ (তুলনা) হওয়ার সন্দেহ রয়েছে, তার বাহ্যিক অর্থ পরিহার করে অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করো অথবা কেবল উক্তির অর্থ বিহীন শব্দমালা সাব্যস্ত করো এবং সৃষ্টির সাথে আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্য হওয়ার ধারণা থেকে তাকে পবিত্র করো"।

আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাতসমূহের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের ক্ষেত্রে এ হলো তাদের আচরণ। কুরআন-সুন্নাহর উক্তিগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ প্রদান করে তা পরিহার করে তাদের অকেজো বিবেক-বুদ্ধি এবং বাতিল মতবাদ যা নির্ধারণ করে, তা গ্রহণ করাকে التأويل বলা হয়। আর তাদের বিবেক-বুদ্ধি যা বুঝতে ও গ্রহণ করতে অক্ষম তারা তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে কুরআন-সুন্নাহ এর বিপরীত আক্বীদা পোষণ করেছে।

হে আমার রব! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। কতইনা উঁচু তোমার শান! বান্দাদের ব্যাপারে তুমি কতইনা সহনশীল! তুমি তোমার নিজের সত্তার জন্য যেসব পূর্ণতার গুণাবলি ও মহত্ত্বের বিশেষণ সাব্যস্ত করেছো, এরা তা অস্বীকার করেছে। তারা তোমার কিতাবের বিরোধিতা করেছে। তুমি তোমার কিতাবে যা অবতীর্ণ করেছো, তার উপর তারা

নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির সিদ্বান্তকে প্রাধান্য দিয়েছে। তারা তোমার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলিকে নাকোচ করে দিয়েছে এবং তোমার দলীল-প্রমাণ ও হিদায়াতকেও নাকোচ করেছে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) জাহমীয়া, মু'তাযিলা এবং তাদের শিষ্যদের ব্যাপারে বলেছেন, যে ব্যক্তি ধারণা করলো যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের সত্তা, ছিফাত ও কর্ম সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছেন, তার বাহ্যিক অর্থ বাতিল, কারণ এতে সৃষ্টির সাথে তার তাশবীহ (সাদৃশ্য দেয়া) এবং তামছীল (তুলনা করা) হয়ে যায়, তাই এ বিষয়ে মূল সত্যটি এড়িয়ে চলা হয়েছে, সে সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা হয়নি; বরং সেদিকে দূর থেকে রহস্যময় ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, ধাঁধায় ফেলা হয়েছে, সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি, এ সম্পর্কে সবসময় সাদৃশ্য এবং বাতিল উপমা পেশ করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের মেধা, বোধশক্তি, চিন্তা-ভাবনা ও বিবেক-বুদ্ধি খাঁটিয়ে তার কালামকে স্বীয় অর্থ থেকে সরানো এবং সেটার আসল ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে অন্য ব্যাখ্যা করার আদেশ করেছেন, তাদেরকে আরো আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন আল্লাহর কালামের তাবীল করার কঠিন কঠিন পদ্ধতি বের করে, যারা এ ধরনের কথা বলল, তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করলো।

এমনি যারা মনে করে, কুরআন মজীদে সর্বদা অর্থহীন শব্দ ও উপমা পেশ করা হয়েছে, আল্লাহর কালামের তাবীলগুলোর মাধ্যমে মানুষকে ধাঁধায় ফেলা হয়েছে এবং সেগুলো অনেকটা খোলাখুলি বর্ণনার মতোই তারাও আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করলো। এমনি যারা মনে করে আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলির পরিচয় জানার জন্য তিনি তাদেরকে বিবেকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন; তার কিতাবের উপর নির্ভর করতে বলেননি, তারাও আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করল। যারা মনে করে, আল্লাহ্ তাদেরকে তার কালামের এমন অর্থ গ্রহণ করতে বলেছেন, যা তাদের ভাষা ও বক্তব্যে পরিচিত ছিল না। অথচ যেই সত্যটি খুলে বলা উচিত ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা খোলাখুলিভাবে তা প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং ঐ সমস্ত শব্দ দূর করতে সক্ষম, যেগুলো মানুষকে বাতিল আক্বীদার দিকে নিয়ে যায়, কিন্তু তিনি তা না করে হেদায়াতের সুস্পষ্ট পথের বিপরীত পথে তাদেরকে নিয়ে গেছেন। যারা এরূপ ধারণা করলো, তারাও আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করল।

এমনি যে ব্যক্তি ধারণা করলো, আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট শব্দের মাধ্যমে সত্য প্রকাশ করতে সক্ষম নন; বরং তার উস্তাদরাই তা করতে সক্ষম, সে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার মধ্যে অপারগতার ধারণা পোষণ করলো। কিন্তু যে বললো, তিনি তা করতে সক্ষম, কিন্তু করেননি; বরং সত্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা না দিয়ে অস্পষ্ট ধারণার দিকে নিয়ে গেছেন, শুধু তাই নয়; বরং অবাস্তব, বাতিল ও ভ্রান্ত আক্বীদার দিকে নিয়ে গেছেন, সেও আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও রহমত সম্পর্কে বাতিল ধারণা পোষণ করলো।

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল ব্যতীত সে নিজে এবং তার উস্তাদরাই সত্য বলেছেন এবং তাদের কথাতেই রয়েছে সুস্পষ্ট হিদায়াত, সত্য, আল্লাহর কালামের বাহ্যিক অর্থের মধ্যে কেবল তাশবীহ, তামছীল এবং গোমরাহী ছাড়া অন্য কিছু নেই, তাদের ধারণা আল্লাহর প্রতি খুবই মন্দ। যারা মনে করে দিশেহারা কালাম শাস্ত্রবিদ ও যুক্তিবিদদের কথার মধ্যেই রয়েছে সত্য ও হিদায়াত আল্লাহর প্রতি তাদের ধারণা সর্বাধিক নিকৃষ্ট।

যারা বিশ্বাস করল, আল্লাহ্ শুনেন না, দেখেন না, জানেন না, তার কোনো ইচ্ছা নেই, তার সত্তার সাথে যুক্ত কালাম ছাড়া আর কোনো কালাম নেই, কোনো সৃষ্টির সাথে কথা বলেন না, কখনো বলবেন না, কোনো আদেশ বা নিষেধও করেন না, তারাও আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করলো। এমনি যারা ধারণা করল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহের উপর আরশে সমুন্নত হন না এবং সৃষ্টি থেকে আলাদা নন; বরং আরশের দিকে তার সত্তার সম্বন্ধ করা সর্বনিম্ন স্থানের প্রতি সেটার সম্বন্ধ করার মতোই, তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধারণা পোষণ করলো। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা এখানেই শেষ।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তার জন্য পূর্ণতার যেসব গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন, জাহমীয়া, মু'তাযিলা ও আশআরী সম্প্রদায়ের লোকেরা তা নাকোচ করে থাকে। আর এ কথা বাস্তব যে, যারাই আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা থেকে পূর্ণতার গুণাবলি নাকোচ করেছে, তারাই তার জন্য সেটার বিপরীতে ত্রুটিযুক্ত বিশেষণ সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তা'আলা এসব যালেমের কথার বহু উর্ধ্বে।

উপরোক্ত কথা গ্রহণ করা হলে এটি আবশ্যক হয় যে, এ গোমরাহ লোকেরাই আল্লাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী এবং আল্লাহর জন্য যা শোভনীয় তা সাব্যস্ত করার জন্য তারাই তার চেয়ে বেশি হকদার। কেননা তিনি নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, তারা তা নাকোচ করেছে। তারা বলেছে, সেটা আল্লাহ তা'আলার জন্য শোভনীয় নয়। এর চেয়ে অধিক গোমরাহী আর কী হতে পারে? আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে এত জঘন্য কথা বলার চেয়ে দুঃসাহসিকতা আর কী হতে পারে।

তাদের কথা থেকে আরো আবশ্যক হয় যে, তারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও অধিক জানে। কেননা তিনিও আল্লাহ তা'আলার জন্য এ ছিফাতগুলো সাব্যস্ত করেছেন। আর এসব জাহমীয়া ও মু'তাযিলারা তা নাকোচ করেছে এবং বলেছে এগুলো তার জন্য শোভনীয় নয়। সুতরাং এদের চেয়ে অধিক গোমরাহ আর কে হতে পারে? আফসোস! যদি তারা বুঝতে পারতো!

আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তা সম্পর্কে যত জ্ঞান রাখেন এ গোমরাহ মূর্খ লোকেরা কীভাবে তার চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখার দাবি করতে পারে। তিনি তাদের কথার বহু উর্ধ্বে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾

"তিনি লোকদের সামনের ও পেছনের সব অবস্থা জানেন। তারা তাদের জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না"। (সূরা ত্বহা: ১১০)

সুতরাং সৃষ্টির মধ্য থেকে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তিনি ছাড়া অন্য কেউ অধিক জানে না। আল্লাহ তা'আলা যা দ্বারা বিশেষিত হওয়ার উপযুক্ত এবং যা কিছু তার জন্য শোভনীয়, সে সম্পর্কে তিনি এবং তার রসূল ব্যতীত অন্য কেউ অধিক জানে না।

আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও জ্ঞান-বুদ্ধির ত্রুটির কারণেই জাহমীয়া এবং তাদের অনুসারীরা আল্লাহ তা'আলার ছিফাত অস্বীকার করেছে। তারা মনে করেছে, এ ছিফাতগুলো আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা হলে তা থেকে তাশবীহ বা তার সদৃশ সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়। কেননা তারা এ ছিফাতগুলো সৃষ্টির মধ্যে প্রত্যক্ষ করে থাকে। তারা স্রষ্টার ছিফাত এবং সৃষ্টির ছিফাতের মধ্যে পার্থক্য করে না এবং স্রষ্টার ছিফাত থেকে কেবল ঐ পরিমাণই বুঝে থাকে, যে পরিমাণ বুঝে থাকে সৃষ্টির ছিফাত থেকে। তারা জানে না যে, মহান স্রষ্টার জন্য রয়েছে খাছ ও শোভনীয় ছিফাত এবং সৃষ্টির জন্য রয়েছে খাছ ও শোভনীয় ছিফাত। স্রষ্টার সত্তা ও সৃষ্টির সত্তার মধ্যে যেমন কোনো সাদৃশ্য নেই ঠিক তেমনি স্রষ্টার ছিফাত ও সৃষ্টির ছিফাতের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা আশ শূরা:১১)

এখানে আল্লাহ নিজের জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টি সাব্যস্ত করেছেন। একই সঙ্গে নিজের সত্তার সাথে কোনো কিছুর সাদৃশ্য হওয়াকেও নাকোচ করেছেন। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহর জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক হয় না।

আল্লাহ তা'আলার জন্য অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এটি হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি। এর উপরই তারা রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তার জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, উদাহরণ-উপমা পেশ করা ছাড়াই তারা তার জন্য সেটা সাব্যস্ত করেন এবং তিনি তার নিজের সত্তা থেকে যা নাকোচ করেছেন, তার মহান গুণাবলি বাতিল করা ব্যতীত কেবল তাই নাকোচ করেন।

কিন্তু জাহমীয়া, আশায়েরা এবং তাদের শিষ্যরা একটি বাতিল মূলনীতির উপর তাদের মাযহাব নির্মাণ করেছে, যা নিজেরাই তৈরী করেছে। তাদের মতে আল্লাহর জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করা হলে সৃষ্টির সাথে তাশবীহ বা সাদৃশ্য আবশ্যক হয়। তাই ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোর ক্ষেত্রে তারা নিম্নোক্ত দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটি আবশ্যক মনে করে।

(১) ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোর বাহ্যিক অর্থ পরিহার করে অন্য অর্থে তাবীল করা। অথবা

(২) কেবল বক্তব্যগুলোর অর্থবিহীন শব্দমালা সাব্যস্ত করা। সেই সঙ্গে এ বিশ্বাস করা যে, তাতে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

এ জন্যই তাদের আক্বীদায় বিশ্বাসী কোনো এক কবি বলেছেন

وكل نص أوهم التشبيها ... أوله أو فوض ورم تنزيها

"হে বন্ধু! কুরআন ও সুন্নাহর যেসব বক্তব্যে আল্লাহর সাথে সৃষ্টির তাশবীহ হওয়ার সন্দেহ রয়েছে, তার বাহ্যিক অর্থ পরিহার করে অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করো অথবা কেবল বক্তব্যগুলোর অর্থ বিহীন শব্দমালা সাব্যস্ত করো এবং সৃষ্টির সাথে আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্য হওয়ার ধারণা থেকে তাকে পবিত্র করো"।

হে আমার রব! এসব যালেম এবং নাস্তিক যা বলছে তা থেকে আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তুমি তাদের কথার বহু উর্ধ্বে। উপরোক্ত কবির জবান থেকে আল্লাহ তা'আলা সত্য বের করেছেন। তিনি বলেছেন, "**وكل نص أوهم التشبيها**" কুরআন ও সুন্নাহর যেসব বক্তব্যে আল্লাহর সাথে সৃষ্টির তাশবীহ হওয়ার সন্দেহ রয়েছে.....। এতে প্রমাণ মিলে যে, তাদের মাযহাবের ভিত্তি হচ্ছে সন্দেহের উপর, সুপ্রাণিত সত্যের উপর নয়। কেননা তারা ধারণা করেছে যে, এ বক্তব্যগুলোতে তাশবীহ বা সাদৃশ্যের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তারা এগুলোর তাবীল করেছে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কি কখনো আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের বিরোধিতা করা বৈধ? সন্দেহের উপর কি আক্বীদা নির্মাণ করা জায়েয? আসলে সন্দেহের স্তর ধারণার চেয়ে নিম্নে। আল্লাহ তা'আলা ধারণা সম্পর্কে বলেন,

﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾

"সত্যের মোকাবেলায় অনুমানের কোনো মূল্য নেই"। (সূরা আন নাযম: ২৮)

الرد على المنحرفين عن منهج السلف في أسماء الله وصفاته من المشبهة والمعطلة

আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলির ক্ষেত্রে সালাফদের মানহাজের পক্ষ হতে পথভ্রষ্ট মুশাব্বেহা ও মুআত্তেলাদের জবাব

দু'টি সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলির ক্ষেত্রে সালাফদের মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তারা হলো মুশাব্বেহা এবং মুআত্তেলা সম্প্রদায়।

(১) মুশাব্বেহা (المشبهة): এরা আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করে দেয় ও তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে। এরা আল্লাহর ছিফাতগুলোকে সৃষ্টির ছিফাতসমূহের হিসাবে নির্ধারণ করেছে। এ জন্যই তাদেরকে মুশাব্বেহা বলা হয়।

হিশাম ইবনে হাকাম রাফেযী এবং বয়ান ইবনে সামআন তামিমী সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার ছিফাতকে সৃষ্টির ছিফাতের সাথে সাদৃশ্য দেয়ার মাযহাব প্রচার করেছে। এই বয়ান ইবনে সামআনকে শিয়াদের সীমালঙ্ঘনকারী বয়ানীয়া মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য করা হয়। সুতরাং মুশাব্বেহারা আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তা থেকে ত্রুটিযুক্ত ও অশোভনীয় যেসব ছিফাত নাকোচ করেছেন এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নাকোচ করেছেন, এরা তার জন্য তাও সাব্যস্ত করেছে। মুশাব্বেহা সম্প্রদায়ের ইমামদের মধ্যে রয়েছে হিশাম ইবনে সালেম আল-জাওয়ালেকী এবং দাউদ আল-যাহেবী। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার বহু উর্ধ্বে।

সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য রাখার কথা আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে নাকোচ করেছেন এবং তার জন্য সৃষ্টির মধ্য থেকে উপমা ও দৃষ্টান্ত পেশ করা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ "তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই"। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ "তোমার জানা মতে তার সমকক্ষ কেউ আছে কি?" (সূরা মারইয়াম: ৬৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ "তার সমতুল্য কেউ নেই"। (সূরা ইখলাছ: ৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ "আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না"। (সূরা আন নাহাল: ৭৪)

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ছিফাতকে সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তাশবীহ দিবে সে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত ইবাদতকারী হিসাবে গণ্য হবে না। সে কেবল এমন মূর্তির পূজা করে, যাকে তার মনের কল্পনা আকৃতি প্রদান করেছে এবং তার অসুস্থ বিবেক রূপদান করেছে। সে মূলত মূর্তিপূজক, আল্লাহর ইবাদতকারী নয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ... إن المشبه عابد الأوثان

আমরা আল্লাহর ছিফাতকে আমাদের ছিফাতের সাথে তুলনা করি না। নিশ্চয় যে ব্যক্তি স্রষ্টার ছিফাতকে সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তুলনা করে সে কেবল মূর্তির ইবাদত করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ছিফাতসমূহকে তার সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তাশবীহ দেয়, সে ঐসব খ্রিষ্টানদের অন্তর্ভুক্ত, যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম 'আলাইহিস সালামের ইবাদত করে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন,

من مثل الله العظيم بخلقه ... فهو النسيب لمشرك نصراني

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে তার সৃষ্টির সাথে তুলনা করে, সে খ্রিষ্টান মুশরেকের কুটুম্ব।

ইমাম বুখারীর উস্তাদ নাঈম ইবনে হাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির সাথে তাশবীহ দিলো, সে কুফুরী করলো। আল্লাহ তা'আলা যা দিয়ে নিজেকে কিংবা তার রসূল তাকে যা দিয়ে বিশেষিত করেছেন, যে তা নাকোচ করলো, সেও কুফুরী করলো। আর আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যে বিশেষণে বিশেষিত করেছেন অথবা তার রসূল তাকে যা দ্বারা বিশেষিত করেছেন, তাতে কোনো তাশবীহ নেই।

(২) মুআত্তেলা (المعطلة): আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র সত্তাকে যেসব পূর্ণতার গুণাবলি দ্বারা বিশেষিত করেছেন অথবা তার রসূল তাকে পূর্ণতার যেসব ছিফাত দ্বারা গুণান্বিত করেছেন, যারা সেগুলো অস্বীকার করে তারাই মুআত্তেলা। তাদের ধারণা হলো আল্লাহর জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করা হলে তাশবীহ ও তাজসীম তথা সৃষ্টির সাথে তার সাদৃশ্য এবং তার জন্য দেহ সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক হয়। এরা মুশাব্বেহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইয়াহূদীদের অনুসারী, মুশরেক এবং পথভ্রষ্ট বে-দীনদের থেকে আল্লাহ তা'আলার ছিফাত অস্বীকার করার মাযহাব এসেছে। হিজরী দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে জা'দ ইবনে দিরহাম সর্বপ্রথম মুসলিম জাতির মধ্যে তা'তীল তথা আল্লাহর ছিফাত অস্বীকার করার মাযহাব প্রচার করে। তার থেকে এ মাযহাব গ্রহণ করে নিকৃষ্ট জাহাম ইবনে সাফওয়ান এবং তা প্রকাশ্যে প্রচার ও প্রসার ঘটায়। জাহাম ইবনে সাফওয়ানের দিকেই জাহমীয়া মাযহাবের সম্বন্ধ করা হয়। অতঃপর মু'তাযিলা ও আশআরীগণ এ মাযহাব গ্রহণ করে।

এ হলো তাদের মাযহাবের সনদ। তাদের মাযহাবের সনদের গোড়ার দিকে রয়েছে ইয়াহূদী, বে-দীন, মুশরেক এবং দার্শনিক। মুআত্তেলারা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। জাহমীয়ারা এক বাক্যে আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাতসমূহ অস্বীকার করে। মু'তাযিলারা আল্লাহ তা'আলার শুধু নামগুলো সাব্যস্ত করে। তবে তারা এ নামগুলোর মধ্যে যেসব সুমহান অর্থ রয়েছে তা অস্বীকার করে এবং তারা আল্লাহ তা'আলার সমস্ত ছিফাত অস্বীকার করে। ঐদিকে আশায়েরাগণ আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামগুলো এবং মাত্র সাতটি

ছিফাত সাব্যস্ত করে। আশআরীগণ যেসব ছিফাত সাব্যস্ত করে, তা হলো, الحياة (আল্লাহর জীবন) العلم (তার জ্ঞান), الإرادة (তার ইচ্ছা), القدرة (তার ক্ষমতা), السمع (তার শ্রবণ), البصر (তার দৃষ্টি) এবং الكلام (তার কথা)। বাকী ছিফাতগুলো তারা নাকোচ করে অথবা তাবীল করে।

আল্লাহ তা'আলার ছিফাত নাকোচ করার ক্ষেত্রে জাহমীয়া, মু'তাযিলা ও আশায়েরাদের দলীল হলো, তাদের মতে আল্লাহ তা'আলার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করা হলে তাশবীহ ও তাজসীম আবশ্যক হয়। অর্থাৎ সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সাদৃশ্য হয়ে যায় এবং স্রষ্টার জন্য দেহ সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়। তাদের মতে দেহ বিশিষ্ট সৃষ্টিই কেবল এসব ছিফাত দ্বারা বিশেষিত হয়। আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কথা হলো, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ "তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই"। (সূরা আশ শূরা ৪২:১১) সুতরাং তাদের মতে আল্লাহর ছিফাত নাকোচ করা আবশ্যক এবং সৃষ্টির সাথে তার সাদৃশ্য হওয়ার ধারণা থেকে তাকে পবিত্র রাখার জন্য তাকে ছিফাতশূন্য রাখা জরুরী। এ জন্যই তারা আল্লাহ তা'আলার সুমহান ছিফাতগুলো সাব্যস্ত কারীদেরকে জাহমীয়ারা মুশাব্বেহা বলে নামকরণ করে।

কুরআন-সুন্নাহর যেসব বক্তব্য আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করে, সে ব্যাপারে তাদের দুই ধরনের মত রয়েছে।

প্রথম মত: ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোর শব্দগুলোর প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করে থাকে এবং শব্দগুলোর অর্থসমূহ আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেয়। তারা এগুলোর ব্যাখ্যা করা থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহর নিকট এগুলোর ব্যাখ্যা সোপর্দ করে দেয়। সেই সঙ্গে ছিফাতগুলো সেসব অর্থ প্রদান করে সেগুলোর কিছুই আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করে না। তারা এই পদ্ধতিকেই সালাফদের তরীকা মনে করে এবং বলে এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ তরীকা।

দ্বিতীয় মত: ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোকে সেটার সঠিক অর্থ থেকে সরিয়ে ফেলে অন্যান্য এমন অর্থে ব্যাখ্যা করা, যা তারা নিজেদের পক্ষ থেকে আবিষ্কার করেছে। এটিকে তারা তাবীল বা ব্যাখ্যা হিসাবে নামকরণ করে থাকে এবং খালাফ তথা পরবর্তীদের তরীকা বলে থাকে। তারা এ তরীকাকে সর্বাধিক প্রজ্ঞাপূর্ণ বলে থাকে।

তাদের উপরোক্ত দলীলের জবাব:

সন্দেহাতীতভাবেই কুরআনুল কারীম সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সদৃশ ও উপমা থাকার কথা নাকোচ করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ "তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা আশ শূরা ৪২:১১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ "তোমার জানা মতে তার সমকক্ষ কোন সত্তা আছে কি"? (সূরা মারইয়াম: ৬৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ "এবং তার সমতুল্য কেউ নেই"। (সূরা ইখলাছ: ৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ "কাজেই আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না"। (সূরা আন নাহাল: ৭৪) তবে সৃষ্টির সাথে আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্য নাকোচ করার সাথে সাথে তিনি তার নিজের সত্তার জন্য পূর্ণতার গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন।

যেমন তিনি বলেছেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ "তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দু'টি বিষয় একসাথে একত্র করেছেন। তিনি নিজের সত্তা থেকে তাশবীহ নাকোচ করেছেন এবং একই সঙ্গে তিনি নিজের জন্য দু'টি ছিফাত তথা শ্রবণ ও দৃষ্টি সাব্যস্ত করেছেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করা হলেই তিনি সৃষ্টির সদৃশ হয়ে যান না কিংবা সৃষ্টির সাথে তার তুলনা হয়ে যায় না। কেননা ছিফাত সাব্যস্ত করার জন্য তাশবীহ দেয়া আবশ্যক নয়। অর্থাৎ সাব্যস্ত করা এবং সাদৃশ্য করা একই বিষয় নয়।

অনুরূপ আমরা কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে দেখতে পাই যে, সৃষ্টির সাথে আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্য নাকোচ করার পাশাপাশি তার জন্য পূর্ণতার গুণাবলি সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটিই হলো সালাফদের মাযহাব। তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করেন এবং তার থেকে তাশবীহ এবং দৃষ্টান্ত-উপমা-উদাহরণ নাকোচ করেন। অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে তার কোনো সদৃশ, দৃষ্টান্ত, উপমা, উদাহরণ ও সমকক্ষ নেই।

যারা মনে করে আল্লাহর জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করা শোভনীয় নয়, কারণ ছিফাত সাব্যস্ত করা হলে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার তাশবীহ আবশ্যক হয়, তাদের বোধশক্তির মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। এ ত্রুটিযুক্ত বোধশক্তিও তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ছিফাত অস্বীকার করার দিকে টেনে নিয়েছে। অপূর্ণ বোধশক্তির কারণেই তারা বুঝেছে যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করলে তাশবীহ আবশ্যক হয়ে যায়। এই অপূর্ণ বোধশক্তি ও ভুল ধারণাই তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ঐসব ছিফাতকে অস্বীকারের দিকে নিয়ে গেছে, যা তিনি তার নিজের সত্তার জন্য সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এসব মূর্খ প্রথমত আল্লাহর ছিফাতকে সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তুলনা করেছে দ্বিতীয়তঃ তার ছিফাতকে অস্বীকার করেছে। তারা প্রথম ও শেষ উভয় পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার শানে অশোভনীয় অন্যায় কথা বলেছে। তাদের অন্তরগুলো যদি তাশবীহর আবর্জনা থেকে পবিত্র হতো, তাহলে সহজেই বুঝতে পারতো যে, আল্লাহ তা'আলার ছিফাতগুলো পূর্ণতা ও মহত্ত্বের এমন উচ্চ শিখরে, যা স্রষ্টার ছিফাত ও সৃষ্টির ছিফাতের মধ্যে সাদৃশ্য ও সম্পর্ক থাকার ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে নাকোচ করে দেয়।

সুতরাং যার অন্তর পবিত্র হবে, সে আল্লাহ তা'আলার ছিফাতগুলোর প্রতি শোভনীয় পদ্ধতিতে ঈমান আনয়নের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকবে। ঐ দিকে অন্তর অসুস্থ থাকার কারণে যে ব্যক্তি ধারণা করে আল্লাহর ছিফাতগুলো সৃষ্টির ছিফাতের মতোই সে আল্লাহকে

যথাযথভাবে চিনতে পারেনি এবং তার যথাযথ কদরও করতে পারেনি। অসুস্থ অন্তরের লোকেরাই আল্লাহর ছিফাতগুলো সৃষ্টির ছিফাতের মতো কল্পনা করেছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা তার ছিফাতগুলো অস্বীকার করার সমস্যায় পড়েছে। অতঃপর তাদের অভ্যাস এ হয়েছে যে, যারাই কুরআন ও ছ্বহীহ সুন্নাহ্র আলোকে আল্লাহ তা'আলার জন্য পূর্ণতার বিশেষণগুলো সাব্যস্ত করে এবং তার পবিত্র সত্তা থেকে অপূর্ণতার বিশেষণগুলো নাকোচ করে, তাদেরকে তারা মুশাব্বেহা ও মুজাস্সেমা বলে গালি দেয়। কেননা তাদের অন্তরে একটি খারাপ ধারণা গেঁথে আছে যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করা হলে সৃষ্টির সাথে তাশবীহ হয়ে যায়। কারণ এগুলো সৃষ্টির মধ্যেও রয়েছে। এসব মূর্খ লোকেরা জানে না যে, সৃষ্টির মধ্যে যেসব দোষমুক্ত পূর্ণতার বিশেষ রয়েছে, স্রষ্টা তা দ্বারা বিশেষিত হওয়ার আরো বেশি হকদার। সুতরাং তারা স্রষ্টাকে প্রথমে সৃষ্টির সাথে তুলনা করেছে। অতঃপর যখন দেখলো যে, এতে করে স্রষ্টা আর সৃষ্টি একরকম হয়ে যায়, তাই তারা তাশবীহ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় স্রষ্টার ছিফাতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে।

জাহমীয়া ও তাদের যেসব শিষ্য মনে করে আল্লাহ তা'আলার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করা হলে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির তাশবীহ হয়ে যায়, তাদের জবাবে সুন্নাতের সাহায্যকারী ইমামদের ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা (রহিমাহুল্লাহ) যা বলেছেন, আমরা সংক্ষিপ্তভাবে তা এখানে উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, অভিশপ্ত জাহমীয়ারা বলে থাকে, সুন্নাতের অনুসরণকারী আহলুস্ সুন্নাতের যেসব লোক দাবি করে যে, তারা তাদের রবের কিতাব ও নাবীর সুন্নাত মোতাবেক আল্লাহ তা'আলার জন্য ঐসব ছিফাত সাব্যস্ত করেন, যা দ্বারা তিনি নিজেকে কুরআনুল কারীমে বিশেষিত করেছেন এবং যা দ্বারা তার নাবী মোস্তফা ন্যায়পরায়ন রাবীদের মুত্তাসেল সনদে বর্ণিত হাদীছে বিশেষিত করেছেন তারা মুশাব্বেহা। আমাদের কিতাব ও আমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত সম্পর্কে জাহমীয়াদের অজ্ঞতা থাকার কারণে এবং আরবদের ভাষা সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই উপরোক্ত কথা বলেছে।

ইমাম ইবনে খুজায়মা (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, আমরা এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে আমাদের আলেমগণ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার নির্ভুল কিতাবে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তার চেহারা রয়েছে। অতঃপর সেই চেহারাকে বিশেষিত করা হয়েছে ذُوالْجَلَالِ والإكرام "মহিয়ান ও দয়াবান" এ দু'টি বিশেষণের মাধ্যমে। অতঃপর চেহারাকে অবিনশ্বর বিশেষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সেটা কখনো ধ্বংস হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা আরো বলি, আমাদের রবের চেহারার এমন আলো, জ্যোতি এবং উজ্জ্বলতা রয়েছে, যার পর্দা উন্মুক্ত করা হলে তার চেহারার আলো যতোদূর পৌঁছাবে ততোদূরের সবকিছুকে জ্বালিয়ে ফেলবে।

আমরা আরো বলি, বনী আদমের এমন চেহারা রয়েছে, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস নির্ধারণ করে রেখেছেন। বনী আদমের চেহারার অস্তিত্ব এক সময় বিদ্যমান ছিল না, পরে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন

করেছেন। সমস্ত বনী আদমের সমস্ত চেহারা ধ্বংসশীল, এগুলোর কোনো স্থায়িত্ব নেই। সমস্ত বনী আদম মারা যাবে অতঃপর ক্ষয়প্রাপ্ত হবে ও পঁচে যাবে। অতঃপর পঁচে-গলে শেষ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন। তখন কেউ যাবে জান্নাতের নেয়ামতে আবার কেউ যাবে জাহান্নামের আযাবে।

সুতরাং হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! যে জ্ঞানবান লোক আরবদের ভাষা বুঝে, আরবী ভাষার সম্বোধন বুঝে এবং এক জিনিসকে অন্য জিনিসের সাথে সাদৃশ্য দেয়ার বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতি বুঝে, তার অন্তরে কীভাবে এ ধারণা উদয় হতে পারে যে, আল্লাহর জন্য চেহারা সাব্যস্ত করা হলে তার অনন্ত-অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী চেহারা সৃষ্টির ধ্বংসশীল চেহারার সদৃশ হয়ে যায়?

হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের দলীলের মাধ্যমে আমাদের মহান প্রভুর চেহারার যে বিশেষণ আমরা বর্ণনা করলাম, তা কি বনী আদমের ঐসব চেহারার অনুরূপ হতে পারে, যার বিবরণ উপরে প্রদান করা হয়েছে?

আল্লাহ তা'আলার চেহারা সাব্যস্ত করা থেকে যদি আমাদের আলেমগণ এটি বুঝতেন যে, তার চেহারা বনী আদমের চেহারার মতোই, তাহলে প্রত্যেকের জন্য এ কথা বলা বৈধ হতো যে, বনী আদমের যেহেতু চেহারা আছে এবং শুকর, বানর, হিংস্র জীব-জন্তু, গাধা, খচ্চর, সাপ-বিচ্ছু ও কীট-পতঙ্গেরও যেহেতু চেহারা আছে, তাই বনী আদমের চেহারাসমূহ শুকর, বানর, কুকুর এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর চেহারার মতোই। আমি মনে করি আল্লাহর ছিফাত অস্বীকারকারী জাহমীয়াদের কারো নিকট যদি তার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিও বলে যে, তোমার চেহারাটি শুকর, বানর, কুকুর, গাধা কিংবা খচ্চর কিংবা অন্য কোনো প্রাণীর চেহারার মতোই, তাহলে সে অবশ্যই রাগ করবে।

ইমাম ইবনে খুযায়মা (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, আমাদের উপরোক্ত আলোচনা থেকে আলেমদের নিকট সাব্যস্ত হলো, যারা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের অনুসারীদেরকে মুশাব্বেহা বলে গালি দেয়, তারা বাতিল, মিথ্যা এবং অন্যায় কথা বলে। সেই সঙ্গে তারা আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং আরবদের ভাষার দাবি বহির্ভূত কথাও বলে।

ইমাম ইবনে খুযায়মা (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার নির্ভুল কিতাবে নিজেকে যেসব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বহীহ সুন্নাতে তার প্রভুর যেসব গুণাবলি বর্ণনা করেছেন, জাহমীয়াদের মুআত্তেলা সম্প্রদায় তার প্রত্যেকটিই অস্বীকার করে। ইসলামী শরী'আত সম্পর্কে অজ্ঞতা তাদেরকে এটি করতে প্রেরণা দিয়েছে। এর কারণ হলো তারা কুরআনুল কারীমে পেয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার নিজের নাম ও ছিফাতসমূহ থেকে কিছু কিছু নাম ও ছিফাত দ্বারা কতিপয় সৃষ্টিকে বিশেষিত করেছেন। তাই মূর্খতার কারণে তারা ধারণা করেছে, যারা উক্ত বিশেষগুণগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বিশেষিত করলো, সে তাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য প্রদান করলো!! হে জ্ঞানী সম্প্রদায় আপনারা এ জাহমীয়াদের মূর্খতার প্রতি খেয়াল করুন।

গ্রন্থকার বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবের অনেক স্থানে নিজেকে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। তিনি তার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ "তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের বিশেষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ "আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি"। (সূরা ইনসান: ২)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আরো জানিয়েছেন যে, তিনি দেখেন। যেমন তিনি বলেন, ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ "আর হে নাবী! তাদেরকে বলো, তোমরা আমল করতে থাকো। আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনগণ তোমাদের আমল দেখবেন"।

আল্লাহ তা'আলা মূসা ও হারুনকে উদ্দেশ্য করে আরো বলেছেন,

﴿ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾

"ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি"। (সূরা তোহা: ৪৬)

আল্লাহ তা'আলা এখানে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বনী আদমের আমলসমূহ দেখেন এবং তার রসূল মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের আমলসমূহ দেখেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

"এরা কি পাখিদের দেখেনি, আকাশে কীভাবে তারা নিয়ন্ত্রিত রয়েছে? আল্লাহ ছাড়া কে তাদেরকে ধরে রেখেছে? এর মধ্যে মুমিনদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে"। (সূরা আন নাহাল: ৭৯)

সুতরাং বনী আদম দেখতে পায় যে পাখিরা আকাশে বশীভূত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ "তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার ওহী অনুযায়ী নৌকা বানাও"। (সূরা হুদ: ৩৭)

আল্লাহ তা'আলা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেন,

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾

"হে নাবী! তোমার রবের ফায়ছালা আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই তুমি আমার চোখে চোখেই আছো। তুমি যখন উঠবে তখন তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ

করো"। *(সূরা তূর: ৪৮)* আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তার জন্য চোখ সাব্যস্ত করেছেন এবং বনী আদমের জন্যও চোখ সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾

"যখন তারা রসূলের উপর অবতীর্ণ কালাম শুনতে পায় তখন তুমি দেখতে পাও যে, সত্যকে চিনতে পারার কারণে তাদের চোখসমূহ অশ্রুবিগলিত হয়ে ওঠে। তারা বলে, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নাও"। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তার চোখ রয়েছে। বনী আদমেরও চোখ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত ইবলীস সম্পর্কে বলেন,

﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَاسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْعَالِينَ﴾

"হে ইবলীস! যাকে আমি নিজের দুই হাতে সৃষ্টি করেছি তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি অহংকার করলে? না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন?" (সূরা সোয়াদ: ৭৫) আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

"আর ইয়াহূদীরা বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা হয়ে গেছে। তাদের হাতই বাঁধা হয়ে গেছে। এ কথা বলার কারণে তাদের উপর অভিসম্পাত করা হয়েছে; বরং তার উভয় হস্ত সদা উন্মুক্ত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন"। (সূরা আল মায়িদা: ৬৪)

আল্লাহ তা'আলা এখানে তার নিজের জন্য দু'টি হাত সাব্যস্ত করেছেন। তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, বনী আদমেরও দু'টি হাত রয়েছে। এ থেকে কোনোভাবেই তাশবীহ আবশ্যক হয় না। আল্লাহর জন্য রয়েছে তার বড়ত্ব ও মর্যাদা অনুযায়ী শোভনীয় হাত। সৃষ্টির জন্যও রয়েছে শোভনীয় ও মানানসই হাত।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তার জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, তা সাব্যস্তকারীকে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সাদৃশ্য প্রদানকারী হিসাবে নামকরণ করা ফাসেক জাহমীয়াদের জন্য কীভাবে বৈধ হতে পারে। ইমাম ইবনে খুযায়মা (রহিমাহুল্লাহ)র বক্তব্য এখানেই শেষ। ইমাম ইবনে খুযায়মা (রহিমাহুল্লাহ) এভাবেই জাহমীয়া ও তাদের শিষ্যদের জবাব দিয়ে তাদেরকে নির্বাক করে দিয়েছেন। এর কোনো জবাব তারা দিতে পারেনি। ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের মত আরো বিজ্ঞ ইমাম তাদের প্রতিবাদ করেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ এখনো তাদের বিদ'আতগুলোর জবাব দিয়ে যাচ্ছেন।

জাহমীয়া, আশায়েরা এবং অন্যান্যদের প্রতিবাদে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) যা বলেছে আমরা এখন তা থেকে কিছু নমুনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এরা মনে করেছে যে আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছের যেসব বক্তব্য রয়েছে তা ঐসব মুতাশাবেহার অন্তর্ভুক্ত, যার ইলম কেবল আল্লাহর নিকটই রয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এগুলোর অর্থ জানে না। তাদের মতে এসব বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতে গেলে তাশবীহ হয়ে যায়। তাই এগুলোর এমন অর্থ রয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এ কারণেই তারা এগুলোর অর্থ বর্ণনা না করে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেয় এবং মনে করে এটিই সালাফদের পদ্ধতি। মূলত তারা সালাফদের নামে মিথ্যা বলছে। তারা সালাফদের প্রতি এমন কথার সম্বন্ধ করছে, যা থেকে তারা সম্পূর্ণ পবিত্র। কেননা তাদের আক্বীদা হলো আল্লাহর সম্মানিত কিতাব ও রসূলের পবিত্র সুন্নাতে তার ছিফাতগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই সাব্যস্ত করা। এগুলো বাহ্যিক অর্থেই সাব্যস্ত করা। আল্লাহ তা'আলার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই তারা এগুলোর ব্যাখ্যা করেন। তারা এগুলোর অর্থ আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেন না। বরং তাদের মতে আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো মুহকাম আয়াতের অন্তর্ভুক্ত; মুতাশাবেহার অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলার ছিফাত অস্বীকার নাকোচকারী পণ্ডিতদের মতে আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সংক্রান্ত বিষয়গুলোর অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তারা আরো বলে এগুলোর যে অর্থ আল্লাহ তা'আলা উদ্দেশ্য করেছেন, তা হলো এগুলোর বাহ্যিক অর্থ পরিহার করে অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করা। তাদের কথার অর্থ থেকে আবশ্যক হয় যে, নাবী-রসূলগণ তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাবের অর্থ জানতেন না। আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাগণ এবং উম্মতের প্রথম যুগের সম্মানিত ছাহাবীগণও জানতেন না। সুতরাং তাদের কথা মত আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে যেসব বিশেষণে নিজেকে বিশেষিত করেছেন তার নাবী তা বুঝতেন না অথবা অন্যান্য নাবীগণ আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো বুঝতেন না। নাবীগণ এমন কথা বলতেন, যা তারা নিজেরাই বুঝতেন না।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া তাদের জবাবে বলেন, নিঃসন্দেহে এটি কুরআন ও নাবীদের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার শামিল। কেননা আল্লাহ তা'আলাই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তাতে সংবাদ দিয়েছেন যে, কুরআন হলো মানুষের জন্য হিদায়াত ও সুস্পষ্ট বর্ণনা স্বরূপ। তিনি রসূলকে মানুষের নিকট কুরআনের বাণী সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়ার আদেশ করেছেন এবং তিনি যা তাদের জন্য নাযিল করেছেন, তা মানুষের জন্য খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করার আদেশ করেছেন। তিনি কুরআন নিয়ে গবেষণা করা ও তা হৃদয়ঙ্গম করার আদেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি কুরআনে তার সুউচ্চ গুণাবলি সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি সর্ববিষয়ে অবগত রয়েছেন, তিনি আদেশ দিয়েছেন, নিষেধ করেছেন, সৎ আমলের বিনিময়ে জান্নাতের ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছে, পাপাচারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন এবং

আখিরাত দিবস সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং কীভাবে এমন ধারণা পোষণ করা যেতে পারে যে, কেউ এগুলোর অর্থ জানে না!! কীভাবে বলা যেতে পারে যে, কুরআন বুঝা সম্ভব নয়, তাতে চিন্তা-গবেষণা করা সম্ভব নয়, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মানুষের জন্য যা নাযিল করা হয়েছে তার বর্ণনা দেননি এবং তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনাও প্রদান করেননি।

যারা বলে সালাফদের মতে আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলি অথবা তার কিয়দাংশ ঐসব মুতাশাবেহার অন্তর্ভুক্ত, যার ইলম একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে, তাদের কথাকে নাকোচ করতে গিয়ে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সালাফগণ এ কথা বলেছেন তার দলীল কী? আমি জানি না এ উম্মতের কোনো সালাফ কিংবা কোনো ইমাম যেমন আহমাদ ইবনে হাম্বল কিংবা অন্য কোনো ইমাম থেকে এ কথা বর্ণিত হয়নি যে, তারা ছিফাত সংক্রান্ত আয়াতগুলোকে মুতাশাবেহার অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন। তারা ছিফাত সংক্রান্ত আয়াতগুলোকে সূরা আল-ইমরানের ৭ নং আয়াতের অন্তর্ভুক্ত মনে করেননি, যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾

"তিনিই তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে মুহকাম (সুস্পষ্ট), সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো মতাশাবেহ (অস্পষ্ট)" (সূরা আলে ইমরান ৩:৭)।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ মুতাশাবেহ আয়াতের অর্থ জানে না। জাহমীয়া এবং তাদের শিষ্যরা আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামসমূহ এবং সুউচ্চ ছিফাতগুলোকে অনারবদের ঐসব কালামের মধ্যে গণ্য করেছে, যা বোধগম্য নয়।

আসল কথা হলো সালাফগণ আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় এমন কথা বলেছেন, যার সঠিক অর্থ রয়েছে। ছিফাত সংক্রান্ত হাদীছগুলোর ক্ষেত্রে তারা বলেছেন, تمر كما جاءت "এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবেই রেখে দিতে হবে"। একই সঙ্গে তারা জাহমীয়াদের তাবীলসমূহ গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন, সেগুলোর প্রতিবাদ করেছেন এবং সেগুলোকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। জাহমীয়াদের তাবীলের সারসংক্ষেপ হলো, তারা ছিফাত সংক্রান্ত আয়াতগুলোর সঠিক অর্থকে বাতিল করে দেয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) এবং তার পূর্বেকার ইমামদের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, তারা জাহমীয়াদের তাবীলসমূহকে বাতিল ঘোষণা করতেন। এ সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো যে অর্থ বহন করে তারা সেগুলোকে অর্থসহ সাব্যস্ত করতেন। সুতরাং ইমামগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, তারা ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোর অর্থ জানতেন। এগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করা থেকে তারা নিরব থাকতেন না। বরং ইমামদের ঐক্যমতে কোনো প্রকার তাহরীফ বা বক্তব্যগুলোকে তার সঠিক স্থান থেকে সরানো ছাড়াই তারা এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশেণ্ডষণ করতেন এবং তারা

আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে বিকৃতি সাধন করা ব্যতীত সেটা তার জন্য সাব্যস্ত করতেন।

সালাফ এবং ইমামদের থেকে এ মাযহাবই শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া বর্ণনা করেছেন। তারা ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোকে এমন মুতাশাবেহার অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন না, যার অর্থ বোধগম্য নয় এবং যার কোনো অর্থ বর্ণনা করা ছাড়াই আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেয়া আবশ্যক। বরং তারা এগুলোর অর্থ জানতেন এবং ব্যাখ্যা করতেন। তারা কেবল আল্লাহ তা'আলার ছিফাতে ধরন, পদ্ধতি, কাইফিয়্যতের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ করে দিতেন। যেমন ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة

'আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া জানা বিষয়। এর পদ্ধতি কেউ অবগত নয়। তার উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। তবে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা বিদ'আত।[১০৯]

ইমাম ইবনে কাছীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ "অতঃপর দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন"- এ সম্পর্কে লোকদের অনেক মতভেদ রয়েছে। সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা করার স্থান এটি নয়। তবে এ ব্যাপারে আমরা সালাফে ছ্বলেহীন, ইমাম মালেক, আওযাঈ, লাইছ ইবনে সা'দ, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই এবং মুসলিম উম্মাহর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক অন্যান্য ইমামদের পথ অবলম্বন করবো।

আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছগুলোর ব্যাপারে তাদের মাযহাব হলো, যেভাবে এগুলো এসেছে কোনো প্রকার ধরন, পদ্ধতি-কায়া বর্ণনা করা, সৃষ্টির সাথে তাশবীহ দেয়া এবং বাতিল করা ছাড়া সেভাবেই রেখে দেয়া। মুশাব্বেহাদের মস্তিস্কে এগুলোর বাহ্যিক যে তাশবীহর ধারণা প্রবেশ করে, তা আল্লাহ তা'আলা থেকে সম্পূর্ণরূপে নাকোচ করতে হবে। কেননা সৃষ্টির কোনো কিছুই আল্লাহ তা'আলার সাথে সাদৃশ্য রাখে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা আশ শূরা ৪২:১১)

মুসলিমদের ইমামগণ একথাই বলেছেন। ইমাম বুখারীর উস্তাদ নুআইম ইবনে হাম্মাদ আল-খুযাঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে তার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দিলো, সে কুফুরী করলো এবং আল্লাহ তা'আলা যা দ্বারা নিজেকে বিশেষিত করেছেন, যে

[১০৯] অতঃপর সেই বিদ'আতী লোককে ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) এর নির্দেশে তাঁর মজলিস থেকে বের করে দেয়া হলো। কেননা এটি এমন প্রশ্ন, যা সালাফে সালেহীনের কোনো লোক নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করেননি।

তা অস্বীকার করলো, সেও কুফুরী করলো। আর আল্লাহ তা'আলা যা দ্বারা নিজেকে বিশেষিত করেছেন এবং তার রসূল যেসব বিশেষণ দ্বারা তার প্রভুকে বিশেষিত করেছেন, তাতে কোনো তাশবীহ বা সাদৃশ্য নেই। সুতরাং সুস্পষ্ট আয়াত ও ছ্বহীহ হাদীছে আল্লাহ তা'আলার যেসব গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জন্য সেগুলোকে তার বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতে সাব্যস্ত করলো এবং অপূর্ণতার বিশেষণগুলো তার থেকে নাকোচ করলো, সে হেদায়াতের পথেই চললো। ইমাম ইবনে কাছীরের বক্তব্য এখানেই শেষ।

আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামগুলো এবং তার সুউচ্চ ছিফাতগুলোর ক্ষেত্রে এ হলো সালাফদের মাযহাব। সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তাশবীহ না দিয়ে এবং এগুলোর অর্থকে বাতিল না করে যেভাবে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে এগুলো এসেছে, সেভাবেই তা সাব্যস্ত করা। আল্লাহ তা'আলার জন্য এগুলো সাব্যস্ত করা এবং তার কোনো ছিফাতকে অস্বীকার না করে তাকে সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র করা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা আশ শূরা ৪২:১১)

সুতরাং যে ব্যক্তি সালাফদের প্রতি এ কথার সম্বন্ধ করবে যে, তারা আল্লাহর ছিফাতসমূহের অর্থ বর্ণনা করা এবং সেটা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা ব্যতীতই রেখে দিতেন, তারা তাদের নামে মিথ্যা অপবাদ দিল ও তাদের প্রতি এমন অভিযোগ করলো, যা থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة

দ্বিতীয় মূলনীতি: ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ঈমানের ছয়টি রুকনের অন্তর্ভুক্ত। ঈমান সম্পর্কে জিবরীল 'আলাইহিস সালামের প্রশ্নের জবাবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

(أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)

"তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে (১) আল্লাহ পাকের উপর (২) তার ফেরেশতাদের উপর (৩) তার কিতাবসমূহের উপর (৪) তার রসূলদের উপর (৫) আখিরাত বা শেষ দিবসের উপর এবং (৬) তাক্বদীরের ভালো-মন্দের উপর"।[১১০]

কুরআনের অনেক আয়াতে ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়টি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

"রসূল তার রবের পক্ষ হতে যে হিদায়াত নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান এনেছেন। মুমিনগণ ঈমান এনেছেন। তারা সকলেই আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি এবং রসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। তারা বলেন, আমরা রসূলদের একজনকে অন্যজন থেকে পার্থক্য করি না। আর তারা বলেন, আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং অনুগত হয়েছি। হে আমাদের প্রভু! আমরা গুনাহ মাফের জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আমরা তোমারই দিকে ফিরে যাবো"। (সূরা আল বাকারা: ২৮৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

"তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরনোর মধ্যে কোনো পূণ্য নেই; বরং পূণ্য তার, যে ব্যক্তি আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নাবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে"। (সূরা আল বাকারা: ১৭৭)

---

[১১০] ছহীহ মুসলিম হা/৮, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনয়নের তাৎপর্য হলো, অন্তর দিয়ে তাদের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস করা। আরো বিশ্বাস করা যে, তারা আল্লাহর মর্যাদাশীল বান্দা। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তার ইবাদতের জন্য এবং তার আদেশ বাস্তবায়নের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সে সঙ্গে আরো বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, বিভিন্ন প্রকার ফেরেশতা রয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন গুণাবলি রয়েছে। আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ বিভিন্ন কাজ-কর্ম ও দায়-দায়িত্ব পালন করে। আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের যে ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে, তার প্রতিও ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক।[১১১]

---

[১১১] কুরআন ও ছ্বহীহ হাদীছের আলোকে ফেরেশতাদের আরো কিছু গুণাগুণ, কাজ-কর্ম ও দায়িত্ব-কর্তব্যের বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হলো,

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ "এরপর আল্লাহর হুকুমে সকল বিষয়ের কাজ পরিচালনা করে"। (সূরা আন নাযিআত, ৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا﴾ "অতঃপর একটি বড় জিনিস বন্টনকারী"। (সূরা আয যারিয়াত, ৪) ঈমানদার ও রাসূলদের অনুসারীদের নিকট এরা হচ্ছেন ফেরেশতা। যারা সৃষ্টিকর্তা ও নবী-রাসূলদেরকে অস্বীকার করে, তারা বলে থাকে যে, উক্ত আয়াত দু'টিতে তারকার কথা বলা হয়েছে।

কুরআন ও সুন্নাহয় বিভিন্ন প্রকার ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে। সেই সাথে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার মাখলুকের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের দায়িত্বে ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মেঘমালা ও বৃষ্টি পরিচালনার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মাতৃগর্ভে শিশুর দায়িত্বে ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। সে শুক্রবিন্দু থেকে শুরু করে শিশুর গঠন পর্যন্ত যাবতীয় কাজ পরিচালনা করে। বান্দা যেই আমল করে, তা সংরক্ষণ করার জন্য এবং লিখে রাখার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। মৃত্যুর জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। কবরে প্রশ্ন করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মহা শূণ্যের গ্রহ-নক্ষত্রের জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। তারা তা ঘুরান ও পরিচালনা করেন। চন্দ্র-সূর্যের নিয়ন্ত্রণের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। জাহান্নাম, জাহান্নামের আগুন জ্বালানো, জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়া এবং জাহান্নামের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। জান্নাত, জান্নাতের পরিচালনা, তাতে বৃক্ষাদি লাগানো এবং তাতে বিভন্ন প্রকার নিয়ামত স্থাপন করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন।

সুতরাং ফেরেশতারা আল্লাহর সর্বাধিক বড় সৈনিক। তাদের মধ্যে রয়েছে এমন সব ফেরেশতা, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ "শপথ ফেরেশতাদের, যারা একের পর এক প্রেরিত হয়। (সূরা মুরসালাত: ১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (٣) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (٤) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا﴾ "শপথ ঐ সমস্ত ফেরেশতাগণের, যারা মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। তারপর তাকে ফেঁড়ে বিচ্ছিন্ন করে। অতঃপর মানুষের মনে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে দেয়"। (সূরা মুরসালাত: ৩-৫)

ফেরেশতাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا

(١) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (٢) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (٣) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا﴾ "সেই ফেরেশতাদের কসম! যারা ডুব দিয়ে টানে এবং ঐ সমস্ত ফেরেশতার কসম, যারা খুব আস্তে আস্তে বের করে নিয়ে যায়। আর সেই ফেরেশতাদেরও শপথ! যারা বিশ্বলোকে দ্রুত গতিতে সাঁতরে চলে অতঃপর বারবার সবেগে এগিয়ে যায়"। (সূরা আন নাযিআত: ১-৪)

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের কাজ সম্পর্কে আরো বলেন,

﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا﴾

"সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মানদের কসম, তারপর যারা ধমক ও অভিশাপ দেয়। তারপর তাদের কসম যারা উপদেশবাণী শুনায়"। (সূরা সাফফাত: ১-৩)

ফেরেশতাদের মধ্যে আরো রয়েছে একদল রহমতের ফেরেশতা। রয়েছে আযাবের ফেরেশতা। আরো এমন ফেরেশতা রয়েছে, যাদেরকে আরশ বহন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আরো এমন ফেরেশতা রয়েছে, যাদেরকে ছ্বলাত কায়েম, তাসবীহ পাঠ এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমে আসমানসমূহ আবাদ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে আরো অনেক ফেরেশতা, যাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। الملك শব্দটির লাম বর্ণে যবর দিয়ে পড়লে এমন অর্থ প্রদান করে যাতে বুঝা যায় যে, তারা সেই বার্তাবাহক অর্থে ব্যবহৃত, যারা বার্তা প্রেরকের বার্তা পৌছিয়ে দেয়। তাদের হাতে কিছু নেই। বরং সকল কিছুর চাবিকাঠি পরাক্রমশালী একক সত্তার হাতে। তারা শুধু তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾

"তারা তো মর্যাদাশালী বান্দা। তারা তাঁর সামনে অগ্রবর্তী হয়ে কথা বলেন না এবং শুধু তাঁর হুকুমে কাজ করেন"। (সূরা আল আম্বীয়া: ২৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾

"যা কিছু মানুষের সামনে আছে তা তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের অগোচরে আছে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত"। (সূরা আল বাকারা: ২৫৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾

"যাদের পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ সম্মত তাদের পক্ষে ছাড়া আর কারো সুপারিশ তারা করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত"। (সূরা আল আম্বীয়া: ২৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"তারা ভয় করে নিজেদের রবকে যিনি তাদের উপরে আছেন এবং যা কিছু হুকুম দেয়া হয় তারা তাই করে"। (সূরা আন নাহাল: ৫০)

সুতরাং ফেরেশতারা হচ্ছেন আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তাদের মধ্যে কতক ফেরেশতা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। কেউবা তাসবীহ পাঠে মশগুল। তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে সুনির্দিষ্ট দাঁড়াবার স্থান। তিনি তা অতিক্রম করতে পারেন না। তিনি আদিষ্ট কর্মে ব্যস্ত রয়েছেন। সেই কাজ করতে কোন প্রকার ত্রুটি করেন না এবং তাঁকে যেই কাজের আদেশ করা হয়েছে, তার সীমালঙ্ঘন করেন না। যারা আল্লাহর নিকটবর্তী, তাদের মর্যাদা সর্বোচ্চ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾

"তারা নিজেদেরকে বড় মনে করে তাঁর ইবাদত থেকে বিমুখ হয় না এবং না ক্লান্ত হয়। দিনরাত তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকেন, বিরাম বা বিশ্রাম নেন না"। (সূরা আল আম্বীয়া: ১৯-২০)

ফেরেশতাদের প্রধান ও নেতা হলেন তিনজন। জিবরীল, মীকাঈল এবং ইসরাফীল। তারা সকল মানুষ, প্রাণী, জীব ও উদ্ভিদের হায়াতের দায়িত্বপ্রাপ্ত। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) অহীর দায়িত্বপ্রাপ্ত। অহীর মাধ্যমেই রূহ এবং অন্তর জীবিত হয়। মিকাঈল বৃষ্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত। বৃষ্টির মাধ্যমে যমীন, উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগৎ জীবিত হয়। ইসরাফীল শিঙ্গায় ফুৎকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এর মাধ্যমে সৃষ্টি মৃত্যুর পর পুনজীবন ফেরত পাবে। সুতরাং ফেরেশতারা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি ও আদেশের ক্ষেত্রে আল্লাহর দূত। তারা তাঁর মাঝে এবং তাঁর বান্দাদের মাঝে দূত স্বরূপ। তারা আল্লাহর নিকট থেকে সৃষ্টি জগতের সকল প্রান্তে তাঁর আদেশ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে অবতরণ করে এবং তাঁর নিকট উন্নীত হয়। ফেরেশতাদের ভারে আসমানসমূহ কড়কড় আওয়াজ করে। আওয়াজ করাই এগুলোর জন্য সমীচিন। আসমানে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও খালী নাই, যাতে কোনো না কোনো ফেরেশতা দাঁড়িয়ে, কিংবা রুকু অবস্থায় অথবা সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল নয়। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা বাইতুল মা'মুরে প্রবেশ করে। তাদের কেউ তাতে দ্বিতীয়বার প্রবেশের সুযোগ পাবে না। কুরআন মাজীদ বিভিন্ন প্রকার ফেরেশতা এবং

ছ্বহীহ মুসলিমের হাদীছে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নূর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতাদের সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে যেসব দলীল রয়েছে, তা থেকে নিম্নে কয়েকটি দলীল উল্লেখ করা হলো।

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সম্মানার্থে তাদেরকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নাবীর প্রতি দরূদ পাঠান। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তার প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠাও"। (সূরা আল আহযাব: ৫৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ﴾

"তারা সবাই আল্লাহর প্রতি ও তার ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

"যারা কুফুরী করেছে, আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি এবং তার রসূলদের প্রতি এবং পরকালের প্রতি, তারা বহুদূরের গোমরাহীতে পতিত হয়েছে"। (সূরা আন নিসা: ১৩৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তার ফেরেশতা, তার রসূলগণ, জিবরীল ও মীকাইলের শত্রু হবে স্বয়ং আল্লাহ সেই কাফেরদের শত্রু"। (সূরা আল বাকারা: ৯৮)

আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষ্যকে ফেরেশতাদের সাক্ষ্যের সাথে এবং নাবীর প্রতি তার দুরূদ পাঠানোর সাথে ফেরেশতাদের দুরূদ পাঠানোকে একসাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ﴾

তাদের বিভিন্ন পদ মর্যাদার আলোচনায় ভরপূর। কোথাও কোথাও আল্লাহ তা'আলা তাঁর নামের সাথে ফেরেশতার নাম যুক্ত করে উল্লেখ করেছেন এবং আল্লাহর ছ্বলাতকে ফেরেশতাদের ছ্বলাতের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন। আবার কখনো কখনো সম্মান জনক স্থানের দিকে তাদেরকে সম্বোধিত করেছেন। আবার কখনো উল্লেখ করেছেন যে, ফেরেশতারা আরশকে ঘিরে আছে এবং তারা আরশ বহন করে আছে। আবার কখনো উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা পাপ কাজ করা হতে মুক্ত। কখনো বলা হয়েছে যে, তারা সম্মানিত, নৈকট্যশীল, তারা উপরে উঠে, তারা পবিত্র, শক্তিধর এবং একনিষ্ঠ। (আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

"আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন"। (সূরা আলে-ইমরান: ১৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নাবীর প্রতি দরূদ পাঠান"। (সূরা আহযাব: ৫৬)

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মর্যাদাবান বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾

"এ উপদেশ লিপিকারদের হস্ত দ্বারা লিপিবদ্ধ। যারা সম্মানিত ও পূণ্যবাণ"। (সূরা আবাসা: ১৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾

"নিশ্চয় তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ নিযুক্ত রয়েছেন। সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তোমরা যা করো তারা তা জানে"। (সূরা ইনফিতার: ১০-১২) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾

"তারা তো মর্যাদাশালী বান্দা। তারা তার সামনে অগ্রবর্তী হয়ে কথা বলেন না এবং শুধু তার হুকুমে কাজ করেন"। (সূরা আল আম্বীয়া: ২৬-২৭)

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উর্ধ্বজগতের বাসিন্দা এবং নৈকট্যশীল বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ﴾

"শয়তানরা উর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না। এদের উপর সকল দিক থেকে উল্কা নিক্ষিপ্ত হয়"। (সূরা আস সাফফাত: ৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ "নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতারা এর দেখাশুনা করে"। (সূরা আল মুতাফফিফীন: ২১)

আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন যে, ফেরেশতাগণ তার আরশ বহন করে এবং সেটাকে ঘিরে রাখে"। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾

"আল্লাহর আরশের ধারক ফেরেশতাগণ এবং যারা আরশের চারপাশে হাজির থাকে তারা সবাই প্রশংসাসহ তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করে। তার প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং ঈমানদারদের জন্য দু'আ করে। তারা বলে, হে আমাদের রব! তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো। তাই যারা তাওবা করেছে এবং তোমার পথ অনুসরণ করছে তাদেরকে মাফ করে দাও"। (সূরা গাফের: ৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

তুমি আরো দেখতে পাবে যে, ফেরেশতারা আরশের চারদিক বৃত্ত বানিয়ে তাদের রবের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে। মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফায়ছালা করে দেয়া হবে এবং ঘোষণা দেয়া হবে, সারা বিশ্ব-জাহানের রবের জন্যই সমস্ত প্রশংসা। (সূরা আয যুমার: ৭৫) আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সম্মান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তারা তার নিকটবর্তী, তারা তার ইবাদত করে এবং তার পবিত্রতা বর্ণনা করে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾

"তোমার রবের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ কখনো নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে তার ইবাদতে বিরত হয় না: বরং তারা তারই মহিমা ঘোষণা করে এবং তার সামনে সিজদাবনত হয়"। (সূরা আল-আরাফ: ২০৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾

কিন্তু তারা যদি অহংকার করে, তাতে কিছু যায় আসে না। যেসব ফেরেশতা তোমার রবের সান্নিধ্য লাভ করেছে তারা রাতদিন তার তাসবীহ বর্ণনা করছে এবং কখনো ক্লান্ত হয় না। (সূরা ফুস্সিলাত: ৩৮)

কাজ-কর্ম ও দায়-দায়িত্ব পালনের দিক থেকে ও ফেরেশতাগণ বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। তাদের মধ্য থেকে একদল ফেরেশতা আল্লাহর আরশ বহনকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ﴾

"আল্লাহর আরশের ধারক ফেরেশতাগণ এবং যারা আরশের চারপাশে হাজির থাকে"।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾

"সেদিন আটজন ফেরেশতা তাদের উপরে তোমার রবের আরশ বহন করবে"। (সূরা হাক্কাহ: ১৭) তাদের একদল আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾

"মসীহ কখনো নিজে আল্লাহর এক বান্দা হবার ব্যাপারে লজ্জা অনুভব করে না এবং ঘনিষ্ঠতর ফেরেশতারাও একে নিজেদের জন্য লজ্জাকর মনে করে না। যে কেউ আল্লাহর ইবাদত করতে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে তাদের সবাইকে নিজের সামনে হাযির করবেন"। (সূরা আন নিসা: ১৭২)

আরেকদল ফেরেশতা রয়েছেন, যারা জান্নাতের সংরক্ষণ এবং তাতে বসবাসকারীদের জন্য বিভিন্ন প্রকার নিয়ামত প্রস্তুত করার দায়িত্বে নিয়োজিত। আরেক শ্রেণির ফেরেশতা জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদেরকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত। এরা হলো জাহান্নামের দারোগা। তাদের মধ্যে ১৯ ফেরেশতা হলেন নেতৃস্থানীয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ "সেখানে নিয়োজিত আছে উনিশজন কর্মচারী"। (সূরা আল মুদ্দাছছির: ৩০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ﴾

"তারা চিৎকার করে বলবে হে মালেক! তোমার রব আমাদেরকে চিরতরে নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে, তোমাদের এভাবেই থাকতে হবে। (সূরা আয যুখরুফ: ৭৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾

"জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত এসব লোক জাহান্নামের প্রহরীদের বলবে, তোমাদের রবের কাছে দু'আ করো তিনি যেন একদিনের জন্য আমাদের আযাব হালকা করেন"। (সূরা গাফের: ৪৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো যার জ্বালানী হবে মানুষ এবং পাথর। সেখানে নিয়োজিত আছে রুঢ় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতারা। যারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাই করে"। (সূরা আত তাহরীম ৬৬:৬)

আল্লাহ তা'আলার কিছু ফেরেশতা রয়েছে, যারা দুনিয়াতে বনী আদমের হেফাযত করে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ﴾

"মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে একের পর এক পাহারাদার নিযুক্ত রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে তার হেফাযত করছে। নিশ্চয় আল্লাহ ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থা বদলান না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের স্বভাব-চরিত্র বদলে ফেলে। আর আল্লাহ যখন কোনো জাতির অকল্যাণ করার ফায়ছালা করেন তখন তা প্রতিহত করার কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই"। (সূরা আর রা'দ: ১১)

অর্থাৎ তার সাথে ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা তাকে তার সামনে ও পেছনে রক্ষণাবেক্ষণ করে। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ফায়ছালা চলে আসে তখন তারা তাকে ছেড়ে চলে যায়। ফেরেশতাদের একদল বান্দাদের আমল সংরক্ষণ করা ও লেখার দায়িত্বে নিয়োজিত। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

"দু'জন লেখক তার ডান ও বাম দিকে বসে সবকিছু লিপিবদ্ধ করছে। এমন কোনো শব্দ তার মুখ থেকে বের হয় না, যা সংরক্ষিত করার জন্য একজন রক্ষক সদা প্রস্তুত থাকে না"। (সূরা কাফ: ১৭-১৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾

"অথচ তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ নিযুক্ত রয়েছে। সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তোমরা যা করো, তারা তা জানে"। (সূরা আল ইনফিতার: ১০-১১)

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

(يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ)

"তোমাদের নিকট রাতে একদল ফেরেশতা এবং দিনে একদল ফেরেশতা পালাক্রমে আগমন করে। তারা ফজর ও আসরের ছ্বলাতের সময় একসাথে একত্রিত হয়। অতঃপর তোমাদের কাছে যে দলটি ছিল, তারা উপরে উঠে যায়। মহান আল্লাহ জানা সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো? তারা বলেন, আমরা তাদেরকে ছ্বলাত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম,

তখন তারা ছ্বলাতেই ছিল”।[১১২]

সুতরাং মানুষের সাথে এক শ্রেণির ফেরেশতা রয়েছে, যারা তাকে কষ্টদায়ক জিনিস থেকে হেফাযত করে। আরেক শ্রেণির ফেরেশতা রয়েছে, যারা তার আমলসমূহ সংরক্ষণ করে এবং তার মুখ থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয়, তা সংরক্ষণ করে। আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাদের মধ্যে এমন ফেরেশতা রয়েছে, যিনি গর্ভাশয় ও শুক্রকীটের দায়িত্বে নিয়োজিত। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদীছে এসেছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نطفة، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يكتب رزقه وَأَجَلَهُ وعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ»

“তোমাদের কারো সৃষ্টির অবস্থা এ যে, সে তার মায়ের পেটে প্রথমে চল্লিশ দিন বীর্য আকারে সঞ্চিত থাকে। পরবর্তী চল্লিশ দিনে সেটা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিনে সেটা মাংশপিন্ডে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তিনি তাতে রূহ ফুঁকে দেন। এসময় তাকে চারটি বিষয় লেখার নির্দেশ দেয়া হয়: (১) সে কী পরিমাণ রিযিক পাবে। (২) বয়স কত হবে। (৩) কর্ম কি হবে এবং (৪) সে সৌভাগ্যবান হবে না হতভাগা হবে”।[১১৩]

ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একদল ফেরেশতা বনী আদমের রূহ কবযের দায়িত্বশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾

“তিনি নিজের বান্দাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং তোমাদের উপর রক্ষক নিযুক্ত করে পাঠান। অবশেষে যখন তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন তার প্রেরিত ফেরেশতারা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজেদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তারা সামান্যতম শৈথিল্য দেখায়না”। (সূরা আল আনআম: ৬১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾

“বলে দাও, মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে, যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে”। (সূরা সাজদাহ: ১১)

---

[১১২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৫৫, নাসাঈ হা/৪৮৫।
[১১৩] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬৪৩, তিরমিযী, হা/২১৩৭, ছ্বহীহ।

সুতরাং মালাকুল মাওতের জন্য ফেরেশতাদের মধ্য থেকে সহযোগী রয়েছে। তারা বান্দার শরীর থেকে রূহ বের করে। তারা যখন রূহকে কণ্ঠনালী পর্যন্ত আনয়ন করে, তখন মালাকুল মাওত নিজের কবযায় নিয়ে নেয়। মোটকথা আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্বজগৎ ও নিম্নজগতে বহু ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। তারা তার অনুমতি, আদেশ ও ইচ্ছায় উভয় জগতের সকল কাজ-কর্ম পরিচালনা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾

"তারা তো মর্যাদাশালী বান্দা। তারা তার সামনে অগ্রবর্তী হয়ে কথা বলেন না এবং শুধু তার হুকুমে কাজ করেন"। (সূরা আল আম্বীয়া: ২৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"তারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাই পালন করে"। (সূরা আত তাহরীম: ৬)

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা কখনো কখনো ফেরেশতাদের দিকেই ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সম্বন্ধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾

"অতঃপর তারা সকল বিষয়ের কাজ পরিচালনা করেন"। (সূরা আন নাযিআত: ৫)

আবার কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলা সেটাকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾

"তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন এবং এ পরিচালনার বৃত্তান্ত উপরে তার কাছে উঠানো হয় এমন একদিনে যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর"। (সূরা সাজদাহ: ৫)

সুতরাং ফেরেশতা হলো আল্লাহ তা'আলা ও তার সৃষ্টির মধ্যে দূত স্বরূপ। তারা তার আদেশ-নিষেধ সৃষ্টির নিকট পৌঁছে দেয়। আর الملك ফেরেশতা নামটির অর্থই হলো দূত। কেননা الملك শব্দটি ألوكة থেকে গৃহীত। ألوكة শব্দটি الرسالة অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা এবং ফেরেশতাদেরকে বাণীবাহক নিয়োগকারী। যাদের দুই দুই তিন তিন ও চার চারটি ডানা আছে। তিনি নিজের মধ্যে যা চান বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জিনিসের উপর শক্তিশালী"। *(সূরা ফাতির: ১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾

"শপথ ফেরেশতাদের, যারা একের পর এক প্রেরিত হয়"। (সূরা আল মুরসালাত: ১)

সুতরাং এরা হলো আল্লাহ তা'আলার ঐসব সৃষ্টিগত আদেশ বাস্তবায়নকারী ফেরেশতা, যা দ্বারা আসমান-যমীনের সবকিছুর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা হয়। সেই সঙ্গে তারা আল্লাহ তা'আলার শরী'আত গত আদেশ নিয়েও মানব রসূলদের কাছে আগমন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾

"তিনি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় নির্দেশে ওহীসহ ফেরেশতাদের নাযিল করেন, এই মর্মে সতর্ক করার জন্য যে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো সত্য মাবুদ নেই। কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় করো"। (সূরা আন নাহাল: ২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

"আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও বাণীবাহক বাছাই করেন এবং মানুষদের মধ্য থেকেও। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা আল হাজ্জ: ৭৫)

ফেরেশতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলেন জিবরীল 'আলাইহিস সালাম। তিনি ওহীর দায়িত্বশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾

"এটি রব্বুল আলামীনের নাযিল করা কিতাব। একে নিয়ে আমানতদার রূহ অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। পরিষ্কার আরবী ভাষায়"। (সূরা শুআরা: ১৯২-১৯৫)

আল্লাহ তা'আলা সূরা নাহালের ১০২ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾

"বলো, একে তো রূহুল কুদুছ সত্যসহকারে তোমার রবের পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছে"।

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বিভিন্ন আকার-আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। তারা ইবরাহীম ও লুত 'আলাইহিস সালামের নিকট মেহমানের বেশে আগমন করেছিলেন। নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিবরীল আসতেন বিভিন্ন আকৃতিতে। কখনো আসতেন দিহইয়া কালবীর আকৃতিতে, কখনো আসতেন গ্রাম্য লোকের আকৃতিতে আবার কখনো আসতেন তার আসল আকৃতিতে যেভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেভাবেই। দু'বার এমনটি হয়েছিল। জিবরীল অন্য আকৃতিতে আসার কারণ হলো, মানুষ ফেরেশতাদেরকে আসল আকৃতিতে দেখার ক্ষমতা রাখে না।

মুশরিকরা যখন আবেদন করেছিল, আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের কাছে ফেরেশতা পাঠান, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ﴾

তারা বলে, তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয় না কেন? যদি ফেরেশতা পাঠাতাম, তাহলে ফায়ছালা হয়ে যেতো, তখন তাদেরকে আর কোনো অবকাশই দেয়া হতোনা। যদি ফেরেশতা পাঠাতাম তাহলেও তাকে মানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম এবং তাদেরকে ঠিক তেমনি সংশয়ে লিপ্ত করতাম যেমন তারা এখন লিপ্ত রয়েছে। (সূরা আল আনআম: ৮-৯)

অর্থাৎ মানুষের কাছে যদি ফেরেশতা রসূল পাঠাতাম, তাহলে ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতেই আসতেন। যাতে করে মানুষেরা তার সাথে কথা বলতে পারে এবং তার কাছ থেকে আল্লাহ তা'আলার বাণী গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারে। কেননা প্রত্যেক প্রকার সৃষ্টিই সমজাতীয় সৃষ্টির সাথে মিশতে পারে, ঘনিষ্টতা ও সখ্যতা তৈরী করতে অভ্যস্ত এবং অন্য প্রকৃতির সৃষ্টি থেকে দূরে সরে যায়। ফেরেশতা সম্পর্কে এতটুকু আলোচনাকেই যথেষ্ট মনে করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দিন। আমীন।

الأصل الثالث: الإيمان بالكتب

তৃতীয় মূলনীতিঃ আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান।

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ঈমানের অন্যতম রুকন। আসমানী কিতাবগুলোর প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হলো দৃঢ় বিশ্বাস করা যে এগুলো সত্য ও সঠিক। আরো বিশ্বাস করা যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলার কালাম। তাতে রয়েছে হিদায়াত, নূর এবং যাদের প্রতি এগুলো নাযিল করা হয়েছে, তাদের জন্য এগুলোই যথেষ্ট।

আসমানী কিতাবগুলো থেকে আল্লাহ তা'আলা যেগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি। যেমন কুরআন, তাওরাত, ইঞ্জিল ও যবুর। আর যেগুলোর নাম আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করেননি, সেগুলোর প্রতিও বিশ্বাস করি। কেননা আল্লাহ তা'আলার আরো অনেক কিতাব রয়েছে, যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যেহেতু সীমিত এবং সেটা দ্বারা ক্ষতিকর ও কল্যাণকর বস্তুর মধ্যে পার্থক্য মোটামুটিভাবে বুঝতে সক্ষম হলেও তারা কল্যাণকর ও ক্ষতিকর বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে জানতে সক্ষম নয়। তাই তাদের জন্য আসমান থেকে কিতাব পাঠানোর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি দয়াশীল হয়ে নাবী-রসূলদের মাধ্যমে অনেক কিতাব পাঠিয়েছেন।

সে সঙ্গে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার উপর প্রবৃত্তির প্রেরণা প্রাধান্য লাভ করে। প্রবৃত্তির তাড়না ও পার্থিব হীন স্বার্থ তাদের বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে খেল-তামাশা করে। সুতরাং মানুষকে যদি তাদের সীমিত বিবেক-বুদ্ধির উপর ছেড়ে দেয়া হতো, তাহলে তারা পথভ্রষ্ট হতো। এ জন্য আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও রহমতের দাবি অনুযায়ী নির্বাচিত রসূলদের উপর তিনি এ কিতাবগুলো নাযিল করেছেন। যাতে তারা মানুষের জন্য এসব কিতাবের দিক-নির্দেশনা বাতলে দিতে পারেন, তাতে যেসব ইনসাফপূর্ণ হুকুম-আহকাম, উপকারী উপদেশ এবং মানবতার সংশোধনের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে আগত আদেশ-নিষেধগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করতে পারেন। মানব জাতির পিতা আদমকে যখন জান্নাত থেকে যমীনে নামিয়ে দেয়া হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

"এরপর যখন আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত তোমাদের কাছে পৌঁছাবে তখন যারা আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের জন্য থাকবে না কোনো ভয় এবং তারা চিন্তিতও হবে না"। (সূরা আল বাকারা: ৩৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

"হে বনী আদম! তোমাদের কাছে যখন তোমাদের মধ্য থেকে রসূলগণ এসে তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ বিবৃত করে, তখন যারা সতর্ক হবে এবং নিজেকে সংশোধন করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং চিন্তিতও হবে না"। (সূরা আল-আরাফ: ৩৫)

আসমানী কিতাবগুলোর ব্যাপারে লোকেরা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক শ্রেণির লোক সমস্ত আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করেছে। নাবী-রসূলদের দুশমন কাফের, মুশরিক ও দার্শনিকরা এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

আরেক শ্রেণির লোক সমস্ত আসমানী কিতাবেই বিশ্বাস করে। এরা হলো ঐসব মুমিন, যারা সমস্ত নাবী-রসূল এবং তাদের উপর অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের উপর ঈমান আনয়ন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

"রসূল তার রবের পক্ষ হতে যে হিদায়াত নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান এনেছেন। মুমিনগণও ঈমান এনেছেন। তারা সকলেই আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি এবং তার রসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তারা বলে, আমরা রসূলদের একজনকে অন্যজন থেকে পৃথক করি না। আর তারা বলে, আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং অনুগত হয়েছি। হে আমাদের প্রভু! আমরা গুনাহ মাফের জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আমরা তোমার দিকেই ফিরে যাবো"। (সূরা আল বাকারা: ২৮৫)

আরেক শ্রেণির লোক কিছু আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে এবং বাকিগুলোর প্রতি কুফুরী করেছে। এরা হলো ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান এবং তাদের অনুসারীগণ। তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তার উপর ঈমান আনো, তখন তারা বলে,

﴿نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾

"আমরা কেবল আমাদের উপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তার উপর ঈমান আনি। এর বাইরে যা কিছু এসেছে তার প্রতি তারা কুফুরী করছে। অথচ তা সত্য এবং তাদের কাছে পূর্ব থেকে যে কিতাব রয়েছে তার সত্যায়নকারী"। (সূরা আল বাকারা: ৯১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

"তোমরা কি কিতাবের এক অংশের উপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশের সাথে কুফুরী করছো? অতএব তোমাদের যারাই এমনটি করে তাদের প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ ছাড়া আর কী হতে পারে? ক্বিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে। তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন"। (সূরা আল বাকারা: ৮৫)

কুরআনের এক অংশের প্রতি ঈমান আনয়ন করা অথবা আসমানী কিতাবসমূহের কোনোটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং কুরআনের কোনো অংশ অথবা কোনো আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করা সমস্ত আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করার মতই কুফুরী। কেননা সমস্ত আসমানী কিতাব এবং সমস্ত নাবী-রসূলের উপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। সেই সঙ্গে ঈমানের বিষয়গুলোর প্রতি একসাথে এমনভাবে অবস্থায় বিশ্বাস করা আবশ্যক, যাতে কোনো পার্থক্য ও বিভক্তি করণ এবং মতভেদ পরিলক্ষিত না হয়। যারা কিতাবের ব্যাপারে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে এবং মতভেদ করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দোষারোপ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾

"আল্লাহ তো যথার্থ সত্য অনুযায়ী কিতাব নাযিল করেছেন। কিন্তু যারা কিতাবের ব্যাপারে মতভেদ করেছে, তারা নিজেদের বিরোধের ক্ষেত্রে সত্য থেকে অনেক দূরে চলে গেছে"। (সূরা আল বাকারা: ১৭৬)

প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং বাতিল ধারণার বশবতী হয়ে বনী আদমের বিরাট অংশ আসমানী কিতাবগুলো কিংবা কতিপয় কিতাব অস্বীকার অথবা একই কিতাবের কিয়দাংশ অস্বীকার করেছে। এ ব্যাপারে তাদের ধারণা, বিবেক-বুদ্ধি, রায় এবং মস্তিষ্ক প্রসূত কিয়াসই সর্বোচ্চ দলীল। তারা নিজেদেরকে মহাজ্ঞানী এবং দার্শনিক হিসাবে নামকরণ করে থাকে। রসূল ও তাদের অনুসারীদেরকে নিয়ে তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে এবং তাদেরকে মূর্খ বলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾

"তাদের নিকট যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ নিয়ে তাদের রসূলগণ এসেছিলেন তখন তারা নিজের কাছে বিদ্যমান জ্ঞানের দম্ভ করতো এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো তাই তাদেরকে বেষ্টন করলো"। (সূরা মু'মিন:৮৩)

আর রসূলদের অনুসারীদের ব্যাপারে কথা হলো, তারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ প্রত্যেক কিতাবের প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা এগুলোর মাঝে কোনো

পার্থক্য করে না। পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করা হবে সংক্ষিপ্তভাবে। অন্তর ও জবানের মাধ্যমে এগুলোর স্বীকৃতি দেয়া আবশ্যক। আর কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন করতে হবে বিস্তারিতভাবে। কুরআনের প্রতি অন্তর ও জবান দিয়ে স্বীকৃতি প্রদান করা আবশ্যক, সেটাতে যা আছে তার অনুসরণ করা জরুরী এবং ছোট-বড় সব বিষয়েই কুরআনের অনুশাসন মেনে চলা ফরয। এই বিশ্বাস করাও কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়নের মধ্যে শামিল যে, সেটা কালাম, আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে, সেটা সৃষ্টি নয়; বরং তার ছিফাত, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সেটা এসেছে এবং আখিরী যামানায়[১১৪] তার দিকেই ফিরে যাবে।

আল্লাহ তা'আলার হিকমতের দাবি অনুযায়ী, পূর্বকালের কিতাবগুলো ছিল নির্দিষ্ট সময়-সীমার জন্য। সেগুলোর সংরক্ষণ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল মানুষের মধ্য থেকে সেটার বাহকদেরকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾

"আমি তাওরাত নাযিল করেছি। তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো। আল্লাহর অনুগত নাবীগণ সে অনুযায়ী ইয়াহূদীদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়ছালা করতো। আর এভাবে রব্বানী ও আহবারগণও। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর উপর সাক্ষী"। (সূরা আল মায়িদা: ৪৪)

আর কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে কথা হলো আল্লাহ তা'আলা সেটাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বযুগের সর্বস্থানের সমগ্র জাতির জন্য নাযিল করেছেন। তিনি নিজেই এটাকে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। কেননা পৃথিবীতে মানব জাতির অস্তিত্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত কুরআনের দায়-দায়িত্ব শেষ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

"নিশ্চয়ই আমি এ উপদেশ নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক"। (সূরা আল হিজর: ৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

"সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে মিথ্যা এতে প্রবেশ করতে পারে না। এটি প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ"। (সূরা ফুচ্ছিলাত: ৪২)

---

[১১৪] আখিরী যামানায় এক রাতেই কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন মানুষের অন্তর এবং মুসহাফ থেকে কুরআন উঠে যাবে। তাদের অন্তরে ও মুসহাফে কুরআনের কোন অংশই অবশিষ্ট থাকবে না। পৃথিবী তখন পাপাচারে ভরে যাবে। এমনকি আল্লাহ আল্লাহ বলার মত কোন লোক থাকবে না। তখন সেই নিকৃষ্ট লোকদের উপর ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

মানব সমাজের সমস্ত বিবাদ-বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কুরআনকে ফায়ছালাকারী বানানো আবশ্যক এবং সমস্ত মতভেদের ক্ষেত্রে কুরআনের দিকে ফিরে আসা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাব ব্যতীত অন্যের নিকট বিচার-ফায়ছালা নিয়ে যাওয়াকে ত্বগূতের নিকট বিচার-ফায়ছালা চাওয়া বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾

"তুমি কি তাদেরকে দেখো নি, যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তারা সে সমস্ত বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে? তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো সমাধানের জন্য ত্বগূতের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা যেন ত্বগূতের প্রতি কুফুরী করে"। (সূরা আন নিসা: ৬০)

الطاغوت শব্দটি الطغيان থেকে فعلون এর ওজনে আধিক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। الطغيان অর্থ সীমালঙ্ঘন করা।

যারা সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনয়নের দাবি করে, অথচ কুরআন ও সুন্নাহর বিচার-ফায়ছালা বাদ দিয়ে কতিপয় ত্বগূতের বিচার-ফায়ছালা মেনে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তাদের নিন্দা করেছেন। নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে জাতি আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাব বাদ দিয়ে অন্য কিছু দিয়ে বিচার-ফায়ছালা করবে, তাদের পরস্পরের মধ্যেই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে যাবে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অবস্থা পরিবর্তন হওয়া, তাদের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়া এবং তাদের মধ্যে মারামারি শুরু হওয়ার এটিই সবচেয়ে বড় কারণ। কেননা কিতাবের প্রতি ঈমানের দাবিতেই সেটার বিচার-ফায়ছালা মেনে নেয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তি কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়নের দাবি করে, অথচ সে কিতাব বাদ দিয়ে অন্য কিছুর নিকট বিচার-ফায়ছালা নিয়ে যায়, সে তার কথায় মিথ্যাবাদী। মূলত আল্লাহর কিতাব অবিভাজ্য। জীবনে সকল ক্ষেত্রেই কিতাবের কুরআনের সব হুকুম বাস্তবায়ন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। আক্বীদা, আমল ও জাগতিক লেন-দেন, ব্যক্তিগত কাজ-কর্ম, অপরাধ ও দণ্ডবিধি, শিষ্টাচার এবং আচার-আচরণের ক্ষেত্রেও কিতাবের দাবি বাস্তবায়ন করা এবং সেটার হুকুম মেনে নেয়া আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা কাফের"। (সূরা আল মায়েদা: ৪৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা যালেম"। (সূরা আল মায়েদা: ৪৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الفَاسِقُوْنَ﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা ফাসেক"। (সূরা আল মায়েদা: ৪৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতোক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক মনে করবে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে নিবে"। (সূরা আন নিসা: ৬০-৬৫)

এখানে কসমের মাধ্যমে জোর দিয়ে ঐসব লোক থেকে ঈমান নাকোচ করা হয়েছে, যারা ঝগড়া-বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফায়ছালাকারী হিসাবে মেনে নেয় না। সেই সঙ্গে বক্ষ প্রশস্ত করে এবং নত হয়ে আল্লাহর হুকুম কবুল করে নেয়া আবশ্যক। অনুরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ কিতাব দ্বারা ফায়ছালা করে না, তিনি তাকে কাফের, যালেম ও ফাসেক বলেছেন। যদিও সে নিজেকে মুমিন ও ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী বলে দাবি করে।

ধ্বংস হোক ঐসব লোক, যারা ত্বগূতের তৈরী আইন-কানুন দ্বারা আল্লাহর কিতাব পরিবর্তন করেছে, অথচ তারা ঈমানের দাবি করে। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সৎকাজের তাওফীক পাওয়া যায় না এবং সুমহান আল্লাহর শক্তি ছাড়া অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকার কোনো শক্তি নেই।

الأصل الرابع: الإيمان بالرسل

চতুর্থ মূলনীতি: রসূলগণের প্রতি ঈমান

রসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ঈমানের অন্যতম রুকন। কেননা আসমানী বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে তারা আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের মাঝে মাধ্যম স্বরূপ এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপর দলীল-প্রমাণ কায়েম করেছেন।

রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হলো তাদের রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাদের নবুওয়াতের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা। আরো বিশ্বাস করা যে, নাবী-রসূলগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যা কিছু বলেছেন, তাতে তারা সত্যবাদী। তারা তাদের রিসালাতের দায়-দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছেন এবং মানুষের জন্য যা অজ্ঞ থাকা মোটেই উচিত নয়, তা তারা বর্ণনা করেছেন। নাবী-রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক হওয়ার অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

"তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত করার মধ্যে কোনো ছাওয়াব নেই; বরং পূণ্য তার, যে ব্যক্তি আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নাবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে"। (সূরা আল বাকারা: ১৭৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾

"রসূল তার রবের পক্ষ থেকে তার উপর যে হিদায়াত নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে। আর যেসব লোক ঐ রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও ঐ হিদায়াতকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহকে, তার ফেরেশতাদেরকে, তার কিতাবসমূহকে ও তার রসূলদেরকে বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছে, "আমরা আল্লাহর রসূলদের একজনকে অন্যজন থেকে আলাদা করি না"। (সূরা আল বাকারা: ২৮৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾

"যারা আল্লাহ ও তার রসূলদের সাথে কুফুরী করে, আল্লাহ ও তার রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে আমরা কারো প্রতি ঈমান আনয়ন করবো ও কারো প্রতি ঈমান আনয়ন করবো না। আর তারা কুফর ও ঈমানের মাঝখানে একটি পথ বের করতে চায়, তারা সবাই প্রকৃত কাফের"। (সূরা আন নিসা ৪: ১৫০)

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়নকে তার প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি এবং কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে যারা আল্লাহর প্রতি এবং রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়নের মধ্যে পার্থক্য করবে এবং কারো প্রতি ঈমান আনবে ও কারো প্রতি কুফুরী করবে, তাদেরকে কাফের বলে উল্লেখ করেছেন।

মানব জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে নাবী-রসূল পাঠানো একটি বিরাট নিয়ামত। কেননা রসূলদের প্রতি মানুষের বিরাট প্রয়োজন রয়েছে। নাবী-রসূলগণ ব্যতীত তাদের অবস্থা সুশৃঙ্খল ও সঠিক থাকা মোটেই সম্ভব নয়। রসূলদের প্রতি তাদের প্রয়োজন পানাহারের প্রয়োজনের চেয়েও অধিক। কেননা মানুষের সামনে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় তুলে ধরা, তাদের জন্য উপকারী বিষয়গুলো বর্ণনা করা এবং ক্ষতিকর বিষয়গুলো থেকে সাবধান করার ক্ষেত্রে তার মাঝে এবং তার সৃষ্টির মাঝে নাবী-রসূলগণই একমাত্র মাধ্যম। সেই সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার শরী'আত, হুকুম-আহকাম, আদেশ-নিষেধ ও বৈধ বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা এবং তিনি যা ভালোবাসেন ও যা ঘৃণা করেন, তা বর্ণনা করার মাধ্যম একমাত্র তারাই। সুতরাং রসূলদের মাধ্যম ছাড়া এগুলো জানার কোনো উপায় নেই। কেননা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এগুলো বিস্তারিতভাবে জানতে ও সন্ধান পেতে সক্ষম নয়। যদিও তারা মোটামুটি সংক্ষিপ্তভাবে এগুলোর প্রয়োজন অনুভব করতে সক্ষম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾

"প্রথমে সব মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। তাদের মধ্যে যখন মতভেদ শুরু হলো তখন আল্লাহ নাবীদেরকে পাঠালেন। তারা ছিলেন সত্য সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা এবং অসত্য পথ অবলম্বনের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শনকারী। আর তাদের সাথে সত্য কিতাব পাঠান, যাতে সত্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল তার মীমাংসা করা যায়"। (সূরা আল বাকারা ২: ২১৩)

রোগীর শরীর সুস্থ করার জন্য যেমন ডাক্তারের প্রয়োজন নাবী-রসূলদের শিক্ষার প্রতি মানুষের প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি। কেননা ডাক্তার পাওয়া না গেলে রোগীর শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই হয় না। কিন্তু নাবী-রসূলদের শিক্ষার অভাবে মানুষের অন্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্তরের ক্ষতি শরীরের ক্ষতির চেয়ে অধিক ভয়াবহ। ঐদিকে যমীনবাসীর মধ্যে যতদিন রিসালাতের প্রভাব বিদ্যমান থাকবে, পৃথিবী কেবল ততদিন

বিদ্যমান থাকবে। যমীন থেকে নাবী-রসূলদের রিসালাতের প্রভাব উঠে যাওয়ার সাথে সাথেই ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা যেসব রসূলের নাম উল্লেখ করেছেন, নির্দিষ্টভাবে তাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। তাদের সংখ্যা মোট ২৫জন। তাদের মধ্য থেকে ১৮ জনের নাম একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

"ইবরাহীমকে তার জাতির মোকাবিলায় আমি এ যুক্তি-প্রমাণ প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে চাই উন্নত মর্যাদা দান করি। তোমার রব প্রজ্ঞাময় ও মহাজ্ঞানী। তারপর আমি ইবরাহীমকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকূবকে এবং সবাইকে সত্য পথ দেখিয়েছি, ইতিপূর্বে নূহকেও আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি। আর তারই বংশধরদের থেকে দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুণকে। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে বদলা দিয়ে থাকি। তার সন্তানদের থেকে যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকেও সঠিক পথ দেখিয়েছি। তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন সৎকর্মশীল। ইসমাঈল, আল ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে আমি সৎপথ প্রদর্শন করেছি। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে আমি সমস্ত দুনিয়াবাসীর উপর মর্যাদা সম্পন্ন করেছি"। (সূরা আল আন-আম: ৮৩-৮৬) বাকী সাতজনের কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

আর যেসব নাবীর নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি, তাদের প্রতি সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾

"তোমার আগে আমি বহু রসূল পাঠিয়েছি। আমি তাদের অনেকের কাহিনী তোমাকে বলেছি আবার অনেকের কাহিনী তোমাকে বলিনি"। (সূরা মুমিন: ৭৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

"এর পূর্বে যেসব নাবীর কথা তোমাকে বলেছি তাদের কাছেও আমি ওহী পাঠিয়েছি এবং যেসব নাবীর কথা তোমাকে বলিনি তাদের কাছেও। আমি মূসার সাথে কথা বলেছি ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়"। (সূরা আন নিসা: ১৬৪)

নাবী ও রসূলের মধ্যে পার্থক্য কী?

এখানে একটি মাসআলা বর্ণনা করা আবশ্যক। তা হলো নাবী ও রসূলের মধ্যে পার্থক্য কী? নাবী ও রসূলের মধ্যে পার্থক্য আছে কি না এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মতটি হলো, রসূল বলা হয় এমন পুরুষকে যার নিকট আল্লাহ তা'আলা নতুন শরী'আত পাঠিয়েছেন এবং তাকে সেটা প্রচার করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আর নাবী হলেন এমন পুরুষ, যার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু তাবলীগ করার আদেশ করা হয়নি। সুতরাং প্রত্যেক নাবী ও রসূলের নিকটই ওহী এসেছে। কিন্তু নাবীকে পাঠানো হয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্বের শরী'আতসহ। যেমন বনী ইসরাঈলের নাবীদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাদের সকলকেই তাওরাতের শরী'আত দিয়ে বনী ইসরাঈলদেরকে পরিচালনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তবে তাদের কারো কারো নিকট নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে খাছ ওহীও করা হয়েছে।

আর রসূলদেরকে পাঠানো হয়েছে কাফের সম্প্রদায়ের নিকট। তারা কাফেরদেরকে আল্লাহর তাওহীদের দিকে এবং তার ইবাদতের দিকে ডাকতেন। সুতরাং রসূলগণ প্রেরিত হতেন অবিশ্বাসী বিরুদ্বাচরণকারী কাফেরদের নিকট। কোনো কোনো কাফের সম্প্রদায় তাদেরকে মিথ্যুক বলতো। রসূলদের মর্যাদা নাবীদের মর্যাদার চেয়ে অধিক। রসূলগণের মর্যাদার মধ্যেও তারতম্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾

"এ রসূলদের একজনকে আরেকজনের উপর মর্যাদাশালী করেছি। তাদের কারোর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, কাউকে তিনি উন্নত মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন"। (সূরা আল বাকারা: ২৫৩) রসূলদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন أولو العزم অর্থাৎ আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রচারে সুদৃঢ় ইচ্ছার অধিকারী রসূলগণ।[১১৫]

তারা হলেন নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন,

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾

"হে নাবী! স্মরণ করো সেই অঙ্গীকারের কথা যা আমি নিয়েছি সকল নাবীর কাছ থেকে, তোমার কাছ থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়াম পুত্র ঈসার কাছ থেকে। সবার কাছ থেকে আমি নিয়েছি পাকাপোক্ত অঙ্গীকার"। (সূরা আল আহযাব: ৭)

---

[১১৫] তারা ছিলেন ঐ সমস্ত রাসূল, যারা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে ছিলেন পর্বত সদৃশ সুদৃঢ় ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন এবং আল্লাহর তাওহীদের দাওয়াত প্রচার করতে গিয়ে নিজ নিজ গোত্রের পক্ষ হতে যেসব যুলুম-নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন তাতে সীমাহীন ধৈর্যধারণকারী।

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একসাথে উল্লেখ করে আরো বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾

"তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেসব নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করেছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং যা আমি তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার আদেশ দিয়েছি আমি ইবরাহীম, মূসা, ও ঈসা 'আলাইহিমুস সালামকে। এ আদেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা দীন কায়েম করো এবং তাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"। *(সূরা আশ শূরা: ১৩)*

উলুল আযম রসূলদের মধ্যে দুই খলীল তথা ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ 'আলাইহিমাস সালাম সর্বোত্তম। সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের পরে ছিলেন অন্যান্য রসূলগণ। অতঃপর নাবীগণ। দুই খলীলের মধ্যে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন উত্তম।

নাবী-রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়নের পর আমাদেরকে জানতে হবে যে, নবুওয়াত আল্লাহর পক্ষ হতে একটি অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলাই তার বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে নাবী হিসাবে বাছাই করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

"আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে বাণীবাহক বাছাই করেন এবং মানুষদের মধ্য থেকেও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। *(সূরা আল হজ্জ: ৭৫)*

নবুওয়াত এমন কোনো সম্মান জনক পদমর্যাদা নয়, যা বান্দা ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে পরিশ্রম করে অর্জন করতে পারে। নবুওয়াত এমন কোনো সম্পদ নয়, যা আনুগত্যের কাজে কঠোর পরিশ্রম, আত্মশুদ্ধির অভ্যাস, অন্তর পরিষ্কার, চরিত্র সংশোধন এবং অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। যেমন দার্শনিকগণ বলে থাকে যে, পরিশ্রম করে নবুওয়াত অর্জন করা যায়। তাদের ধারণা হলো, আত্মশুদ্ধি ও অনুশীলনীর মাধ্যমে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কামালিয়াত বা পূর্ণতা অর্জন করার পর নিয়মিত আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনগুলোর প্রতি কেউ যখন গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিতে থাকবে, তখন তার হৃদয়ের আয়না প্রস্ফুটিত হবে, তার জ্ঞানের দৃষ্টি উন্মুক্ত হবে এবং তার জন্য এমন কিছু অর্জন করা সম্ভব হবে, যা অন্যদের জন্য হবে না।

দার্শনিকদের মতে নবুওয়াতের জন্য তিনটি শক্তি থাকা দরকার।

(১) এমন শক্তিশালী ইলম থাকা চাই, যাতে শিক্ষক ছাড়াই স্বীয় শক্তির মাধ্যমে ইলম অর্জন করতে সক্ষম হয়।

(২) এমন কল্পনাশক্তি থাকা আবশ্যক, যার মাধ্যমে মানুষ নিজের মধ্যে বিভিন্ন রকম এমন নূরানী চেহারা কল্পনা করতে পারে, যা তাকে সম্বোধন করে এবং সে উক্ত নূরানী চেহারার কথা শুনতে পায়।

(৩) মানুষের মাঝে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। এ শক্তিকে তারা সৃষ্টিজগতের মৌলিক বস্তুতে হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্বকারী শক্তি হিসাবে নামকরণ করে থাকে। দার্শনিকদের মতে এ ছিফাতগুলো অর্জন করা সম্ভব।

এমন বিভ্রান্তিকর বক্তব্যকে পুঁজি করে কতিপয় ছূফী নবুওয়াত দাবি করেছে। তাদের মতে নবুওয়াত সাধারণ একটি পেশা মাত্র। এটি একটি সম্পূর্ণ বাতিল কথা। আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আনআমের ১২৪ নং আয়াতে বলেন,

﴿قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾

"তারা বলে, আল্লাহর রসূলদেরকে যা দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তা আমাদের দেয়া হয় ততক্ষণ আমরা ঈমান আনয়ন করবো না। আল্লাহর নিজের রিসালাত কাকে দিবেন তা তিনিই সর্বাধিক অবগত আছেন"। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও বাণীবাহক বাছাই করেন এবং মানুষদের মধ্য থেকেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা আল হজ্জ: ৭৫)

সুতরাং নবুওয়াত আল্লাহ তা'আলার হিকমত অনুযায়ী এবং সেটার জন্য কে উপযুক্ত সে অনুপাতেই তার পক্ষ হতে নির্বাচিত হয়ে থাকে। বান্দা এটি উপার্জন করতে সক্ষম নয়।

তবে এ কথা সঠিক যে, নাবীগণের এমন ফযীলত রয়েছে, যার মাধ্যমে তারা অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছেন। তবে বিভ্রান্ত দার্শনিকরা নবুওয়াতের যে ব্যাখ্যা দেয়, সেটা মোটেই সেরকম নয়।

دلائل النبوة

নবুওয়াতের দলীল-প্রমাণসমূহ

দালায়েলুন নুবুওয়াত বলতে এমনসব দলীল-প্রমাণ উদ্দেশ্য, যার মাধ্যমে সত্য নাবীর নবুওয়াত সম্পর্কে জানা যায় এবং নবুওয়াতের মিথ্যুক দাবিদারদের মিথ্যাবাদিতা জানা যায়। সে হিসাবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নবুওয়াতের অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে, যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। নিম্নে কতিপয় দলীল বর্ণনা করা হলো।

(১) المعجزة মুজিযা অক্ষমকারী: القدرة (ক্ষমতা) এর বিপরীত অর্থবোধক শব্দ العجز (অক্ষমতা) থেকে المعجزة শব্দটি ইসমে ফায়েল হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধান গ্রন্থে নাবীর মুজিযা বলতে এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা তিনি চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় প্রতিপক্ষকে অক্ষম করে দিতে পারেন। المعجزة শব্দের মধ্যকার তা বর্ণটি আধিক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

আর ইসলামের পরিভাষায় মুজিযা হলো সাধারণ অভ্যাসের বিপরীত এমন বিষয়, যা আল্লাহ তা'আলা নাবীর হাতে প্রকাশ করে থাকেন। উদ্দেশ্য হলো এর মাধ্যমে তিনি নাবীর সত্যতা ও তার রিসালাতের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেন।

নাবী রসূলদের অনেক মুজিযা রয়েছে। যেমন সালেহ 'আলাইহিস সালামের উটনী। তার গোত্রের লোকদের উপর হুজ্জত কায়েম করার জন্য তিনি তাকে তা দান করেছিলেন। মূসা 'আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের দলীল হিসাবে হাতের লাঠিকে আল্লাহ তা'আলা সাপে পরিণত করেছিলেন। জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভালো করা এবং মৃতদেরকে জীবিত করা ছিল ঈসা 'আলাইহিস সালামের মুজিযা।

আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও রয়েছে অনেক মুজিযা। তার মুজিযাসমূহের মধ্যে কুরআনুল কারীম হলো সবচেয়ে বড় মুজিযা। এ চিরন্তন মুজিযার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জিন ও ইনসানকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। ইসরা ও মিরাজ, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা, তার হাতের তালুতে পাথরের তাসবীহ পাঠ করা, খেজুর গাছের গুড়ির তার বিচ্ছেদে কান্নাকাটি করা এবং অতীত ও ভবিষ্যতের কিছু কিছু ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম মুজিযা।

তর্কশাস্ত্রবিদরা বলে থাকে যে, নবুওয়াতের দলীল-প্রমাণ শুধু মুজিযার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সঠিক কথা হচ্ছে, তা কেবল মুজিযার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা অসংখ্য। তার মধ্যে রয়েছে,

(১) নাবীগণ তাদের জাতির লোকদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তারা অচিরেই বিজয়ী হবেন, তাদের শত্রুরা ধ্বংস হবে এবং শুভ পরিণাম তাদেরই হবে। নাবীগণ যে সংবাদ দিয়েছেন, তাই হয়েছে। তাদের একটি সংবাদও মিথ্যা হয়নি। যেমন হয়েছিল নূহ 'আলাইহিস সালাম, হুদ 'আলাইহিস সালাম, সালেহ 'আলাইহিস সালাম, শুআইব 'আলাইহিস সালাম, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম, লুত 'আলাইহিস সালাম, মূসা 'আলাইহিস সালাম এবং আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবাদগুলোর ক্ষেত্রে। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে এ সংবাদ দিয়েছেন।

(২) নাবীগণ যে শরী'আত ও সংবাদ নিয়ে এসেছেন, তা দৃঢ়তা, নিপুণতা, সত্যবাদিতা এবং সৃষ্টির জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করায় পূর্ণতম। বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে জানা যায় যে, সর্বাধিক জ্ঞানী ও সৎ লোক ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে এ রকম সুনিপুন কথা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়।

(৩) নাবীদের আরেকটি মুজিযা হলো আল্লাহ তা'আলা সবসময় তাদেরকে সাহায্য করেন। আল্লাহ তা'আলার সুন্নাত (রীতি-নীতি) থেকে অবগত হওয়া গেছে যে, সত্যবাদীকে তিনি যেভাবে সাহায্য করেন মিথ্যাবাদীকে সেভাবে সাহায্য করেন না। বরং তিনি বিথ্যাবাদীকে লাঞ্ছিত করেন। তবে কখনো কখনো তাকে অবকাশ দেয়া হয়। অতঃপর ধ্বংস করেন।

(৪) আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্য করা এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করা, সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ও রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়ন করার ব্যাপারে সমস্ত নাবী-রসূলের তরীকা মাত্র একটি। তাদের এক ও অভিন্ন কাজের বিরোধিতা করা কারো জন্য বৈধ নয়। তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদেরকে সত্যায়ন করেন এবং পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদের আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেন। যেমন ঈসা 'আলাইহিস সালাম মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পূর্বের সমস্ত নাবীকে সত্যায়ন করেছেন।

(৬) নবুওয়াতের আরেকটি দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা নাবীদেরকে সাহায্য করেন। আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন রীতি-নীতি সম্পর্কে অবগত হওয়া গেছে যে, তিনি সত্যাবাদীকে সাহায্য করার মত মিথ্যাবাদীকে সাহায্য করেন না। বরং মিথ্যুককে তিনি অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন, তাকে সাহায্য করেন না। বরং তাকে ধ্বংস করেন। তিনি যদি কোনো প্রভাবশালী যালেমকে কখনো সাহায্য করেন, তাহলে সে নবুওয়াত দাবি করে না এবং আল্লাহর নামে মিথ্যাও বলে না। বরং সে এমন যালেম হয়, যাকে আল্লাহ তা'আলা তার মতই অন্য যালেমের উপর শক্তিশালী ও সক্ষম করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

"এভাবেই আমি কতক যালেমকে অন্যসব যালেমের উপর শক্তিশালী করে দেই তাদের কৃতকর্মের কারণে"। (সূরা আল আনআম: ১২৯)

যারা বলে আল্লাহ তা'আলা মিথ্যুক লোককে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তাদের কথা সত্যের বিপরীত। কেননা মিথ্যুকের জন্য আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত থাকে না। তবে তিনি কিছুকাল তাকে অবকাশ দেন। অতঃপর তাকে ধ্বংস করেন। আরেকটি কথা হলো নবুওয়াতের দাবি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে সত্যবাদী মানুষ ও মিথ্যুক মানুষের মধ্যে পার্থক্য করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। সুতরাং নবুওয়াতের সত্য দাবিদার এবং মিথ্যুক দাবিদারের মধ্যে পার্থক্য করার উপায় থাকবে না কেন?

এ কথা সকলের জেনে রাখা আবশ্যক যে, রিসালাতের দাবিদার হয়ত মানুষের মধ্যে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ হবে অথবা তাদের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট হবে। এ জন্যই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ছাকীফ গোত্রে গেলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন তাদের জনৈক নেতা তাকে বলেছিল, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে একটি কথাও বলবোনা। তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে আমার দৃষ্টিতে তোমার কথার প্রতিবাদ করা অনর্থক। আর যদি তুমি মিথ্যুক হয়ে থাকো, তাহলে আমার দৃষ্টিতে তুমি এত নিকৃষ্ট যে, তোমার কথা প্রতিবাদের যোগ্য নয়।

নবুওয়াত সাধারণত সৃষ্টির সেরা ব্যক্তি এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিই দাবি করে। সুতরাং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির বিষয়টি কীভাবে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি থেকে অস্পষ্ট হতে পারে! মিথ্যুকদের যে কেউ নবুওয়াত দাবি করেছে, তার মিথ্যাবাদিতা, মূর্খতা, পাপাচার এবং তার উপর শয়তান বিজয়ী হওয়ার বিষয়টি সামান্য বিবেক-বুদ্ধিমান লোকের নিকটও সুস্পষ্ট হয়েছে। আর নবুওয়াতের প্রত্যেক সত্য দাবিদার থেকে এমন জ্ঞান, সত্যবাদিতা, সৎ আমল এবং বিভিন্ন প্রকার কল্যাণ প্রকাশিত হয়েছে, যার মাধ্যমে সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধিমান লোকের কাছেও তার সত্যবাদিতা সুস্পষ্ট হয়েছে। কেননা রসূলগণ অবশ্যই মানুষকে অনেক বিষয়ের সংবাদ দেন, অনেক কাজের আদেশ দেন এবং তারা অবশ্যই অনেক কাজ-কর্ম সম্পাদন করেন। মিথ্যুকরা যা বলে, যা আদেশ দেয়, যেসব বিষয়ের সংবাদ দেয় এবং তারা যেসব কাজ-কর্ম করে, তা থেকেই বিভিন্নভাবে তাদের মিথ্যাবাদিতা ধরা পরে। তাদের মিথ্যাবাদিতা সাব্যস্ত করতে বাইরের কোনো দলীলের প্রয়োজন হয় না।

কেউ কেউ প্রশ্ন করে, নবুওয়াতের দলীল-প্রমাণ এবং যাদুকর, গণক ও সাম্প্রতিক কালের বিস্ময়কর আবিষ্কারের মধ্যে পার্থক্য কী?

এ প্রশ্নের জবাব হলো, নবুওয়াতের দলীল-প্রমাণ এবং যাদুকর, গণক ও সাম্প্রতিক কালের বিস্ময়কর আবিষ্কারের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

(১) নাবী-রসূলদের কথার মধ্যে কোনো খেলাপী কিংবা ভুল হয় না। কিন্তু গণক ও জ্যোতিষীর সংবাদ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের অধিকাংশ সংবাদ মিথ্যা হয়। তবে

শয়তানদের চুরি করা কথা থেকে গণকরা যা শুনে তার মধ্য থেকে কিছু কিছু বিষয়ে তাদের কথা কখনো কখনো সত্য হয়।

(২) যাদুকর ও গণকের কাজ-কারবার এবং আধুনিক আবিষ্কারের বিষয়গুলো মানুষের নিকট খুবই স্বাভাবিক ও পরিচিত। মানুষ এগুলো শিখতে পারে। এগুলো মানুষ ও জিনের ক্ষমতার বাইরে নয়। সমপর্যায়ের বিষয় দ্বারা এগুলোর মোকাবেলা করা সম্ভব। কিন্তু নাবীদের নিদর্শন ও মুজিযার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এগুলোর মোকাবেলা করা কোনো জিন-ইনসানের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

"হে নাবী! বলো, সমস্ত মানব ও জিন যদি এ কুরআনের অনুরূপ রচনা করার জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না"। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৮)

সুতরাং সৃষ্টির পক্ষে নাবীদের নিদর্শনের অনুরূপ কিছু আনয়ন করা সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলাই নাবীদের সত্যবাদিতার জন্য নিদর্শন ও আলামত নির্ধারণ করেন। যেমন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা, হাতের লাঠিকে সাপে পরিণত করা, পাথরের তাসবীহ শ্রবণ করা, খেজুর কাঠের বিরহ-বিচ্ছেদের বেদনা মূলক ক্রন্দনের আওয়াজ শ্রবণ করা এবং সামান্য পরিমাণ পানি ও খাদ্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয় সংঘটিত করা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ক্ষমতাধীন নয়।

(৩) নাবীগণ ঈমানদার মুসলমান হয়ে থাকেন। তারা এক আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগী করেন। তারা সমস্ত নাবীর আনীত দীনকে সত্যায়ন করেন। অপর পক্ষে যাদুকর, গণক এবং ভণ্ড নাবীরা কাফের, মুশরেক এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি কুফুরী করে।

(৪) সৃষ্টিগত স্বভাব এবং বিবেক-বুদ্ধি নাবী-রসূলদের আনিত দীনকে সমর্থন করে। ঐদিকে যাদুকর, গণক ও মিথ্যুক দাজ্জালদের কাজকর্ম শরী'আতের দলীল এবং বিবেক-বুদ্ধি ও সৃষ্টিগত স্বভাবের পরিপন্থি।

(৫) নাবী-রসূলগণ এসেছেন মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব ও বিবেক-বুদ্ধিকে পূর্ণতা প্রদান করার জন্য। বিপরীত পক্ষে যাদুকর, গণক ও মিথ্যুকরা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও সৃষ্টিগত পরিশুদ্ধ স্বভাবকে নষ্ট করে দেয়।

(৬) নাবীদের মুজিযা তাদের নিজস্ব কাজের ফসল নয়। নবুওয়াতের আলামত ও নিদর্শন স্বরূপ এটি আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে দান করেন। যেমন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা, হাতের লাঠিকে সাপে পরিণত করা, কুরআন প্রদান করা এবং আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব ছিফাত ইলমুল গায়েবের খবর প্রদান করা। সুতরাং নিদর্শন প্রদান করার বিষয়টি সম্পূর্ণ

রূপে আল্লাহর হাতে। এতে সৃষ্টির কোনো হাত নেই। মুশরিকরা যখন নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিদর্শন চাইলো, তখন আল্লাহ তা‘আলা তার নাবীকে বললেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾

“বলো, নিদর্শনাবলী তো রয়েছে আল্লাহর কাছে এবং আমি কেবলমাত্র সুস্পষ্ট সতর্ককারী”। *(সূরা আনকাবুত: ৫০)* আর যাদুকর, গণক এবং শিল্প ও কারিগরি বিষয়ক আধুনিক আবিষ্কার সম্পর্কে কথা হলো এগুলো সৃষ্টির কাজের অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও নাবীদের মুজিযা এবং যাদুকর ও গণকদের ভেলকিবাজির মধ্যে পার্থক্য করার অনেক উপায় রয়েছে। যে এ বিষয়ে অধিকতর জানতে চান, তিনি যেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এর النبوات নামক কিতাবটি অধ্যয়ন করে।

কুরআনের মুজিযা (معجزات القرأن)

কুরআনুল কারীম আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় মুজিযা। প্রত্যেক নাবীর গোত্রের অবস্থা অনুপাতেই তার মুজিযা হয়ে থাকে। এ জন্যই ফেরআউন সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন যাদু বিদ্যা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করলো, তখন মূসা ‘আলাইহিস সালাম এমন একটি লাঠি নিয়ে আসলেন, যা যাদুকরেরা ব্যবহার করতো। কিন্তু মূসা ‘আলাইহিস সালামের যাদুকরদের সাপ সদৃশ সব লাঠি গিলে ফেললো। এতে যাদুকররা হয়রান হয়ে গেলো এবং বিস্মিত হলো। তারা বিশ্বাস করে নিলো যে, মূসা আ. যা নিয়ে এসেছেন, তা সত্য-সঠিক; যাদু নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾

“তারপর মূসা নিজের লাঠিটি নিক্ষেপ করলেন। সে তাদের বানোয়াট কীর্তিগুলো গ্রাস করতে থাকলো। তখন সকল যাদুকর সিজদাবনত হয়ে পড়লো এবং বলে উঠলো, আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। মূসা ও হারুনের রবের প্রতি”। (সূরা শুআরা: ৪৬-৪৮)।

ঈসা ‘আলাইহিস সালামের যুগে যখন ডাক্তারী বিদ্যা ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছিল, তখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন মুজিযা নিয়ে আসলেন, যা দেখে সে যুগের ডাক্তারগণ দিশেহারা হয়ে গেলেন। তিনি মৃতদেরকে জীবিত এবং জটিল ও কঠিন রোগ ভালো করতেন। যেমন জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করতেন এবং মাটি দিয়ে পাখির

আকৃতি বানিয়ে তাতে ফুঁ দিলেই তা আল্লাহর অনুমতিতে পাখি হয়ে যেতো। এতে ডাক্তারদের বিবেক-বুদ্ধি হয়রান হয়ে গেলো এবং তারা স্বীকার করে নিলো যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই।

ঐদিকে আরবরা যখন ফাসাহাত ও বালাগাত তথা বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় বাগপটুতা ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক মান দিয়ে ভাষণ-বক্তৃতা দেয়ায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এমন সাহিত্যিক মান সম্পন্ন কুরআনুল কারীম দান করলেন, যার ভাষাগত মান তাদের কথা-বার্তা ও ভাষণ-বক্তৃতায় ব্যবহৃত বাক্যসমূহের বহু উর্ধ্বে এবং যার সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে বাতিল প্রবেশ করতে পারে না। আর এ কুরআন হলো সর্বযুগের চিরন্তন মুজিযা।

আল্লাহ তা'আলা সর্বযুগের সমস্ত মানুষের জন্য সর্বশেষ আসমানী রিসালাত হিসাবে কুরআনুল কারীমকে একটি উজ্জ্বল মুজিযা বানিয়েছেন। প্রত্যেক যামানার লোকেরা কুরআনের মুজিযা প্রত্যক্ষ করছে এবং সেটা তেলাওয়াত করছে। তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে যে, কুরআন প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর কালাম। এটি কোনো মানুষের কালাম নয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জিনকে কুরআনের অনুরূপ একটি কিতাব অথবা কুরআনের সূরার অনুরূপ দশটি সূরা কিংবা সেটার সূরার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ করেছেন।

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী হিসাবে প্রেরণ করার পর থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনের চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। ভবিষ্যতেও ইসলামের শত্রুরা কখনো কুরআনের অনুরূপ একটি কিতাব কিংবা কুরআনের সূরার ন্যায় একটি সূরা রচনা করে আনতে পারবে না। যদিও ইতিহাসের প্রত্যেক যুগেই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও দীন ইসলামের শত্রুর সংখ্যা প্রচুর। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

"আর যে কিতাবটি আমি আমার বান্দার উপর নাযিল করেছি তাতে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করো তাহলে তার মতো একটি সূরা তৈরি করে আনো এবং নিজেদের সমস্ত সমর্থক গোষ্ঠীকে ডেকে আনো আল্লাহকে ছাড়া। তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো। কিন্তু তোমরা যদি এমনটি না করো আর নিঃসন্দেহে কখনই তোমরা এটা করতে পারবে না, তাহলে ভয় করো সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর যা তৈরি রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য"। (সূরা আল বাকারা: ২৩-২৪)

সুতরাং কুরআনের চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান রয়েছে। এটা ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা যদি এখন এমনটি করতে না পারো, নিঃসন্দেহে কখনই তোমরা এটা করতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ﴾

"তারা কি বলে যে, এ ব্যক্তি নিজেই কুরআন রচনা করে নিয়েছে? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তারা ঈমান গ্রহণ করতে চায় না। তাদের এ কথার ব্যাপারে তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহলে এ বাণীর মত একটি বাণী তৈরি করে আনুক"। (সূরা আত তুর: ৩৩-৩৪)

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ চ্যালেঞ্জটি ছিল মক্কায়। কেননা সূরা হুদ, সূরা ইউনুস এবং সূরা তুর মক্কী সূরার অন্তর্ভুক্ত। মদীনায় হিজরত করার পর এ চ্যালেঞ্জের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। মাদানী সূরা আল বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

"আর যে কিতাবটি আমি আমার বান্দার উপর নাযিল করেছি তাতে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করো তাহলে তার মতো একটি সূরা তৈরি করে আনো এবং নিজেদের সমস্ত সমর্থক গোষ্ঠীকে ডেকে আনো আল্লাহকে ছাড়া। তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো। কিন্তু তোমরা যদি এমনটি না করো আর নিঃসন্দেহে কখনই তোমরা এটা করতে পারবে না, তাহলে ভয় করো সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর যা তৈরি রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য"। (সূরা আল বাকারা: ২৩-২৪) এখানে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

"কিন্তু তোমরা যদি এমনটি না করো আর নিঃসন্দেহে কখনই তোমরা এটা করতে পারবে না, তাহলে ভয় করো সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর"। তোমরা যখন এমনটি করতে পারবে না, তখন জেনে নিবে যে, এটি সত্য। সুতরাং তোমরা তাকে মিথ্যায়ন করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আর তা না করলে, তোমাদেরকে পরিবেষ্টন করবে সেই আযাব, যার ওয়াদা করা হয়েছে সত্য অস্বীকার কারীদের জন্য।

(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَن تَفْعَلُوا "আর নিঃসন্দেহে কখনই তোমরা এটা করতে পারবে না"। এখানে لن অব্যয় দ্বারা ভবিষ্যতে তাদের ক্ষমতা অর্জিত হওয়াকে নাকোচ করা হয়েছে। এতে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতেও তারা কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আনয়ন করতে পারবে না। কুরআন এভাবেই সংবাদ প্রদান করেছে।

কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং মুতাওয়াতির হাদীছের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, সূরা বানী ইসরাঈল মাক্কী সূরা। ইসরা বা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈশ ভ্রমণের মাধ্যমে এ সূরার সূচনা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

"হে নাবী তুমি বলো, সমস্ত মানব ও জিন যদি এ কুরআনের অনুরূপ রচনা করার জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না"। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৮)

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন, তিনি যেন সমস্ত সৃষ্টিকে চ্যালেঞ্জ করে অকাট্যভাবে এ সংবাদ দিয়ে দেন যে, তারা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা করলেও কুরআনের অনুরূপ কিতাব রচনা করতে পারবে না। যদিও তারা এ ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। সমগ্র সৃষ্টির জন্যই কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ। যারা কুরআন শুনেছে, তাদের প্রত্যেকেই এ চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবগত আছে। কাছের কিংবা দূরের সকলেই এটি শুনেছে। সেই সঙ্গে এটি অবগত হওয়া গেছে যে, কাফেরদের কেউই কুরআনের মোকাবেলা করার সাহস পায়নি এবং কুরআনের অনুরূপ একটি সূরাও আনয়ন করতে পারেনি।

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করার সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আরবের সকলেই ছিল কাফের। তিনি যখন নাবী হিসাবে প্রেরিত হলেন তখন অল্প সংখ্যক লোকই কেবল তার অনুসরণ করলো। কাফেররা নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকে বাতিল প্রমাণ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল এবং সম্ভাব্য সকল পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। তারা কখনো কখনো আহলে কিতাবদের কাছে গিয়ে গায়েবী বিষয়ে প্রশ্ন শিখে নিতো। যাতে পরবর্তীতে তারা এ বিষয়ে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করতে পারে। যেমন তারা প্রশ্ন করেছিল ইউসুফ 'আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে, আসহাফে কাহাফ সম্পর্কে এবং যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কে। সেই সঙ্গে তারা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সম্মিলিতভাবে একটি মিথ্যা কথা বলার জন্য একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়েছিল। তারা তার জন্য একাধিক উদাহরণ পেশ করতে লাগলো। অতঃপর তারা তাকে এমন ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্য দিল, যার সাথে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট। কখনো তারা তাকে পাগল বলেছে, কখনো যাদুকর বলেছে, কখনো গণক বলেছে এবং কখনো কবি বলেছে। তারা তার সম্পর্কে এমনসব কথা বলেছে, যা তারা নিজেরা এবং প্রত্যেক বিবেকবান লোক শুনে বুঝতে সক্ষম হতো যে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কুরআন যেহেতু তাদের দাবিকে বাতিল করে সেটার মোকাবেলা করার জন্য চ্যালেঞ্জের পর চ্যালেঞ্জ করেছে, তাই জানা গেলো যে, তারা যদি মোকাবেলা করতে পারতো, তাহলে অবশ্যই তারা তা করতো। সুতরাং চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার যথেষ্ট প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যদি তাদের মোকাবেলা করার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে অবশ্যই তারা কুরআনের অনুরূপ একটি কিতাব কিংবা সেটার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসতো। সমগ্র যমীনবাসীর জন্যই কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

সুতরাং প্রত্যেকের কাছেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, সমস্ত যমীনবাসী কৌশল কিংবা বিনা কৌশলে এই কুরআনের অনুরূপ একটি কুরআন আনয়ন করতে অক্ষম। কুরআনের মুজিযা ঐসব নিদর্শনের চেয়েও অধিক সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ যা কুরআনে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মৃতদেরকে জীবিত করার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। কুরআনের অনুরূপ মুজিযা আর কোনো নাবী আনয়ন করতে পারেনি।

ইসলামের প্রথম যুগে মক্কাতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীর সংখ্যা যখন একদম কমছিল তখন তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে একটি অকাট্য খবর দিয়েছেন যে, সমস্ত জিন এবং ইনসান যদি ঐক্যবদ্ধ হতো তবুও সে যুগে কুরআনের ন্যায় একটি কিতাব রচনা করে আনতে পারতো না। পরবর্তী যুগসমূহেও একই কথা। নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ও সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এ কথা বলেছেন। কিন্তু মনের মধ্যে সন্দেহ নিয়ে এ ধরনের কথা কেবল ঐ ব্যক্তিই বলতে পারে, যে নিজের মিথ্যাবাদিতা প্রকাশিত হওয়ার ভয় করে এবং অপদস্থ হওয়া ও মানুষ তার কথা সত্যায়ন না করার আশঙ্কা করে।

আর যখন দৃঢ়চিত্তে ও পর্বত সদৃশ ঈমান নিয়ে বলবে, তখন আল্লাহর পক্ষ হতে নিশ্চিত সংবাদ নিয়েই বলবে। মানুষের পরিচিত ও স্বভাবগত যেসব ইলম রয়েছে, তার মধ্যে এমন কিছু আছে বলে মানুষ জানে না, যা সমগ্র সৃষ্টি মিলে আনয়ন করতে অক্ষম। আলেমগণ কেবল ঐসব কালাম রচনা করতে অক্ষম, যা তাদের ক্ষমতার বাইরে। সুতরাং মানুষ যেহেতু কুরআনের অনুরূপ কালাম রচনা করে আনয়ন করতে পারে না, তখন এটি বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, কুরআন একটি চিরন্তন মুজিযা। বিভিন্ন পদ্ধতিতেই কুরআনুল কারীমের মুজিযা প্রমাণ করা যায়।

কুরআনের শব্দমালা, গ্রন্থনা, অলঙ্কারপূর্ণ শব্দের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর প্রতি নির্দেশনা প্রদান, তার আদেশ-নিষেধ, আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলির সংবাদ প্রদান, তার ফেরেশতাদের খবরাদি, ভবিষ্যৎ ও অতীতের গায়েবী বিষয় সম্পর্কিত খবর, পুনরুত্থান দিবস সংক্রান্ত খবর, ঈমান ও ইয়াকীনের দলীল-প্রমাণাদি এবং অন্যান্য বিষয়েও কুরআন একটি চিরন্তন মুজিযা।

عصمة الأنبياء

নাবী-রসূলদের পবিত্রতা

العصمة শব্দের অর্থ সংরক্ষণ করা, বাঁচানো। সে হিসাবে العاصم অর্থ সংরক্ষণকারী, হেফাযতকারী। الاعتصام অর্থ কোনো জিনিসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা। এখানে ইসমত শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গুনাহ ও পাপাচার থেকে নাবীদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সংরক্ষণ করা।

নাবী-রসূলগণ গুনাহ ও পাপাচার থেকে পবিত্র কি না, এ মাসআলায় শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া আলেমদের মতভেদ বর্ণনা করার পর প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আলেমদের ঐক্যমতে নাবীগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সংবাদ দেয়া এবং রিসালাতের তাবলীগ করার ব্যাপারে মাসুম (দোষ-ত্রুটিমুক্ত)। তাই আল্লাহর পক্ষ হতে তারা যেসব সংবাদ প্রদান করেছেন, একবাক্যে তার প্রতি বিশ্বাস করা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

"তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের জন্য যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের সন্তানদের প্রতি যা নাযিল হয়েছিল তার প্রতি, মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য নাবীদেরকে তাদের রবের পক্ষ হতে যা দেয়া হয়েছে তার প্রতি। আমরা কারোর মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আমরা সবাই আল্লাহর অনুগত মুসলিম। তোমরা যেরূপ ঈমান এনেছো তারাও যদি সেরূপ ঈমান আনে, তাহলে নিশ্চয় তারা সুপথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধচারিতায় লিপ্ত। কাজেই তাদের মোকাবিলায় তোমাদের সহায়তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ"। (সূরা আল বাকারা: ১৩৬-১৩৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

"তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরানোর মধ্যে কোনো ছাওয়াব নেই; বরং পূণ্য তার, যে ব্যক্তি আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নাবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে"। (সূরা আল বাকারা: ১৭৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

"রসূল তার রবের পক্ষ থেকে তার উপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে। মুমিনগণও তার প্রতি ঈমান এনেছে। তারা সবাই আল্লাহকে, তার ফেরেশতাদেরকে, তার কিতাবসমূহকে ও তার রসূলদেরকে বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা আল্লাহর রসূলদের একজনকে অন্যজন থেকে আলাদা করি না। আর তারা বলেন, আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং অনুগত হয়েছি। হে আমাদের প্রভু! আমরা গুনাহ মাফের জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আমরা তোমারই দিকে ফিরে যাবো"। (সূরা আল বাকারা: ২৮৫)

নবুওয়াত ও রিসালাতের উদ্দেশ্য এ প্রকার মাসুম হওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। কেননা নাবী হলেন আল্লাহর পক্ষ হতে সংবাদ প্রদানকারী। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তিনিই হলেন রসূল। সে হিসাবে প্রত্যেক রসূলই নাবী, কিন্তু প্রত্যেক নাবী রসূল নন। তারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যা পৌঁছিয়ে দেন সে বিষয়ে তাদের নির্দোষিতা সুসাব্যস্ত। মুসলিমদের ঐক্যমতে এ ব্যাপারে ভুল হওয়া সম্ভব নয়।

শাইখুল ইসলাম আরো বলেন, রিসালাতের তাবলীগ সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে নাবীগণ ভুল-ত্রুটি থেকে পবিত্র কি না, এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাদের পবিত্র হওয়ার বিষয়টি কি বিবেক-বুদ্ধির দলীল দ্বারা সাব্যস্ত? না কি শরী'আতের দলীল দ্বারা সাব্যস্ত? তারা আরো মতভেদ করেছেন যে, তারা কি কাবীরা ও ছ্বগীরা উভয় প্রকার গুনাহ থেকে পবিত্র? না কি কতক গুনাহ থেকে পবিত্র? না কি গুনাহর উপর স্থির থাকা হতে পবিত্র? না কি মূলতই গুনাহ করা থেকে পবিত্র? না কি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তারা যার তাবলীগ করেন সে ক্ষেত্রেই তারা ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র? এমন কি নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও কুফুরী ও পাপাচার হতে তাদের পবিত্র হওয়া আবশ্যক কি না? -এ ব্যাপারেও আলেমগণ মতভেদ করেছেন।

অধিকাংশ আলেমের মতে নাবী-রসূলগণ সর্বপ্রকার গুনাহর উপর স্থির থাকা থেকে পবিত্র। আলেমগণ ঐসব লোকের প্রতিবাদ করেছেন, যাদের মতে গুনাহর উপর নাবী-রসূলদের স্থির থাকা সম্ভব। গুনাহর উপর নাবীগণ স্থির থাকেন না, এমতটিই সালাফদের উক্তিসমূহ দ্বারা সমর্থিত। নাবীগণ গুনাহর উপর স্থির থাকা হতে পবিত্র মর্মে মত পোষণকারীদের দলীলগুলো একত্রিত করলে প্রমাণিত হয় যে, তাদের কথাই সঠিক। আর যারা বলেছে, তারা গুনাহ থেকে পবিত্র নন তাদের দলীলগুলো সাব্যস্ত করে না যে, নাবী-রসূলগণ গুনাহর উপর স্থির থাকতে পারেন।

আর যাদের মতে নাবীগণের দ্বারা গুনাহর কাজ হতেই পারে না, তাদের দলীল হলো নাবীগণকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা জরুরী। তাদের কাজ-কর্মগুলোকে গুনাহ হিসাবে সাব্যস্ত করা হলে তাদেরকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ নয়। আর এটি জানা কথা যে, নাবীগণ যার উপর স্থির থাকেন এবং যা সাব্যস্ত করেন কেবল তাতেই তাদেরকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ। যা থেকে তারা নিষেধ করেছেন কিংবা যা থেকে তারা ফিরে এসেছেন, তাতে তাদেরকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ নয়। যেমন ঐসব আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রেই তাদের আনুগত্য করা আবশ্যক, যা রহিত করা হয়নি। সুতরাং যেসব আদেশ-নিষেধ রহিত করা হয়েছে, তার অনুসরণ করা তো দূরের কথা, সেগুলোকে পরবর্তীতে আদেশ বা নিষেধ হিসাবে গণ্য করা বৈধ নয়।

নাবীগণের পক্ষ হতে গুনাহর কাজ হওয়া অসম্ভব হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশকারীদের আরেকটি দলীল হলো, তারা বলেন নাবীদের মধ্যে পূর্ণতার গুণাবলি থাকা আবশ্যক। আর পাপাচার পূর্ণতার পরিপন্থি অথবা যাকে নবুওয়াতের মত বিরাট নিয়ামত দেয়া হয়েছে, তার থেকে পাপাচার প্রকাশিত হওয়া খুবই জঘন্য ব্যাপার অথবা বলা যায় যে, পাপাচারের কারণে মানুষ নাবীদের থেকে দূরে সরে যেতে পারে বিধায় তাদের থেকে পাপাচার হওয়া মোটেই বৈধ নয়। তারা এমনি আরো আকলী বিবেক-বুদ্ধি প্রসূত দলীল পেশ করেছেন।

আমরা তাদের জবাবে বলবো যে, গুনাহর উপর অটল থাকলে এবং তা থেকে ফিরে এসে তাওবা না করলে উপরোক্ত কথা ঠিক আছে। কিন্তু খাটি তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তাওবা কবুল করেন, তাই তাওবাকারীর মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার আগের চেয়ে আরো বাড়িয়ে দেন। যেমন কোনো কোনো সালাফ বলেছেন, দাউদ 'আলাইহিস সালাম তাওবা করার পর গুনাহ করার পূর্বের চেয়ে ভালো হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাওবা করা যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় না হতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক সম্মানিত বান্দা নাবী-রসূলগণকে গুনাহ করার ফিতনায় ফেলতেন না। তাওবার ব্যাপারে ছ্বহীহ হাদীছে এসেছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ»

"বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন তিনি তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশি হন, যে তার বাহনে আরোহণ করে সফরে বের হলো। বাহনের উপরেই ছিল তার খাদ্য-পানীয় ও সফর সামগ্রী। মরুভূমির উপর দিয়ে সফর করার সময় বিশ্রামার্থে সে একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করল। অতঃপর মাটিতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখল তার বাহন কোথায় যেন চলে গেছে। সে নিরাশ হয়ে একটি

গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে পেলো, তার হারানো বাহনটি সমুদয় খাদ্য-পানীয়সহ মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাহনটির লাগাম ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার প্রভু। অতি আনন্দের কারণেই সে এত বড় ভুল করে বসেছে।[১১৬]

শাইখুল ইসলাম আরো বলেন, কুরআন, ছ্বহীহ হাদীছ এবং কুরআনের পূর্বে যেসব আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তাতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নাবীগণ কাবীরা গুনাহ থেকে মাসুম। কিন্তু তাদের পক্ষ হতে ছ্বগীরা গুনাহ হওয়া সম্ভব। কুরআন, সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এ মতের সমর্থনে বর্ণিত দলীলসমূহ গণনা করে শেষ করা যাবে না।

আর যারা বলে যে, নাবীগণ কাবীরা ও ছ্বগীরা উভয় প্রকার গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ রূপে নিষ্পাপ তারা জাহমীয়া, কাদারীয়া এবং দাহরীয়া সম্প্রদায়ের ন্যায় আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম, সুউচ্চ গুণাবলি, তাক্বদীর এবং পুনরুত্থান দিবস সংক্রান্তবক্তব্যগুলোর তাবীল করেছে। এগুলো কারামেতা বাতেনী[১১৭] সম্প্রদায়ের তাবীলের মতই, যা বিবেক-বুদ্ধির

---

[১১৬] মুসলিম, হা/২৭৪৭, অধ্যায়: কিতাবুত্ তাওবা।

[১১৭] **কারামেতা সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:** হামদান ইবনে আশআছ কুরমুতের প্রতি সম্বন্ধ করে এই ঈমান বিধ্বংসী বাতেনী সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়ে থাকে। তাদের কতিপয় আক্বীদা হচ্ছে,

(১) তারা ছ্বলাত ছ্বিয়ামসহ শরীআতের অন্যান্য যাবতীয় ফরয বিষয়গুলোকে বাতিল বলে থাকে।

(২) তারা পুনরুত্থান দিবস, আখিরাতের শাস্তি, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাতি সবকিছুই অস্বীকার করে। জান্নাত বলতে তাদের মতে দুনিয়ার নিয়ামত এবং আযাব বলতে ছ্বিয়াম, ছ্বলাত, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি পালন করার কষ্ট উদ্দেশ্য।

(৩) তাদের মতে ছ্বিয়াম বলতে গোপন তথ্য ফাঁস করা থেকে বিরত থাকা উদ্দেশ্য।

(৪) পুনরুত্থান বলতে তাদের মাযহাব গ্রহণ করা উদ্দেশ্য।

(৫) তাদের মতে যার উপর প্রথম মাবুদের তরফ থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শক্তির ফয়েয (বরকত) নাযিল হয়েছে, তিনিই নবী।

(৬) মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে ফয়েয নাযিল হয়েছে এবং তিনি সেটার যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তাই কুরআন।

(৭) তাদের মতে অবিনশ্বর মাবুদের সংখ্যা দুইজন। একজন প্রথম অন্যজন দ্বিতীয়। তাদের একজনের কারণেই দ্বিতীয়জন অস্তিত্ব লাভ করেছে।

(৮) তাদের কুফুরী মতাদর্শগুলো গোপন রেখে আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের মুখোশ পরে তারা মুসলিমদের কাতারে ঢুকে পরে। তারা বলে যে, আহলে বাইতের উপর যুলুম করা হয়েছে। এ কথা বলে তারা মূর্খ লোকদেরকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। এ সম্প্রদায় কাবার আঙ্গিনায় হাজীদেরকে হত্যা করে এবং তাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে হাজারে আসওয়াদ চুরি করে তাদের অঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিল। ২২ বছর পর্যন্ত মুসলিমগণ হাজারে আসওয়াদ ছাড়াই কাবা ঘরের তাওয়াফ করেছে। এটি ছিল ৩১৭ হিজরী সালের ঘটনা। তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এই কিতাবগুলো পড়ার অনুরোধ রইলো,

দলীল-প্রমাণ দ্বারা বাতিল প্রমাণিত হয় এবং এগুলো কুরআন-হাদীছের বক্তব্যকে নিজ স্থান থেকে সরিয়ে ফেলার শামিল। এদের কেউ কেউ নাবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে তাদেরকে মিথ্যায়ন করে ফেলে এবং তাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করতে গিয়ে তাদের প্রতি কুফুরীতে লিপ্ত হয়।

আমরা নাবীদের ইসমতের কথা উপরে উল্লেখ করেছি, তা কেবল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাবলীগ করার ক্ষেত্রেই। আর এটি শরী'আতের দলীল, বিবেক-বুদ্ধির দলীল এবং ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। নাবীগণ যেসব বিষয়ের তাবলীগ করেছেন, তারা যদি তার স্বীকৃতি প্রদান না করে এবং সেটার উপর সন্তুষ্ট না থাকে, তাহলে নাবীদের রেসালাত দ্বারা তারা মোটেই উপকৃত হবে না। কিন্তু তারা কেবল কুরআনের ঐসব বাক্য বুঝার চেষ্টা করে, যার অর্থ থেকে তারা মাহরুম-বঞ্চিত হয়েছে অথবা তারা তাদের ঐসব মূর্খ লোকদের মতোই, যারা শুধু ধারণা ব্যতীত কিতাবের আর কোনো জ্ঞান রাখে না।

যারা দাবি করে যে নাবীগণ কাবীরা ও ছ্বগীরা উভয় প্রকার গুনাহ থেকে পবিত্র, এ ক্ষেত্রে তাদের কথা যদি সঠিক হয়েও থাকে, তথাপিও তা দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি। কেননা তাদের মতে নাবীগণের রিসালাতের প্রতি তাদের কোনো প্রয়োজন নেই। রিসালাতের বিষয়টি যেহেতু তাদের ব্যতীত অন্যদের সাথে সম্পৃক্ত, তাই তাতে নাক গলানো তাদের উচিত নয়। মোটকথা তাদের কেউ আল্লাহর পক্ষ হতে বিনা দলীলেই নাবীদের ব্যাপারে কথা বলে এবং নাবীদের প্রতি সত্যায়ন ও তাদের আনুগত্য সম্পর্কিত ওয়াজিব বিষয়কে পরিহার করে। অথচ তাদের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যই সৌভাগ্য অর্জনের মাধ্যম এবং এর বিপরীত করার মধ্যেই রয়েছে দুর্ভাগ্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ﴾ "কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও। তাহলে জেনে রাখো যে, রসূলের উপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সে জন্য রসূল দায়ী এবং তোমাদের উপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সে জন্য তোমরাই দায়ী"। (সূরা আন নূর: ৫৪)

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমের যেখানেই কোনো নাবী থেকে ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানেই তার পক্ষ হতে তাওবা-ইস্তেগফারের কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমন আদম ও তার স্ত্রী বলেছেন,

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

---

(১)الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (২) كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة(৩) الملل والنحل للشهرستاني

"হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি রহম না করো, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো"। (সূরা আল-আরাফ: ২৩) নূহ 'আলাইহিস সালাম ভুল করে বলেছিলেন,

﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"হে আমার রব! যে সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই তা তোমার কাছে চাইবো, এ থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি যদি আমাকে মাফ না করো এবং আমার প্রতি রহম না করো তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবো"। (সূরা হুদ: ৪৭)

ইবরাহীম খলীল 'আলাইহিস সালাম তার দু'আয় বলেছেন,

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

"হে আমাদের রব! যেদিন হিসাব কায়েম হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সমস্ত মুমিনদেরকে মাফ করে দিয়ো"। (সূরা ইবরাহীম: ৪১)

আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে আরো বলেন যে তিনি বলেছেন,

﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾

"আর তার কাছে আমি আশা করি, প্রতিদান দিবসে তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন"। (সূরা শুআরা: ৮২) মূসা 'আলাইহিস সালাম বলেছেন,

﴿أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾

"তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। কাজেই আমাদের মাফ করে দাও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। আর আমাদের জন্য এ দুনিয়ায় কল্যাণ লিখে দাও এবং আখিরাতেও। আমরা তোমার দিকে ফিরেছি"। (সূরা আল-আরাফ: ১৫৫) মূসা 'আলাইহিস সালাম তার দু'আয় বলেছেন,

﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

"হে আমার রব! আমি নিজের উপর যুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তিনি ক্ষমাশীল মেহেরবান"। (সূরা কাসাস: ১৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"অতঃপর যখন সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে মূসা বললো: আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি তোমার কাছে তাওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম মুমিন"। (সূরা আল-আরাফ: ১৪৩)

দাউদ ‘আলাইহিস সালামের তাওবা সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ﴾

“অতঃপর সে নিজের রবের কাছে ক্ষমা চাইলো এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লো এবং তার অভিমুখী হলো। তখন আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করে দিলাম এবং নিশ্চয় আমার কাছে তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম”। (সূরা সোয়াদ: ২৪-২৫)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾

“সে বললো, হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দাও এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করো যার অধিকারী আমার পরে অন্য কেউ হতে পারবে না; নিশ্চয় তুমি মহাদাতা”। (সূরা সোয়াদ: ৩৫)

ঐদিকে আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে ইউসুফ ‘আলাইহিস সালামের কোনো গুনাহর কথা উল্লেখ করেননি। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা তার ব্যাপারে গুনাহর জন্য উপযুক্ত কোনো তাওবার কথা উল্লেখ করেননি। বরং শুধু এতটুকু বলেছেন যে,

﴿كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾

“মন্দকাজ ও অশ্লীলতা থেকে দূর রাখার জন্য এভাবে তাকে আমার নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন আমার একনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত”। (সূরা ইউসুফ: ২৪)

আল্লাহ তা‘আলা এখানে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তার থেকে মন্দকাজ ও অশ্লীলতা প্রতিহত করেছেন। এ কথা প্রমাণ করে যে, তার থেকে কোনো পাপাচার ও অশ্লীলতা প্রকাশিত হয়নি। আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾

“মহিলাটি তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং ইউসুফও তার প্রতি আসক্ত হয়ে যেতো, যদি না তার রবের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতো”। (সূরা ইউসুফ: ২৪)

এখানে الهم শব্দটি এমন ইসমে জিনস বা শ্রেণিবাচক বিশেষ্য, যার অধীনে দু’টি প্রকার রয়েছে। যেমন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, الهم দুই প্রকার। (১) মনের কল্পনা ও (২) সুদৃঢ় সংকল্প।

ছ্বহীহ বুখারীতে (হা/৬৪৯১) নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

«إن العبد إذا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لم تكتب عليه وإذا تركها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له سيئة

واحدة وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حَسَنَةً ولا سَيِّئَةً»

"বান্দা পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই গুনাহ লেখা হয় না। আর তা করার ইচ্ছা করার পর পরিত্যাগ করলে তাতে আল্লাহ্ তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন। আর যদি সংকল্প করার পর তা বাস্তবে পরিণত করে, তাহলে মাত্র একটি গুনাহ লেখা হয়। আর যদি পাপ কাজটি ছেড়ে দেয় ঠিকই; কিন্তু আল্লাহর জন্য ছেড়ে দেয় না, তাতে তার জন্য নেকী লেখা হয় না, গুনাহও লেখা হয় না। ইউসুফ 'আলাইহিস সালাম মনে মনে এমন চিন্তা করেছিলেন, যা তিনি আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা ইখলাছের কারণে তার থেকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। এমনটি তখনই হয়ে থাকে, যখন গুনাহর প্রতি আহবানকারী খারাপ চিন্তা মনের মধ্যে জাগ্রত হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে এবং আল্লাহর জন্য অন্তরের ইখলাছ সেটার প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়। ইউসুফ 'আলাইহিস সালাম থেকে কেবল ছাওয়াব পাওয়ার যোগ্য সৎকর্মই সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾

"যারা তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে তাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয়, তখনই সতর্ক হয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়"। (সূরা আল-আরাফ: ২০১)

শাইখুল ইসলাম আরো বলেন, উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে ঐসব লোকের সন্দেহের জবাব সুস্পষ্ট হলো, যারা বলে নবুওয়াতের পূর্বে গুনাহ থেকে পবিত্র না থাকলে আল্লাহ তা'আলা কাউকে নাবী বানিয়ে পাঠান না। রাফেযী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ও অনুরূপ কথা বলে থাকে। সেই সঙ্গে ঐসব লোকের জবাব সুস্পষ্ট হয়েছে, যারা বলে যারা নবুওয়াতের পূর্বে ঈমানদার থাকে, আল্লাহ তা'আলা কেবল তাদেরকেই নাবী হিসাবে প্রেরণ করেন। এ শ্রেণির লোকেরা ধারণা করে যে, গুনাহ থেকে তাওবা করলেও সেটা বান্দার মর্যাদা কমিয়ে ফেলে। এটি তাদের ভুল ধারণা। সুতরাং যারা মনে করবে যে, খাঁটি তাওবা করার পরও গুনাহকারীর অসম্পূর্ণতা থেকে যায়, তারা বিরাট ভুলের মধ্যে রয়েছে। গুনাহকারীদের ব্যাপারে যেসব শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তাওবাকারীগণকে তা স্পর্শ করতে পারবে না। সে যদি দ্রুত তাওবা করে, তাহলে তার কোনো শাস্তি হবে না। কিন্তু তাওবা করতে দেরী করলে গুনাহ করার পর থেকে তাওবা করার পূর্ব পর্যন্ত তার অবস্থা অনুপাতে দোষারোপ ও শাস্তির সম্মুখীন হবে। নাবীগণ তাওবা করতে বিলম্ব করতেন না। বরং দ্রুত তাওবা করতেন, দেরী করতেন না এবং গুনাহর উপর স্থিরও থাকতেন না। তার গুনাহর উপর স্থির থাকা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। আর তাদের কেউ যদি তাওবা করতে সামান্য বিলম্ব করেন, তাহলে মুছীবতে নিপতিত করে তার গুনাহকে মোচন করে দেন। যেমন করা হয়েছিল ইউনুস 'আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে।

প্রসিদ্ধ মতে নবুওয়াত প্রাপ্তির পরই তাকে পানিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। যারা বলে নবুওয়াত পাওয়ার পূর্বে তাকে পানিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তারা এ আলোচনার প্রতি

মুখাপেক্ষী নয়। কুফুরী ও পাপাচার থেকে তাওবাকারী কখনো ঐ ব্যক্তি থেকে উত্তম হতে পারে, যে কুফুরী ও পাপাচারে একদম লিপ্ত হয়নি। গুনাহকারী যেহেতু নিষ্পাপ ব্যক্তি থেকে কখনো উত্তম হয়, তাই উত্তম ব্যক্তি নবুওয়াতের জন্য তার চেয়ে অধিক যোগ্য, যে ফযীলতের ক্ষেত্রে তার সমান নয়। আল্লাহ তা'আলা ইউসুফের ভাইদের গুনাহর কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তারা ছিলেন নাবীদের বংশের লোক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"অতঃপর ইবরাহীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন লুত। ইবরাহীম বললেন, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করছি। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"। (সূরা আল আনকাবুত: ২৬)

লুত 'আলাইহিস সালাম প্রথমে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান আনয়ন করলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে রসূল বানিয়ে তার জাতির নিকট প্রেরণ করলেন। শোআইব 'আলাইহিস সালামের ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾

"তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা তাকে বললো, হে শোআইব! আমাদের ধর্মে তোমাদের ফিরে আসতেই হবে। অন্যথায় তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবো। শোআইব জবাব দিলো: আমরা রাজি না হলেও কি আমাদের জোর করে ফিরিয়ে আনা হবে? তোমাদের ধর্ম থেকে আল্লাহ আমাদের উদ্ধার করার পর আবার যদি আমরা তাতে ফিরে আসি তাহলে আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী বিবেচিত হবো। আমাদের রব আল্লাহ যদি না চান, তাহলে আমাদের পক্ষে সে দিকে ফিরে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আমাদের রবের জ্ঞান সমস্ত জিনিসকে ঘিরে আছে। আমরা তারই উপর নির্ভর করি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যথাযথভাবে ফায়ছালা করে দাও এবং তুমি সর্বোত্তম ফায়ছালাকারী"। (সূরা আল-আরাফ: ৮৮-৮৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾

"শেষে কাফেররা তাদের রসূলদের বলে দিলো, হয় তোমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের মিল্লাতে আর নয়তো আমরা তোমাদের বের করে দেবো আমাদের দেশ থেকে"। (সূরা ইবরাহীম: ১৩)

সুতরাং জানা গেল যে, শেষে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়াই মূল্যায়নযোগ্য; শুরুতে অপূর্ণতা মূল্যায়নের বিষয় নয়। প্রত্যেক বান্দারই তাওবা করা আবশ্যক। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্যই তাওবা করা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِّيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

"পরিণামে আল্লাহ মুনাফেক পুরুষ, মুনাফেক নারী, মুশরেক পুরুষ ও মুশরেক নারীদেরকে শাস্তি দেবেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের তাওবা কবুল করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়"। (সূরা আল আহযাব: ৭৩)

আল্লাহ তা'আলা আদম ও নূহ 'আলাইহিমাস সালামের তাওবা করা থেকে শুরু করে সর্বশেষ রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নাবীর তাওবা করার কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সর্বশেষ যা নাযিল হয়েছে, তা হলো,

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে। আর মানুষকে আল্লাহর দীনে দলে দলে প্রবেশ করতে দেখতে পাবে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী। (সূরা আন নাসর:১-৩)

অতঃপর নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) অনেক আয়াত উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে কুরআনের আয়াতগুলো খুব সুস্পষ্ট। যেমন রয়েছে ছাহাবী, তাবেঈ এবং মুসলিম উম্মাহর আলেমদের অনেক বক্তব্য। কিন্তু বিরোধীগণ জাহমীয়া ও বাতেনী সম্প্রদায়ের লোকদের ন্যায় এ বক্তব্যগুলোর অপব্যাখ্যা করে থাকে। এগুলোতে গভীরভাবে দৃষ্টি প্রদানকারী বুঝতে সক্ষম হবে যে, এগুলো একদম বাতিল। এগুলো কালামকে স্বীয় স্থান থেকে সরিয়ে ফেলার মতই। যেমন তারা আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর ব্যাপারে বলে থাকে যে, ﴿لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ "আল্লাহ যাতে তোমার আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন", এখানে তার আগের গুনাহ বলতে আদমের গুনাহ এবং পরের গুনাহ বলতে তার উম্মতের গুনাহ উদ্দেশ্য। এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বাতিল।

শাইখুল ইসলাম আরো বলেন, অধিকাংশ আলেম যেখানে বলেছেন, নাবীদের দ্বারা ছ্বগীরা গুনাহ হতে পারে, তাদের কথার উদ্দেশ্য হলো নাবীগণের দ্বারা ছ্বগীরা গুনাহ হলেও তারা তার উপর অটল ও স্থির থাকেন না; বরং তাওবা করেন। সুতরাং এতে তারা নাবীদেরকে পূর্ণতার গুণাবলি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা বিশেষিত করেননি। কেননা সর্বশেষ

আমলগুলোই ধর্তব্য। যারা বলে নাবীগণ ছ্বগীরা কিংবা কাবীরা, কোনো গুনাহই করতে পারে না, তাদের কথা থেকে আবশ্যক হয় যে, নাবীগণ তাওবা করেন না। শাইখুল ইসলামের বক্তব্য থেকে যেটুকু নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল, তা এখানেই শেষ।

নাবী-রসূলগণ গুনাহ থেকে মাসুম কি না, এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কথা হলো, গুনাহ থেকে নাবীগণের মাসুম বা পবিত্র হওয়ার বিষয়টি এ রকম যে, তাতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যাতে তারা ভুল-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তাতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা জরুরী। তাতে আরো কিছু বিষয় রয়েছে, তাতে তারা মাসুম কি না এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অর্থাৎ শুরু থেকেই তারা তা থেকে পবিত্র থাকার ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও পরিশেষে তারা তা থেকে মাসুম হয়ে যান।

(১) নাবীগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যেসব বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেন, তাতে এবং রিসালাতের তাবলীগ করার ক্ষেত্রে নাবীগণ সম্পূর্ণরূপে মাসুম বা নিষ্পাপ। কেননা এ ক্ষেত্রে নিষ্পাপ না হলে নবুওয়াত ও রিসালাতের মাকুসদ পূর্ণ হবে না।

(২) গুনাহ থেকে তারা মাসুম কি না, এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কতিপয় আলেম বলেছেন, তারা কাবীরা, ছ্বগীরা সমস্ত গুনাহ থেকেই মুক্ত। কেননা নবুওয়াতের পদমর্যাদা পাপাচারে লিপ্ত হওয়া এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করার অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করার আদেশ করেছেন। তাদের কাজ-কর্মে পাপাচার থাকলে তাদের অনুসরণ করা বৈধ নয়। তাদেরকে অনুসরণ করার আদেশ দেয়ার অর্থ হলো তাদের সমস্ত কাজই অনুসরণীয়। যেসব আয়াত ও হাদীছে নাবীদের কিছু কিছু গুনাহর কথা এসেছে, তারা সেগুলোর ব্যাখ্যা করেছে। অধিকাংশ আলেমের কথা হলো নাবীদের পক্ষ হতে ছ্বগীরা গুনাহ হওয়া সম্ভব। কুরআনুল কারীমে এ মর্মে অনেক দলীল রয়েছে। তবে তারা ছ্বগীরা গুনাহর উপর স্থির থাকেন না। তা থেকে তাওবা করেন এবং ফিরে আসেন। যেমন ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। অতএব তারা ছ্বগীরা গুনাহর উপর স্থির থাকা থেকে পবিত্র। সুতরাং তাদের থেকে যেসব ছোট-খাটো গুনাহ হয়েছে, আমরা তাতে তাদের অনুসরণ করবো না; বরং তারা যে তাওবা করেছেন, তাতেই তারা আমাদের আদর্শ।

دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد

সমস্ত নাবী-রসূলের দীন এক ও অভিন্ন

নাবী 'আলাইহিমুস সালামদের দীন একটিই। যদিও তাদের শরী'আত বিভিন্ন রকম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾

"তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেসব নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করেছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং যা আমি তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার আদেশ দিয়েছি আমি ইবরাহীম, মূসা, ও ঈসা 'আলাইহিমুস সালামকে। এই আদেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা দীন কায়েম করো এবং এ ব্যাপারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"। (সূরা আশ শূরা ৪২:১৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾

"হে রসূলগণ! তোমরা পাক-পবিত্র জিনিস খাও এবং সৎকাজ করো। আর তোমরা সৎকর্ম করো। তোমরা যা কিছুই করো না কেন আমি তা জানি। আর তোমাদের এ উম্মত হচ্ছে একই উম্মত এবং আমি তোমাদের রব, কাজেই আমাকেই তোমরা ভয় করো"। (সূরা মুমিনুন: ৫১-৫২)

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমরা নাবীদের দল। আমাদের দীন মাত্র একটিই। আর নাবীগণ পরস্পর সতালো ভাই। ইসলামই হলো নাবীদের দীন। এ দীন ছাড়া আল্লাহ তা'আলা অন্য কোনো দীন কবুল করবেন না। ইসলাম হলো তাওহীদ ও আনুগত্যের সাথে এক আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পন করা এবং শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

"আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হই"। (সূরা আন নামল: ৯১)

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"যখন তার রব তাকে বললো, মুসলিম হয়ে যাও। তখন সে বলে উঠলো, আমি বিশ্ব-জাহানের প্রভুর জন্য মুসলিম হয়ে গেলাম"। (সূরা আল বাকারা: ১৩১) আল্লাহ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ﴾

" মূসা তার কওমকে বলল, হে লোকেরা! তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে থাকো তাহলে কেবল তার উপর ভরসা করো, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো"। (সূরা ইউনুস: ৮৪) ঈসা 'আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ﴾

"আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে ইঙ্গিত করেছিলাম, আমার ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আনো, তারা বলেছিল, আমরা ঈমান আনলাম এবং সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম"। (সূরা আল মায়েদা: ১১১) পূর্ববর্তী যামানার নাবীগণ এবং তাওরাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾

"আমি তাওরাত নাযিল করেছি। তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো। আল্লাহর অনুগত নাবীগণ, আল্লাহ ওয়ালাগণ এবং পণ্ডিতগণ ইয়াহূদীদেরকে তা দিয়ে যাবতীয় বিষয়ের ফায়ছালা প্রদান করতো"। (সূরা আল মায়েদা: ৪৪) সাবার রাণী বিলকীস বলেছিলেন,

﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"হে আমার রব! আমি নিজের উপর বড় যুলুম করেছি এবং এখন আমি সুলাইমানের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য ইসলাম কবুল করে নিয়েছি"। (সূরা আন নামল: ৪৪)

সুতরাং সমস্ত নাবী-রসূলের দীন হলো ইসলাম। একমাত্র আল্লাহর জন্য আত্মসমর্পন করাকে ইসলাম বলা হয়। যে ব্যক্তি একই সময় আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য আত্মসমর্পন করে সে মুশরেক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য আত্মসমর্পন করে না, সে অহঙ্কারী। যারা শিরক করে এবং যারা অহঙ্কারবশত আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা থেকে বিরত থাকে, তারা সবাই কাফের। আল্লাহ তা'আলার জন্য আত্মসমর্পন, এককভাবে তার ইবাদত করা এবং একমাত্র তার অনুসরণ করাকে শামিল করে। প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার যেসব আদেশ রয়েছে, যথাসময়ে তা সম্পন্ন করার মাধ্যমেই তার আনুগত্য করা সম্ভব। ইসলামের প্রথম যুগে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে ছ্বলাত পড়ার আদেশ ছিল, পরবর্তীতে তা রহিত করে কাবার দিকে মুখ ফিরানোর আদেশ করা হয়েছে। এ উভয়ই কাজের আদেশ যখন করা হয়েছিল, প্রত্যেকটি কাজই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং দীন হলো আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার নাম।

বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে ছ্বলাত আদায় করা এবং কাবার দিকে ফিরে ছ্বলাত আদায় করা উভয়টিই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত। তবে আমলটি আদায়ের পদ্ধতির ভিন্নতা মাত্র। আর তা হলো ছ্বলাতীর মুখ ফিরানো। এমনি রসূলদের দীন মাত্র একটিই। যদিও তার হুকুম-আহকাম, পথ-পদ্ধতি এবং রীতি-নীতি ভিন্নতর হয়। এ ভিন্নতা দীন এক হওয়ার পরিপন্থি নয়। এমনি একই রসূলের শরী'আত বিভিন্ন হওয়া দোষণীয় নয়। যেমন আমরা ইতিপূর্বে বাইতুল মাকদিসের দিকে ছ্বলাত পড়ার উদাহরণ দিয়েছি। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরী'আতেই কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছ্বলাত পড়ার হুকুম করা হয়েছে।

সুতরাং নাবীদের শরী'আত বিভিন্ন রকম হলেও তাদের দীন মাত্র একটি। বিশেষ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এক সময় একটি বিষয় শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত করেন, অন্য সময় বিশেষ উদ্দেশ্যে আরেকটি আদেশ করেন। রহিত হওয়ার পূর্বে রহিত বিষয়ের উপর আমল করা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। রহিত হওয়ার পর রহিতকারী বিষয়ের উপর আমল করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি রহিতকারী বিষয় পরিত্যাগ করে রহিত কৃত বিষয়ের উপরই থেকে যাবে, সে দীন ইসলামের উপর থাকতে পারবে না। এমনকি সে কোনো নাবীর অনুসরণকারী হিসাবেই গণ্য হবে না। এ জন্যই ইয়াহূদী- খ্রিষ্টানদের কাফের হিসাবে গণ্য করা হবে। কেননা তারা পরিবর্তিত ও রহিত শরী'আতকেই আঁকড়ে ধরেছে।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের অবস্থা ও সময় অনুপাতে শরী'আত নির্ধারণ করেন এবং তাদের কল্যাণার্থে সেটা সংশোধন করার দায়িত্ব নেন। অতঃপর সেসব শরী'আতের মেয়াদ শেষে সেটা থেকে আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা রহিত করেন। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তার সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যমীনবাসীর নিকট পাঠালেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে, তাদের সকলের জন্য তিনিই নাবী হিসাবে থাকবেন। তাকে এমন শরী'আত দিয়ে পাঠানো হয়েছে, যা সর্বকালের সকল মানুষের জন্য উপযোগী। এ শরী'আতের কোনো পরিবর্তন কিংবা রদবদল হবে না। সমস্ত যমীনবাসীর জন্য তার অনুসরণ এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ "হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল হিসাবে এসেছি"। (সূরা আল-আরাফ: ১৫৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"আর আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছি। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক জানে না"। (সূরা সাবা: ২৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ "হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি"। (সূরা আল আম্বীয়াঃ ১০৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

"মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারোর পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নাবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত"। (সূরা আল আহযাবঃ ৪০)

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে আয়াতগুলো নাযিল করেছেন, তাতে সমস্ত জিন-ইনসানকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং জাতিগত ভেদাভেদের উর্ধ্বে থেকে তাদের সকলকে এক দীনের বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে। আরবদের জন্য কোনো খাছ হুকুম নাযিল করা হয়নি। বরং কুরআনের হুকুম-আহকামগুলোর সম্বন্ধ করা হয়েছে কাফের, মুমিন, মুসলিম, মুনাফিক, পূণ্যবান, পাপিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, যালেম এবং কুরআন ও হাদীছে উল্লেখিত ইত্যাদি নামের প্রতি। সুতরাং কুরআন ও হাদীছে আরবদেরকে খাছ করে বিশেষ কোনো শারঈ হুকুম প্রদান করা হয়নি। বরং হুকুমগুলোকে ছিফাত বা বিশেষণের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বান্দার যেসব কাজ-কর্ম ভালোবাসেন তা সম্পন্নকারীদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করার ওয়াদা করা হয়েছে এবং তাদের যেসব খারাপ আমলকে অপছন্দ করেন, তার অধিকারীদেরকে শাস্তি প্রদানের ধমক দেয়া হয়েছে।

শুধু তাবলীগ করার জন্যই আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করা হয়েছে। প্রথমত তিনি তার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে তাবলীগ করেছেন। অতঃপর তাদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির নিকট সেটা প্রচার করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে প্রথমে স্বীয় গোত্রের কাছে তাবলীগ করার আদেশ করেছেন। অতঃপর তার নিকটতম লোকদেরকে পর্যায়ক্রমে সতর্ক করার আদেশ দিয়েছেন। এমনিভাবে প্রথমে পার্শ্ববর্তী কাফেরদের অতঃপর দূরবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার হুকুম করা হয়েছে। এর মধ্যে তাদের বিশেষ কোনো বিশেষত্ব নেই। বরং তাবলীগ করার ক্ষেত্রে কেবল ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়ার নীতি অবলম্বন করা হয়েছে।

মোটকথা নাবীদের দীন মাত্র একটিই। আর তা হচ্ছে ইখলাছের সাথে আল্লাহর ইবাদত করা এবং শিরক ও ফাসাদ থেকে বিরত থাকা। পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন অনুপাতে যদিও তাদের শরী'আত বিভিন্ন হয়েছে, কিন্তু তাদের দীনের মূল কথা একই। এভাবেই মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এসে নাবী-রসূলদের ধারাবাহিকতা শেষ হয়েছে।[১১৮]

[১১৮] ছ্বহীহ হাদীছে এসেছে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন দালানের সর্বশেষ ইট।

সমগ্র সৃষ্টির জন্যই তার রিসালাত এবং তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তা পরিবর্তন, রদবদল কিংবা রহিত হবে না। এটি সকল যুগের সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যই উপকারী এবং সর্বকাল ও সর্বস্থানের মানুষের জন্যই রক্ষাকবচ। তার পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নাবী আসবে না। তার পূর্বের নাবী-রসূলগণকে ঈমান আনয়ন করাসহ শরী'আতের হুকুম-আহকাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইখলাছের সাথে আল্লাহর ইবাদত করার যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তাকেও সেই একই আদেশ প্রদান করা হয়েছে। তিনি ছিলেন তার পূর্বেকার নাবীদেরকে সত্যায়নকারী। তার পূর্বের নাবীগণ তার আগমনের সুখবর দিয়েছেন। বিশেষ করে সময়ের দিক থেকে তার নিকটতম নাবী ঈসা ইবনে মারইয়াম 'আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে বলেছেন,

﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾

"হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল। আমি তাওরাতের সত্যায়নকারী যা আমার পূর্বে এসেছে এবং একজন রসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমাদ"। (সূরা আস সাফ: ৬)

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে আমাদের রসূলের এমন বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এসেছে, যা একদম সুস্পষ্ট। ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে যারা তাকে রসূল হিসাবে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছে, তারা কেবল হিংসা ও অহংকারের বশবর্তী হয়েই করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেভাবেই চেনে যেমন নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে। কিন্তু তাদের একদল লোক জেনেবুঝে সত্য গোপন করে থাকে"। (সূরা আল-বাকারা: ১৪৬)

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সামনে সত্যকে সত্য হিসাবে দেখাও এবং সেটার অনুসরণ করার তাওফীক দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সামনে বাতিলকে বাতিল হিসাবে দেখাও এবং সেটা পরিত্যাগ করার তাওফীক দাও।

ذكر خصائص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إجمالا

সংক্ষেপে রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু বৈশিষ্ট্য

রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা দ্বারা তিনি অন্যান্য নাবীদের চেয়ে বিশেষ ফযীলতের অধিকারী হয়েছেন। এমনি তার এমন আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা দ্বারা তিনি তার উম্মত থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছেন।

অন্যান্য নাবীদের তুলনায় তার কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য:

(১) তিনি হলেন সর্বশেষ নাবী (أنه خاتم النبيين)। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

“মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারোর পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নাবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত”। (সূরা আল আহযাব: ৪০)

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أمتي بَعْدِي ثَلَاثُونَ كذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزعم أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»

“আমার উম্মতের মধ্যে আমার পরে ত্রিশজন মিথ্যুকের আগমন ঘটবে। তারা সকলেই নবুওয়াতের দাবী করবে। অথচ আমিই সর্বশেষ নাবী। আমার পর ক্বিয়ামতের পূর্বে আর কোনো নাবী নেই”।[১১৯]

(২) তাকে মাকামে মাহমুদ প্রদান করা হয়েছে। আর এটিই হলো শাফা‘আতে উযমা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ “তোমার প্রতিপালক তোমাকে অচিরেই একটি প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন”। (সূরা বানী ইসরাঈল: ৭৯)

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত শাফা‘আতের দীর্ঘ হাদীছে এসেছে, আল্লাহ তা‘আলা যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বনী আদমকে একই যমীনে একত্রিত করবেন তখন তারা পরস্পর বলাবলি করবে, তোমরা কি দেখছো না, তোমরা কী অবস্থায় আছো? তোমরা কি দেখছো না তোমাদের কেমন কষ্ট হচ্ছে? তোমরা কি এমন কাউকে খুঁজবে না, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর নিকট সুপারিশ করবেন? অতঃপর তারা দ্রুত বিচার সম্পন্ন করতে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার জন্যে পর্যায়ক্রমে আদম, নুহ, ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামের কাছে গমন করবে। সকলেই অক্ষমতা প্রকাশ করে বলবে, তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে যাও। পরিশেষে তারা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

[১১৯] ছ্বহীহ: তিরমিযী, হা/২২১৯।

সাল্লামের কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি তা করবো। অতঃপর তিনি শাফা'আত করার অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকবেন"।[১২০] উপরোক্ত হাদীছের মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টির উপর আমাদের নাবীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এবং সম্মানিত স্থান মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে তার বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়।

(৩) তিনি সমস্ত জিন-ইনসানের নিকট প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ "হে মুহাম্মাদ! বলো, হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল হিসাবে এসেছি"। (সূরা আল-আরাফ: ১৫৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"আর আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছি। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক জানে না"। (সূরা সাবা: ২৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾

"বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি, যিনি তারঁ বান্দার উপর নাযিল করেছেন এ ফুরকান। যাতে সে সমগ্র সৃষ্টির জন্য সতর্ককারী হন"। (সূরা আল ফুরকান: ১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ "হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে সৃষ্টিজগতের জন্য আমার রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি"। (সূরা আল আম্বীয়া: ১০৭)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ﴾

"আর যখন আমি জিনদের একটি দলকে তোমার কাছে নিয়ে পাঠিয়েছিলাম, যাতে তারা কুরআন শোনে। যখন তারা সেখানে পৌঁছলো তখন পরস্পরকে বললো, চুপ করো। যখন তা পাঠ করা শেষ হলো তখন তারা সতর্ককারী হয়ে নিজ নিজ কওমের কাছে ফিরে গেল"। (সূরা আহকাফ: ২৯)

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মানব ও জিন জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছেন।

---

[১২০] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪৭১২, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৯৩, তিরমিযী, হা/২৪৩৪।

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যেসব আয়াত নাযিল করা হয়েছে, তাতে জিন-ইনসান সকলকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা তার রিসালাত তাদের সকলের জন্যই। যদিও আরবদের মধ্যে শিরক, অশ্লীলতা, পাপাচার, অন্যায়-অপকর্ম অনুপ্রবেশ করার কারণেই কেবল তার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তবে মুসলিমদের ঐক্যমতে এটা সাব্যস্ত যে, কুরআনের যেসব আয়াত বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে, সেগুলো উক্ত কারণের সাথেই খাছ। কোনো মুসলিম বলেনি যে, তালাকের আয়াত, যিহারের আয়াত, লিআনের আয়াত, চোরের শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত এবং সন্ত্রাসীদের শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত ঐ ব্যক্তির সাথেই খাছ, যাকে কেন্দ্র করে সেটা নাযিল হয়েছে।

কুরআন কি শুধু আরবদের জন্যই?

মোটকথা কুরআনের কতক আয়াত আরবদের মধ্যে বিদ্যমান দোষ-ত্রুটিকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে, কিন্তু আয়াতগুলোর হুকুম ব্যাপক। শব্দগত ও অর্থগত উভয় দিক থেকেই যে কোনো শ্রেণির মানুষের মধ্যে তা বিদ্যমান থাকবে, তাদের উপর আয়াতগুলো প্রয়োগ করা হবে। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত জিন-ইনসান সকলের জন্যই। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যই তার দাওয়াত। সুতরাং কেউ যেন এটি মনে না করে যে, ইসলামের কোনো হুকুম শুধু আরবদের জন্যই খাছ। বরং কুরআনে মুসলিম, কাফের, মুমিন, মুনাফেক, নেককার, বদকার, সৎকর্মশীল, যালেম এবং কুরআন-হাদীছে উল্লেখিত অন্যান্য বিভিন্ন নামের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা হুকুম উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীছে শরী‘আতের কোনো হুকুমই আরবদের জন্য খাছ করে নাযিল হয়নি। তাতে কেবল আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রিয় আমল ও তার নিকট অপ্রিয় আমলের উপর আলাদা আলাদাভাবে হুকুম প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি যা ভালোবাসেন সাধ্যানুসারে তা করার হুকুম করেছেন। তিনি যা ঘৃণা করেন, তা থেকে নিষেধ করেছেন এবং সেটা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন। আরবদের জন্য খাছ করে শরী‘আতের কোনো হুকুমই প্রদান করা হয়নি। কেননা তার দাওয়াত ছিল সমস্ত সৃষ্টির জন্য। তবে আরবদের ভাষায় এবং কুরাইশদের ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে। যাতে করে তিনি আরবদের জন্য এর তাবলীগ করতে পারেন। তাই তিনি প্রথমে আরবদের মাঝে তাবলীগ করেছেন। অতঃপর আরবদের মাধ্যমে সমস্ত জাতির কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা তার নাবীকে সর্বপ্রথম তাবলীগ করার আদেশ দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে পার্শ্ববর্তী লোকদের নিকট তাবলীগ করার আদেশ করেছেন। ইসলামের জন্য জিহাদ করার ক্ষেত্রেও তিনি প্রথমে পার্শ্ববর্তী কাফেরদেরকে অতঃপর অন্যান্য কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আদেশ করেছেন।

তিনি যেমন প্রেরিত হয়েছিলেন মানব জাতির প্রতি তেমনি প্রেরিত হয়েছেন জিন জাতির প্রতি। জিনেরা নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন তেলাওয়াত শুনেছিল। অতঃপর তারা সতর্ককারী হয়ে নিজ কওমের কাছে ফিরে গিয়েছিল। কুরআনে

আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন। মুসলিমদের ঐক্যমতে এটি সুসাব্যস্ত। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে জিন-ইনসানকে উল্লেখ করে যে সম্বোধন করেছেন, তা এই মূলনীতিকে সুস্পষ্ট করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾

"হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদেরকে আমার আয়াত শোনাতো এবং এ দিনটির সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সর্তক করতো?" (সূরা আল আনআম: ১৩০)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا﴾ "আর আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছে নেককার আর কিছু লোক আছে তার চেয়ে নীচু পর্যায়ের। এভাবে আমরা বিভিন্ন মতে বিভক্ত ছিলাম"। (সূরা আল জিন: ১১) অর্থাৎ বিভিন্ন মাযহাবে বিভক্ত ছিলাম। মুসলিম, কাফের, আহলে সুন্নাত, আহলে বিদ'আত ইত্যাদি বিভিন্ন তরীকায় বিভক্ত ছিলাম। তারা আরো বলেছিল,

﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾

"আর আমাদের মধ্যে আছে মুসলিম আর যালেম। তবে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা নিঃসন্দেহে সত্য পথ বেছে নিয়েছে"। (সূরা আল জিন: ১৪) القاسط অর্থ হলো সত্য পথ থেকে বিচ্যুত। যখন কেউ যুলুম করে, তখন বলা হয়, قسط। আর যখন ন্যায়নীতি অবলম্বন করে, তখন বলা হয় أقسط।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মানুষের উপর জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত জিন-ইনসানের জন্য রসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন এবং তাদের উপর তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার আনুগত্য করা আবশ্যক করেছেন। সুতরাং তার উম্মতের উপর আবশ্যক হলো, আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন ও তার রসূল যা হালাল করেছেন তা হালাল মনে করবে, আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল যা হারাম করেছেন, তা হারাম মনে করবে, আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল যা ভালোবাসেন, তার প্রতি ভালোবাসা রাখা এবং আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল যা অপছন্দ করেন, তার প্রতি ঘৃণাবোধ রাখা আবশ্যক। জিন-ইনসানের মধ্য থেকে যাদের কাছে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের প্রমাণাদি আসার পর তারা যদি তার প্রতি ঈমান না আনয়ন করে, তাহলে তারা আল্লাহ তা'আলার শাস্তির হকদার হবে। অনুরূপ যেসব কাফেরের নিকট রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনয়ন করেনি, তারাও আযাবের হকদার হবে। এটি ছাহাবী, তাবেঈ, উত্তমভাবে তাদের

অনুসারী, মুসলিমদের ইমাম এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সমস্ত ফির্কার ঐক্যমত দ্বারা সুসাব্যস্ত। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন।

(৪) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তার উপর এমন কুরআন নাযিল হয়েছে, যার মুজিযার সামনে জিন-ইনসান নতি স্বীকার করেছে, যার মোকাবেলা করতে জিন-ইনসানের সমস্ত পণ্ডিত বিরত হয়েছে এবং সমস্ত ধর্মের ভাষাবিদগণ সেটার সর্বাধিক ছোট সূরার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আনয়ন করতে অপারগতা স্বীকার করেছে। ইতিপূর্বে এর বিস্তারিত বিবরণ অতিক্রান্ত হয়েছে।

(৫) সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত মিরাজের ঘটনা নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য। এখানেই শেষ নয়; সেখান থেকে আরো উপরে উঠে এমন স্থানে পৌঁছে গেলেন, যেখান থেকে তিনি কলমের লেখার (খস্‌খস্) শব্দ শুনতে পেলেন। অতঃপর তাদের মাঝে মুখোমুখি দু'টি ধনুকের কিংবা তার চেয়ে কিছু কম ব্যবধান রাইলো।

আর উম্মতের অন্যান্য লোকের উপর তার ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকে শরী'আতের ফরয, হারাম হালাল সম্পর্কিত এমন কিছু বিশেষ হুকুম প্রদান করেছেন, যাতে উম্মতের কেউ শরীক নয়। এগুলো আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করেছেন এবং এগুলো তার খাছ মর্যাদা। তার উপর এমন কিছু জিনিস ফরয করা হয়েছে, যা অন্যদের উপর ফরয করা হয়নি এবং তার উপর এমন কিছু জিনিস হারাম করা হয়েছে, যা অন্যদের উপর হারাম করা হয়নি। তার জন্য এমন কিছু জিনিস হালাল করা হয়েছে, যা অন্যদের জন্য হালাল করা হয়নি। এগুলোর মধ্য থেকে কিছু কিছু বিষয় আলেমদের ঐক্যমতে তার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে আবার কিছু কিছু বিষয়ে আলেমদের মতবিরোধ রয়েছে। অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার খাছ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেছেন। তার মধ্য থেকে

(১) রাতের বেলায় তার জন্য তাহাজ্জুদের ছ্বলাত আদায় করা ফরয ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মৃত্যু পর্যন্ত তাহাজ্জুদ ছ্বলাত পড়া ফরয ছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ "হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী রাতের বেলা ছ্বলাতে রত থাকো। তবে কিছু সময় ছাড়া"। (সূরা আল মুযাম্মেল: ১-২) কুরআনের বক্তব্য দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, তাহাজ্জুদ ছ্বলাত তার উপর ওয়াজিব ছিল। অতঃপর তা রহিত হয়ে গেছে।

(২) তিনি যখন কোনো আমল করতেন, তা সর্বদা চালু রাখতেন।

(৩) তার উপর এবং তার পরিবারের জন্য মানুষের যাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল।

(৩) তার জন্য সাহরী না খেয়ে কিংবা একটানা দু'দিন পর্যন্ত রাতের বেলা কিছু না খেয়ে ছিয়াম পালন রাখা বৈধ ছিল।

(৪) তার জন্য চারের অধিক বিবাহ করা বৈধ করা হয়েছে।

(৫) মক্কাতে তার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি ছিল।

(৬) তার সম্পদের কোনো ওয়ারিছ হবে না।

(৭) তার স্ত্রীগণ তার মৃত্যুর পরও স্ত্রী হিসাবেই থাকবেন। তিনি যখন তার কোনো স্ত্রীকে তালাক দিতেন, তখন সে স্ত্রীকে বিবাহ করা অন্য কারো জন্য বৈধ ছিল না। এ ছাড়াও তার আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এখানে আমরা আমাদের নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য থেকে তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশা-আল্লাহ।

(১) ইসরা ও মিরাজ,

(২) সর্বকালের সমগ্র জিন-ইনসানের জন্য তার রিসালাত এবং

(৩) তার মাধ্যমে নবুওয়াত খতম-শেষ করা হয়েছে।

أولا: الإسراء والمعراج

প্রথমত ইসরা ও মি'রাজ

আল্লাহ তা'আলা মিরাজের ঘটনায় বলেন,

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"পবিত্র তিনি যিনি নিয়ে গেছেন এক রাতের কিয়দাংশে নিজের বান্দাকে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্সা পর্যন্ত, যার পরিবেশকে আমি করেছি বরকতময়। যাতে আমি তাকে নিজের কিছু নিদর্শন দেখাই। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১)

হাফেয ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) এ আয়াতে কারীমার তাফসীরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে নিজের বড়ত্ব ও শান বর্ণনা করেছেন। কারণ তিনি এমন সব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, যার উপর তিনি ছাড়া অন্য কেউ ক্ষমতাবান নন। তিনি ছাড়া অন্য

কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং তিনি ছাড়া আমাদের কোনো রব নেই। তিনি তার বান্দা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতের অন্ধকারে ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদুল হারাম তথা মক্কার মাসজিদ থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত এটি জেরুযালেম শহরে অবস্থিত। ইবরাহীম খলীল ‘আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে এ শহরটি নাবীদের কেন্দ্রস্থল। এ জন্যই মুহম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সমস্ত নাবীকে মিরাজের রাতে সেখানে একত্রিত করা হয়েছে। তিনি তাদের শহরে এবং তাদের বাড়িতে গিয়ে ছ্বলাতে তাদের ইমামতি করেছেন। এতে বুঝা গেলো তিনিই হলেন ইমামে আযাম এবং তিনিই অগ্রনায়ক। আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত নাবী-রসূলের উপর রহম করুন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, باركناحوله “আমি তার আশপাশকে বরকতময় করেছি”। অর্থাৎ সেখানকার ফল ও ফসলে বরকত দান করেছি। যাতে তাকে আমার বড় বড় নিদর্শন দেখাতে পারি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾

“তিনি তার রবের বড় বড় নিদর্শনসমূহ দেখেছেন”। (সূরা আন নাযম:১৮)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

“তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা”। (সূরা মু‘মিন:৫৬)

অর্থাৎ তিনি তার বান্দাদের সমস্ত কথা শুনেন। মুমিন, কাফের, সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী সকলের কথাই শুনেন এবং তাদের সকলের অবস্থাই দেখেন। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করবেন।

المعراج শব্দটি مفعال এর ওজনে ব্যবহৃত হয়েছে। উপরে উঠার যন্ত্রকে المعراج বলা হয়। এটি সিঁড়ির মতোই। কিন্তু সেটা কেমন, তা জানা সম্ভব নয়। এর হুকুম অন্যান্য গায়েবী বিষয়ের হুকুম একই রকম। আমরা এগুলোর উপর ঈমান আনয়ন করি। কিন্তু এগুলোর কাইফিয়্যাত জানার চেষ্টা করি না।

হাদীছের হাফেযগণ বলেন, নবুওয়াতের পর নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাতে থাকা কালে হিজরতের একবছর পূর্বে একবার মিরাজ হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, মিরাজ হয়েছিল হিজরতের একবছর দুই মাস পূর্বে। ইমাম ইবনে আব্দিল বার এরকমই উল্লেখ করেছেন।

صفة الإسراء والمعراج

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসরা ও মিরাজের ধরন

হাফেয ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) তার তাফসীরে বলেন, সঠিক কথা হচ্ছে, তাকে জাগ্রত অবস্থায় রাতের বেলা মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছে; স্বপ্নযোগে নয়। তিনি বোরাকের উপর আরোহণ করে ভ্রমণ করেছেন। তিনি যখন মাসজিদুল আকসার দরজা পর্যন্ত পৌঁছালেন, তখন দরজার নিকট বোরাক বেধে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর মাসজিদের কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাহিয়াতুল মাসজিদ দুই রাক'আত ছ্বলাত পড়লেন। অতঃপর তার জন্য সিঁড়ি আনয়ন করা হলো। এটি হচ্ছে বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট সিঁড়ি, যা দ্বারা উপরে উঠা হয়। সুতরাং এ সিঁড়ির মাধ্যমে তিনি প্রথমে দুনিয়ার আসমানে আরোহণ করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় আসমানে আরোহণ করলেন। অতঃপর তিনি অন্যান্য আসমানে আরোহণ করলেন। প্রত্যেক আকাশের নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ তাকে সংবর্ধনা জানালো। সমস্ত আসমানের নাবীদের মর্যাদা ও সম্মান অনুযায়ী তাদেরকে সালাম দিলেন। ষষ্ঠ আসমানে মূসা কালীমুল্লাহ 'আলাইহিস সালামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছেন এবং সপ্তম আসমান ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। অতঃপর তিনি উভয়ের অবস্থানস্থল অতিক্রম করেছেন। আল্লাহ তার প্রতি, মূসা 'আলাইহিস সালামের প্রতি এবং সমস্ত নাবীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। পরিশেষে তিনি এমন স্থানে পৌঁছে গেলেন, যেখান থেকে তিনি কলম দিয়ে লেখার আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন। অর্থাৎ যা কিছু হবে তাক্বদীর লেখার কলম দিয়ে তা লেখার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি সিদরাতুল মুনতাহা দেখতে পেলেন। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব, স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রং তাকে আচ্ছাদিত রেখেছে ও তাকে ছায়া দিচ্ছে। সেই সঙ্গে ফেরেশতারা সেটাকে ঘিরে রেখেছে। সেখানে জিবরীল 'আলাইহিস সালামকে তার আসল আকৃতিতে দেখতে পেলেন। তার রয়েছে ছয়শত পাখা। সেখানে তিনি সবুজ রঙের রাফরাফ দেখলেন, যা দিগন্তকে বন্ধ করে রেখেছে। তিনি সেখানে বাইতুল মা'মুর দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন, পৃথিবীতে কাবা নির্মাণকারী ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম বাউতুল মামুরের সাথে হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন। কেননা এটাই হলো আসমানের কাবা। প্রতিদিন বাইতুল মামুরে ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে সেখানে ইবাদত করার জন্য। একবার যারা প্রবেশ করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা দ্বিতীয়বার তাতে প্রবেশ করার সুযোগ পায় না।

ঐ রাতে তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেন। সেখানে তার উপর ৫০ ওয়াক্ত ছ্বলাত ফরয করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে পাঁচ ওয়াক্তে পরিণত করেছেন। এখান থেকেই ছ্বলাতের মর্যাদা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে নেমে আসলেন এবং তার সাথে নাবীগণও নেমে

আসলেন। ছ্বলাতের সময় হলে তিনি তাদেরকে নিয়ে ছ্বলাত পড়েছেন। এটি সম্ভবত সেদিনকার ফজরের ছ্বলাত ছিল। কেউ কেউ মনে করে তিনি আসমানে তাদেরকে নিয়ে ছ্বলাত পড়েছেন এবং ছ্বলাতে তাদের ইমামতি করেছেন। তবে এ বিষয়ে বর্ণনাগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে ইমামতি করেছেন। কিছু কিছু বর্ণনা প্রমাণ করে যে, প্রথমবার প্রবেশ করার সময় ছ্বলাত পড়েছেন। তবে ফিরে আসার সময় ছ্বলাত পড়াই অধিক সুস্পষ্ট। কেননা তিনি যখন নাবীদের পাশদিয়ে নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছেন, তখন তাদের সম্পর্কে একজন একজন করে জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করেছেন। জিবরীল তাকে বলে দিয়েছেন। এমতটিই যথার্থ। কারণ তাকে প্রথমে উর্ধ্বজগতে রবের সান্নিধ্যে ডেকে নেয়া হয়েছিল। যাতে করে আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তার উম্মতের উপর ফরয করেন। যে জন্য তাকে আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তা শেষ হলে তিনি এবং অন্যান্য নাবীগণ বাইতুল মুকাদ্দাসে একত্রিত হয়েছেন। ইমামতি করার জন্য তাকে আগে বাড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে তার সম্মান ও ফযীলত সাব্যস্ত হয়েছে। জিবরীল 'আলাইহিস সালামের ইঙ্গিতেই তিনি ছ্বলাতে নাবীদের ইমামতি করেছেন। অতঃপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বের হয়ে বোরাকে আরোহণ করে অন্ধকার থাকতেই মক্কায় ফিরে আসলেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أو بروحه فقط

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিরাজ কি শরীর ও রূহের সাথে হয়েছিল? না কি শুধু রূহের মাধ্যমে হয়েছিল?

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসরা ও মিরাজ কি শরীর ও রূহ মিলেই হয়েছিল? না কি শুধু রূহের মাধ্যমে হয়েছিল? এ ব্যাপারে আলেমদের দু'টি মত পাওয়া যায়। অধিকাংশ আলেমের মতে শরীর ও রূহের মিলিত অবস্থায় মিরাজ হয়েছিল। আর তা হয়েছিল জাগ্রত অবস্থায়; ঘুমন্ত অবস্থায় নয়। এর দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা মিরাজের ঘটনায় বলেন,

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾

"পবিত্র তিনি যিনি নিয়ে গেছেন এক রাতের কিয়দাংশে নিজের বান্দাকে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্সা পর্যন্ত, যার পরিবেশকে আমি করেছি বরকতময়"। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১)

বড় বড় বিষয়ের আলোচনা আসলেই সুবহানাল্লাহ বা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়। মিরাজ যদি স্বপ্নযোগে হতো, তাহলে এতে বড় কিছু ছিল না, তাকে বিরাট মনে করা

হতো না, কুরাইশরা একে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতো না এবং একদল মুসলিম মুরতাদ হয়েও যেতো না। কেননা দেহ ও 'রূহ' এর সমন্বয়ে গঠিত সত্তাকে عبد বা বান্দা বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি তার বান্দাকে রজনীর কিয়দাংশে ভ্রমণ করিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾

"আর আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত গাছকে শুধু মানুষের জন্য একটি ফিতনা বানিয়ে রেখে দিয়েছি"। (সূরা বানী ইসরাঈল: ৬০)

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, এখানে চোখের দেখা উদ্দেশ্য। মিরাজের রাত্রিতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখানো হয়েছে। ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ﴾ "তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচুতও হয়নি"। (সূরা আন নাজম: ১৭) চোখ দেহেরই একটি যন্ত্র বা অংশ; রূহের অংশ নয়। সেই সঙ্গে আরো জানা যাচ্ছে, যে বোরাকে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা আলোকজ্জ্বল চকচকে সাদা একটি জন্তু। এ বিশেষণ বিশিষ্ট প্রাণীর উপর আরোহণ করা দেহের জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে। রূহের জন্য এ জাতীয় বিশেষণ ও অবস্থা প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা রূহ নড়াচড়া করা এবং একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য বাহনে আরোহণ করার মুখাপেক্ষী নয়।

অন্য আরেকটি দল বলেছে, শুধু রূহের মাধ্যমে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিরাজ হয়েছে; শরীর সহকারে নয়। ইবনে ইসহাক আয়েশা এবং মুআবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন। হাসান বাছরী থেকেও অনুরূপ কথা পাওয়া যায়। তবে তাদের এ কথা প্রমাণ করে না যে, স্বপ্নের মাধ্যমে ইসরা ও মিরাজ হয়েছিল। বরং তাদের কথার অর্থ হলো রূহকে রাতে ভ্রমণ ও মিরাজ করানো হয়েছিল। দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে মিরাজে গিয়েছিল। অতঃপর দেহের মধ্যে রূহ ফিরে এসেছে। এটি ছিল নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাছ বৈশিষ্ট্য। তিনি ছাড়া অন্য কারো রূহ মৃত্যুর আগে পরিপূর্ণরূপে আসমানে উঠার ফযীলত পাবে না।

স্বপ্নের ব্যাপারে কথা হলো, ঘুমন্ত লোক স্বপ্নে যা দেখে তা কখনো উদাহরণ স্বরূপ হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞাত জিনিস কখনো তার সামনে উদাহরণ আকারে পেশ করা হয়। সে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে যে আসমানে উড়ছে, মক্কা যাচ্ছে। অথচ তার রূহ উপরে উঠে নেই, মক্কাতেও যায় নেই। স্বপ্ন সম্রাট (স্বপ্নের ফেরেশতা) কেবল তার সামনে একটা উদাহরণ পেশ করেছে। সুতরাং দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসলেই রূহ উপরে উঠা এবং নিছক একটা স্বপ্ন দেখার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

যারা বলে ইসরা ও মিরাজ হয়েছিল রূহের মাধ্যমে; শরীরের মাধ্যমে নয়, তারা আনাস (ছাহাবী আনহু) থেকে শারীক ইবনে আবী নুমুরের সূত্রে হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। সেখানে এসেছে, অতঃপর আমি জাগ্রত হয়ে দেখলাম যে আমি হাতীমের মধ্যেই আছি।

এ হাদীছের দু'টি জবাব রয়েছে। প্রথম জবাব হলো এ হাদীছটি শারীকের ভুল-ত্রুটির মধ্যে গণ্য। হাদীছের হাফেযগণ ইসরা ও মিরাজের হাদীছ বর্ণনায় শারীক ইবনে আবু নুমুরকে ভুলকারী হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। আর দ্বিতীয় জবাব হলো শারীকের হাদীছে জাগ্রত হওয়া দ্বারা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থানান্তরিত হওয়া উদ্দেশ্য। ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, শারীক ভুল করেছেন, এ কথা বলার চেয়ে হাদীছের ব্যাখ্যা করাই উত্তম। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, মিরাজ হওয়ার পূর্বে আমরা স্বপ্নে আরেকবার মিরাজ হওয়াকে অস্বীকার করি না। যেভাবে মিরাজ হয়েছে, হুবহু সেভাবে আরেকবার মিরাজ সংঘটিত হতে পারে। কেননা তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, সকালের মতই সুস্পষ্ট সত্য হিসাবে বাস্তবায়িত হতো। ওহী নাযিলের সূচনা সম্পর্কিত হাদীছে ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, জাগ্রত অবস্থায় তার সামনে যা সংঘটিত হয়েছে, তার পূর্বে ঘুমন্ত অবস্থায় তার অনুরূপ দেখেছেন। যাতে করে স্বপ্নটি তার জন্য ভূমিকা স্বরূপ হয় এবং তার অন্তরে দৃঢ়তা প্রদানকারী হয় এবং তিনি যেন স্বস্তি লাভ করেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

هل تكرر المعراج

মিরাজ কি একাধিকবার হয়েছে?

মিরাজ সম্পর্কিত হাদীছগুলো বর্ণনা করার পর হাফেয ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মিরাজ সম্পর্কে ছ্বহীহ, হাসান ও যঈফ হাদীছগুলো যখন অবগত হওয়া যাবে, তখনই মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈশ ভ্রমণ সম্পর্কে জানা সম্ভব। আর তা মাত্র একবার সংঘটিত হয়েছে। যদিও বর্ণনাকারীগণের বাক্য বিভিন্ন রকম হয়েছে অথবা কেউ তাতে কিছু বাড়িয়ে বলেছেন কিংবা কেউ কমিয়ে বলেছেন। কেননা নাবীগণ ব্যতীত কেউ ভুলের উর্ধ্বে নয়।

আর যারা মিরাজ সম্পর্কে বর্ণিত মতভেদপূর্ণ প্রত্যেক বর্ণনা দ্বারা স্বতন্ত্র একটি মিরাজ নির্ধারণ করেছেন, তারা বহুবার ইসরা ও মিরাজ সাব্যস্ত করেছেন। তারা তাদের কথায় সত্য থেকে বহুদূরে সরে গিয়ে অদ্ভুত কথা বলেছেন এবং হাদীছগুলোর মধ্যে সমন্বয় করতে না পেরে দিশেহারা হয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়েছেন।

পরবর্তী কালের কিছু আলেম সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, একবার শুধু মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাত্রিতে তাকে ভ্রমণ করানো হয়েছিল। আরেকবার শুধু মক্কা থেকে সরাসরি আসমান পর্যন্ত রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছিল। আরেকবার প্রথমে মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল। এভাবে সমন্বয় করে তারা আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে। এর মাধ্যমে তারা সমস্যামুক্ত হতে পেরেছে বলে মনে করেছে। অথচ এসব কথা মূল সত্য থেকে বহু দূরে। কোনো সালাফ থেকেই এ ধরনের কথা বর্ণিত হয়নি। এতবার যদি মিরাজ হতো, তাহলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই উম্মতকে সংবাদ দিতেন। বর্ণনাকারীগণও বারবার মিরাজ হওয়ার কথা বর্ণনা করতেন।

কতিপয় ছূফীসাধক মনে করে যে, ত্রিশবার মিরাজ হয়েছিল। তাদের কেউ কেউ চৌত্রিশবার হওয়ার কথাও বলেছেন। এগুলো থেকে মাত্র একবার হয়েছিল সশরীরে। বাকিগুলো হয়েছিল রূহের মাধ্যমে।

কেউ কেউ বলেছেন, মিরাজ হয়েছে দুইবার। একবার জাগ্রত অবস্থায় এবং আরেকবার স্বপ্নের মাধ্যমে। এ মতের সমর্থকগণ সম্ভবত শারীকের হাদীছ, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: ثم استيقظت "অতঃপর আমি জাগ্রত হলাম" এবং এ সম্পর্কে অন্যান্য হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করতে চেয়েছেন। আবার কেউ কেউ জাগ্রত অবস্থাতেই দুইবার মিরাজ হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। একবার নবুওয়াতের পূর্বে আরেকবার নবুওয়াতের পরে।

কেউ কেউ বলেছেন, মিরাজ হয়েছিল তিনবার। নবুওয়াতের পূর্বে একবার এবং নবুওয়াতের পরে দুইবার। এ শ্রেণির লোকদের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে, মিরাজ সম্পর্কিত হাদীছের কোনো শব্দ যখন তাদের কাছে অস্পষ্ট হয়েছে তারা উভয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে একটি মিরাজ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ইমাম শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি ঐসব লোকদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যারা বহুবার মিরাজ হওয়ার কথা বলে থাকেন। তারা কীভাবে ধারণা করতে পারে যে, প্রত্যেকবারই ৫০ ওয়াক্ত ছ্বলাত ফরয করা হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেকবার মূসা 'আলাইহিস সালাম এবং তার প্রভুর মাঝে ঘুরাঘুরি করার মাধ্যমে ৫ ওয়াক্তে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকবারই তিনি বলেছেন, আমি আমার ফরয ঠিক রাখলাম; কিন্তু আমার বান্দাদের উপর সংখ্যা কমিয়ে দিলাম। অতঃপর দ্বিতীয়বার ৫০ ওয়াক্তে ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্তে পরিণত করলেন।

ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কিছু কিছু বর্ণনাকারী ইচ্ছা করে কিংবা ভুলক্রমে হাদীছের কিছু অংশ বিলুপ্ত করে ফেলেন অথবা তিনি যে অংশটুকু গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন সেটুকু রেখে বাকিটুকু বিলুপ্ত করে ফেলেন অথবা কখনো কখনো পূর্ণ হাদীছকেই বর্ণনা করেন। আবার সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক উপকারী অংশটুকুই বাদ দেন। ইতিপূর্বে

কতিপয় আলেমের উদ্বৃতি দিয়ে বলেছি যে, যারা ইসরা ও মিরাজ সংক্রান্ত প্রত্যেকটি বর্ণনা থেকে স্বতন্ত্র একটি মিরাজ সাব্যস্ত করেছেন, তারা মারাত্মক ভুল করেছেন। কেননা এ সংক্রান্ত প্রত্যেক বর্ণনার মধ্যেই রয়েছে যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবীদেরকে সালাম দিয়েছেন, জিবরীল 'আলাইহিস সালাম তাকে নাবীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং প্রত্যেকটিতেই আছে যে, তার উপর ৫০ ওয়াক্ত ছ্বলাত ফরয করা হয়েছে। সুতরাং কীভাবে দাবি করা যেতে পারে যে, বহুবার মিরাজ হয়েছে। এ কথা মূল সত্য থেকে বহুদূরে এবং বহুবার মিরাজ সংঘটিত হওয়া অসম্ভবও বটে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

ثانيا: عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكره

দ্বিতীয়তঃ মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত বিশ্বজনীন এবং তা অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান এবং তাদের অন্ধ অনুসারীদের এক দল লোকের কথা হলো, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবদের নিকট প্রেরিত হয়েছেন এবং তিনি ইয়াহূদী- খ্রিষ্টানদের নাবী নন। তারা সত্যকে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করার জন্য বলে থাকে, তার দীন সত্য হলে আমাদের দীনও সত্য। আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছার বহু পথ রয়েছে। তারা তাদের দীন এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনকে ইমামদের ফিক্বহী মাযহাবের সাথে তুলনা করে। ফিক্বহী মাযহাবের কোনো একটি মাযহাব প্রাধান্যপ্রাপ্ত হওয়ার দ্বারা অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীরা কাফের সাব্যস্ত হয় না।

এটি একটি বাতিল কথা। তারা যেহেতু তার রিসালাতকে সত্যায়ন করেছে, তাই তার সমস্ত সংবাদকে সত্যায়ন করা আবশ্যক। তিনি বলেছেন যে, তাকে সমস্ত মানুষের নিকট রসূল হিসাবে পাঠানো হয়েছে। রসূলগণ কখনো মিথ্যা বলেন না। সুতরাং তার সমস্ত সংবাদকেই সত্য হিসাবে বিশ্বাস করা আবশ্যক।

তিনি ইসলামের দাওয়াতপত্র সহ বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা-বাদশাহদের নিকট দূতগণকে পাঠিয়েছেন। তিনি পারস্যের বাদশাহ কেসরা ও রোমের সম্রাট কায়সার, আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী, মুকাওকিস এবং তৎকালীন সমস্ত রাজা-বাদশাহর নিকটেই দূত পাঠিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

অতঃপর আহলে কিতাবদের সাথে যুদ্ধ করা, তাদের নারী-শিশুদেরকে বন্দী করা, তাদের রক্ত হালাল করা এবং তাদের উপর জিযিয়া নির্ধারণ করা মুতওয়াতির সূত্রে বর্ণিত একটি জ্ঞাত বিষয়। তিনি মুশরেকদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করেছেন এবং ইয়াহূদী- খ্রিষ্টানদেরকেও ইসলামের দিকে আহবান করেছেন। মুশরেকদের বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে যুদ্ধ করেছেন, আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে সেভাবেই যুদ্ধ করেছেন। তিনি বানী কায়নুকা, বানী নাযীর, বানী কুরায়যা এবং খায়বারবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এরা সবাই ছিল ইয়াহূদী। তিনি ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করেছেন এবং ধন-সম্পদকে গণীমত হিসাবে দখল করেছেন। তাবুক যুদ্ধের বছর তিনি তার সেনাবাহিনী নিয়ে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তার আযাদ করা গোলাম যায়েদ ইবনে হারেসা, জা'ফর ইবনে আবু তালেব এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্য শাহাদাত বরণ করেছেন। তিনি নাজরানের খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে জিযিয়া কর ধার্য করেছেন।

তার মৃত্যুর পর খোলাফায়ে রাশেদাগণ আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেছেন। যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করেছেন এবং যারা স্বেচ্ছায় নত হয়ে জিযিয়া কর দিতে রাযী হয়েছে তাদের উপর তারা জিযিয়া কর নির্ধারণ করেছেন।

কুরআনের জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেকেই অবগত রয়েছে যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কিতাব নিয়ে এসেছেন, তাতে আহলে কিতাবদেরকে তার আনুগত্য করার দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং তাদের মধ্য থেকে যারা তার আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে এবং তাদের প্রতি অভিশাপ করা হয়েছে। তেমনি যেসব মুশরেক এবং যিম্মী তার আনুগত্য করে নেই, তাদেরকেও কাফের বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾

"হে কিতাবধারীগণ! সেই কিতাবটি মেনে নাও যেটি আমি এখন নাযিল করেছি এবং যেটি তোমাদের কাছে আগে থেকে মওজুদ কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে ও তার প্রতি সমর্থন জানায়। আর আমি চেহারা বিকৃত করে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেবার অথবা শনিবার-ওয়ালাদের মতো তাদেরকে অভিশপ্ত করার আগে এর প্রতি ঈমান আনো। আর মনে রেখো, আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালিত হয়েই থাকে"। (সূরা আন নিসা ৪:৪৭)

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে يأهل الكتاب "হে আহলে কিতাবগণ" এবং يا بني إسرائيل "হে বাণী ইসরাঈল সম্প্রদায়" বলে এত বেশি সম্বোধন করেছেন যে, বিনা কষ্টে তা গণনা করে শেষ করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾

"আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফুরী করেছে তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত তারা আপন মতে অবিচল ছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল যিনি পবিত্র সহীফা পড়ে শুনাতেন। যাতে রয়েছে সঠিক-সহজ বিধান। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে তো বিভেদ সৃষ্টি হলো তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর। তাদেরকে তো এ ছাড়া আর কোনো আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করবে, ছ্বলাত কায়েম করবে ও যাকাত দেবে, এটিই যথার্থ সত্য-সঠিক দীন। আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফুরী করেছে তারা নিশ্চিতভাবে জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। তারাই সৃষ্টির অধম। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারাই সৃষ্টির সেরা"। (সূরা আল বাইয়্যিনাহ: ১-৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

"বলো, হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল হিসাবে এসেছি"। (সূরা আল-আরাফ: ১৫৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾

"আর আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছি"। (সূরা সাবা: ২৮)

প্রসিদ্ধ হাদীছে এসেছে, রসূলুল্লাহ্ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমাকে পাঁচটি জিনিস দ্বারা অন্যান্য নাবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ হাদীছে আরো এসেছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً»

"আমার পূর্বেকার নাবীগণ প্রেরিত হতেন খাছ-নির্দিষ্ট করে তাদের গোত্রের লোকদের

নিকট। আর আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্য"।[১২১] বরং মুতাওয়াতির সূত্রে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সমস্ত জিন-ইনসানের প্রতি রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন।

সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে এবং মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে যেভাবে পৃথিবীর বুকে তার দাওয়াত প্রকাশিত হওয়ার কথাটি জানা যাচ্ছে, ঠিক সেভাবেই জানা যাচ্ছে যে, তিনি আহলে কিতাবদেরকে তার প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত দিয়েছেন এবং যারা তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি, তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছেন। সেই সঙ্গে ইসলাম কবুল অথবা নতি স্বীকার করে জিযিয়ার কর না দেয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার আদেশ দিয়েছেন। তিনি নিজেও সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। তিনি তাদের উপর জিযিয়া নির্ধারণ করেছেন, তাদের যুবকদেরকে হত্যা করেছেন, শিশুদেরকে বন্দী করেছেন এবং তাদের ধন-সম্পদগুলো গণীমত হিসাবে আয়ত্ত করেছেন। তিনি বনী কায়নুকাকে কেল্লার মধ্যে ঘেরাও করেছেন। অতঃপর তাদেরকে আযরেআত নামক স্থানে নির্বাসন করেছেন। বনী নাযীরদেরকে তিনি ঘেরাও করেছেন। অতঃপর তাদেরকে খায়বারে নির্বাসন করেছেন। তাদের ব্যাপারেই সূরা হাশর নাযিল হয়েছে। ঐদিকে বনী কুরায়যার লোকেরা যখন অঙ্গিকার ভঙ্গ করলো, তখন তাদেরকেও অবরোধ করেছেন। অতঃপর তাদের মধ্যকার যুবকদেরকে হত্যা করেছেন এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করেছেন। তাদের ধন-সম্পদগুলো গণীমত হিসাবে বাজেয়াপ্ত করেছেন। তাদের এ ঘটনা কুরআনের সূরা আহযাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি খায়বারের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে সেটা জয় করেছেন এবং তাদের পুরুষদের থেকে কাউকে হত্যা করেছেন, কাউকে বন্দী করেছেন এবং সেখানকার জমাজমি মুমিনদের মাঝে ভাগ-বণ্টন করে দিয়েছেন। কুরআন মাজীদের সূরা ফাতাহ এ আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘটনা আলোচনা করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খ্রিষ্টানদের উপর জিযিয়া কর নির্ধারণ করেছেন। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে-ইমরান নাযিল করেছেন। তাবুক যুদ্ধের বছর তিনি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তাদেরকে কেন্দ্র করে সূরা তাওবা নাযিল হয়েছে। অধিকাংশ মাদানী সূরা যেমন আল বাকারা, আলে-ইমরান, আন-নিসা, আল-মায়িদা এবং অন্যান্য মাদানী সূরাগুলোতে আহলে কিতাবদেরকে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে এবং তাদেরকে এতবার সম্বোধন করা হয়েছে যে, এ সংক্ষিপ্ত কিতাবে তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে তার খলীফাগণ যেমন আবু বকর ও উমার তার আদেশ-নিষেধের সর্বাধিক আনুগত্যকারী ও তার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গিকারের সর্বাধিক সংরক্ষণকারী মুহাজির ও আনসার ছাহাবীদের সাথে নিয়ে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তারা অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতই

[১২১] ছ্বহীহ: বুখারী হা/৪৩৮, নাসাঈ হা/৪৩২।

খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে যারা নতি স্বীকার করে জিযিয়া কর দিতে সম্মত হয়েছে, তাদের উপর তারা সেটা ধার্য করেছেন।

উপরোক্ত বিষয়ে তার থেকে অনেক ছ্বহীহ হাদীছ রয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«والذي نفسي بيده لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لا يُؤْمِنُ بِي إِلاَّ دخل النَّارِ»

"এ উম্মতের যে কেউ আমার ব্যাপারে শুনবে, চাই সে ইয়াহূদী হোক বা খ্রিষ্টান হোক, অতঃপর সে যদি আমার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"।[১২২]

সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর কিতাবে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾

"আর মানব গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে-ই তার প্রতি কুফুরী করবে জাহান্নাম হবে তার জন্য প্রতিশ্রুত স্থান"। (সূরা হুদ: ১৭) হাদীছের অর্থ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। সর্বসাধারণের নিকট তা খুবই সুস্পষ্ট।

সুতরাং ব্যাপারটি যেহেতু এরকমই, তাই প্রমাণিত হলো যে, তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্যই রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে সাব্যস্ত হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সমগ্র মানবের জন্য তিনি রসূল হিসাবে এসেছেন। আল্লাহর রসূল কখনো মিথ্যা বলেন না এবং তার আনুগত্য করার জন্য আল্লাহর আদেশ ব্যতীত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেন না। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মানুষের জান-মাল ও বসতবাড়ির উপর আক্রমণও চালাতে পারেন না।

সুতরাং যে মনে করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে আরবের কাফের-মুশরেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ করেছেন কিন্তু মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা করার আদেশ করেননি, সে মিথ্যুক ও যালেম বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾

"আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটায় অথবা বলে আমার কাছে ওহী এসেছে অথচ তার উপর কোনো ওহী নাযিল করা হয়নি"। (সূরা আল আনআম: ৯৩)

যে ব্যক্তি এমন কিছু দাবি করবে, সে যালেম মিথ্যুক হওয়ার পাশাপাশি পৃথিবীতে

[১২২] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৫৩, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

সর্বাধিক ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও অহংকারী হিসাবে গণ্য হবে। সেই সঙ্গে সে ভয়ানক যালেম বাদশাহদের চেয়েও ক্ষতিকর হবে। কেননা অহংকারী যালেম রাজা-বাদশাহরা তাদের আনুগত্যের উপর বাধ্য করার জন্য মানুষের সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু তারা এটি বলে না যে, আমরা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য রসূল স্বরূপ প্রেরিত হয়েছি। তাই যারা আমাদের আনুগত্য করবে, তারা জান্নাত পাবে এবং যারা আমাদের অবাধ্য হবে, তারা জাহান্নামে যাবে। ফেরাউন এবং তার অনুরূপ যালেমরাও এমন কথা বলেনি। সত্য নাবী কিংবা মিথ্যুক নাবীরাই এমন কথা বলে থাকে। যেমন মুসাইলামা কায্যাব, আসওয়াদ আনাসী এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য মিথ্যুকরা বলেছিল।

সুতরাং যখন জানা গেলো যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নাবী, তখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব সংবাদ দিয়েছেন, তাও সত্য হওয়া আবশ্যক। তিনি যেহেতু আল্লাহর রসূল, তাই তার প্রত্যেকটি কথার আনুগত্য করা জরুরী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

"আমি একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই রসূল পাঠিয়েছি, যাতে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হয়"। (সূরা আন-নিসা: ৬৪)

আর তিনি যখন সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আহলে কিতাবদের জন্যও আল্লাহর রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন এবং তাদের উপর তার আনুগত্য করা ওয়াজিব তখন তার সংবাদ সত্য হিসাবে কবুল করে নেয়া জরুরী। যে লোক মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর রসূল বলে স্বীকার করার সাথে সাথে ইয়াহূদী- খ্রিষ্টানদের প্রতি তার প্রেরিত হওয়ার কথা অস্বীকার করবে সে ঐ ব্যক্তির মতোই, যে বলল মূসা 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর রসূল ছিলেন ঠিকই; কিন্তু সিরিয়ার পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করা তার উপর আবশ্যক ছিল না, মিশর থেকে বনী ইসরাঈলকে বের করাও তার জন্য আবশ্যক ছিল না, আল্লাহ তা'আলা তাকে সে বিষয়ে আদেশও করেনি, শনিবারের পবিত্রতা রক্ষা করার আদেশও তাকে করা হয়নি, তার উপর তাওরাত কিতাবও নাযিল করা হয়নি এবং তুর পাহাড়ে তার সাথে আল্লাহ তা'আলা কথাও বলেননি। সে ঐ ব্যক্তির মতোই যে বললো, ঈসা 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর রসূল ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হননি, তার আনুগত্য করা বনী ইসরাঈলের প্রতি আবশ্যকও ছিল না এবং তিনি ইয়াহূদীদের উপর যুলুম করেছেন। উপরোক্ত কথার অনুরূপ আরো যেসব কথা রয়েছে, তা সবই কুফুরী কথা। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾

"যারা আল্লাহ ও তার রসূলদের সাথে কুফুরী করে, আল্লাহ ও তার রসূলদের মধ্যে

পার্থক্য করতে চায় এবং বলে আমরা কারো প্রতি ঈমান আনয়ন করবো ও কারো প্রতি ঈমান আনয়ন করবো না। আর তারা কুফর ও ঈমানের মাঝখানে একটি পথ বের করতে চায়, তারা সবাই আসলে কট্টর কাফের। আর কাফেরদের জন্য আমি লাঞ্ছনাকর শাস্তি তৈরী করে রেখেছি"। (সূরা আন নিসা: ১৫০-১৫১)

ثالثا: ختم الرسالات ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم

তৃতীয়তঃ মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী হিসাবে প্রেরণের মাধ্যমে নাবী-রসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে নাবী-রসূল আগমনের ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾

"মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারোর পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নাবী"। (সূরা আল আহযাব: ৪০)

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أمتي بَعْدِي ثَلَاثُونَ كذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزعم أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»

"আমার উম্মতের মধ্যে আমার পরে ত্রিশজন মিথ্যুকের আগমন ঘটবে। তারা সকলেই নবুওয়াতের দাবী করবে। অথচ আমিই সর্বশেষ নাবী। আমার পর ক্বিয়ামতের পূর্বে আর কোনো নাবী নেই"।[১২৩]

নাবীদের আগমন বন্ধ হয়ে যাওয়া রসূলদের আগমন বন্ধ হওয়ার দাবি রাখে। কেননা নাবী হলেন আম আর রসূল হলেন খাছ তথা নবুওয়াতের মর্যাদার চেয়ে রিসালাতের মর্যাদা বেশি। তাই কুরআনের আয়াত ও হাদীছের মাধ্যমে যেহেতু নাবী আগমনের পথ বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা করা হয়েছে, তাই রসূল আসার দরজা আরো উত্তমভাবেই বন্ধ করা হয়েছে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের মাধ্যমে নবুওয়াত খতম হয়ে গেছে -এর অর্থ হলো তার নবুওয়াতের পরে আর কোনো নবুওয়াত হবে না এবং তার শরী'আতের পরে আর কোনো শরী'আত আসবে না।

[১২৩] ছ্বহীহ: আবু দাউদ, হা/৪২৫২, তিরমিযী, হা/২২১৯, অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান।

আখিরী যামানায় ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অবতরণ এর পরিপন্থি নয়। কেননা তিনি যখন আসবেন, তখন মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরী‘আত অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করবেন; তার পূর্বের শরী‘আত অনুযায়ী নয়। কেননা তার আগের শরী‘আত রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং তিনি এ শরী‘আতের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা বাস্তবায়ন করার মাধ্যমেই আল্লাহর ইবাদত করবেন। অতএব তিনি হবেন আমাদের নাবীর খলীফা এবং তার উম্মতের মধ্যকার শাসকদের অন্যতম।

অতএব সর্বশেষ নাবী সর্বোত্তম কিতাব, পূর্ণতম শরী‘আত, সর্বশ্রেষ্ঠ মিল্লাত এবং পরিপূর্ণ দীনসহ প্রেরিত হয়েছেন। তিনি এমন এক শরী‘আত নিয়ে এসেছেন, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের সর্বস্থানের সমস্ত মানবতার সমস্ত প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট। তার মাধ্যমে নাবীদের মালা গাঁথা শেষ হয়ে গেছে। তার পর আর কোনো নাবী আসবে না।

ছ্বহীহ বুখারী (হা/৩৫৩৫), ছ্বহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

«إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دارا فَأَكملها وأحسنها إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فجعل الناس يدخلون ويعجبون منها ويقولون لولا موضع لبنة»

“আমার এবং আমার পূর্বে নাবীদের উদাহরণ হলো, যেমন কোনো লোক একটি সুন্দর প্রাসাদ বা বিল্ডিং নির্মাণ করলো। সে সেটার নির্মাণ কাজ পূর্ণ করলো এবং সুন্দর করলো কিন্তু প্রাসাদের এক কোণায় এক ইট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রেখে দিল। লোকেরা এই প্রাসাদে প্রবেশ করে তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে বলতে লাগলো, একটি ইট রাখার জায়গা ফাঁকা না থাকলে প্রাসাদটি কতইনা সুন্দর হতো! ইমাম মুসলিম আরেকটু বাড়িয়ে বলেছেন যে, فجئت فختمت الأنبياء “অতঃপর আমি এসে নাবীদের আগমনের দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।

ছ্বহীহ বুখারী (হা/৩৫৩৫) ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এ অর্থে আরেকটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে,

«مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ»

“লোকেরা এ প্রাসাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে বলতে লাগলো, এ ফাঁকা জায়গায় একটি ইট রাখা হয় না কেন? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি হলাম বিল্ডিংএর সে শেষ ইট। আমিই সর্বশেষ নাবী”।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الانْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ»

“বনী ইসরাঈলদেরকে তাদের নাবীগণ পরিচালনা করতেন। যখন একজন নাবী মারা যেতেন তখন অন্য একজন নাবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নাবী নেই। অবশ্য আমার পরে অনেক খলীফা হবেন”।[১২৪]

জাবের ইবনে সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিঠে কবুতরের ডিম সদৃশ একটি ছিলমোহর দেখেছি। ইমাম মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) ফতহুল বারীতে বলেন, ইমাম কুরতুবী বলেছেন, অনেক ছ্বহীহ হাদীছের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাম কাঁধের নিকট নবুওয়াতের লাল রং এর ছিল মোহর সুস্পষ্ট ছিল। সেটা যখন ছোট হতো কবুতরের ডিমের মতো পরিলক্ষিত হতো এবং যখন বড় হতো, তখন হাতের মুষ্ঠি পরিমাণ ছিল। আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

আলেমগণ বলেছেন, বাম কাধের নিকট নবুওয়াতের ছিলমোহর থাকার কারণ হলো, সেখানে রয়েছে قلب বা অন্তকরণ। ইমাম সুহাইলী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাম কাঁধের নিকট নবুওয়াতের ছিলমোহর থাকার কারণ হলো, তিনি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মাসুম ছিলেন। আর এ স্থান দিয়েই যেহেতু শয়তান প্রবেশ করে, তাই তার বাম কাধের নিকট ছিলমোহর লাগিয়ে শয়তানের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

হাফেয ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদের প্রতি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে বিশেষ রহমত করেছেন। সেই সঙ্গে তার মাধ্যমে নাবী-রসূলদের আগমনের দরজা বন্ধ করে আল্লাহ তা‘আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে সম্মানিত করেছেন এবং তার জন্য একনিষ্ঠ দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা‘আলা তার কিতাবে এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পবিত্র মুতাওয়াতির সুন্নাতে সংবাদ দিয়েছেন যে, তার পরে আর কোনো নাবী নেই। যাতে করে মুসলিমগণ জানতে পারে যে, তার পরে যে কেউ নবুওয়াত দাবি করবে, সে গোমরাহ মিথ্যুক দাজ্জাল এবং পথভ্রষ্টকারী হিসাবে গণ্য হবে। যদিও তারা কাল্পনিক কাহিনী, ভেলকিবাজি, বিভিন্ন প্রকার যাদুমন্ত্র, তেলেসমাতি এবং অস্পষ্ট অর্থবিশিষ্ট কিছু লিখে

[১২৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৫৫।

মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, কিন্তু জ্ঞানী ও বিবেকবানদের নিকট এগুলো গোমরাহী ও অবাস্তব হিসাবেই ধরা পড়ে।

আল্লাহ তা'আলা ইয়ামানের আসওয়াদ আনাসী এবং ইয়ামামার মুসায়লামা কাজ্জাবের হাতে এমন কিছু ভ্রান্তিকর অবস্থা এবং এমন অসত্য কথা বের করেছেন, যার মাধ্যমে প্রত্যেক জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, তারা দু'জন ছিল গোমরাহ ও মিথ্যুক। তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে অভিশাপ বর্ষিত হোক।

অনুরূপভাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত নবুওয়াতের প্রত্যেক মিথ্যা দাবিদারের মিথ্যাচারিতা প্রকাশ হতেই থাকবে। মিথ্যুক দাজ্জালের মিথ্যাবাদিতা সুপ্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমেই তাদের আগমনের দরজা বন্ধ হবে। এসব মিথ্যুকের প্রত্যেকের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু জিনিস সৃষ্টি করবেন, যার মাধ্যমে আলেম ও মুমিনগণ তাদের মুখোশ উন্মুক্ত করতে সক্ষম হবেন। সেই সঙ্গে এটি হবে সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়া স্বরূপ।

আসল কথা হলো, তারা কোনো সৎকাজের আদেশ দেয় না এবং কোনো অসৎকাজ থেকেই নিষেধ করে না; তবে তারা নিজেদের প্রকৃত চেহারা গোপন রাখার জন্যই কখনো কখনো সেটা করে থাকে অথবা তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্যই অসৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন করার কথা বলে থাকে। সেই সঙ্গে তারা কথায় ও কাজে মিথ্যা ও পাপাচারে সীমালঙ্ঘন করে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾

"আমি কি তোমাদের জানাবো শয়তানরা কার উপর অবতীর্ণ হয়? তারা তো প্রত্যেক মিথ্যুক বদকারের উপর অবতীর্ণ হয়"? (সূরা আশ শুআরা: ২১-২৬)

নাবী-রসূলদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা তারা যা বলেন, যার আদেশ করেন এবং যা থেকে নিষেধ করেন, তারা তাতে সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ন এবং সুদৃঢ় হয়ে থাকেন। সেই সঙ্গে তাদেরকে মুজিযা, সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এবং উজ্জ্বল নির্দশণাবলী দ্বারা শক্তিশালী করা হয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের সকলের উপর সর্বদা অজস্র শান্তির ধারা বর্ষিত হোক।

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী হিসাবে প্রেরণ করার পর মানব জাতি আর কোনো নাবী প্রেরণের প্রতি মুখাপেক্ষী নয়। কারণ তার শরী'আত পরিপূর্ণ এবং মানুষের সকল প্রয়োজন পূরণের অঙ্গিকার রয়েছে তাতে। সুতরাং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের পর নতুন নাবী প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

কেউ যদি বলে উম্মত নষ্ট হয়ে গেছে। নষ্ট উম্মতকে সংস্কার ও সংশোধন করার জন্য নতুন নাবী পাঠানোর প্রয়োজন রয়েছে, তার জবাবে আমরা বলবো যে, শুধু সংস্কার ও সংশোধনের জন্যই কি অতীতে নাবী পাঠানো হয়েছে, যাতে বর্তমান কালেও একই

উদ্দেশ্যে নাবী পাঠানোর প্রয়োজন পড়তে পারে? আসল কথা হলো ওহীর বার্তা বহন করার জন্যই নাবী পাঠানো হয়ে থাকে। আর নতুন রিসালাত পৌঁছানো বা পূর্ববর্তী রিসালাতের পূর্ণতার জন্য অথবা সেটাকে বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কবল থেকে পবিত্র করার জন্যই নাবীদেরকে পাঠানো এবং তাদের নিকট ওহী প্রেরণ করার প্রয়োজন পড়ে।

নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে যেহেতু কুরআন ও সুন্নাতে মুহাম্মাদীকে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং দীন ইসলামকে তার মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে, তাই নতুন নাবী পাঠানোর কোনো প্রয়োজন নেই। এখন শুধু সংস্কারকদের প্রয়োজন রয়েছে। ঈষৎ পরিবর্তনসহ 'কাদীয়ানী ফির্কার জবাব' নামক বই থেকে উপরোক্ত কথাগুলো উল্লেখ করা হলো।

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী বানিয়ে পাঠানোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াত ও রিসালাতের দরজা বন্ধ করার ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾

"মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারোর পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নাবী"। (সূরা আল আহযাব: ৪০)

নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য কথা হলো, ইসলামের সমস্ত বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকামসহ কুরআনুল কারীম যেভাবে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে হুবহু সেভাবে আমাদের মাঝে সংরক্ষিত রাখার মাধ্যমে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের আইন-কানুন তৈরী করা, সীরাতে নববী বিদ্যমান থাকা এবং কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকারী সুন্নাতগুলো সঠিকভাবে বিদ্যমান থাকা আমাদের মাঝে রসূল জীবিত অবস্থায় থাকার মতোই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾

"তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ো, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তার রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম"। (সূরা আন নিসা: ৫৯)

আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে আসার অর্থ হলো তার কিতাবের দিকে ফিরে আসা আর তার মৃত্যুর পর তার দিকে ফিরে আসার অর্থ হলো তার সুন্নাতের দিকে ফিরে আসা। এ কারণেই মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের পর পৃথিবীবাসী আর কোনো নাবী বা রসূল কিংবা নতুন শরী'আত পাঠানোর প্রতি মুখাপেক্ষ নয়। কেননা যদিও আল্লাহ তা'আলা নাবী-রসূল পাঠান, তাহলেও তারা নতুন কিছু আনয়ন করতে পারবেন না এবং

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তার উপর কিছুই বাড়াতে পারবেন না। তারা দীনের মূলনীতি, আক্বীদা কিংবা শরী‘আতের মধ্যে কিছুই বাড়াতে পারবেন না। কেননা আল্লাহ তা‘আলা দীন পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং শরী‘আতকে পূর্ণতা দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম, আমার নিয়ামতকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসাবে মনোনীত করলাম। (সূরা আল মায়েদা: ৩)

রসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য যদিও দীনের এ রিসালাত পৌঁছিয়ে দেয়া এবং মানুষকে সেদিকে দাওয়াত দেয়া, তথাপিও এটি হলো উম্মতের আলেম-উলামাদেরও দায়িত্ব। সুতরাং তাদের উপর আবশ্যক হলো মানুষের কাছে দীনের এ দায়িত্ব পৌঁছিয়ে দেয়া। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে নবুওয়াত খতম না হওয়ার দাবি করবে অথবা যে ব্যক্তি কাউকে নবুওয়াতের দাবিতে সত্যায়ন করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়ে মুরতাদে পরিণত হবে।

এ জন্যই মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু বরণ করার পর যে নবুওয়াত দাবি করেছিল ছাহাবীগণ তাকে মুরতাদ বলে গণ্য করেছেন। তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং তাদেরকে মুরতাদ হিসাবে নামকরণ করেছেন। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কালের আলেমগণ তাদের মুরতাদ হওয়ার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

الحكمة في ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ করে দেয়ার হিকমাত

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত, নবুওয়াতের ধারাসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। কেননা তিনি প্রেরিত হয়েছেন ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের নিকট। যেমন আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"আর আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছি। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক জানে না"। (সূরা সাবা: ২৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

"আমি তোমাকে সৃষ্টিজগতের জন্য আমার রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি"। (সূরা আল আম্বীয়া: ১০৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾

"বরকতময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন, যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারেন"। (সূরা আল ফুরকান: ১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

"হে মুহাম্মাদ! বলো, হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল হিসাবে এসেছি"। (সূরা আল-আরাফ: ১৫৮)

সুতরাং তার রিসালাত যেহেতু সমস্ত মানুষের জন্যই, তাই তার শরী'আত পরিপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে মানুষের সমস্ত প্রয়োজন পূরণে সক্ষম। এ শরী'আত থাকতে অন্য শরী'আতের প্রয়োজন নেই এবং অন্য কোনো নাবী প্রেরণেরও দরকার নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম, আমার নিয়ামতকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসাবে মনোনীত করলাম। *(সূরা আল মায়িদা: ৩)*

আল্লাহ তা'আলা সূরা নাহালের ৮৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾

"আমি তোমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ স্বরূপ এবং মুসলিমদের পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ স্বরূপ"। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾

"এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে আমি তোমার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি"। (সূরা আল মায়িদা: ৪৮)

শাইখ আবুল আ'লা মাওদুদী কাদিয়ানীদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেছেন, আমরা যখন কুরআনে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাবো, তখন দেখতে পাবো যে, পৃথিবীর মানব জাতিসমূহের মধ্য থেকে যখন কোনো একটি গোষ্ঠির নিকট আল্লাহ তা'আলা নতুন নাবী-রসূল পাঠিয়েছেন, তখন চারটি কারণের যে কোনো একটি কারণ অবশ্যই বিদ্যমান ছিল।

(১) পূর্ব থেকে সেই মানব গোষ্ঠির নিকট কোনো রসূল ছিলেন না অথবা ইতিপূর্বে রসূল পাঠানো হয়নি কিংবা অন্য কোনো মানব গোষ্ঠির নিকট থেকে নাবী-রসূলের শিক্ষা তাদের কাছে পৌঁছেনি।

(২) ইতিপূর্বে তাদের নিকট নাবী-রসূল পাঠিয়েছেন ঠিকই; কিন্তু নাবীর শিক্ষা মিটে গিয়েছিল কিংবা লোকেরা তা ভুলে গিয়েছিল অথবা লোকেরা তাতে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করেছিল। এতে করে মানুষের পক্ষে সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে নাবীর অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না।

(৩) পূর্বে নাবী পাঠানো হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু তার শিক্ষা পরবর্তীতে আগমনকারী সমস্ত মানুষের জন্য পরিব্যাপ্ত ছিল না এবং সর্বযুগের মানুষের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট ছিল না। তাই দীনকে পরিপূর্ণ করার জন্য অতিরিক্ত নাবী-রসূল পাঠানোর প্রয়োজন ছিল।

(৪) পূর্বে নাবী পাঠানো হয়েছে ঠিকই; কিন্তু তাকে সত্যায়ন ও সমর্থন করার জন্য আরেকজন নাবী পাঠানোর প্রয়োজন ছিল।

এ চারটি কারণের প্রত্যেকটিই নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে পূরণ হয়ে গেছে। সুতরাং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী হিসাবে প্রেরণ করার পর মুসলিম জাতির জন্য অথবা পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির জন্য নতুন কোনো নাবী প্রেরণের দরকার নেই।

কেননা কুরআন নিজেই বর্ণনা করার দায়িত্ব নিয়েছে যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমগ্র মানব জাতির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে এবং সমস্ত মানুষের হেদায়াতের জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

"হে মুহাম্মাদ! বলো, হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল হিসাবে এসেছি"। *(সূরা আল-আরাফ: ১৫৮)*

বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস প্রমাণ করে যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের পর থেকে আজ পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক প্রান্তের প্রত্যেক জাতির কাছেই তার রিসালাত পৌঁছার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং নাবী-রসূল পাঠানোর প্রথম কারণ অনুপস্থিত।

কুরআনুল কারীম, হাদীছ ও সীরাতের কিতাবের ভাণ্ডারগুলো সাক্ষ্য দেয় যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তা এখনো প্রকৃত অবস্থায় রয়েছে। তাতে ভুল-ভ্রান্তি, বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। তিনি

যে কিতাব নিয়ে এসেছেন, তার মধ্যে কোনো বিকৃতি-পরিবর্তন হয়নি, তা থেকে একটি অক্ষরও কমানো হয়নি এবং একটি বাড়ানোও হয়নি। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা হওয়াও সম্ভব নয়।

সে সঙ্গে তিনি তার কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষকে যে পথ প্রদর্শন করেছেন, তার প্রভাব আজও সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি যেন আমাদের সামনেই জীবিত রয়েছেন এবং আমরাও যেন তার সামনেই আছি। সুতরাং নতুন কোনো নাবী আসার প্রয়োজন নেই। সুতরাং এর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, নতুন নাবী পাঠানোর দ্বিতীয় কারণও অনুপস্থিত।

কুরআন সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে নতুন নাবী প্রেরণের তৃতীয় কারণও অনুপস্থিত। অতঃপর মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্য ও সত্যায়ন করার জন্য যদি অন্য কোনো নাবী পাঠানোর প্রয়োজন পড়তো, তাহলে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতেই পাঠানো হতো। এর মাধ্যমে নতুন নাবী পাঠানোর চতুর্থ সম্ভাবনাও বিদূরিত হলো।

সুতরাং উপরোক্ত চারটি কারণ বিদূরিত হওয়ার পর আর কোনো খাছ কারণ থাকতে পারে কি? আবুল আলা মাওদুদী (রহিমাহুল্লাহ) এর বক্তব্য থেকে যেটুকু গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল, তা এখানেই শেষ।

كرامات الأولياء

ওলীদের কারামত

ইতিপূর্বে আমরা নাবীদের মুজিযা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাদের মুজিযার মধ্যে এবং যাদুকর, গণক, বিস্ময়কর আধুনিক আবিষ্কারের মধ্যে পার্থক্য ও তার ফলাফল-প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। এখানে ইনশা-আল্লাহ আমরা ওলীদের কারামত সম্পর্কে আলোচনা করবো। কেননা নাবীদের মুজিযা এবং ওলীদের কারামতের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সেই সঙ্গে আমরা কারামতের মাঝে এবং যাদুকর ও ভেলকিবাজদের ধোঁকাবাজির মধ্যকার পার্থক্যও আলোচনা করবো। আমরা বলবো যে, মুমিন মুত্তাকীরাই আল্লাহ তা'আলার ওলী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

"শোনো, আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই। তাদের চিন্তারও কোনো কারণ নেই। তারাই আল্লাহর বন্ধু, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে"। *(সূরা ইউনূস: ৬২-৬৩)*

সুতরাং ঈমান ও তাকওয়া অনুপাতে প্রত্যেক মুমিন মুত্তাকী আল্লাহ তা'আলার ওলী। আল্লাহ তা'আলা তার ওলীদের হাতে সাধারণ অভ্যাস বহির্ভূত যেসব ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন, সেগুলোকে কারামত বলা হয়। সুতরাং রসূলদের অনুসারীদের কারো কারো হাতে সাধারণ অভ্যাস বহির্ভূত যা কিছু ঘটান, তাই কারামত। নাবী-রসূলদের অনুসরণ করার বরকতের উসীলায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সৎ লোকদেরকে সম্মান স্বরূপ তা প্রদান করা হয়।

তবে প্রত্যেক ওলীর কারামত হাসিল হওয়া জরুরী নয়। কতিপয় ওলীর জন্যই কারামত হাসিল হয়ে থাকে। ঈমান শক্তিশালী করার জন্য অথবা কারামতের প্রতি তার প্রয়োজন থাকার কারণে কিংবা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও বিরোধীর উপর দলীল-প্রমাণ কায়েম করার জন্যই কারামত দেয়া হয়। যেসব ওলীর কারামত প্রকাশিত হয়নি, এর কারণে তাদের মর্যাদা কমে যায়নি। ঐদিকে যাদের কারামত প্রকাশিত হয়েছে, এটি প্রমাণ করে না যে তারা অন্যদের তুলনায় উত্তম।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐক্যমতে ওলীদের কারামত সত্য। কুরআনুল কারীম ও ছ্বহীহ সুন্নাত দ্বারা তা প্রমাণিত। বিদ'আতী, মু'তাযিলা, জাহমীয়া এবং তাদের অনুসারীরাই কেবল ওলীদের কারামত অস্বীকার করে। সুতরাং তারা কুরআন ও ছ্বহীহ সুন্নাত দ্বারা একটি সাব্যস্ত বিষয়কেই অস্বীকার করেছে।

কুরআনুল কারীমে আসহাবে কাহাফের ঘটনা, মারইয়াম 'আলাইহিস সালামের ঘটনাসহ আরো কিছু কারামতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। ছ্বহীহ সুন্নাত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, উসাইদ ইবনে হুযায়েরের কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করার জন্য অসংখ্য প্রদীপ আকারে মেঘ সদৃশ বস্তুর মধ্যে ফেরেশতা নামার কথা সাব্যস্ত হয়েছে এবং ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ফেরেশতাগণ সালাম দিয়েছেন। এ রকম উদাহরণ আরো অনেক রয়েছে।

ওলীদের কারামত সম্পর্কে যে আরো বেশি জানতে চায়, সে যেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এর الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان "আল্লাহর ওলী ও শয়তানের ওলীর মধ্যে পার্থক্য" নামক বইটি অধ্যয়ন করে। ওলীদের কারামত বিষয়ে মানুষের মাঝে অনেক অস্পষ্ট ধারণা এবং বিরাট বিভ্রান্তি রয়েছে। একদল লোক কারামতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে এবং সেটা সংঘটিত হওয়াকে নাকোচ করেছে। এরা হলো জাহমীয়া, মু'তাযিলা এবং তাদের অনুসারী সম্প্রদায়। তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যগুলোর বিরোধীতা করেছে এবং বাস্তব সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আরেক দল লোক কারামত সাব্যস্ত করতে গিয়ে চরম বাড়াবাড়ি করেছে। অজ্ঞ, মূর্খ এবং গোমরাহ আলেমরাই এ শ্রেণির লোকের অন্তর্ভুক্ত। তারা ফাসেক, পাপিষ্ঠ এবং এমন

লোকদের জন্য কারামত সাব্যস্ত করেছে, যারা আল্লাহর ওলী নয়; বরং শয়তানের ওলী। মিথ্যা বর্ণনা, স্বপ্ন এবং শয়তানী অবস্থার উপর নির্ভর করেই তারা তাদের জন্য কারামত সাব্যস্ত করেছে। শুধু তাই নয়; তারা যাদুকর, ভেলকিবাজ এবং ছূফী তরীকার মিথ্যুক শাইখদের জন্যও কারামত সাব্যস্ত করেছে। এমনকি মূর্খরা আল্লাহর পরিবর্তে এসব শাইখের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে তাদের ইবাদত করেছে। যাদের ব্যাপারে কারামতের সুদীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করা হয়, সৃষ্টিজগতের পরিচালনা-তদবীর ইত্যাদির মধ্যে যাদের ক্ষমতা আছে বলে ধারণা করা হয়, যাদের কাছে দু'আ করা হলে দু'আকারীদের প্রয়োজন পূরণ করা হয় বলে বিশ্বাস করা হয়, যাদের কাছে মদদ চাওয়া হলে ও ফরীয়াদ করা হলে উদ্দেশ্য হাসিল হয় বলে ধারণা করা হয়, তাদের মৃত্যুর পর তাদের কবরের উপর ভক্তরা সমাধি নির্মাণ করেছে। এদের ব্যাপারে বর্ণিত কল্পিত কারামত ও মিথ্যা বর্ণনাগুলোর কারণে মূর্খরা এদেরকে গাউছ, কুতুব, আবদাল ইত্যাদি নাম দিয়েছে।

যাদের থেকে এ কারামতগুলো প্রকাশিত হওয়ার দাবি করা হয়েছে, কারামতগুলোকে অযুহাত বানিয়ে তাদের ইবাদত করা হয়েছে। কখনো কখনো তারা ভেলকিবাজি ও যাদুকেই কারামত নাম দিয়েছে। কেননা তারা কারামত, যাদু, ভেলকিবাজি ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না এবং আল্লাহর ওলী ও শয়তানের ওলীর মধ্যে পার্থক্যও করতে জানে না। এমনকি কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের মাধ্যমে যিনি ওলী হিসাবে প্রমাণিত, তারা তার মাঝে এবং শয়তানের ওলীর মধ্যেও পার্থক্য করতে পারে না। যদিও আল্লাহর পক্ষ হতে তার হাতে কারামত প্রকাশিত হয়ে থাকে। মোটকথা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করা জায়েয নয়, ওলীর নিকট থেকে কিংবা তার কবর থেকে বরকতের আশা করা জায়েয নয়। কেননা ইবাদতের হকদার একমাত্র আল্লাহ।

فتبين بهذا أن بين كرامات الأولياء وتهريجات المشعوذين والدجالين فروقا تميز الحق من الباطل

ওলীদের কারামত, যাদুকর-ভেলকিবাজ ও মিথ্যুকদের কারসাজির মধ্যে পার্থক্য

ওলীদের কারামত এবং যাদুকর, ভেলকিবাজ ও মিথ্যুকদের ধোঁকাবাজির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার ভয় এবং সৎ আমলের মাধ্যমে কারামত অর্জিত হয়। আর যাদুকর ও ভেলকিবাজদের দ্বারা অস্বাভাবিক যা কিছু প্রকাশিত হয়, তা কুফুরী ও পাপাচারের কারণেই প্রকাশিত হয়। ওলীদের কারামতের মাধ্যমে সৎ ও তাকওয়ার কাজ

অথবা পার্থিব বৈধ কাজে সাহায্য গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ভেলকিবাজ ও মিথ্যুকদের কাজের মাধ্যমে শিরক, কুফুরী হত্যা ইত্যাদি হারাম কাজে সাহায্য নেয়া হয়।

আল্লাহর যিকির ও তাওহীদের মাধ্যমে ওলীদের কারামত শক্তিশালী হয়। কিন্তু যাদুকর ও ভেলকিবাজদের কাজ-কর্ম আল্লাহর যিকির, কুরআন তেলাওয়াত ও তাওহীদের মাধ্যমে বাতিল অথবা দুর্বল হয়ে যায়। ওলীদের কারামত এবং ভেলকিবাজ ও মিথ্যুকদের রসিকতা-কৌতুক ইত্যাদির মধ্যে এমন পার্থক্য রয়েছে, যা সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করে দেয়।

আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে, যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ওলী, তাদের হাতে আল্লাহ তা'আলা যেসব কারামত প্রকাশ করেন, তারা সেটাকে মানুষের ধন-সম্পদ চুরি ও ফাঁকিবাজির মাধ্যম বানান না এবং সেটাকে মানুষ থেকে অতিরিক্ত সম্মান আদায়ের হাতিয়ারও বানান না; বরং কারামত কেবল তাদের বিনয়, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং তার ইবাদতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে। ভেলকিবাজ ও মিথ্যুকদের কথা ভিন্ন। তাদের হাতে যেসব শয়তানী অবস্থা প্রকাশ পায়, সেটার মাধ্যমে তারা মানুষকে নিজেদের দিকে টেনে আনে, তাদের নৈকট্য অর্জনের প্রতি উৎসাহ দেয় এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের ইবাদত করারও আহবান জানায়। প্রত্যেক ভণ্ড ওলী নির্দিষ্ট তরীকা তৈরী করে নিয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের নামে একটি করে জামা'আত রয়েছে। যেমন শাযেলী তরীকা, রেফাঈ তরীকা, নকশবন্দী তরীকা এবং অনুরূপ আরো অনেক ছূফী তরীকা রয়েছে।

মোটকথা, কারামতের ব্যাপারে লোকেরা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়েছে। এক শ্রেণির লোক কারামত অস্বীকার করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত মুত্তাকী ওলীদের জন্য কুরআনুল কারীম ও ছ্বহীহ সুন্নাত দ্বারা সুসাব্যস্ত কারামতগুলোকে অস্বীকার করেছে। আরেক শ্রেণির লোক কারামত সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে এবং যাদু, ভেলকিবাজি এবং মিথ্যাচারকে কারামতের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এগুলোকে তারা শিরকের মাধ্যম বানিয়েছে এবং এগুলোর জীবিত ও মৃত উদ্ভাবনকারীদের ব্যাপারে নিকৃষ্ট আক্বীদা পোষণ করেছে। এ থেকে শুরু হয়েছে বড় শিরক, কবর পূজা, ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় বাড়াবাড়ি। কেননা লোকেরা তাদের থেকে কারামত ও অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার ধারণা করেছে।

আর তৃতীয় শ্রেণি হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। তারা কারামত সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে। তারা এ বিষয়ে কড়াকড়ি অবলম্বন করেনি এবং শৈথিল্য প্রদর্শন করেনি। তারা কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত কারামতগুলোতে বিশ্বাস করেছে এবং যাদের হাতে এগুলো প্রকাশিত হয়েছে, তাদের প্রশংসায় তারা বাড়াবাড়ি করেনি ও আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে এদের উপর নির্ভরও করেনি। কেননা কারামতহীন এমন ওলী রয়েছেন, যারা কারামতপ্রাপ্ত ওলীদের চেয়ে উত্তম। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কারামতের নামে কুরআনুল কারীম ও ছ্বহীহ সুন্নাহ বিরোধী

ভেলকিবাজি, ধোঁকাবাজি, ফাঁকিবাজির প্রতিবাদ করেন। তারা মনে করেন এগুলো শয়তানের কাজ; ওলীদের কারামত নয়।

সত্য প্রকাশিত হওয়া এবং বাতিল সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"বস্তুত যা ঘটার ছিল তা সম্পন্ন করার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করলেন। যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে জীবিত থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ"। (সূরা আল আনফাল: ৪২)

الأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر

পঞ্চম মূলনীতি: শেষ দিবসের প্রতি ঈমান

ঈমানের পঞ্চম মূলনীতি সম্পর্কিত আলোচনায় একাধিক অনুচ্ছেদ রয়েছে।

المبحث الأول: الإيمان بأشراط الساعة

প্রথম অনুচ্ছেদ: ক্বিয়ামতের আলামতসমূহের প্রতি ঈমান।

শেষ দিবস উপস্থিত হওয়ার পূর্বে যেহেতু অনেক আলামত প্রকাশিত হয়ে তা নিকটবর্তী হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করবে এবং সেগুলোকে যেহেতু ক্বিয়ামতের আলামত হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে, তাই উক্ত আলামতসমূহ থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় আলামত এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। কেননা ক্বিয়ামতের আলামতসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। এ বিষয়টির সাথে আক্বীদার গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ "ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে"। (সূরা কামার: ১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ﴾

"তারা কি শুধু এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, ক্বিয়ামত তাদের নিকট হঠাৎ এসে পড়ুক? ক্বিয়ামতের আলামতসমূহ তো এসেই পড়েছে। অতঃপর ক্বিয়ামত এসে পড়লে উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?"। (সূরা মুহাম্মাদ: ১৮) أشراط অর্থ নিদর্শন ও লক্ষণসমূহ। এর একবচন হলো شرط 'রা' বর্ণে যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে আলামত বা নিদর্শন।

ইমাম বগবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করা ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ "তুমি জানো কি সম্ভবত ক্বিয়ামত আসন্ন?" (সূরা আশ শূরা ৪২:১৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

"তারা তো তাদের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ ক্বিয়ামত আসার অপেক্ষা করছে"। (সূরা যুখরুফ: ৬৬) ক্বিয়ামতের দিন যেহেতু অতি নিকটে এবং তা যেহেতু নিশ্চয়ই সংঘটিত হবে, তাই ঐদিনকে আল্লাহ তা'আলা আগামীকাল বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾

"প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে?"। (সূরা আল হাশর: ১৮) আজকের দিনের পরের দিনকে غد আগামীকাল বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾

"তারা সেটিকে অনেক দূরে মনে করছে। কিন্তু আমি দেখছি তা অতি নিকটে"। (সূরা মা'আরেজ: ৬-৭)। ইমাম তিরমিযী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেন যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَأشار بالسَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى»

"আমি এবং ক্বিয়ামত এক সাথে প্রেরিত হয়েছি। একথা বলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের শাহাদাত আঙ্গুল এবং মধ্যমা আঙ্গুলকে একত্রিত করে দেখালেন"।[১২৫]

ছ্বহীহ বুখারী (৫৫৭) ও মুসলিমে ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَن مضى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ من صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ»

"পূর্বের জাতিসমূহের তুলনায় দুনিয়াতে তোমাদের অবস্থানের মেয়াদ হল আসরের ছ্বলাতের সময় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত"। অন্য বর্ণনায় এসেছে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ»

"পূর্বের জাতিসমূহের তুলনায় দুনিয়াতে তোমাদের অবস্থানের মেয়াদ হল আসরের ছ্বলাতের সময় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত"। উভয় বর্ণনার মধ্যে কেবল শব্দগত পার্থক্য রয়েছে।

ক্বিয়ামতের বিষয়টি যেহেতু খুবই ভয়াবহ, তাই এ ব্যাপারে অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ জন্যই নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়ামতের আলামত এবং সেটার লক্ষণগুলো খুব বেশি বর্ণনা করেছেন। ক্বিয়ামতের আগে

[১২৫] ছ্বহীহ মুসলিম ২৯৫১, অধ্যায়: ক্বিয়ামতের আলামত, বুখারী ৪৯৩৬, ইবনে মাজাহ ৪৫।

যেসব ফিতনার আবির্ভাব হবে তিনি তাও বলেছেন। উম্মতকে তিনি এ বিষয়ে সতর্ক ও সাবধান করেছেন, যাতে তারা এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

তবে ক্বিয়ামত আসার সময়কাল কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন। বান্দাদের কল্যাণার্থেই তিনি এর সময়কে তাদের থেকে গোপন রেখেছেন। ক্বিয়ামত দিবসের ভয়াবহ বিপদ থেকে বাঁচার জন্য বান্দারা যেন সবসময় প্রস্তুত থাকে, তাই তিনি এর আগমনকাল গোপন রেখেছেন। অনুরূপ তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ও আড়াল করে রেখেছেন, যাতে করে সে সবসময় মৃত্যুর জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুত থাকে এবং ইহধামের মায়া-মমতা ছেড়ে পরপারের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে অধির আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে ও সেজন্য প্রয়োজনীয় আমলও করতে থাকে।

আল্লামা সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জেনে রাখা আবশ্যক যে, ক্বিয়ামতের আলামত ও লক্ষণসমূহ তিন প্রকার। এক প্রকার আলামত প্রকাশিত হওয়ার পর অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আরেক শ্রেণির আলামত প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি; বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর তৃতীয় শ্রেণির বড় আলামতগুলো বের হওয়ার পর ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। পুতির মালার সুতা ছিড়ে গেলে যেমন সবগুলো পুতি একের পর এক পর্যায়ক্রমে পড়ে যায়, ঠিক তেমনি বড় আলামতসমূহ থেকে একটি বের হয়ে গেলে পর্যায়ক্রমে সবগুলোই প্রকাশিত হবে।

প্রথমত: ক্বিয়ামতের যেসব আলামত প্রকাশিত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তার মধ্যে রয়েছে নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন, তার মৃত্যুবরণ, বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় এবং আমীরুল মুমিনীন উছমান ইবনে আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যাকাণ্ড অন্যতম। হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যার মাধ্যমেই ফিতনার সূচনা হয়েছে।

আল্লামা সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যার পর সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিভিন্ন ফির্কা যেমন খারেজী, রাফেযী ইত্যাদি বাতিল ফির্কার আবির্ভাব হয়। অতঃপর শাইখ সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ক্বিয়ামতের আরো যেসব আলামত রয়েছে, তার মধ্যে মিথ্যুক দাজ্জালদের আগমন। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নাবী বলে দাবি করবে। আরবদের রাজত্ব চলে যাওয়াও ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ধন-সম্পদ বেড়ে যাওয়া ক্বিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে গণ্য। ইমাম বুখারী এবং অন্যান্য ইমামগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ক্বিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে আরো রয়েছে যে, ক্বিয়ামতের আগে অনেক ভূমিকম্প হবে, ভূমিধস হবে, চেহারা পরিবর্তনের শাস্তি হবে এবং উপরে উঠিয়ে নিক্ষেপ করার শাস্তিও হবে। এমনি আরো অনেক আলামত সম্পর্কে নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, যা প্রকাশিত হয়েছে এবং অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত: ক্বিয়ামতের মধ্যম পর্যায়ের কিছু আলামত রয়েছে। এগুলো বের হয়েছে; কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। বরং এগুলো দিন দিন বেড়েই চলেছে। এগুলোর সংখ্যা প্রচুর।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ»

“নিকৃষ্ট লোকের নিকৃষ্ট সন্তানরা দুনিয়ার সম্পদ লাভে সর্বাধিক ধন্য না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না”।[১২৬]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইমাম তিরমিযী এবং যিয়া আল-মাকদেসী (রহিমাহুমুল্লাহ) হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। لكع অর্থ হলো ক্রিতদাস, বোকা এবং নিকৃষ্ট লোক। হাদীছের অর্থ হলো নিকৃষ্ট, অভদ্র, বোকা এবং তাদের অনুরূপ লোকেরা মানুষের নেতা না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না। ক্বিয়ামতের আরো আলামত যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ»

“মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে, যখন জ্বলন্ত আগুনের স্ফুলিঙ্গ হাতের মুষ্ঠির মধ্যে রাখার মতই দীন নিয়ে টিকে থাকা কঠিন হবে”।[১২৭] ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ»

“যতদিন লোকেরা মাসজিদ নিয়ে গর্ব না করবে ততদিন ক্বিয়ামত হবে না”।[১২৮] ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান এবং ইবনে মাজাহ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, আখিরী যামানায় মূর্খ আবেদ-ইবাদতকারী এবং ফাসেকদের আবির্ভাব হবে”। আবু নুআইম এবং হাকেম আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে, চাঁদ উঠার সময় বলা হবে, এটি দুই রাতের চাঁদ। চাঁদ খুব মোটা হয়ে উঠার কারণেই এমন কথা বলা হবে। এ অর্থে ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম তাবারানী একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

[১২৬] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২২০৯।

[১২৭] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২২৬০।

[১২৮] মুসনাদে আহমাদ। ইমাম আলবানী ছ্বহীহ বলেছেন, ছ্বহীহুল জামে, হা/৭২৯৮।

সাল্লাম বলেন, "ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত হচ্ছে, চন্দ্র মোটা হয়ে উদিত হবে"।[১২৯] মাসজিদকে সচরাচর যাতায়াতের রাস্তা বানানোও ক্বিয়ামতের একটি আলামত।

ইমাম সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, ছ্বহীহ বুখারী এবং অন্যান্য কিতাবে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, আমি তোমাদেরকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি হাদীছ শুনাবো। আমি ব্যতীত তোমাদেরকে অন্য কেউ তা শুনাবে না। আমি রসূল তাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

«إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكثر الْجَهْلُ ويكثر الزنى وَيكثر شْرب الْخَمْرُ ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين إمرأة القيم الواحد»

"নিশ্চয় ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করবে, যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে, মদ্যপান ছড়িয়ে পড়বে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে, মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি পঞ্চাশজন মহিলার দেখা-শুনা করার জন্য মাত্র একজন পুরুষ বিদ্যমান থাকবে"।[১৩০]

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক মজলিসে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় একজন গ্রাম্য লোক এসে নাবীজীকে এই বলে প্রশ্ন করলো যে, ক্বিয়ামত কখন হবে? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা চালিয়ে যেতে থাকলেন। কিছু লোক মন্তব্য করলো, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটির প্রশ্নকে অপছন্দ করেছেন। আবার কিছু লোক বললো, তিনি তার কথা শুনতে পাননি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচনা শেষে বললেন, প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বললো, এ তো আমি। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»

"যখন আমানতের খেয়ানত হবে তখন ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে বলে মনে করবে। লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, কীভাবে আমানতের খেয়ানত করা হবে? নাবীজী বললেন, যখন অযোগ্য লোকদেরকে দায়িত্ব দেয়া হবে তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করতে থাকো"।[১৩১]

তৃতীয়তঃ ক্বিয়ামতের বেশ কিছু বড় বড় আলামত রয়েছে। এসব বড় বড় আলামত প্রকাশিত হওয়ার পরপরই ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। এগুলো হচ্ছে, মাহদীর আত্মপ্রকাশ,

---

[১২৯] তাবরানী। ইমাম আলবানী হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন, ছ্বহীহুল জামে আস্ সাগীর, হা/৫৭৭৪।

[১৩০] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫২৩১, অধ্যায়: কিতাবুল ইলম, মুসনাদে আহমাদ।

[১৩১] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৪৯৬, অধ্যায়: কিতাবুর রিকাক, মুসনাদে আহমাদ।

দাজ্জালের আগমন, ঈসা ইবনে মারইয়াম 'আলাইহিস সালামের অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন, কাবাঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া, বিশাল আকারের ধোঁয়ার আগমন, কুরআন উঠে যাওয়া, পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়া, যমীন থেকে দাব্বাতুল আরয নামক একটি অদ্ভুত প্রাণী বের হওয়া এবং আদনের গর্ত থেকে বিশাল আকারের আগুন বের হওয়া। অতঃপর শিঙ্গায় তিনবার ফুঁ দেয়া হবে। প্রথমবার ফুঁ দেয়ার সময় সমস্ত মানুষ ঘাবড়ে যাবে, দ্বিতীয়বার ফুঁ দেয়ার সময় মানুষ অচেতন ও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যাবে এবং সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে, তৃতীয়বার ফুঁ দেয়ার সময় পুনরুত্থান ও হাশর-নাসর সংঘটিত হবে।

মোটকথা ক্বিয়ামতের বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ। অথচ আমরা গাফেল হয়ে আছি। ক্বিয়ামতের অনেক আলামত বের হয়ে গেছে। আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদেরকে দীনের উপর অটল রাখেন, ইসলামের উপর মৃত্যু দান করেন এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত ফিতনা থেকে হেফাযত করেন।

এ আলামতগুলো আমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য যেসব বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন, তা তিনি যেভাবে সংবাদ দিয়েছেন, হুবহু সেভাবেই সংঘটিত হয়েছে। এগুলো বান্দার ঈমান মজবুত করে।

এসব আলামত সম্পর্কে সংবাদ দেয়া বান্দাদের জন্য রহমত স্বরূপ। যাতে তারা সতর্ক হয়, প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং তাদের দীনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণার উপর থাকতে পারে। সুতরাং সেই সম্মানিত নাবীর প্রতি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, যিনি সুস্পষ্টভাবে মানুষের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং পূর্ণভাবে তার বিবরণ দিয়েছেন। আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানকারী।

এসব আলামতের মধ্যে সর্বপ্রথম আলামত হলো মাহদীর আত্মপ্রকাশ, অতঃপর দাজ্জালের আগমন অতঃপর ঈসা 'আলাইহিস সালামের আগমন। অতঃপর বাকি বড় আলামতগুলো ধারাবাহিকভাবে একের পর এক প্রকাশিত হবে।

١- ظهور المهدي

১. ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ

ইতিপূর্বে আমরা ক্বিয়ামতের বড় আলামতগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এখন আমরা সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা করবো। এগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হলো মাহদীর আত্মপ্রকাশ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "ততদিন দুনিয়া ধ্বংস হবে

না যতদিন না আমার পরিবারের একজন লোক আরবদের বাদশা হবেন। তার নাম হবে আমার নাম এবং তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নাম”।[১৩২] অর্থাৎ তার নাম হবে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ। ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ এবং তিরমিযী (রহিমাহুমুল্লাহু) ছ্বহীহ সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহু) বলেন, হাদীছটি হাসান-ছ্বহীহ। এ বিষয়ে আলী, আবু সাঈদ, উম্মে সালামা এবং আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে হাদীছ রয়েছে।

আল্লামা সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহু) বলেন, মাহদীর ব্যাপারে অনেক হাদীছ ও আছার রয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহু) বলেন, যেসব হাদীছ দ্বারা মাহদীর আগমনের উপর দলীল গ্রহণ করা হয়, তা ছ্বহীহ। ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ এবং অন্যান্য ইমামগণ এসব হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

মাহদীর নাম হলো মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ। আখিরী যামানায় যখন পৃথিবী যুলুমে ভরপুর হয়ে যাবে, তখন তিনি হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালেবের বংশধর থেকে বের হবেন এবং ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ করে দিবেন।

আল্লামা সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহু) আরো বলেন, মাহদীর ব্যাপারে অনেক কথা বর্ণিত হয়েছে। এমন কি এ কথাও বলা হয়েছে যে, لامهدي إلا عيسى “ঈসা ব্যতীত আর কোনো মাহদী নেই”। অর্থাৎ ঈসা ‘আলাইহিস সালাম আসবেন; মাহদী নন। তবে আহলে হকদের মতে, সঠিক কথা হলো মাহদী ঈসা নন। মাহদী আসবেন ঈসা ‘আলাইহিস সালাম আসার আগে। মাহদী সম্পর্কে এত বেশি হাদীছ এসেছে যে, তা অর্থগত মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আহলে সুন্নাতের আলেমদের নিকট মাহদী সংক্রান্ত হাদীছগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে তা আক্বীদার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

আমি বলছি, মাহদীর ব্যাপারে দু’টি সম্প্রদায় পরস্পর বিপরীতমুখী কথা বলেছে এবং আরেকটি পক্ষ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। কুরআন ও হাদীছের উক্তি এবং আলেম-উলামাদের বক্তব্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ সাম্প্রতিক কালের কিছু লেখক মাহদীর আগমন সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে। এ ব্যাপারে নিজেদের মতো ও বিবেক বুদ্ধির উপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো দলীল নেই।

কিছু গোমরাহ সম্প্রদায় মাহদীর ব্যাপারে খুব বাড়াবাড়ি করেছে। এমনকি প্রত্যেক গোমরাহ সম্প্রদায় নিজেদের নেতাকে প্রতীক্ষিত মাহদী মনে করেছে। রাফেযীরা দাবি করে যে, তাদের প্রতীক্ষিত ইমামই মাহদী। তারা সামেরার গর্ত থেকে তাদের প্রতীক্ষিত ইমাম বের হবে বলে অপেক্ষা করছে। তারা তার নাম দিয়েছে মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আল-আসকারী। তাদের মতে তিনি পাঁচশত বছর পূর্বে শিশুকালে সামেরার গর্তে প্রবেশ করেছেন। তারা তাদের ইমাম বের হওয়ার অপেক্ষা করছে।

শিয়াদের ফাতেমীয় সম্প্রদায় দাবি করে যে, তাদের নেতাই হবেন মাহদী। এভাবে যে

---

[১৩২] মুসনাদে আহমাদ, ছ্বহীহুল জামে আস্‌সাগীর, হা/৫১৮০।

কেউ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করা, বিজয়ী হওয়া এবং তাদেরকে ধোঁকা দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে, সে নিজেকে প্রতীক্ষিত মাহদী বলে দাবি করেছে। অনুরূপ ছূফীদের যে কেউ মিথ্যাচার ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে, সে নিজেকে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত সাইয়্যেদ বা আওলাদে রসূল বলে দাবি করেছে।

আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মাহদীর ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তারা ছ্বহীহ হাদীছ মোতাবেক মাহদীর আগমন সাব্যস্ত করেন। ছ্বহীহ হাদীছে তার নাম, পিতার নাম, বংশ, গুণাবলি ও তার বের হওয়ার সময়ের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে সে অনুপাতে তারা মাহদীর আগমনে বিশ্বাসী। তারা এ ব্যাপারে ছ্বহীহ হাদীছের সীমালঙ্ঘন করেন না। তার বের হওয়ার পূর্বে অনেক আলামত দেখা দিবে, যা আলেমগণ তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, মাহদীর ব্যাপারে অনেক কথা বর্ণিত হয়েছে। এমন কি এ কথাও বলা হয়েছে যে, لامهدي إلا عيسى "ঈসা ব্যতীত আর কোনো মাহদী নেই"। অর্থাৎ ঈসা 'আলাইহিস সালাম আসবেন; মাহদী নন। তবে আহলে হকদের মতে, সঠিক কথা হলো মাহদী ঈসা নন। মাহদী আসবেন ঈসা 'আলাইহিস সালাম নামার আগে। মাহদী সম্পর্কে এত বেশি হাদীছ এসেছে যে, তা অর্থগত মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আহলে সুন্নাতের আলেমদের নিকট মাহদী সংক্রান্ত হাদীছগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে তা আক্বীদার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ছাহাবীদের নাম উল্লেখসহ এবং তাদের নাম উল্লেখ ছাড়া মাহদীর ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এবং ছাহাবীদের পরে তাবেঈদের থেকেও অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বারা অকাট্য ইলম অর্জিত হয়। সুতরাং মাহদীর আগমনের উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। আলেমদের নিকট এটি একটি সুসাব্যস্ত বিষয় এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার কিতাবগুলোতে এটি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

অতঃপর ইমাম সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) মাহদীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন, আলেমগণ বলেছেন, তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক আমল করবেন। এমনকি কোনো স্থান দিয়ে অতিক্রম করার সময় যদি ঘুমন্ত ও জাগ্রত উভয় শ্রেণির লোক দেখতে পান, সে ক্ষেত্রেও তিনি সুন্নাতের অনুসরণ করবেন। অর্থাৎ জাগ্রতদেরকে সালাম দিয়ে চলে যাবেন, কিন্তু ঘুমন্তদেরকে জাগাবেন না। তিনি সুন্নাত প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করবেন, প্রতিটি সুন্নাত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন এবং সমস্ত বিদ'আতের মূলোৎপাটন করবেন। আখিরী যামানায় তিনি নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায় দীন প্রতিষ্ঠা করবেন। খ্রিষ্টানদের ক্রুশ চিহ্ন ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন সুদৃঢ় করবেন এবং পৃথিবী যেভাবে যুলুম-নির্যাতনে ভরে গেছে, সেভাবেই ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা ভরপুর করে দিবেন।

ইমাম সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামের পরিবার থেকে সুপথ প্রাপ্ত একজন পুরুষ বের হবেন। তার চরিত্র হবে উত্তম। তিনি কন্‌স্টানটিনোপ্‌ল জয় করবেন। তিনি হবেন উম্মতে মুহাম্মাদীর সর্বশেষ আমীর। তার যামানাতেই দাজ্জাল বের হবে এবং ঈসা 'আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন।

তিনি আরো বলেন, আল্লামা শাইখ মারঈ (রহিমাহুল্লাহ) তার فوائد الفكر নামক কিতাবে আবুল হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ মোস্তফা ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মাহদীর আগমন সম্পর্কে প্রচুর হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এবং সেটার বর্ণনাকরীগণ খুব প্রসিদ্ধ। তিনি হবেন রসূলের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তিনি সাতবছর রাজত্ব করবেন এবং পৃথিবীকে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা ভরপুর করে দিবেন। তার জীবদ্দশাতেই ঈসা 'আলাইহিস সালাম আগমন করবেন এবং ফিলিস্তীনের যমীনে লুদ্দের ফটকের সামনে দাজ্জালকে হত্যা করার কাজে তাকে সাহায্য করবেন। তিনি এ উম্মতের ইমামতি করবেন এবং ঈসা 'আলাইহিস সালাম তার পিছনেই মুক্তাদী হয়ে ছ্বলাত পড়বেন। অর্থাৎ মাত্র এক ওয়াক্ত ছ্বলাত পড়বেন। সেটি হলো ফজরের ছ্বলাত ।

তিনি হলেন মাহদী। নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন, তার সুস্পষ্ট গুণাবলি বর্ণনা করেছেন, তার বের হওয়ার সময় বলে দিয়েছেন এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। মাহদী আসার আগেই একদল গোমরাহ লোক নিজেদেরকে মাহদী বলে দাবি করেছে। মাহদীর বিশেষণ তাদের মধ্যে মোটেই পাওয়া যায়নি। এর মাধ্যমে তারা সরল প্রাণ মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে এবং মাহদীয়াতের দাবি করে নিজেদের লোভ-লালসা বাস্তবায়নের পায়তারা করেছে। আল্লাহ তা'আলা এই মিথ্যুকদের মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মুক্ত করেছেন এবং তাদের বাতিলকে মানুষের সামনে সুস্পষ্ট করে দেখিয়েছেন।

হে পাঠক সম্প্রদায়! আপনারা আশ্চর্যবোধ করবেন না! একদল লোক নবুওয়াত দাবি করেছে। তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾

"আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটায় অথবা বলে আমার কাছে ওহী এসেছে অথচ তার উপর কোনো ওহী নাযিল করা হয়নি"। (সূরা আল আনআম: ৯৩)

আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদের সামনে সত্যকে সত্য হিসাবে উদ্ভাসিত করেন এবং সেটার অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন। সেই সঙ্গে বাতিলকেও যেন আমাদের সামনে বাতিল হিসাবে সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করেন এবং আমাদেরকে সেটা থেকে দূরে রাখেন। একই সঙ্গে আমাদেরকে যেন পথভ্রষ্ট ইমাম এবং প্রতারক-মিথ্যুকদের অনিষ্ট থেকে হেফাযত করেন। আমরা আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা করছি।

২- خروج الدجال

২. দাজ্জালের আগমন

সে হলো মাসীহ দাজ্জাল, ফিতনাবাজ, মিথ্যুক এবং গোমরাহ। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তার ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। প্রত্যেক নাবীই নিজ নিজ সম্প্রদায়কে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন, তার ফিতনা থেকে সতর্ক করেছেন এবং তার স্বভাব-চরিত্র বর্ণনা করেছেন। আমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে সবচেয়ে বেশী সতর্ক করেছেন। তিনি তার উম্মতের জন্য দাজ্জালের বৈশিষ্ট্যগুলো এত খোলাসা করে বর্ণনা করেছেন যে, বিবেকবান লোকদের কাছে তা মোটেই অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। সুনানে তিরমিযীর হাদীছে আছে, সে খোরাসান থেকে বের হবে। ছ্বহীহ মুসলিমে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইয়াহূদী দাজ্জালের অনুসরণ করবে। তাদের সবার পরনে থাকবে তায়ালেসা বা সেলাই বিহীন চাদর"।[১৩৩]

দাজ্জালকে المسيح বলার কারণ হলো, তার এক চোখ অন্ধ থাকবে। কেউ কেউ বলেছেন, সে যেহেতু মক্কা ও মদীনা ব্যতীত সমগ্র ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করবে, তাই তার নাম দেয়া হয়েছে মাসীহ বা ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রমণকারী। আর الدجال শব্দটি الدجل থেকে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো, الخلط বিভ্রান্তিতে নিপতিত করা, ধোঁকাবাজি করা। কেউ যখন বিভ্রান্তিতে ফেলে এবং ধোঁকাবাজি করে তখন বলা হয়, خَلَطَ وَمَوَّهَ বিভ্রান্তিতে ফেলেছে ও ধোঁকা দিয়েছে। دجال শব্দটি فَعَّال এর ওজনে আধিক্য বাচক বিশেষ্য। তার থেকে যেহেতু প্রচুর পরিমাণ মিথ্যাচার ও ধোঁকাবাজি প্রকাশিত হবে, তাই তাকে দাজ্জাল বলা হয়। মাহদীর জীবদ্দশাতেই সে বের হবে।

হাফেয ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অতঃপর আখিরী যামানায় দাজ্জালকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। প্রথমত সে প্রভাবশালী বাদশাহর বেশে প্রকাশিত হবে। অতঃপর সে নবুওয়াত দাবি করবে। অতঃপর রুবূবীয়াত দাবি করবে। বনী আদমের অজ্ঞ, মূর্খ এবং ইতর শ্রেণি ও সাধারণ লোকেরা তার অনুসরণ করবে। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে হেদায়াতের পথে রাখবেন, তারা তার প্রতিবাদ করবেন। সে এক এক করে দেশ, ঘাটি, অঞ্চল ও গ্রাম দখল করতে থাকবে। সে তার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীসহ মক্কা ও মদীনা ব্যতীত সবদেশেই প্রবেশ করবে।

---

[১৩৩] মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান।

ছাহাবীগণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন দাজ্জাল পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করবে? উত্তরে তিনি বলেছেন, সে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। প্রথম দিনটি হবে এক বছরের মতো লম্বা। দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের মতো। তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের মতো। আর বাকী দিনগুলো দুনিয়ার স্বাভাবিক দিনের মতই হবে। সে গড়ে একবছর আড়াই মাস অবস্থান করবে। আমরা বললাম, যে দিনটি এক বছরের মত দীর্ঘ হবে সে দিন কি এক দিনের ছ্বলাতই যথেষ্ট হবে? উত্তরে তিনি বললেন, না; বরং তোমরা অনুমান করে সময় নির্ধারণ করে ছ্বলাত পড়বে।[১৩৪]

আল্লাহ তা‘আলা দাজ্জালের হাতে অনেক অস্বাভাবিক জিনিস সৃষ্টি করবেন। এর মাধ্যমে তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করবেন। মুমিনগণ এগুলো দেখেও ঈমানের উপর অটল থাকবেন। তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বৃদ্ধি পাবে এবং হেদায়াতের সাথে আরো হিদায়াত বৃদ্ধি পাবে। হেদায়াতের প্রদীপ ঈসা ইবনে মারইয়াম ‘আলাইহিস সালাম এ গোমরাহ মিথ্যুক ধোঁকাবাজের জীবদ্দশাতেই বের হবেন। মুমিনগণ ঈসা ইবনে মারইয়ামের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হবেন। আল্লাহর মুত্তাকী বান্দারা তার সাথে যোগদান করবেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে দাজ্জালের উদ্দেশ্যে বের হবেন। দাজ্জাল তখন বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে যেতে থাকবে। তাকে দেখে দাজ্জাল পালানোর চেষ্টা করবে। অতঃপর ঈসা ‘আলাইহিস সালাম লুদ্দ শহরের ফটকের নিকট তার সাক্ষাত পাবেন। দাজ্জাল যখন লুদ্দ শহরে প্রবেশ করতে চাইবে তখন ঈসা ‘আলাইহিস সালাম বর্শার আঘাতে তাকে হত্যা করবেন। তিনি তখন দাজ্জালকে লক্ষ্য করে বলবেন, আমি তোমাকে একটি আঘাত করবো, যা থেকে তুমি কখনো পালাতে পারবে না। ঈসা ‘আলাইহিস সালামের সামনে পড়ার সাথে সাথে সে পানিতে লবণ গলার মতই গলতে থাকবে। তারপরও তিনি অগ্রসর হয়ে লুদ্দ শহরের গেইটের নিকট যুদ্ধের বর্শা দিয়ে তাকে একটি আঘাতের মাধ্যমে হত্যা করবেন। সেখানেই সে মারা যাবে। এভাবেই দাজ্জালের পরিসমাপ্তির কথা একাধিক ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তার উপর আল্লাহর লা‘নত বর্ষিত হোক। ছ্বহীহ হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক ইমাম ইবনে কাছীরের বর্ণনায় সংক্ষিপ্তভাবে এখানেই দাজ্জালের কাহিনী শেষ হলো। এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি খুবই উপকারী।

দাজ্জাল ও তার ফিতনা সম্পর্কিত হাদীছগুলো প্রমাণ করে যে, যারা দাজ্জালের আহবানে সাড়া দিবে, সে তাদের জন্য আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে বলার সাথে আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করবে, যমীনকে ফল ও ফসল উৎপন্ন করার আদেশ দেয়ার সাথে সাথে যমীন তা উৎপন্ন করবে। তা থেকে তারা ও তাদের পশু-পাখিগুলো আহার করবে। এতে করে তাদের পশুপাল মোটা-তাজা ও প্রচুর দুধ ওয়ালা হয়ে যাবে।

আর যারা তার আহবানে সাড়া দিবে না; বরং তার প্রতিবাদ করবে, তারা দুর্ভিক্ষ, ফসলহানি, অনাবৃষ্টি, ধন-সম্পদের কমতি, চতুষ্পদ জন্তুর প্রাণহানি, জান-মাল ও ফলফলাদির ঘাটতিসহ আরো অনেক বিপদাপদে নিপতিত হবে। আর দাজ্জালের পিছনে

[১৩৪] মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান।

ভূগর্ভস্থ গুপ্তধন মৌমাছির ন্যায় ছুটে চলবে। সে একজন মুমিন যুবককে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে।[১৩৫] এসবগুলোই ফিতনা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আখিরী যামানায় তার মুমিন বান্দাদেরকে পরীক্ষা করবেন। এর মাধ্যমে অনেকেই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হবে।

দাজ্জালের মাধ্যমে এত কিছু প্রকাশিত হওয়ার পরও সে হবে আল্লাহর নিকট খুব তুচ্ছ, সুস্পষ্ট ত্রুটিযুক্ত। তার থেকে পাপাচার ও যুলুম প্রকাশিত হবে। যদিও তার সাথে অনেক অস্বাভাবিক ও অসাধারণ জিনিস থাকবে। তার দুই চোখের মাঝখানে কাফের লেখা থাকবে। তার হাতে যা কিছু ঘটবে তা কেবল আল্লাহর পক্ষ হতে তার বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই। এটি একটি বিরাট পরীক্ষা। ঈমানদার ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারীরাই এ থেকে রেহাই পাবে। তার ভয়ানক ক্ষতি ও ফিতনার কারণেই সমস্ত নাবী নিজ নিজ উম্মতকে সতর্ক করেছেন। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতকে সবচেয়ে বেশি সতর্ক করেছেন।

আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, নূহ 'আলাইহিস সালামের পরে যত নাবী আগমন করেছেন, তাদের সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়কে দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে

---

[১৩৫] নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দাজ্জাল বের হয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হবে। যেহেতু মদীনায় দাজ্জালের প্রবেশ নিষেধ তাই সে মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানে অবস্থান করবে। তার কাছে একজন মুমিন লোক গমন করবেন। তিনি হবেন ঐ যামানার সর্বোত্তম মু'মিন। দাজ্জালকে দেখে তিনি বলবেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সে দাজ্জাল যার সম্পর্কে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সাবধান করেছেন। তখন দাজ্জাল উপস্থিত মানুষকে লক্ষ্য করে বলবে, আমি যদি একে হত্যা করে জীবিত করতে পারি তাহলে কি তোমরা আমার ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করবে? লোকেরা বলবে, না। অতঃপর সে উক্ত মুমিনকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। এ পর্যায়ে যুবকটি বলবে, আল্লাহর শপথ! তুমি যে মিথ্যুক দাজ্জাল- এ সম্পর্কে আমার বিশ্বাস আগের তুলনায় আরো মজবুত হলো। দাজ্জাল তাকে দ্বিতীয়বার হত্যা করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না।

ছ্বহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে উক্ত যুবক দাজ্জালকে দেখে বলবে, হে লোক সকল! এটি সে দাজ্জাল যা থেকে নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সাবধান করেছেন। অতঃপর দাজ্জাল তার অনুসারীদেরকে বলবে, একে ধর এবং প্রহার কর। তাকে মেরে-পিটিয়ে যখম করা হবে। অতঃপর দাজ্জাল তাকে জিজ্ঞাসা করবে এখনও কি আমার প্রতি ঈমান আনবে না? নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, উক্ত যুবক বলবেন, তুমি মিথ্যাবাদী দাজ্জাল। তারপর দাজ্জালের আদেশে তার মাথায় করাত লাগিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। দাজ্জাল দু'খণ্ডের মাঝ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করবে। অতঃপর বলবে: উঠে দাঁড়াও। তিনি উঠে দাঁড়াবেন। দাজ্জাল বলবে এখনও ঈমান আনবে না? তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যুক দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে এখন আমার বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। অতঃপর তিনি বলবেন, হে লোক সকল! আমার পরে আর কারো সাথে এরূপ করতে পারবে না। অতঃপর দাজ্জাল তাকে পাকড়াও করে আবার যবেহ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার গলায় যবেহ করার স্থানটি তামায় পরিণত হয়ে যাবে। কাজেই সে যবেহ করতে ব্যর্থ হবে। অতঃপর তার হাতে-পায়ে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। লোকেরা মনে করবে তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অথচ সে জান্নাতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এই ব্যক্তি হবে পৃথিবীতে সেদিন সবচেয়ে মহা সত্যের সাক্ষ্য দানকারী"।

সতর্ক করেছেন। আর আমিও তার থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। ইমাম আবু দাউদ, আহমাদ ও তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

প্রত্যেক ছ্বলাতের শেষাংশে নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»

“তোমাদের কেউ যখন ছ্বলাতের শেষ তাশাহুদ পাঠ শেষ করবে, তখন সে যেন আল্লাহর কাছে চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় চায়। হে আল্লাহ! জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন-মরণের ফিতনা থেকে এবং মিথ্যুক দাজ্জালের ফিতনা থেকে”।[১৩৬] ইমাম আহমাদ ও মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

দাজ্জাল বের হওয়া, তার ফিতনা এবং তার ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আখিরী যামানায় তার বের হওয়ার উপর আলেমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। আক্বীদা সংক্রান্ত আলোচনার সাথেই তারা দাজ্জালের আলোচনা করেছেন। যে ব্যক্তি দাজ্জালের আগমন অস্বীকার করবে, সে মুতাওয়াতের সূত্রে বর্ণিত ছ্বহীহ হাদীছসমূহের বিরোধীতাকারী হিসাবে গণ্য হবে। সেই সঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের বিরোধীতাকারী বলে গণ্য হবে। খারেজী, জাহমীয়া, কতিপয় মু‘তাযিলা এবং সমসাময়িক কিছু লেখক ও স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবি ছাড়া অন্য কেউ দাজ্জালের আগমন অস্বীকার করেনি। এ ব্যাপারে তাদের নিকট বিবেক-বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া আর কোনো দলীল নেই। এসব লোকের কথার কোনো মূল্য নেই।

আল্লাহ তা‘আলা ও তার রসূল থেকে ছ্বহীহ সূত্রে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, মুমিনদের উপর তা বিশ্বাস করা এবং আক্বীদা হিসাবে গ্রহণ করা আবশ্যক। তারা যেন ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত না হন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾

“বরং তারা এমন বিষয়কে অস্বীকার করেছে, যা তারা জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে পারেনি। তাদের কাছে এখনো সেটার পরিণাম ফল আগমন করেনি”। (সূরা ইউনুস: ৩৯)

কেননা আল্লাহর প্রতি এবং তার রসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের দাবি হলো আল্লাহ ও তার রসূলের নিকট থেকে যা কিছু এসেছে, তা সম্পূর্ণরূপে মেনে নেয়া এবং তার প্রতি পরিপূর্ণরূপে ঈমান আনয়ন করা। যে ব্যক্তি তা করবে না, সে আল্লাহর হিদায়াত ছাড়াই

[১৩৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৮৮, অধ্যায়: ছ্বলাতে যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা চাই, আবূ দাউদ হা/৯৮৩, ছ্বহীহ।।

স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণকারী হিসাবে গণ্য হবে। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে সন্দেহ, শিরক, কুফুরী, নিফাকী-মুনাফিকী এবং মন্দ আখলাক-চরিত্র হতে নিরাপত্তা কামনা করছি এবং আমরা আরো প্রার্থনা করছি, তিনি যেন সঠিক পথ দেখানোর পর আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র না করে দেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

٣- نزول عيسى بن مريم عليه السلام

৩. ঈসা ইবনে মারইয়াম 'আলাইহিস সালামের অবতরণ

ঈসা ইবনে মারইয়াম 'আলাইহিস সালামের অবতরণের বিষয়টি যেমন কুরআন দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি সত্যবাদী ও সত্যবাদী হিসাবে সমর্থিত আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার আগমন সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি তো নিজের পক্ষ হতে বানিয়ে কিছুই বলেন না। এ ব্যাপারে মুতাওয়াতের সূত্রে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের সমস্ত আলেমের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। ঈসা 'আলাইহিস সালামের অবতরণের প্রতি ঈমান আনয়ন করাকে ওয়াজিব হিসাবে গণ্য করেছেন।

ইমাম সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ঈসা 'আলাইহিস সালামের অবতরণের বিষয়টি আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত ও উম্মতের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾

"আহলে কিতাবদের প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং ক্বিয়ামত দিবসে তিনি তাদের উপর সাক্ষ্য প্রদান করবেন"। সূরা আন নিসা ৪:১৫৯

অর্থাৎ ঈসার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। আর সেটি হবে আখিরী যামানায় তার অবতরণের পর। তখন মাত্র একটি দীন ব্যতীত অন্য কোনো দীন থাকবে না। সেটি হবে একনিষ্ঠ মুসলিম ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের দীন।

সুন্নাতের দলীল দ্বারাও তার অবতরণের বিষয়টি সাব্যস্ত। বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য কিতাবে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ»

"ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। অচিরেই ন্যায় বিচারক শাসক হিসাবে ঈসা (আলাইহিস সালাম) তোমাদের মাঝে আগমন করবেন। তিনি ক্রুশচিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর

হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর প্রত্যাখ্যান করবেন”।[১৩৭] ছ্বহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«وَاللَّه لَيَنْزِلَن فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ»

“আল্লাহর শপথ! অচিরেই ন্যায় বিচারক শাসক হিসাবে ঈসা (আলাইহিস সালাম) তোমাদের মাঝে আগমন করবেন। তিনি এসে খ্রিষ্টানদের ক্রুশচিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন”। ইমাম মুসলিম জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণনা করেছেন যে, রসূল নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ بنا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ»

“আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত লড়াই করে বিজয়ী থাকবে। অতঃপর ঈসা (আলাইহিস সালাম) আগমন করবেন। সেদিন মুসলমানদের আমীর তাকে লক্ষ্য করে বলবেন, আসুন! আমাদের ইমামতি করুন। তিনি বলবেন, না; বরং তোমাদের একজন অন্যজনের আমীর। এ কারণে যে, আল্লাহ এ উম্মতকে সম্মানিত করেছেন”।[১৩৮]

ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আগমনের ব্যাপারে উম্মতের আলেমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। ইসলামী শরী‘আতের কোনো আলেম এই ইজমার বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায়নি। দার্শনিক, নাস্তিক অথবা যাদের কথার কোনো মূল্য নেই তারাই কেবল ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আগমনকে অস্বীকার করেছে।

এই মর্মে আলেমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, ঈসা ‘আলাইহিস সালাম আগমন করবেন এবং শরী‘আতে মুহাম্মাদীর মাধ্যমে হুকুম-ফায়ছালা করবেন। তিনি আসমান থেকে নামার সময় নতুন কোনো শরী‘আত নিয়ে আসবেন না। যদিও তিনি নাবী হিসাবেই থাকবেন। তিনি নেমে মাহদীর নিকট থেকে দায়িত্ব বুঝে নিবেন। মাহদী নিজে এবং তার অন্যান্য সাথীগণও ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অনুসরণ করবেন। ইমাম সাফারায়েনীর কথা এখানেই শেষ।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ঈসা ‘আলাইহিস সালাম আসমানে এখনো জীবিত আছেন। তিনি যখন আসমান থেকে নেমে আসবেন, তখন আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ফায়ছালা করবেন না। তখন আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের বিরোধিতা করার মতো কিছুই থাকবে না।

---

[১৩৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৪৮, অধ্যায়: কিতাবু আহাদীছুল আম্বীয়া। মুসলিম, অধ্যায়: ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর অবতরণ।

[১৩৮] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৫৬, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

শাইখুল ইসলাম আরো বলেন, ঈসা 'আলাইহিস সালাম জীবিত আছেন। ছ্বহীহ সূত্রে নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের মাঝে ঈসা ইবনে মারইয়াম 'আলাইহিস সালাম ন্যায় বিচারক এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হিসাবে অবতরণ করবেন। তিনি এসে ক্রুশচিহ্ন ভেঙে ফেলবেন। তিনি শূকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর রহিত করবেন। তার থেকে ছ্বহীহ সূত্রে আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, দামেস্ক নগরীর পূর্ব পার্শ্বের সাদা মিনারের উপর তিনি অবতরণ করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। আর যাদের রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আসমান থেকে তাদের দেহ অবতরণ করবে না। তাদেরকে যখন জীবিত করা হবে, তখন তারা তাদের কবর থেকে বের হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾

"যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ওয়াফাত দান করবো। অতঃপর তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নিবো এবং আমি তোমাকে কাফেরদের থেকে পবিত্র করবো"। *(সূরা আলে-ইমরান: ৫৫)*

এ আয়াতে ওয়াফাত দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য করা হয়নি। যদি মৃত্যু উদ্দেশ্য করা হতো, তাহলে তিনি এ বিষয়ে অন্যান্য সাধারণ মুমিনের মতই হতেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের রূহ কবয করেন এবং তা আসমানে উঠানো হয়। এতে জানা গেলো যে, তার রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুনরায় তাতে ফেরত দেয়ার মধ্যে আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে না।

অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ "এবং আমি তোমাকে কাফেরদের থেকে পবিত্র করবো"। তাকে আসমানে উঠানোর সময় যদি তার রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হতো, তাহলে তার দেহ অন্যান্য নাবী কিংবা সাধারণ মুমিনদের দেহের মতোই যমীনে থাকতো। আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

"প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যা করেনি এবং শূলেও চড়ায়নি বরং ব্যাপারটিকে তাদের জন্য সন্দিহান করে দেয়া হয়েছে। আর যারা এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছে তারাও আসলে সন্দেহের মধ্যে অবস্থান করছে। তাদের কাছে এ সম্পর্কিত কোনো জ্ঞান নেই, আছে আন্দাজ-অনুমানের অন্ধ অনুসরণ মাত্র। নিঃসন্দেহে তারা ঈসা মসীহকে হত্যা করেনি; বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়"। (সূরা আন নিসা: ১৫৭-১৫৮)

আল্লাহ তা'আলার বাণী, তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, এর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, তাকে রূহ এবং দেহ সহকারে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। যেমন ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত

হয়েছে যে, তার দেহ এবং রূহ উভয়ই অবতরণ করবে। যদি তার মৃত্যু উদ্দেশ্য করা হতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা বলতেন, তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি, ক্রুশবিদ্ধ করতে পারেনি; বরং তিনি স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছেন।

এ জন্যই কতক আলেম বলেছেন, ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ "নিশ্চয় আমি তোমাকে ওয়াফাত দান করবো"। অর্থাৎ আমি তোমার দেহ ও রূহ গ্রহণ করে নিবো। যেমন বলা হয়, توفيت الحساب واستوفيته "আমি তার থেকে পরিপূর্ণ হিসাব গ্রহণ করেছি"। التوفي শব্দটি দ্বারা দেহ ব্যতীত শুধু রূহ কবয করা বুঝায় এবং আলাদা কোনো আলামত ছাড়া উভয়টি একসাথে কবয করাও বুঝায় না। কখনো কখনো সেটা দ্বারা নিদ্রা উদ্দেশ্য হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"মৃত্যুর সময় আল্লাহ রূহসমূহ কবয করেন আর যে এখনো মরেনি নিদ্রাবস্থায় তার রূহ কবয করেন। অতঃপর যার মৃত্যুর ফায়ছালা কার্যকরী হয় তাকে রেখে দেন এবং অন্যদের 'রূহ' একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত পাঠান। যারা চিন্তা-গবেষণা করে তাদের জন্য এর মধ্যে বড় নিদর্শন রয়েছে"। (সূরা আয যুমার: ৪২) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'রূহ' কবয করা হয়, তাকে আটকিয়ে রাখা হয় আবার ছেড়েও দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

"তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যা কিছু উপার্জন করো তা জানেন। পুনরায় তোমাদের সেই কর্মজগতে ফেরত পাঠান, যাতে জীবনের নির্ধারিত সময়-কাল পূর্ণ হয়। সবশেষে তারই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি জানিয়ে দেবেন তোমরা কি কাজে লিপ্ত ছিলে"। (সূরা আল আনআম: ৬০) শাইখুল ইসলামের কথা এখানেই শেষ।

ইমাম কাযী ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে ঈসা 'আলাইহিস সালামের আগমন এবং দাজ্জালকে হত্যা করা সত্য ও সঠিক। কেননা এ মর্মে অনেক ছ্বহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বিবেক-বুদ্ধি প্রসূত দলীল ও শরী'আতের দলীল এটিকে বাতিল করে না। সুতরাং ঈসা 'আলাইহিস সালামের আগমন ও দাজ্জালের আগমন সাব্যস্ত করা আবশ্যক। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন, এটি সাব্যস্ত করাও আবশ্যক। কিছু কিছু মু'তাযিলা ও জাহমীয়া দাজ্জালের আগমন ও ঈসা 'আলাইহিস সালামের আগমনকে অস্বীকার করেছে। তারা মনে করেছে ঈসা 'আলাইহিস সালামের আগমন সংক্রান্ত

হাদীছগুলো আল্লাহ তা'আলার বাণী: «وخاتم النبيين» "তিনি সর্বশেষ নাবী" এবং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, «لاني بعدي» "আমার পরে আর কোনো নাবী নেই" দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে মুসলিমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, আমাদের নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবীর পরে আর কোনো নাবী নেই। তার শরী'আত ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, তা কখনো রহিত হবে না।

এটি একটি ভ্রান্ত দলীল। কেননা ঈসা 'আলাইহিস সালামের আগমনের উদ্দেশ্য এ নয় যে, তিনি নাবী হয়ে আগমন করবেন এবং নতুন শরী'আত নিয়ে আসবেন ও আমাদের শরী'আতকে রহিত করে দিবেন। উপরোক্ত হাদীছে কিংবা অন্যান্য হাদীছে এমন কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায় না। বরং এখানে আলোচিত একাধিক ছ্বহীহ হাদীছ এবং ঈমান অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হাদীছগুলো প্রমাণ করে যে, তিনি একজন ন্যায়পরায়ন শাসক হয়ে আগমন করবেন ও আমাদেরকে শরী'আত দ্বারা ফায়ছালা করবেন। সেই সঙ্গে মানুষ আমাদের শরী'আতের যে বিষয়গুলো পরিত্যাগ করেছে, তিনি তা পুনরুজ্জীবিত করবেন। শাইখুল ইসলামের কথা এখানেই শেষ।

আল্লামা শাইখ সালেহ ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ বলেন, আমি বলছি, বর্তমান সময়ে কিছু মূর্খ লেখক এবং অর্ধ শিক্ষিত লোক তাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে ঈসা 'আলাইহিস সালামের অবতরণকে অস্বীকার করে। তারা এ বিষয়ে বর্ণিত ছ্বহীহ হাদীছগুলোকে অস্বীকার করে থাকে অথবা এগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন এবং আক্বীদার যেসব বিষয় তার থেকে ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, মুসলিমদের তা বিশ্বাস করা আবশ্যক। কেননা এগুলোতে বিশ্বাস করা ঐসব গায়েবী বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকে অবগত করেছেন।

আল্লামা ইমাম সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ঈসা 'আলাইহিস সালাম আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরী'আতের স্বীকৃতি প্রদান করবেন। কেননা তিনি এ উম্মতের জন্য একজন দূত স্বরূপ। যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি দুনিয়াতে নামার আগেই আসমানে অবস্থানকালে আল্লাহ তা'আলার আদেশে এ শরী'আতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জেনে নিবেন। ইমাম সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, কতিপয় আলেম মনে করে ঈসা ইবনে মারইয়াম অবতরণ করার আগে ইসলামী শরী'আতের হুকুম-আহকাম উঠে যাবে। একাধিক ছ্বহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুপাতে এ ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল। হাদীছগুলো প্রমাণ করে যে, তিনি এ শরী'আতের হুকুম-আহকামের স্বীকৃতি প্রদান করবেন এবং সেটার সংস্কার সাধন করবেন। কেননা মুহাম্মাদী শরী'আত হলো সর্বশেষ শরী'আত এবং আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ রসূল। বিনা আসমানী শরী'আতে দুনিয়া কখনো টিকে থাকবে না। দুনিয়া টিকে থাকা আসমানী শরী'আতের তাকলীফ বিদ্যমান থাকার উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীতে যতদিন আল্লাহ আল্লাহ বলা হবে ততো দিন ক্বিয়ামত হবে না। ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) তার 'তাযকিরা' নামক গ্রন্থে

এ কথা উল্লেখ করেছেন।

তিনি আরো বলেন, ঈসা 'আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে কতদিন থাকবেন, এ বিষয়ে ইমাম তাবারানী এবং ইবনে আসাকির আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনি মানুষের মাঝে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। ইমাম আহমাদ, ইবনে আবী শায়বা, আবু দাউদ, ইবনে জারীর এবং ইবনে হিব্বান প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। অতঃপর মৃত্যুবরণ করবেন। মুসলিমগণ তার জানাযা ছ্বলাত পড়বে। আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশেই তাকে দাফন করা হবে। ইমাম সাফারায়েনীর উক্তি এখানেই শেষ।

٤- خروج يأجوج ومأجوج

৪. ইয়াজুজ-মা'জুজের আগমন

আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের বিবরণ অনুযায়ী আমরা এখন ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে আলোচনা করবো। কেননা মুসলিমদের উপর আবশ্যক হলো আক্বীদার অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইয়াজুজ-মা'জুজ বের হওয়ার প্রতি ঈমান আনয়ন করা। ইমাম সাফারায়েনী (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং মুসলিমদের ইজমা দ্বারা ইয়াজুজ-মা'জুজ বের হওয়া সাব্যস্ত। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ (٩٦) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾

"এমনকি যখন ইয়াজুজ ও মা'জুজকে মুক্ত করা হবে তখন তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে দলে দলে ছুটে আসবে। যখন সত্য প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী হবে তখন কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে, হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; বরং আমরা ছিলাম যালেম"। (সূরা আল আম্বীয়া: ৯৬-৯৭) আল্লাহ তা'আলা যুল কারনাইনের ঘটনায় বলেন,

﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (٩٢) حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا(٩٣) قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (٩٤) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (٩٥) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا(٩٦) فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (٩٧) قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ

وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا(٩٨) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾

"অতঃপর তিনি পথ অবলম্বন করলেন। চলতে চলতে তিনি যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলেন তখন তথায় এমন এক জাতির সন্ধান পেলেন যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বললো হে যুল-কারনাইন! ইয়াজুয ও মা'জুয পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা কি আপনাকে বিনিময় স্বরূপ কর প্রদান করবো এ শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিবেন? যুল-কারনাইন বললেন, আমার প্রভু আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই যথেষ্ট। তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য করো। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি মজবুত প্রাচীর তৈরী করে দিবো। তোমরা লোহার পাত নিয়ে আসো। অতঃপর যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থান পূর্ণ হয়ে লৌহ স্তুপ দুই পর্বতের সমান হলো তখন যুল-কারনাইন বললেন, তোমরা ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাও। যখন ওটা আগুনে পরিণত হলো তখন তিনি বললেন, তোমরা গলিত তামা আনয়ন করো, ওটা আগুনের উপরে ঢেলে দেই। এভাবে প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর ইয়াজুজ ও মা'জুজ তা অতিক্রম করতে পারলো না এবং তা ছিদ্র করতেও সক্ষম হলো না। যুল-কারনাইন বললেন, এটা আমার প্রভুর অনুগ্রহ। যখন আমার প্রভুর ওয়াদা পূরণের সময় নিকটবর্তী হবে তখন তিনি প্রাচীরকে ভেঙ্গে চুরমার করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবেন। আমার প্রতিপালকের ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেবো দলের পর দলে সাগরের ঢেউয়ের আকারে। এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্রিত করবো"। (সূরা কাহাফ: ৯২-৯৯)

দুই পাহাড়ের মাঝখানে নির্মিত এটি একটি লোহার প্রাচীর। যুলকারনাইন বাদশাহ এটি নির্মাণ করেছেন। ফলে তা এমন একটি মজবুত প্রাচীরে পরিণত হয়েছে, যা ভূপৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং মানুষকে কষ্টদানকারী ইয়াজুজ-মা'জুজ সম্প্রদায়ের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতঃপর যখন এ প্রাচীর ধ্বংসের সময় উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা এটিকে মাটির সমান করে দিবেন। এটি এমন ওয়াদা, যা বাস্তবায়ন হবেই। প্রাচীর ধ্বংস হয়ে গেলে তারা প্রত্যেক টিলা থেকে দ্রুতগতিতে দলে দলে মানব সমাজে বের হয়ে আসবে। এর কিছুদিন পরেই শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে।

হাদীছ থেকে ইয়াজুজ-মা'জুজের দল বের হওয়ার দলীল হলো, ছ্বহীহ মুসলিমে নাওয়াস ইবনে সামআন থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঈসা 'আলাইহিস সালামকে জানাবেন যে, আমি এমন একটি জাতি বের করেছি, যাদের সাথে মোকাবেলা করার ক্ষমতা কারো নেই। কাজেই তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে উঠে যাও। এ সময় আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ-মা'জুজের বাহিনী প্রেরণ করবেন। তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে বের হয়ে আসবে। তাদের প্রথম দলটি ফিলিস্তীনের তাবারীয়া জলাশয়ের সমস্ত পানি পান করে ফেলবে। তাদের শেষ দলটি সেখানে এসে কোনো পানি না পেয়ে বলবে, এক সময় এখানে পানি ছিল। তারা

আল্লাহর নাবী ঈসা ও তার সাথীদেরকে অবরোধ করে রাখবে। ঈসা 'আলাইহিস সালাম ও তার সাথীগণ এ সময় প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে পড়বেন। এমনকি বর্তমানে তোমাদের কাছে একশত স্বর্ণ মুদ্রার চেয়ে তাদের কাছে একটি গরুর মাথা তখন বেশি প্রিয় হবে। আল্লাহর নাবী ঈসা ও তার সাথীগণ এ ফিতনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। আল্লাহ তাদের দু'আ কবূল করে ইয়াজুজ-মা'জুজের ঘাড়ে 'নাগাফ' নামক এক শ্রেণির পোঁকা প্রেরণ করবেন। এতে একই সময়ে একটি প্রাণী মৃত্যু বরণ করার মতো তারা সবাই মারা যাবে। অতঃপর আল্লাহর নাবী ঈসা ও তার সাথীগণ যমীনে নেমে এসে দেখবেন ইয়াজুজ-মাজুযের মরা-পচা লাশ ও তাদের শরীরের চর্বিতে সমগ্র যমীন ভরপূর হয়ে গেছে। কোথাও অর্ধহাত জায়গাও খালি নেই। আল্লাহর নাবী ঈসা ও তার সাথীগণ আল্লাহর কাছে আবার দু'আ করবেন। আল্লাহ তাদের দু'আ কবুল করে উটের গর্দানের মত লম্বা লম্বা একদল পাখি পাঠাবেন। আল্লাহর আদেশে পাখিগুলো তাদেরকে অন্যত্র নিক্ষেপ করে পৃথিবীকে পরিষ্কার করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এতে পৃথিবী একেবারে আয়নার মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।[১৩৯]

ইমাম তাবারানী হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মক্কা, মদীনা ও বাইতুল মাকদিসে প্রবেশ করা থেকে বাধা প্রদান করবেন। ইমাম নববী বলেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে তারা আদম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনে আব্দিল বার বলেছেন, আলেমদের ঐক্যমতে তারা ইয়াফিছ ইবনে নূহ 'আলাইহিস সালামের বংশধর। আল্লামা সাফারায়েনী (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াজুজ-মা'জুজ আদমের সন্তানদের মধ্য থেকে তুর্কী বংশোদ্ভত দু'টি সম্প্রদায়। তিনি আরো বাড়িয়ে বলেছেন যে, তারা হলো নূহ 'আলাইহিস সালামের সন্তান তুর্কীদের পূর্ব পুরুষ ইয়াফিসের বংশধর।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াজুজ-মা'জুজ বের হওয়ার সময় নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন এবং তাদের থেকে সতর্ক করেছেন। ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, তিনি বলেছেন, আজ ইয়াজুজ-মা'জুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে দেয়া হয়েছে। এ কথা বলে তিনি হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে বৃত্ত তৈরী করে দেখিয়েছেন। ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে,

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نام عندها ثم استيقظ محمرا وجهه وهو يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِين إِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ»

"একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট নিদ্রা গেলেন। অতঃপর তিনি

[১৩৯] মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান।

জাগ্রত হলেন। তখন তার চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করেছিল। তিনি তখন বলছিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরবদের জন্য ধ্বংস! একটি অকল্যাণ তাদের অতি নিকটবর্তী হয়ে গেছে। ইয়াজুজ-মা'জুজের প্রাচীর আজ এ পরিমাণ খুলে দেয়া হয়েছে। এ কথা বলে তিনি হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও তার পার্শ্বের আঙ্গুল দিয়ে বৃত্ত তৈরী করে দেখালেন। যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মাঝে সৎ লোক থাকতেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যখন পাপাচার বেড়ে যাবে"।[১৪০]

ইয়াজুজ-মা'জুজের দৈহিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য

তাদের দৈহিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম ইবনে কাছীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারা তাদের অনারব স্বজাতীয় তুর্কী মোগল সন্তানদের মতই কঠিন প্রকৃতির হবে। তাদের চোখ হবে ছোট, নাক হবে খাটো এবং মাথার চুল হবে লাল। তাদের আকৃতি ও রং হবে তুর্কীদের মতোই। যারা মনে করে ইয়াজুজ-মা'জুজের কতক লোক লম্বা খেজুর গাজের মতো অথবা তার চেয়ে বেশি লম্বা, যারা মনে করে তাদের কেউ কেউ নিকৃষ্ট আকৃতির একদম খাটো এবং যারা মনে করে তাদের কারো কারো রয়েছে বৃহদাকার দু'টি কান, একটি দিয়ে গা ঢেকে রাখে ও অন্যটিকে বালিশ হিসাবে ব্যবহার করে, তারা কেবল বিনা ইলম ও বিনা দলীলে বানিয়ে কথা বলে।

পৃথিবীতে তাদের কারণে মানুষ যে কষ্ট পাবে, তারা যে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং যেভাবে তাদের শেষ পরিণতি হবে সে ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ইয়াজুজ-মা'জুজ মানব সমাজে বের হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ﴾ "তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে দলে দলে ছুটে আসবে"। (সূরা আল আম্বীয়া: ৯৬)

তারা মানুষের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। তাদের ভয়ে লোকেরা পশুপাল নিয়ে শহর ও দুর্গে আশ্রয় নিবে। তারা যমীনের সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। তাদের কেউ কেউ নদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেটার সমস্ত পানি পান করে একদম শুকিয়ে ফেলবে। পরবর্তীরা তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে, এ নদীতে তো এক সময় পানি ছিল। তারা যখন পৃথিবীর সব মানুষ হত্যা করে শেষ করে ফেলবে এবং কোনো কোনো দুর্গে কিংবা শহরে পালিয়ে মাত্র দু'একজন মানুষ অবশিষ্ট থাকবে, তখন তাদের কেউ

[১৪০] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৭১৩৫, অধ্যায়: কিতাবুল আম্বীয়া।

বলবে, যমীন বাসীকে হত্যা করে শেষ করে ফেলেছি। এখন কেবল আসমানের বাসিন্দারাই বাকি আছে। অতঃপর তাদের একজন বর্শা নাড়া দিয়ে আসমানের দিকে সেটা নিক্ষেপ করবে। বর্শাটি ফিতনা স্বরূপ তাদের নিকট রক্তাক্ত অবস্থায় ফেরত আসবে।

তখন আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুয-মা'জুজের ঘাড়ে উটের নাকের পোকার মতো ছোট ছোট এক ধরনের পোঁকা প্রেরণ করবেন। পোঁকাগুলোর আক্রমণে এ বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর তাদের আর কোনো আওয়াজ পাওয়া যাবে না। মুসলিমরা তখন বলবে, এমন কেউ আছে কি যে তার নিজেকে আমাদের জন্য উৎসর্গ করবে এবং দেখার চেষ্টা করবে এ দুশমনদের কী অবস্থা হয়েছে? এতে তাদের একজন ছাওয়াবের আশায় অগ্রসর হবে। সে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেই দুর্গ হতে বের হবে। সে তাদের একজনের উপর অন্যজনকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখবে। সে এই বলে আহ্বান করবে যে, হে মুসলিমগণ! তোমরা সুখবর গ্রহণ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এ কথা শুনে তারা তাদের দুর্গ ও শহর থেকে বের হয়ে আসবে। তারা তাদের পশুপাল ছাড়বে। পশুপালের জন্য ইয়াজুজ-মা'জুজের মরা দেহ ছাড়া আর কোনো খাবার থাকবে না। ঘাস ও তৃণলতা খেয়ে পশুগুলো যত মোটা-তাজা হয়নি, তার চেয়ে বেশি মোটা-তাজা হবে ইয়াজুজ-মা'জুজের মৃতদেহ ভক্ষণ করে।

ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইউনুস ইবনে বুকাইর মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক থেকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি ভালো। বর্তমান কালের কিছু লেখক ইয়াজুজ-মা'জুজ বিদ্যমান থাকা এবং তাদের প্রাচীর থাকার কথা অস্বীকার করেছে। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, শিল্পোন্নত কাফের রাষ্ট্রসমূহের নাগরিকরাই ইয়াজুজ-মা'জুজ। নিঃসন্দেহে এটি কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করা কিংবা এর আসল অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করার শামিল। যে ব্যক্তি কুরআনের কোনো বিষয় অথবা নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত কোনো বিষয়কে অস্বীকার করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। তবে যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীছের কোনো বিষয়কে অসম্ভাব্য কোনো অর্থে ব্যাখ্যা করবে, সে গোমরাহ বলে বিবেচিত হবে এবং তার কুফুরীতে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যারা ইয়াজুজ-মা'জুজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাদের কাছে এ ছাড়া অন্য কোনো দলীল নেই যে, তারা বলে থাকে, পৃথিবীতে যত শুকনো জায়গা আছে তা সবই আবিষ্কৃত হয়েছে; কিন্তু কোথাও ইয়াজুজ-মা'জুজ কিংবা তাদের প্রাচীর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

উপরোক্ত কথার জবাব হলো, আবিষ্কারকরা অনুসন্ধান করে ইয়াজুজ-মা'জুজ ও তাদের প্রাচীর না পাওয়া তাদের অস্তিত্বহীনতার কথা প্রমাণ করে না। বরং আল্লাহ তা'আলার রাজত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন করতে মানুষের অক্ষমতা প্রমাণিত হয়। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টিকে ইয়াজুজ-মা'জুজ ও তাদের প্রাচীর থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন অথবা এমন কিছু জিনিসকে প্রতিবন্ধক করে দিয়েছেন, যার কারণে তারা তাদের পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান এবং প্রত্যেক জিনিসের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾

"তোমার জাতি তো ওটাকে মিথ্যা বলেছে। অথচ তা সত্য। বলো, আমি তোমাদের কার্যনির্বাহক নই। প্রত্যেক খবর প্রকাশিত হবার একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে"। (সূরা আল আনআম: ৬৬-৬৭)

বর্তমান সময়ের গবেষকগণ পেট্রোলসহ অন্যান্য যেসব খনিজ সম্পদ আবিষ্কার করেছে প্রথম যুগের মুসলিমগণ তা খুঁজে না পাওয়া এবং তা আবিষ্কার করতে না পারার কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তা বের হওয়ার জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে রেখেছেন। নির্ধারিত সময় না হওয়ায় ছাহাবী, তাবেঈ কিংবা তাদের কাছাকাছি যুগে তা বের হয়নি।

٥- خروج الدابة

৫. দাব্বাতুল আরয বের হওয়া

দাব্বাতুল আর্য বের হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾

"যখন প্রতিশ্রুতি (ক্বিয়ামত) নিকটবর্তী হবে তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি প্রাণী নির্গত করবো। সে মানুষের সাথে কথা বলবে, এ বিষয়ে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করতো না"। (সূরা আন নামল: ৮২)

ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) নিহায়া গ্রন্থে বলেন, ইবনে আব্বাস, হাসান ও কাতাদাহ বলেছেন, প্রাণীটি মানুষকে সম্বোধন করে সরাসরি কথা বলবে। ইমাম ইবনে জারীর বলেন, আয়াতে উল্লেখিত কুরআনের বাণীটিই হবে তার কথা: ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ এ বাক্যটি সে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে শুনাবে। মানুষ আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করতো না। ইবনে জারীর আলী ও আতা থেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম ইবনে কাছীর বলেন, এতে মতভেদ রয়েছে। অতঃপর ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, এখানে تكلمهم দ্বারা উদ্দেশ্য হলো تجرحهم অর্থাৎ দাগ লাগাবে। সে কাফেরের কপালে 'কাফের' লিখে দিবে এবং মুমিনের কপালে 'মুমিন' লিখে দিবে। ইবনে আব্বাস থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, কথা বলবে এবং দাগ লাগাবে। এ কথাটি উভয় মতকে একত্রিত করে দেয়। এটি সুন্দর ও শক্তিশালী মত। এতে উভয় মতের মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে।

তিনি তার তাফসীরে আরো বলেন, আখিরী যামানায় মানুষ নষ্ট হয়ে যাওয়া, আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ বর্জন করা এবং সত্য দীন পরিবর্তন করার সময় আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যমীন থেকে এ প্রাণীটি বের করবেন। বলা হয়েছে যে, সে মক্কা থেকে বের হবে। কেউ কেউ বলেছেন, অন্যস্থান থেকে বের হবে এবং মানুষের সাথে কথা বলবে।

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় তাফসীরে আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم﴾ এবং الدابة এর অর্থ সম্পর্কে আলেমগণ মতবেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, وقع الغضب عليهم তাদের উপর ক্রোধ আবশ্যক হয়েছে। ইমাম কাতাদাহ এ কথা বলেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, حق القول عليهم بأنهم لايؤمنون তাদের ব্যাপারে এ কথা সত্য হয়েছে যে, তারা ঈমান আনয়ন করবে না। ইবনে উমার এবং আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, মানুষ যখন সৎকাজের আদেশ করবে না এবং অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করবে না, তখন তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ আবশ্যক হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আলেমদের উঠে যাওয়া, ইলম চলে যাওয়া এবং কুরআনুল কারীম উঠিয়ে নেয়ার প্রতিশ্রুতি সত্য হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আরো বলেন, কুরআন উঠিয়ে নেয়ার আগেই তোমরা বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করো। ছাহাবীগণ বললেন, কুরআনের কপিসমূহ উঠিয়ে নেয়া হলে মানুষের বক্ষদেশে সংরক্ষিত কুরআনের কী অবস্থা হবে? ইবনে মাসউদ বললেন, এমন একটি রাত আসবে, যখন তারা অন্তরে কুরআন খুঁজে পাবে না এবং তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ভুলে যাবে। এরপর তারা জাহেলী যুগের কথা-বার্তা এবং তাদের কবিতাগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তখনই তাদের জন্য প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হবে।

অতঃপর ইমাম কুরতুবী, ﴿وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ এর ব্যাখ্যায় অন্যান্য কথা বলেছেন। পরিশেষে বলেছেন, তবে গবেষণা করলে বুঝা যায় যে, সবগুলোর কথার অর্থ একটিই। আয়াতের শেষাংষেই এর দলীল রয়েছে, ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ এ বাক্যটি সে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে শুনাবে। মানুষ আল্লাহর নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করতো না।

ছ্বহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনটি জিনিস যখন বের হবে, তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোনো উপকারে আসবে না যে ইতিপূর্বে ঈমান আনয়ন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী সৎকাজ করেনি। পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়, দাজ্জাল এবং দাব্বাতুল আরয্।

এ প্রাণীটি নির্দিষ্ট করণ, তার গুণাবলি এবং তা বের হওয়ার স্থান সম্পর্কে আলেমদের অনেক মতভেদ বর্ণিত হয়েছে। التذكرة নামক কিতাবে আমরা এগুলো বর্ণনা করেছি। হুযায়ফা ইবনে উসাইদ আল-গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

«اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذَاكَرُونَ قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا

لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ»

“একদা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন। আমরা তখন ক্বিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, যতদিন তোমরা দশটি আলামত না দেখবে ততোদিন ক্বিয়ামত হবে না। (১) ধোঁয়া (২) দাজ্জালের আগমন (৩) দাব্বাতুল আরদ্ (৪) পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় (৫) ঈসা ইবনে মারইয়ামের অবতরণ (৬) ইয়াজুয-মা’জুজ (৭-৯) তিনটি ভূমিধস। একটি পশ্চিমে, আরেকটি পূর্বে এবং তৃতীয়টি হবে আরব উপদ্বীপে (১০) সর্বশেষে ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার দিকে হাঁকিয়ে নিবে”।[১৪১] ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, আত্-তায়ালেসী, ইমাম মুসলিম এবং সুনান গ্রন্থকারগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীছটি হাসান ছ্বহীহ।

আলা (রহিমাহুল্লাহ আনহু) তার পিতা থেকে, তার পিতা আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ছয়টি জিনিস বের হওয়ার আগেই তোমরা আমল করো। পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয়, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরয্.....। ছ্বহীহ মুসলিমে কাতাদাহ হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যিয়াদ ইবনে রাবাহ থেকে, তিনি বর্ণনা করেন আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমরা ছয়টি জিনিস বের হওয়ার আগেই আমল করো। দাজ্জাল, ধোঁয়া, দাব্বাতুল আরয্...।

ইমাম মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি হাদীছ মুখস্থ করে রেখেছি, যা আমি কখনো ভুলিনি। আমি তাকে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের সর্বপ্রথম যে নিদর্শনটি প্রকাশিত হবে, তা হলো পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হওয়ার দিন সকাল বেলাতেই মানুষের সামনে দাব্বাতুল আরয্ বের হবে। এ দু’টি থেকে যেটি আগে প্রকাশিত হবে, অন্যটি তার পিছে পিছেই প্রকাশিত হবে”।

ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উপরোক্ত হাদীছে ক্বিয়ামতের সর্বপ্রথম যে দু’টি আলামত প্রকাশিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা দ্বারা ঐসব আলামত উদ্দেশ্য, যা সাধারণত মানুষের কাছে পরিচিত নয়। যদিও এর আগে দাজ্জাল বের হবে এবং আসমান থেকে ঈসা ‘আলাইহিস সালাম নেমে আসবেন। ইয়াজুজ-মা’জুজ বের হওয়ার বিষয়টিও অনুরূপ। তবে এগুলো সাধারণ রীতিনীতি ও চিরাচরিত অভ্যাসের পরিপন্থি নয়। কেননা তারা সকলেই হবে মানুষ। তারা এবং অন্যান্য মানুষেরা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

---

[১৪১] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯০১।

কিন্তু অস্বাভাবিক ও অসাধারণ আকৃতিতে দাব্বাতুল আরয্ বের হওয়া, মানুষের সাথে কথা বলা এবং তাদের কপালে ঈমান কিংবা কুফুরীর চিহ্ন লাগিয়ে দেয়া অভ্যাস বহির্ভূত একটি অভিনব বিষয়। এটি যমীন থেকে নির্গত অভ্যাস বহির্ভূত সর্বপ্রথম নিদর্শন। অনুরূপ সাধারণ অভ্যাস বহির্ভূত নিয়মে পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হওয়া আসমানে প্রকাশিত সর্বপ্রথম নিদর্শন।

ছ্বহীহ হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক এ প্রাণীটির কাজ হবে সে মুমিন-কাফের সমস্ত মানুষকে নির্দিষ্ট আলামতের মাধ্যমে চিহ্নিত করবে। মুমিনের কপালে যখন দাগ দেয়া হবে, তখন তার চেহারা আকাশে উদীয়মান তারকার মতো দেখা যাবে। তার দুই চোখের মাঝখানে مؤمن লেখা হবে। আর কাফেরের কপালে দুই চোখের মাঝখানে কালো দাগ লাগানো হবে এবং كافر লেখা হবে।

ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উপরোক্ত হাদীছে ক্বিয়ামতের সর্বপ্রথম যে দু'টি আলামত প্রকাশিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা দ্বারা ঐসব আয়াত উদ্দেশ্য যা সাধারণত মানুষের কাছে পরিচিত নয়। যদিও এর আগে দাজ্জাল বের হবে এবং আসমান থেকে ঈসা 'আলাইহিস সালাম নামবেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, সে মুমিনের সাথে সাক্ষাত করে তার কপালে সাদা দাগ লাগিয়ে চেহারাকে উজ্জ্বল করে দিবে এবং কাফেরের সাথে সাক্ষাত করে তার কপালে কালো দাগ লাগিয়ে তার চেহারাকে কালো করে দিবে। তখনো তারা মিলেমিশে ক্রয়বিক্রয় করবে, একই শহরে বসবাস করবে এবং মুমিন কাফেরকে এবং কাফের মুমিনকে চিনতে পাবে। এমনকি মুমিন কাফেরকে বলবে, হে কাফের! আমার হক ফেরত দাও।

তার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে নাসের ইবনে সা'দী স্বীয় তাফসীরে বলেন, আখিরী যামানায় যে সুপ্রসিদ্ধ প্রাণীটি বের হবে, তা ক্বিয়ামতের বড় আলামতগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল প্রাণীটির ধরন বর্ণনা করেননি। তার কাজ-কর্ম থেকে যেটুকু বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, কেবল সেটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে। সে বিরাট একটি নিদর্শন এবং সাধারণ অভ্যাস বহির্ভূত নিয়মে মানুষের সাথে কথা বলবে। মানুষের নিকট যখন প্রতিশ্রুতি দিবস চলে আসবে এবং তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে সন্দেহে নিপতিত হবে, তখন সে বের হবে। এটি মুমিনদের জন্য একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং সীমালঙ্ঘন কারীদের বিরুদ্ধে বিরাট দলীল।

সাম্প্রতিক কালের কিছু কিছু গবেষক এ প্রাণীটি বের হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছে এবং বের হওয়া অসম্ভব মনে করেছে। তাদের কেউ কেউ এর এমন ব্যাখ্যা করে থাকে, যা সম্পূর্ণ নিরর্থক। তাদের বিবেক-বুদ্ধি এটি বুঝতে অক্ষম, এ ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো দলীল নেই।

মুমিনদের উপর আবশ্যক হলো, আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলের নিকট থেকে যে সংবাদ এসেছে, তা সত্য বলে বিশ্বাস করা। দাব্বাতুল আরয্ এর প্রতি ঈমান আনয়ন করা

ঐসব গায়েবী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কারণে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রশংসা করেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে হিদায়াত চাই এবং সত্য জানা ও সেটা মানার তাওফীক চাই।

٦- طلوع الشمس من مغربها

৬. পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ﴾

"তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা তোমার পালনকর্তা আগমন করবেন। অথবা তোমার পালনকর্তার কোনো নিদর্শন আসবে। যেদিন তোমার পালনকর্তার কোনো নিদর্শন এসে যাবে তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোনো উপকারে আসবে না ইতিপূর্বে ঈমান আনয়ন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী সৎকাজ করেনি। হে নাবী! তুমি বলো তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো। আমরাও অপেক্ষা করতে থাকলাম"। (সূরা আনআম: ১৫৮)

হাফেয ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) নেহায়া গ্রন্থে বলেন, ইমাম বুখারী এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামত হবে না। যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে উঠবে, তখন তারা সবাই ঈমান আনয়ন করবে। কিন্তু ইতিপূর্বে যারা ঈমান আনয়ন করেনি, তাদের ঈমান কোনো উপকারে আসবে না। ইমাম তিরমিযী ব্যতীত সুনান গ্রন্থের অন্যান্য ইমামগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে কাছীরের কথা এখানেই শেষ।

ইমাম সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আলেমগণ বলেন পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়া ছ্বহীহ সুন্নাহ ও সুস্পষ্ট খবর দ্বারা সাব্যস্ত। শুধু তাই নয়; বরং রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ কিতাবের দলীল দ্বারাও সাব্যস্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾

"যেদিন তোমার পালনকর্তার কোনো নিদর্শন এসে যাবে তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোনো উপকারে আসবে না যে ইতিপূর্বে ঈমান আনয়ন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী সৎকাজ করেনি"। (সূরা আল আন'আম :১৫৮)

মুফাস্সিরদের ঐক্যমতে অথবা অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এখানে নিদর্শন বলতে পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়া উদ্দেশ্য। উপরোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়ার সময় যদি কারো ঈমান না থাকে, সূর্য উদিত হওয়ার পর ঈমান নবায়ন করে এবং বিভিন্ন প্রকার সৎকর্ম করে তাতে কোনো লাভ হবে না। কেননা তারা আমলসমূহ গ্রহণযোগ্য হওয়ার মূল শর্ত ঈমান হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং সূর্য উদিত হওয়ার সময় নতুন করে ঈমান আনয়ন করে কোনো লাভ হবে না। যেহেতু ইতিপূর্বে তার ঈমান ছিল না, তাই ঈমানের পূর্বে তার সৎকর্ম, আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা, দাসমুক্ত করা, মেহমানদারী করা, উত্তম আচরণ করা এবং অন্যান্য আমলের কোনো মূল্যায়ন হবে না। কেননা তার আমলগুলো মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সম্পন্ন হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾

"যারা তাদের রবের সাথে কুফুরী করে তাদের উপমা এই যে, তাদের কর্মগুলো ছাইয়ের মতো, যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়"। (সূরা ইবরাহীম: ১৮)

সুতরাং পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়ার সময়ে ঈমান আনয়ন গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য ইমামগণ আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا»

"যতদিন পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হবে না ততোদিন ক্বিয়ামত হবে না। যখন পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হবে এবং মানুষ তা দেখবে তখন সবাই ঈমান আনবে। তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোনো উপকারে আসবে না যে ইতিপূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করে স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী সৎকাজ করেনি"।[১৪২]

ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী যে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, যাকে ইমাম নাসাঈ ছ্বহীহ বলেছেন এবং ইমাম ইবনে মাজাহ যাকে আসেম ইবনে আবু নাজুদের সনদে যার ইবনে হুবাইশ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন সাফওয়ান ইবনে আস্সাল থেকে। সাফওয়ান বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু

[১৪২] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪৬৩৬, অধ্যায়: কিতাবুর রিকাক।

'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পশ্চিম আকাশে তাওবার এমন একটি দরজা খুলে রেখেছেন যার প্রশস্ততা ৭০ অথবা ৪০ বছরের পথ। পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে বন্ধ করা হবে না।

উপরোক্ত হাদীছগুলো এবং কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটি প্রমাণ করে যে, যারা পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হতে দেখে ঈমান আনবে ও তাওবা করবে তাদের কাছ থেকে সেটা কবুল করা হবে না। সে সময় ঈমান ও তাওবা কবুল না হওয়ার কারণ হলো পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়া ঐসব আলামতের অন্তর্ভুক্ত, যা ক্বিয়ামত অত্যন্ত নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ বহন করে। সুতরাং ঐ সময়ের অবস্থা ক্বিয়ামতের দিনের অবস্থার অনুরূপ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ﴾

"তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা তোমার পালনকর্তা আগমন করবেন অথবা তোমার পালনকর্তার কোনো নিদর্শন আসবে। যেদিন তোমার পালনকর্তার কিছু নিদর্শন এসে যাবে তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোনো উপকারে আসবে না যে পূর্ব থেকে ঈমান আনয়ন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী সৎকাজ করেনি। হে নাবী! তুমি বলো, তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো। আমরাও অপেক্ষা করতে থাকলাম"। (সূরা আল আনআম: ১৫৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾

"অতঃপর তারা যখন আমার আযাব দেখতে পেলো তখন বললো, আমরা এক আল্লাহতেই বিশ্বাস করলাম এবং আমরা তার সঙ্গে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে অস্বীকার করলাম। কিন্তু তারা যখন আমার আযাব প্রত্যক্ষ করলো তখন তাদের বিশ্বাস তাদের কোনো উপকারে এলো না। আল্লাহর এ বিধান তার বান্দাদের মধ্যে অনুসৃত হয়ে আসছে। আর তখন অবিশ্বাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো"। (সূরা মুমিন: ৮৪-৮৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ﴾

"তারা কি শুধু এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, ক্বিয়ামত তাদের নিকট হঠাৎ এসে পড়ুক? ক্বিয়ামতের নিদর্শনসমূহ তো এসেই পড়েছে। অতঃপর ক্বিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?" (সূরা মুহাম্মাদ: ১৮)

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ),

﴿لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾

"তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোনো উপকারে আসবে না যে পূর্ব থেকে ঈমান আনয়ন করেনি" এর ব্যাখ্যায় বলেন, সেদিন যখন কাফের ঈমান আনয়ন করবে, তখন তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে সেদিনের পূর্বে যারা ঈমানদার থাকবে এবং পরিশুদ্ধ আমলকারী হবে, সে বিরাট কল্যাণের মধ্যে থাকবে। আর যদি পরিশুদ্ধ আমলকারী না হয়ে থাকে; কিন্তু তখন যদি তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে না। এ মর্মে অনেক হাদীছ রয়েছে। এটিই ﴿أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ "কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনো সৎকাজ করেনি" এর অর্থ। অর্থাৎ পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার আগে আমলকারী না হলে সেটা উদিত হওয়ার পর সৎআমল করলে, তা কবুল হবে না। ইমাম ইবনে কাছীরের কথা এখানেই শেষ। ইমাম বগবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾

"যেদিন তোমার পালনকর্তার কিছু নিদর্শন এসে যাবে তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোনো উপকারে আসবে না যে পূর্ব থেকে ঈমান আনয়ন করেনি"। (সূরা আল আনআম: ১৫৮)

অর্থাৎ যেসব নির্দশন প্রকাশিত হলে তারা ঈমান আনতে বাধ্য হবে, তা বের হওয়ার সময় ঈমান তাদের কোনো উপকার করবে না। আর ﴿أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ "কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী সৎকাজ করেনি" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তখন কাফেরের ঈমান ও ফাসেকের তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় তাফসীরে আরো বলেন, আলেমগণ বলেছেন, পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়ার সময় ঈমান আনলে কারো ঈমান উপকারে আসবে না। কেননা তখন তাদের অন্তরে এমন ভয় ঢুকে যাবে যে, নফ্সের চাহিদা পূরণ করার ইচ্ছা একদম নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং শরীরের শক্তি একদম শেষ হয়ে যাবে। ক্বিয়ামত নিকটে দেখে তখন সমস্ত মানুষ ঠিক ঐরকম হয়ে যাবে যেমন মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তিদের থেকে পাপাচারের আগ্রহ সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায় এবং তাদের শরীরে পাপাচার ও নাফরমানির ইচ্ছা একদম বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং ক্বিয়ামত নিকটবর্তী দেখে কেউ তাওবা করলে তার তাওবা কবুল হবে না। যেমন মৃত্যু উপস্থিত দেখে কেউ তাওবা করলে তার তাওবা কবুল হবে না। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ»

"আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তাওবা ততোক্ষণ পর্যন্ত কবুল করেন, যতক্ষণ না তার মৃত্যুর গড়গড়ানী শুরু হয়"।[১৪৩]

অর্থাৎ কণ্ঠনালীর মাথায় রূহ না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবা কবুল করেন। এটি ঐ সময়ের অবস্থা যখন মানুষ জান্নাত কিংবা জাহান্নামে নিজের ঠিকানা দেখতে পায়। যারা পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হতে দেখবে, তাদের অবস্থাও অনুরূপ।

মোটকথা, এটি একটি বিরাট ঘটনা। তখন ভয়াবহ অবস্থা হবে, যাতে সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে এবং ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হবে। এতে আল্লাহ তা'আলার মহা শক্তির দলীল রয়েছে। এ বিশাল সৃষ্টি সূর্য আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহর ইচ্ছায় এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদেরকে বিশুদ্ধ ঈমান এবং এমন উপকারী ইয়াকীন দান করেন, যা সৎ আমলের দিকে ধাবিত করে। আমরা আরো দু'আ করি, সময় ও বয়স ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই পুনরুত্থান দিবসের জন্য উপকারী পাথেয় সংগ্রহ করার তাওফীক দেন। সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রভু আল্লাহ তা'আলার জন্য সমস্ত প্রশংসা।

٧- حشر الناس إلى أرض المحشر

৭. ভয়াবহ একটি আগুন মানুষকে সিরিয়ার যমীনে একত্রিত করবে

ইমাম ইবনে কাছীর নেহায়া গ্রন্থে বলেন, ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا»

"মানুষকে তিনভাবে একত্রিত করা হবে। (১) একদল লোককে আশা ও ভয় মিশ্রিত অবস্থায় হাঁকিয়ে নেয়া হবে। (২) দু'জনকে একটি উটের উপর, তিনজনকে একটি উটের উপর, চারজনকে একটি উটের উপর এবং দশজনকে একটি উটের উপর আরোহিত অবস্থায় হাশরের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। (৩) বাকি সব মানুষকে আগুন হাঁকিয়ে নিবে। মানুষ যেখানে দুপুরের বিশ্রাম নেয়ার জন্যে অবস্থান করবে আগুনও সেখানে থেমে যাবে।

---

[১৪৩] হাসান: তিরমিযী হা/৩৫৩৭, অধ্যায়: কিতাবুত্ তাওবা। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাসান গরীব। হাকেম তার মুস্তাদরাকে হাদীছটি বর্ণনা করে ছ্বহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। দেখুন: মুস্তাদরাকুল হাকেম, (৪/২৫৭)।

মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্য অবস্থান করবে আগুনও সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে। তারা যেখানে সকাল করবে আগুনও সেখানে থেমে যাবে। তারা যেস্থানে বিকালে অবস্থান করবে আগুনও সেস্থানে অবস্থান করবে। এরপর আবার তাদেরকে হাঁকিয়ে নিবে।[১৪৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আদনের গর্ত হতে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে বেষ্টন করে নিবে। চতুর্দিক থেকে তাদেরকে হাশরের মাঠের দিকে হাঁকিয়ে যাবে। যে পিছিয়ে থাকবে আগুন তাকে জ্বালিয়ে ফেলবে।[১৪৫]

অতঃপর ইমাম ইবনে কাছীর এ অর্থে আরো অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে বলেছেন, হাদীছগুলোর বর্ণনা প্রসঙ্গ প্রমাণ করে যে, এটি হবে আখিরী যামানায় দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমস্ত মানুষকে সিরিয়ার একটি স্থানে সমবেত করণ। তারা তিনভাগে বিভক্ত হবে। এক শ্রেণির লোক তখন পানাহার করবে, কাপড়চোপড় পরিধান করবে এবং আরোহণ করবে। আরেক শ্রেণির লোক কখনো পায়ে হেঁটে চলবে আবার কখনো আরোহণ করবে। তারা পালাক্রমে মাত্র একটি উটের উপর আরোহণ করবে। যেমন ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দু'জন মিলে একটি উটের উপর আরোহণ করবে....তিনজন মিলে একটি উটের উপর আরোহণ করবে.....দশজন একটি উটের উপর আরোহণ করবে। বাহন কম থাকার কারণে এভাবেই তারা একই বাহনের উপর পালাক্রমে আরোহণ করবে। যেমন ইতিপূর্বে হাদীছে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং হাদীছের শেষাংশে এসেছে যে, বাকীদেরকে আগুন হাঁকিয়ে নিবে। এ আগুনটি ইয়ামানের আদানের গর্ত থেকে বের হয়ে সমস্ত মানুষকে ঘেরাও করবে এবং প্রত্যেক দিক থেকে হাশরের যমীনের দিকে হাঁকিয়ে নিবে। যে কেউ পিছিয়ে থাকবে আগুন তাকে জ্বালিয়ে ফেলবে।

এমনটি হবে আখিরী যামানায়। তখন পানাহার, ক্রয়-বিক্রি ও বাহনের উপর আরোহণ করা এবং অন্যান্য কাজ-কর্ম বাকী থাকবে। যারা আগুনের তাড়া খেয়েও পিছিয়ে থাকবে, আগুন তাদেরকে ধ্বংস করবে। এটি যদি সিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার পরের ঘটনা হতো, তাহলে মাওত, যানবাহন ক্রয়-বিক্রয়, পানাহার ইত্যাদি অবশিষ্ট থাকার কথা নয়।

আখিরী যামানায় আদনের গর্ত থেকে আগুন বের হয়ে সিরিয়ার যমীনে মানুষকে হাঁকিয়ে নেয়ার ব্যাপারে অনেক হাদীছ রয়েছে। এগুলো থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম, আহমাদ ও সুনান গ্রন্থকারগণ। আদনের গর্ত থেকে একটি আগুন বের হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিবে। মানুষ যেখানে রাত্রি যাপন করবে, আগুনও সেখানে থেমে যাবে এবং মানুষ যেখানে বিশ্রাম নিবে আগুনও সেখানে থেমে যাবে। এ মর্মে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

[১৪৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৫২২, অধ্যায়: কিতাবুর্ রিকাক, মুসলিম হা/২৮৬১।

[১৪৫] নিহায়া, অধ্যায়: ফিতান ওয়া মালাহিম।

«سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ نَحْوِ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ»

"অচিরেই ক্বিয়ামত দিবসের পূর্বে হাযারামাউত শহর বা হাযারামাওতের দিক থেকে একটি আগুন বের হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে কিসের আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমরা সিরিয়াতে বসবাস করো।[১৪৬] আহমাদ, তিরমিযী এবং ইবনে হিব্বান তার ছ্বহীহ গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীছটি হাসান ছ্বহীহ গরীব।

ইমাম সাফারায়েনী (রহমাহুল্লাহ) বলেন পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকের হাশর বা মানুষকে হাঁকিয়ে নেয়ার ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। এটি কি ক্বিয়ামতের দিন হবে? না কি ক্বিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতেই হবে?

ইমাম কুরতুবী, খাত্তাবী বলেন, এ হাশর হবে ক্বিয়ামত দিবসের পূর্বে দুনিয়াতেই। কাযী ইয়ায এ মতকে সঠিক বলেছেন। আর কবর থেকে উঠিয়ে হাশরের মাঠে একত্রিত করার কথা ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মারফু হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইবনে আব্বাস থেকে ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ثُمَّ قَرَأَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ»

"নিশ্চয় তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে নগ্নপদ, বস্ত্রহীন এবং খাতনা বিহীন অবস্থায়। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾

"যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে পূর্ণ করতেই হবে। (সূরা আল আম্বীয়া: ১০৪) ক্বিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে সর্বপ্রথম কাপড় পরিধান করানো হবে।[১৪৭]

ইমাম সাফারায়েনী (রহমাহুল্লাহ) বলেন, কাযী ইয়ায (রহমাহুল্লাহ) খাত্তাবী ও কুরতুবীর কথা সমর্থন করতে গিয়ে বলেন, আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছে এসেছে, তারা যেখানে বিশ্রাম নিবে, আগুন সেখানে থেমে যাবে, তারা যেখানে রাত্রি যাপন করবে, আগুনও সেখানে থেমে যাবে, তারা যেখানে সকাল কাটাবে আগুন সেখানে থেমে থাকবে এবং তারা যেখানে বিকাল কাটাবে আগুন সেখানে থেমে যাবে.....এসব কথার মধ্যে দলীল পাওয়া যায় যে, এ

[১৪৬] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২২১৭।

[১৪৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৩৪৯, অধ্যায়: কিতাবুর্ রিকাক।

হাশর হবে দুনিয়াতে সিরিয়ার যমীনে। কেননা এগুলো পার্থিব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়।

ইমাম সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) তার তাযকিরা নামক গ্রন্থে আরো বলেন, হাশর মোট চারটি। দু'টি হাশর দুনিয়ার এবং অন্য দু'টি আখিরাতের। দুনিয়ার হাশর দু'টির কথা সূরা হাশরে উল্লেখিত হয়েছে। একটি হচ্ছে ইয়াহূদীদেরকে সিরিয়াতে একত্রিত করার হাশর। নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা বের হয়ে যাও। তারা বলেছিল, আমরা কোথায় যাবো? তিনি বলেছিলেন, হাশরের যমীনে চলে যাও। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাকীদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে সিরিয়ায় নির্বাসন দিয়েছিলেন।

দুনিয়ার দ্বিতীয় হাশরটি হবে ক্বিয়ামতের আলামত হিসাবে। যেমন আনাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন,

نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنْ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ

"একটি আগুন সমস্ত মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে নিবে"।[১৪৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত মারফু হাদীছে এসেছে, পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রতি একটি আগুন প্রেরণ করা হবে, যা তাদেরকে পশ্চিম দিকে একত্রিত করবে। তারা যেখানে রাত্রি যাপন করবে, আগুন সেখানে থেমে যাবে। তারা যেখানে বিশ্রাম নেবে, আগুন সেখানে থেমে যাবে এবং যারা পিছিয়ে থাকবে, আগুন তাদেরকে জ্বালিয়ে দিবে। মূলত আগুনটি তাদেরকে উট তাড়িয়ে নেয়ার মতো তাড়িয়ে নিবে।

হাফেয ইবনে হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আদনের গর্ত থেকে আগুনটি বের হওয়ার অর্থ এ নয় যে, সেটা তাদেরকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে হাঁকিয়ে নিবে না। কারণ এটি প্রথমত বের হবে আদন থেকে। বের হওয়ার পর সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। মূলত এখানে পশ্চিম বা পূর্ব উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য হলো তখন পৃথিবীতে জীবিত সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে। অথবা এটি প্রথমে পূর্ব দিক থেকে বের হয়ে পরবর্তীতে সমস্ত যমীনে ছড়িয়ে পড়বে।

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আখিরাতের হাশর দু'টি হলো মৃত্যুর পর কবর থেকে সমস্ত মানুষকে উঠিয়ে একটি মাত্র মাঠে একত্রিত করার নাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ "সেদিন আমি মানুষকে একত্রিত করবো এবং তাদের কাউকে ছাড়বো না"। (সূরা কাহাফ: ৪৭)

আর অন্য হাশরটি হলো তাদেরকে জান্নাত কিংবা জাহান্নামে একত্রিত করার নাম। দুনিয়ার হাশর সম্পর্কে কবি বলেন, وآخر الأيات حشر النار كما أتى في محمكم الأخبار

[১৪৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১১৮ নং হাদীছের অধ্যায়ে: আগুন বের হওয়া।

ক্বিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে সর্বশেষ হলো একটি আগুন, যা মানুষকে একত্রিত করবে। যেমন এসেছে ছ্বহীহ হাদীছসমূহে।

এখানে আলামতগুলো বলতে বড় বড় নিদর্শনসমূহ উদ্দেশ্য। ভয়াবহ একটি আগুন লোকদেরকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে এবং ইয়ামান থেকে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের হিজরতের যমীন সিরিয়াতে একত্রিত করবে। ছ্বহীহ হাদীছসমূহে সুস্পষ্টভাবে এ কথা উল্লেখ আছে। অতঃপর হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) ইয়ামান থেকে আগুনটি বের হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আদানের গর্ত থেকে আগুনটি বের হওয়ার কথাও সুস্পষ্ট। সেই সঙ্গে পূর্ব থেকে পশ্চিমের দিকে মানুষকে তাড়িয়ে নেয়ার কথা এবং সিরিয়ার যমীনে একত্রিত করার কথাও বর্ণিত হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় এভাবে করা যেতে পারে যে, দু'টি আগুন বের হবে। একটি পূর্ব দিক থেকে বের হয়ে পশ্চিম দিকে মানুষকে ধাওয়া করবে এবং অন্যটি ইয়ামান থেকে বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার যমীনে নিয়ে যাবে।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, আগুন একটি হলেও হাদীছগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ فَتَسُوقُ النَّاسَ» "হাযারা মাওত থেকে একটি আগুন বের হবে অতঃপর মানুষকে হাঁকিয়ে নিবে"। অন্য বর্ণনা এসেছে, আদানের গর্ত থেকে আগুন বের হবে এবং মানুষকে হাশরের দিকে তাড়িয়ে নিবে।

অন্য হাদীছে আছে,«نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنْ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ» "একটি আগুন মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে জড়ো করবে"। উক্ত হাদীছগুলোর মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা সম্ভব যে, সিরিয়া হলো একত্রিত করার স্থান এবং এটি পূর্বের দেশগুলোর তুলনায় পশ্চিমে। অতএব ইয়ামানের আদানের গর্ত থেকে সর্বপ্রথম বের হবে। সেখান থেকে বের হয়ে পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়বে। অতঃপর পূর্বের বাসিন্দাদেরকে পশ্চিমে তথা সিরিয়াতে একত্রিত করবে। সুতরাং সিরিয়া হবে দুনিয়ার হাশরের যমীন; আখিরাতের হাশরের যমীন নয়। যেমনটি মনে করে থাকেন এক শ্রেণির আলেম।

٨- النفخ في الصور والصعق

৮. শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া এবং আসমান-যমীনের সবাই সংজ্ঞাহীন হওয়া

কুরআনুল কারীমে সিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার আলোচনা অনেকবার এসেছে। সিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার সময় যা কিছু ঘটবে সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কুরআনে তিনটি ফুঁ দেয়ার কথা উল্লেখ আছে।

(১) ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের ফুৎকার। সূরা আন নামালে এ ফুৎকারের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾

"আর সেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। ফলে আকাশ ও যমীনে যারা আছে সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, সে ব্যতীত"। (সূরা আন নামল: ৮৭)

(২) সংজ্ঞাহীন হওয়া ও

(৩) দাঁড়ানোর ফুৎকার সম্পর্কে সূরা আয্ যুমারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾

"এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। ফলে আকাশ ও যমীনে যারা আছে সকলেই বেহুশ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, সে ব্যতীত। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। তৎক্ষনাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে"। (সূরা আয যুমার: ৬৮)

এখানে যারা ভীত-আতঙ্কিত হবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হলেন জান্নাতের হুরগণ। কেননা জান্নাতে কোনো মৃত্যু নেই। অনেকেই তা থেকে রেহাই পাবে। তবে কারা কারা ভয়-ভীতি ও আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া থেকে রেহাই পাবে, তাদের প্রত্যেককে দৃঢ়তার সাথে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে বিষয়টিকে সাধারণ রেখেছেন। ছ্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَأَجِدُ مُوسَى بَاطِشًا بِسَاقِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي هَلْ أَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَاه اللَّهُ؟»

“তোমরা আমাকে মূসার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না। কেননা ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ অজ্ঞান হয়ে যাবে। আমিই সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবো। জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমি দেখতে পাবো, মূসা ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহর আরশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জানি না, তিনি কি আমার পূর্বে জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন? না কি আল্লাহ তা‘আলা তাকে ঐসব সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যারা সংজ্ঞাহীন হবে না?”[১৪৯]

এ সংজ্ঞাহীন হওয়ার ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন, এটি চতুর্থবার ফুঁ দেয়ার কারণে। কেউ কেউ বলেছেন, এটি কুরআনে উল্লেখিত ফুৎকার সমূহেরই অন্তর্ভুক্ত। শাইখুল ইসলামের উক্তি এখানেই শেষ।

ইমাম সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জেনে রাখুন যে, শিঙ্গায় তিনবার ফুঁ দেয়া হবে।

(১) ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হওয়ার ফুৎকার। এর মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা পরিবর্তন হবে এবং সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। এ দিকে ইশারা করেই আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾

এরা তো কেবল অপেক্ষা করছে এক মহাগর্জনের, যাতে কোনো বিরতি থাকবে না। (সূরা সোয়াদ: ১৫) অর্থাৎ কোনো পুনরাবৃত্তি হবে না।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾

“এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, সে ব্যতীত। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। তখন তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে”। (সূরা আয যুমার: ৮৭)

ইমাম যামাখশারী (রহিমাহুল্লাহ) তার কাশ্‌শাফে এ আয়াতে শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার সময় ভয়-ভীতি থেকে যেসব ফেরেশতাদেরকে মুক্ত রাখবেন, তারা হলেন জিবরীল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও মালাকুল মাওত। কেউ কেউ অন্য কথাও বলেছেন। শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার সময় যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হবে, তার কারণেই তারা ভীত-আতঙ্কিত হয়ে যাবে।

(২) ইমাম সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, দ্বিতীয় ফুৎকারটি হবে সংজ্ঞাহীন হওয়ার জন্য। এতে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾

[১৪৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪১১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৩৭৩।

"এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। ফলে আকাশ ও যমীনে যারা আছে সকলেই সংজ্ঞাহীন হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, সে ব্যতীত"। (সূরা আয যুমার: ৬৮) সংজ্ঞাহীন হওয়াকে মৃত্যু বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শিঙ্গাটি হবে নূরের। সমস্ত সৃষ্টির রূহকে সেটার মধ্যে ঢুকানো হবে। মুজাহিদ বলেন, এটি হবে হর্ন বা বিউগলের মতো। ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) এ কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক গ্রাম্য লোক নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললো, শিঙ্গা কী? জবাবে তিনি বললেন, এটি হলো একটি শিঙ্গা, যাতে ফুঁ দেয়া হবে। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি হাসান।

(৩) তৃতীয় ফুৎকারটি হবে পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত এবং অনেক হাদীছ শিঙ্গায় পুনরুত্থানের ফুঁ দেয়ার কথা প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾

"তারপর শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে এবং সহসা তারা নিজেদের রবের সামনে হাযির হবার জন্য নিজেদের কবর থেকে বের হবে"। (সূরা ইয়াসীন: ৫১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾

"অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। তখন তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে"। (সূরা আয যুমার: ৬৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (٨) فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (٩) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾

"যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। সেদিন হবে এক সঙ্কটের দিন। যা কাফেরদের জন্য সহজ নয়। (সূরা আল-মুদ্দাছছির: ৮-১০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (٤١) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾

"মন দিয়ে শোন! যেদিন এক ঘোষক ঘোষণা করবে নিকটবর্তী স্থান হতে আহবান করবে। সেদিন মানুষ অবশ্যই শ্রবণ করবে এক বিরাট আওয়াজ। সেদিনই বের হওয়ার দিন"। (সূরা কাফ: ৪০-৪১)

মুফাস্সিরগণ বলেন, আহ্বায়ক হলেন ইসরাফীল 'আলাইহিস সালাম। তিনি শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন এবং আহবান করবেন, হে পুরাতন হাড্ডীসমূহ! হে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পেশী ও

গোশতসমূহ এবং বিক্ষিপ্ত চুলসমূহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে একত্রিত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন। যাতে তিনি বান্দাদের মাঝে বিচার-ফায়ছালা করতে পারেন।

কেউ কেউ বলেছেন, ইসরাফীল ফুঁ দিবেন এবং জিবরীল ডাক দিবেন। নিকটবর্তী স্থান বলতে বাইতুল মুকাদ্দাসের একটি পাথর উদ্দেশ্য। আরেকদল মুফাস্সির বলেছেন, উভয় ফুৎকারের মাঝের ব্যবধান হবে চল্লিশ বছর। কতিপয় আলেম বলেছেন, সমস্ত বর্ণনা একথারই প্রমাণ বহন করে। ছ্বহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, উভয় ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশের ব্যবধান হবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু হুরায়রা! চল্লিশ দিন? আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি তা বলতে অস্বীকার করলাম। ছাহাবীগণ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, চল্লিশ মাস? তিনি বলেন, আমি তা বলতেও অস্বীকার করলাম। তারা বললেন, চল্লিশ বছর? তিনি বলেন, আমি তাও অস্বীকার করলাম.....।

আবু হুরায়রার উক্তি, আমি অস্বীকার করলাম, এ কথার তিনটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

(১) প্রথম ব্যাখ্যা হলো, আমি তোমাদের জন্য সেটা বলা থেকে বিরত থাকলাম।

(২) কেউ কেউ বলেছেন, আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কথার অর্থ হলো আমি নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা জিজ্ঞাসা করা থেকে বিরত রয়েছি।

(৩) কেউ কেউ বলেছেন, আমি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি তা খুলে বলা থেকে বিরত থাকার কারণ হলো, এ বিষয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ অবগত নয়। কেননা এটি মহান আল্লাহর রুবূবীয়াতের বৈশিষ্ট্য।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইবনে জারীর, তাবারী, আবু ইয়ালা স্বীয় মুসনাদে, বায়হাকী পুনরুত্থান অধ্যায়ে, আবু মুসা আল-মাদীনি এবং অন্যরা যে দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাতে তিনি বলেছেন যে, আমাদের কাছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যখন আসমান-যমীন সৃষ্টি করে শেষ করলেন তখন শিঙ্গা সৃষ্টি করলেন এবং সেটা ইসরাফীলকে দিলেন। তিনি সেটাকে তার মুখে রেখে আরশের দিকে মাথা উঠিয়ে অপেক্ষা করছেন, কখন তাকে সেটাতে ফুঁ দেয়ার আদেশ দেয়া হবে। আবু হুরায়রা বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! শিঙ্গা কী? তিনি বললেন, সেটা হলো হর্ন বা বিউগল। আবু হুরায়রা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী দিয়ে সেটা সৃষ্টি করা হয়েছে? তিনি বললেন, সেটা একটি বিরাট শিঙ্গা। সেটার একটি আংটা আসমান-যমীনের চেয়ে বড়। তাতে তিনি তিনবার ফুঁ দিবেন। প্রথমটি হবে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার ফুৎকার, দ্বিতীয়টি হবে সংজ্ঞাহীন হওয়ার ফুৎকার ও তৃতীয়টি হবে সৃষ্টিজগতের প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ফুৎকার।

আল্লাহ তা'আলা ইসরাফীলকে প্রথমবার ফুঁ দেয়ার আদেশ দিবেন। তুমি ভয়-ভীতি ও আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার ফুঁ প্রদান করো। তিনি ফুঁ দিবেন। এতে আসমান-যমীনের সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হবে। তবে আল্লাহ তা'আলা যাকে এর বাইরে রাখবেন, তার কথা ভিন্ন।

আল্লাহ তাকে ফুঁ দেয়ার আদেশ দিবেন। তিনি দীর্ঘ ফুৎকার প্রদান করবেন এবং কোনো প্রকার ক্লান্তিবোধ করবেন না। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলছেন,

﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾

"এরা তো কেবল অপেক্ষা করছে এক মহাগর্জনের, যাতে কোনো বিরতি থাকবে না"। (সূরা সোয়াদ: ১৫)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পাহাড়গুলো চালিত করবেন। এতে মেঘমালা চলার মতো তা চলতে থাকবে। অতঃপর সেটা মরীচিকার মতো হয়ে যাবে। যমীন তার সমস্ত বাসিন্দা সহকারে প্রকম্পিত হবে। সেটা সমুদ্রে ভাসমান মাল বোঝাই করা নৌকার মতো হবে, যাকে আঘাত করছে ঢেউয়ের পর ঢেউ এবং তা ঝুলতে থাকবে ঐ ফানুসের মতো, যা লটকানো আছে আরশের সাথে এবং সেটাতে আশ্রয় নিচ্ছে মুমিনদের রূহসমূহ। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন,

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (٦) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾

"সেদিন প্রকম্পিত করবে মহাপ্রলয়ের প্রথম শিঙ্গাধ্বনি। তার অনুগামী হবে পরবর্তী শিঙ্গাধ্বনি"। (সূরা আন্-নাযিআত: ৬-৭)

এতে যমীন কাত হয়ে যাবে মানুষের পিঠের উপরে। স্তন্য দানকারীনী মহিলারা কোলের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে, শিশুরা বৃদ্ধে পরিণত হবে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শয়তান উড়ে পালানোর চেষ্টা করবে। এমনকি সে দিগন্তের দিকে চলে যাবে। কিন্তু ফেরেশতারা তাকে পাকড়াও করবে এবং তার চেহারায় আঘাত করবে। অতঃপর সে আঘাত খেয়ে ফিরে আসবে। মানুষেরা পরস্পরকে ডকাডাকি করতে করতে পালাতে চেষ্টা করবে। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন,

﴿يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ﴾

"সেদিন তোমরা পশ্চাতে ফিরে পলায়ন করতে চাইবে। আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষাকারী কেউ থাকবে না"। (সূরা গাফির :৩৩)

এমতাবস্থায় যমীন ফেটে যাবে এবং বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হবে। তখন তারা এক ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখতে পাবে। তারা আসমানের দিকে তাকাবে। সেটাকে তারা ফুটন্ত তেলের গাদের মতো দেখতে পাবে। অতঃপর আসমান ফেটে যাবে এবং সেটার নক্ষত্রসমূহ ছিটকে পড়বে। আসমানের সূর্য ও চন্দ্র আলো বিহীন হয়ে যাবে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কবরে দাফন কৃত মৃতরা এ ভয়াবহ অবস্থার কিছুই জানতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ!

﴿ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾

"তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, সে ব্যতীত" এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে আলাদা করেছেন, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হলো শহীদগণ। জীবিত লোকেরা ভীত-আতঙ্কিত হবে। আর শহীদগণ তাদের রবের নিকট জীবিত অবস্থায় রিযিকপ্রাপ্ত হতে থাকবেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেদিনের ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক থেকে হেফাযত করবেন ও নিরাপত্তা প্রদান করবেন। আর এ ভয়-ভীতি হবে আল্লাহর পক্ষ হতে নিকৃষ্ট লোকদের জন্য শাস্তি স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾

"হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সেদিন তোমরা দেখতে পাবে প্রত্যেক স্তন্যদায়ী তার দুধের শিশুকে ভুলে গেছে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলা তার গর্ভের সন্তান প্রসব করে দিবে আর তুমি মানুষকে মাতাল অবস্থায় দেখতে পাবে। অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুত আল্লাহর আযাব খুবই কঠিন"। (সূরা আল হজ্জ: ১-২)

অতঃপর যতক্ষণ আল্লাহ চাইবেন, ততোক্ষণ তারা উক্ত ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে অবস্থান করতে থাকবে।

আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে ছিরাতুল মুস্তাকীম প্রার্থনা করছি এবং আমরা প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে ঐসব লোকের মধ্যে গণ্য করেন, যাদেরকে ভয়াবহ আতঙ্ক কোনো প্রকার চিন্তিত করবে না এবং যাদেরকে ফেরেশতাগণ নিরাপত্তা দিয়ে বলবেন, এটি হলো সেই দিন, যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে।

المبحث الثاني: الإيمان باليوم الآخر

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: শেষ দিবসের প্রতি ঈমান

আখিরাত দিবসকে শেষ দিবস হিসাবে নামকরণ করার কারণ হলো, এটি দুনিয়ার দিনসমূহ শেষ হওয়ার পর সংঘটিত হবে। সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহ যেমন এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছে এবং সমস্ত নাবী-রসূল যেমন এর প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানিয়েছেন ঠিক তেমনি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও সৃষ্টিগত স্বভাবও এটি সংঘটিত হওয়ার কথা প্রমাণ করে।

আল্লাহ তা'আলা তার সম্মানিত কিতাব কুরআনুল কারীমে এ বিষয়ে খবর দিয়েছেন, তার পক্ষে দলীল কায়েম করেছেন এবং যারা শেষ দিবসকে অস্বীকার করে কুরআনের অধিকাংশ সূরায় তাদের প্রতিবাদ করেছেন। সমস্ত বনী আদম রবের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। এটি একটি সৃষ্টিগত বিষয়। প্রত্যেকেই রবের অস্তিত্বের স্বীকৃতি প্রদান করে এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করে। কিন্তু ফেরাউনের মতো অল্প সংখ্যক লোকই কেবল অহংকার বশত রবের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে। তবে আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়নের কথাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনেক মানুষ এটিকে অস্বীকার করে।

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু শেষ নাবী এবং তাকে যেহেতু ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে পাঠানো হয়েছে, তাই তিনি আখিরাত ও ক্বিয়ামতের বিষয়গুলো এমন খোলাসা করে বর্ণনা করেছেন, যা অন্যান্য আসমানী কিতাবে পাওয়া যাবে না। কুরআনুল কারীমে পুনরুত্থান দিবসের বিভিন্ন দলীল রয়েছে।

কখনো কখনো কুরআন বলছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত্যু দান করেন। অতঃপর তিনিই পুনরায় জীবিত করেন। যেমন তিনি মূসা 'আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা যখন বললো, আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে চাই, তখন বজ্রপাত তাদেরকে আক্রমণ করলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"তখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে এবং নিজেরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। অতঃপর মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনর্বার জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও"। (সূরা আল-বাকারা: ৫৫-৫৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾

"হে নাবী! তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে হাজারে হাজারে আপন ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করেছিল? অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা মৃত্যুবরণ করো। পরে তাদেরকে জীবিত করলেন"। (সূরা আল-বাকারা: ২৪৩)

আল্লাহ তা'আলা মৃতকে জীবিত করার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম বললো, হে আমার প্রতিপালক! কীভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করো আমাকে দেখাও। তিনি বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? সে বললো, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু আমার মনকে শান্তনা প্রদানের জন্য দেখতে চাই। তিনি বললেন, তবে চারটি পাখি ধরো এবং ঐগুলোকে তোমার বশীভূত করো (তা যবেহ করার পর টুকরা টুকরা করে সম্মিলিত করো)। তারপর তাদের একেক অংশ একেক পাহাড়ে নিক্ষেপ করো। অতঃপর ঐগুলোকে ডাক দাও। দেখবে ঐগুলো দ্রুত গতিতে তোমার নিকট এসে উপস্থিত হবে। জেনে রাখো যে, আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"। (সূরা আল-বাকারা: ২৬০)

আল্লাহ তা'আলা ঈসা 'আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আল্লাহর অনুমতিক্রমে মৃতদেরকে জীবিত করতেন। আসহাফে কাহাফ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, তাদেরকে তিনশত নয় বছর পর ঘুম থেকে জাগ্রত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা কখনো কখনো প্রথমবার সৃষ্টি করার মাধ্যমে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার দলীল পেশ করেছেন। কেননা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে সহজ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾

"হে লোক সকল! তোমরা যদি পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কর, তবে আমি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। এর পর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট গোশত পিণ্ড হতে, তোমাদের নিকট (আমার কুদরত) বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই"। (সূরা আল হজ্জ: ৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ "তাকে বলো, এদেরকে তিনি জীবিত করবেন যিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন"। (সূরা ইয়াসীন: ৭৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ "তারা নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবে, কে আমাদের আবার জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনবে? জবাবে বলো, তিনিই, যিনি প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা বানী ইসরাঈল: ৫১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই আবার তাকে পুনরুত্থিত করবেন এবং এটি তার জন্য সহজতর। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ গুণাবলি ও উদাহরণ তারই। তিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী"। (সূরা রোম: ২৭)

কখনো কখনো তিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করার মাধ্যমে পুনরুত্থানের দলীল প্রদান করেন। কেননা আসমান-যমীন সৃষ্টি করা মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টি করার চেয়ে সহজ। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোনো ক্লান্তিবোধ করেননি। তিনি মৃতকে জীবন দান করতে সক্ষম। তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান"। (সূরা আহকাফ: ৩৩)

কখনো কখনো পুনরুত্থানের উপর দলীল গ্রহণ করতে গিয়ে বলা হয় যে, তিনি অনর্থক কিছু সৃষ্টি করা থেকে পবিত্র। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

"তোমরা কি মনে করেছো আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে কখনো আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না?" (সূরা মুমিনুন: ১১৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ﴾

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি বীর্যরূপ এক বিন্দু নগণ্য পানি ছিল না যা (মায়ের জরায়ুতে) নিক্ষিপ্ত হয়? অতঃপর তা গোশতপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তার সুন্দর দেহ বানালেন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সুসামঞ্জস্য করলেন। তারপর তা থেকে নারী ও পুরুষ দু'রকম মানুষ বানালেন। সেই স্রষ্টা কি মৃতদের পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন?" (সূরা আল ক্বিয়ামাহ: ৩৬-৪০)

পার্থিব জীবনে কোনো কোনো মানুষ সৎকর্মশীল হয় আবার কোনো কোনো মানুষ মন্দ কর্মকারী হয়। তাদের কেউ কেউ নিজ কর্মের ফলাফল ভোগ করার পূর্বেই মারা যায়। এ জন্য আরেকটি জগৎ থাকা উচিত যেখানে মানুষের মাঝে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেখানে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলের বিনিময় পাবে।

আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ঈমানের অন্যতম রুকন। কুরআনের অনেক আয়াতে এ মর্মে দলীল রয়েছে। কখনো কখনো ঈমানের ছয়টি রুকনের সাথে আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়টিও জড়িয়ে উল্লেখ করা হয়। ঈমানের রুকনগুলো হচ্ছে: আল্লাহর প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, রসূলদের প্রতি ঈমান, আখিরাতের প্রতি ঈমান এবং তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান।[১৫০] উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছে জিবরীল 'আলাইহিস সালাম নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব প্রশ্ন করেছিলেন, তাতে ঈমানের উপরোক্ত রুকনগুলোর বিবরণ এসেছে।

কখনো কখনো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের সাথে আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়টি মিলিয়ে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

"যারা আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো"। (সূরা আত্ তাওবা: ২৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করে দিও না। ঐ লোকের মতো যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না"। (সূরা আল-বাকারা: ২৬৪)

আল্লাহ তা'আলা আখিরাত দিবসের বিশেষ মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য এবং তার বান্দাদেরকে সতর্ক করার জন্য একে অনেকগুলো নামে নামকরণ করেছেন। যাতে তারা এ দিবসের অকল্যাণকে ভয় করে। তাই আল্লাহ তা'আলা এর নাম রেখেছেন শেষ দিবস। কেননা এটি আসবে দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার পর। আখিরাত দিবসের পরে আর কোনো দিবস নেই। এর আরেকটি নাম হলো ক্বিয়ামত দিবস। কেননা এতে লোকেরা তাদের রবের সামনে উপস্থিত হবে। এর আরো যেসব নাম রয়েছে, তার মধ্যে আল-ওয়াকেয়া, আল-হাক্কাহ, আল-কারিআহ, আল-রাজিফাহ, আল-সাখ্খাহ, আল-আযিফাহ্, আলফাযাউল আকবার, ইয়াওমুল হিসাব, ইয়াওমুদ্দীন এবং আল-ওয়াদুল হাক্ক অন্যতম। এসব নাম

[১৫০] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮।

ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা, কঠিন বিপদ এবং তাতে মানুষ যেসব ভয়াবহ ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তার প্রমাণ বহন করে। এটি এমন দিন, যাতে দৃষ্টিসমূহ অবনত হবে, হৃদয়সমূহ স্বীয় স্থান থেকে সড়ে এসে কণ্ঠনালির কাছে চলে আসবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَا جَاءَتْ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾

"অতঃপর যখন কর্ণ বিদারক আওয়াজ আসবে। সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার স্ত্রী এবং তার সন্তানদের কাছ থেকেও। সেদিন প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে"। (সূরা আবাসা: ৩৩-৩৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (٨) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (٩) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (١٠) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (١١) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (١٣) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ﴾

"সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মতো এবং পর্বতসমূহ হবে রঙিন পশমের মতো। আর কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু অন্তরঙ্গ বন্ধুর খবর নিবে না। যদিও তাদেরকে একে অপরের দৃষ্টির সামনে রাখা হবে। অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে, স্ত্রী ও ভাইকে এবং তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠিকে, যারা তাকে আশ্রয় দিতো এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এ মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়"। (সূরা আল-মাআরিজ: ৮-১৪)

আখিরাত দিবসের প্রতি আমলই মানুষকে সৎকাজে এবং প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

"অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎ আমল করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে"। (সূরা আল-কাহাফ: ১১০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿٤٦﴾﴾

"তোমরা ধৈর্য ও ছ্বলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তা কঠিন বিষয়। তবে বিনয়ীগণের পক্ষে সেটা মোটেই কঠিন নয়। যারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয় তারা তাদের

প্রতিপালকের সাথে সম্মিলিত হবে এবং তারা তারই দিকে ফিরে যাবে"। (সূরা আল বাকারা: ৪৫-৪৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا ۝٧ وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرًا ۝٨ إِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمۡ جَزَآءٗ وَلَا شُكُورًا ۝٩ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوۡمًا عَبُوسٗا قَمۡطَرِيرٗا ۝١٠ فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمِ وَلَقَّىٰهُمۡ نَضۡرَةٗ وَسُرُورٗا ۝١١ ﴾

"তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূর প্রসারী এবং খাবারের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। তারা বলে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা তোমাদেরকে খাদ্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে কোনো প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশঙ্কা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ঙ্কর দিনের। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সে দিবসের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে উৎফুল্লতা ও আনন্দ দান করবেন"। (সূরা আল ইনসান/আদ দাহার: ৭-১১)

আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকতে এবং কঠিন আপদ-বিপদের সময় ছ্বর করতে উৎসাহিত করে। বাদশাহ তালুত এবং তার সেনাবাহিনী পরীক্ষার নদী পার হয়ে যখন তাদের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক শত্রুর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন কেবল তাদের মধ্যকার কতিপয় লোক সফলকাম হতে পেরেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ঘটনা সম্পর্কে বলেন,

﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

"অতঃপর তালুত ও তার সাথীরা যখন নদী পেরিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো তখন তারা তালুতকে বললো, আজ জালুত ও তার সেনাদলের মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু যারা একথা মনে করেছিল যে, তাদের একদিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হবে, তারা বললো, অনেকবারই দেখা গেছে, স্বল্প সংখ্যক লোকের একটি দল আল্লাহর হুকুমে একটি বিরাট দলের উপর বিজয় লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলা ছ্বরকারীদের সাথে রয়েছেন"। (সূরা আল বাকারা: ৪৯)

আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান না রাখাই মানুষকে কুফুরী, পাপাচার, যুলুম, শত্রুতা, সীমালঙ্ঘন ও ফিতনা-ফাসাদের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (٧) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

"নিশ্চয় যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, পার্থিব জীবন পেয়ে পরিতৃপ্ত থাকে, যারা এতেই নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে গাফেল, এরূপ লোকদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম তাদের কার্যকলাপের কারণে"। (সূরা ইউনুস: ৭-৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ ত্যাগ করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা হিসাবের দিবসকে ভুলে রয়েছে"। (সূরা সোয়াদ: ২৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾

"তুমি কি দেখেছো তাকে যে পরকালকে অস্বীকার করে? সে তো ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করে না"। (সূরা আল-মাউন: ১-৩)

যেসব সৎকর্ম আখিরাত দিবসের ভয়াবহ বিপদ থেকে বাঁচাবে আল্লাহ তা'আলা সেটা সম্পাদন করার মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

"যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে সেদিনকে ভয় করো। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত সৎকর্মের ও অপকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারো উপর যুলুম করা হবে না"। (সূরা আল বাকারা: ২৮১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾

"আর তোমরা সেদিনের ভয় করো, যেদিন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কোনো সুপারিশও কবুল হবে না; এবং তারা কোনো রকম সাহায্যও পাবে না"। *(সূরা আল বাকারা: ১২৩)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾

"হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো এবং সেই দিনকে ভয় করো যেদিন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না এবং সন্তানও কোনো উপকারে আসবে

না তার পিতার। নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে”। *(সূরা লুকমান: ৩৩)*

আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হলো মরণের পর যা হবে, যেমন কবরের আযাব, নিয়ামত, পুনরুত্থান, হিসাব, দাঁড়িপাল্লা স্থাপন, সৎকাজের ছাওযাব, পাপকাজের শাস্তি, জান্নাত, জাহান্নাম এবং ক্বিয়ামত দিবসের আরো যেসব বিশেষণ আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন তাতে বিশ্বাস করা।

أسماء اليوم الآخر

আখিরাত দিবসের নামসমূহ

দুনিয়ার পরে যেহেতু আখিরাত দিবস হবে, তাই এটিকে আখিরাত বা শেষ দিবস হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। কুরআনে আখিরাত দিবসের অনেক নাম রয়েছে:

(১) يوم البعث (পুনরুত্থান দিবস): কেননা তাতে পুনরুত্থান হবে এবং মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে।

(২) يوم الخروج (বের হওয়ার দিন): কেননা তাতে লোকেরা তাদের কবরসমূহ থেকে হাশরের উদ্দেশ্যে বের হবে।

(৩) يوم القيامة (দণ্ডায়মান দিবস): কেননা তাতে মানুষ হিসাবের জন্য আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে।

(৪) يوم الدين (বিচার দিবস): কেননা তাতে সমস্ত সৃষ্টির বিচার করা হবে এবং আমল অনুযায়ী তাদেরকে বদলা দেয়া হবে।

(৫) يوم الفصل (ফায়ছালা দিবস): কেননা তাতে মানুষের মধ্যে ন্যায়ভাবে ফায়ছালা করা হবে।

(৬) يوم الحشر (একত্রিত করার দিন): কেননা তাতে হিসাবের ময়দানে সমস্ত সৃষ্টিকে একত্র করা হবে।

(৭) يوم الجمع (সমাবেত দিবস): কেননা আল্লাহ তা'আলা তাতে বদলা দেয়ার জন্য সমস্ত মানুষকে একত্র করবেন।

(৮) يوم الحساب (হিসাবের দিন): কেননা তাতে সমস্ত মানুষের ঐসব আমলের হিসাব নেয়া হবে, যা তারা দুনিয়াতে করে থাকে।

(৯) يوم الوعيد (ভয়-ভীতি প্রদর্শনের দিন): কেননা তাতে কাফের-মুশরেকদের জন্য আল্লাহর ভয়-ভীতি বাস্তবায়ন হবে।

(১০) يوم الحسرة (পরিতাপের দিবস): কেননা তাতে কাফের-মুশরেক ও মুনাফেকরা অনুতপ্ত হবে।

(১১) يوم الخلود (অনন্ত জীবনের দিন): কেননা তাতে মানুষ চিরস্থায়ী অনাদি-অনন্ত জীবন লাভ করবে।

(১২) الدار الآخرة (সর্বশেষ বাসস্থান): কেননা আখিরাতের ঘর হবে দুনিয়ার ঘরের পরে এবং আখিরাতের ঘর থেকে অন্য কোনো ঘরে স্থানান্তরিত হওয়ার সুযোগ নেই।

(১৩) دار القرار (চিরস্থায়ী আবাস): কেননা এতে মানুষ চিরকাল থাকবে। এ ঘর ধ্বংস হবে না এবং এখান থেকে কেউ স্থানান্তরিতও হবে না।

(১৪) دار الخلد (স্থায়ী আবাস): কেননা তাতে মানুষ অনন্তকাল বসবাস করবে।

(১৫) الواقعة (নিশ্চিত ঘটনা): কেননা সেটা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

(১৬) الحاقة (সত্য ঘটনা): কেননা সেটা অন্যায়ভাবে প্রত্যেক ঝগড়াটে ও বাক-বিতন্ডাকারীকে পরাজিত করবে। এই দিনে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে এবং এদিনও বাস্তবে সংঘটিত হবে। তাই এটাকে আলহাক্কাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(১৭) القارعة (বিকট আওয়াজ): কেননা সেটা কর্ণ ও অন্তরসমূহে বিকট আওয়াজ প্রদান করবে।

(১৮) الغاشية (আচ্ছন্নকারী): কেননা এদিনের ভয়াবহ বিপদ জিন-ইনসান সকলকেই আচ্ছাদিত করে ফেলবে।

(১৯) الطامة (ভয়ানক বিপদ): কেননা ক্বিয়ামতের বিপদ অন্যান্য সমস্ত বিপদাপদের চেয়ে ভয়াবহ।

(২০) الآزفة (আসন্ন দিবস): অর্থাৎ অতি নিকটবর্তী দিবস। আখিরাত দিবসকে এ নামে নামকরণ করার মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য যে, সেটা অতি নিকটে।

(২১) يوم التغابن (লোকসানের দিন): কেননা তাতে জান্নাতীগণ লাভবান হবে এবং জাহান্নামীরা লোকসানে পড়বে।

(২২) يوم التناد (আহবান দিবস): কেননা এদিন প্রত্যেক মানুষকেই তার আমলনামাসহ ডাকা হবে। এদিন পরস্পর ডাকাডাকি করবে। জান্নাতীগণ জাহান্নামীদেরকে ডাকবে, জাহান্নামীগণ জান্নাতীদেরকে আহ্বান করবে এবং আরাফ তথা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানের লোকেরাও ডাকাডাকি করবে।

الموت: القيامة الصغرى

মৃত্যু: ছোট ক্বিয়ামত

মৃত্যু আখিরাত দিবসের ভূমিকা স্বরূপ। এটি হলো ছোট ক্বিয়ামত। প্রত্যেক মানুষের আয়ু শেষ হয়ে গেলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এটি তার জন্য ছোট ক্বিয়ামত। এর মাধ্যমেই বান্দা দুনিয়া থেকে আখিরাতের দিকে পাড়ি জমায়। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে বারবার মাওতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি স্বরূপ সৎ আমল সম্পাদন করে এবং খারাপ কাজ থেকে তাওবা করে। কেননা মরণ এসে গেলে আমল করার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। মৃত্যু এসে গেলে মোটেই অবকাশ দেয়া হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে। যারা এমন করবে (উদাসীন হবে) তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তোমরা তা হতে ব্যয় করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই। অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও না কেন? দিলে আমি ছ্বদাকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকেও অবকাশ

দিবেন না। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত"। (সূরা মুনাফিকূন: ৯-১১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾

"প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ পেতে হবে। তারপর তোমাদের সবাইকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে"। (সূরা আল আনকাবুত: ৫৭) সুতরাং মৃত্যু হলো ছোট ক্বিয়ামত। আর ছোট ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বড় ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা একই সূরাতে ছোট ক্বিয়ামত ও বড় ক্বিয়ামতের আলোচনা করেছেন। যেমন সূরা আল-ওয়াকেয়ার শুরুতে বড় ক্বিয়ামতের কথা আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি বলেছেন যে, মানুষ সেদিন তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (٢) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (٣) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (٤) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (٥) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (٦) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾

"যখন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। তখন এর সংঘটন অস্বীকার করার আর কেউ থাকবে না। ওটা কাউকে করবে নীচ, কাউকে করবে সমুন্নত। যখন প্রবল কম্পনে পৃথিবী প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তখন ওটা উৎক্ষিপ্ত ধূলিকনায় পরিণত হবে এবং তোমরা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে"। (সূরা আল-ওয়াকেয়া: ১-৭)

অতঃপর সূরার শেষাংশে ছোট ক্বিয়ামত তথা মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পরও লোকেরা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (٨٣) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (٨٤) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (٨٥) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨٦) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٧) فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (٨٩) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾

"তবে কেন নয়; প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় এবং তখন তোমরা তাকিয়ে দেখো। আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতম। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। তবে কেন নয়; যদি তোমরা প্রতিদান প্রাপ্ত না হও। তবে তোমরা ওটা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন হয়। তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম রিযিক ও নিয়ামতময় জান্নাত। আর সে যদি হয় ডান দিকের একজন। তাহলে তাকে

সাদর অভিনন্দন জানানো হবে এভাবে যে, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আর সে যদি হয় অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের একজন, তাহলে তার সমাদরের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানি এবং জাহান্নামের দহন"। (সূরা আল-ওয়াকেয়া: ৮৩-৯৪)

মৃত্যুর সময় মানুষের রূহ তার দেহ থেকে আল্লাহর আদেশে কবয করা হয়। রূহ কবয করার বিষয়টি কখনো আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"মৃত্যুর সময় আল্লাহই রূহসমূহ কবয করেন। আর যে এখনো মরেনি নিদ্রাবস্থায় তার রূহ কবয করেন। অতঃপর যার মৃত্যুর ফায়ছালা কার্যকরী হয় তাকে রেখে দেন এবং অন্যদের রূহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত পাঠান। যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য এর মধ্যে বড় নিদর্শন রয়েছে"। (সূরা আয যুমার: ৪২)

আবার কখনো রূহ কবয করার বিষয়টি ফেরেশতাদের প্রতি সম্বন্ধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾

"তিনি নিজের বান্দাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তোমাদের উপর রক্ষক নিযুক্ত করে পাঠান। অবশেষে যখন তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন তার প্রেরিত ফেরেশতারা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজেদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তারা সামান্যতম শৈথিল্যও প্রদর্শন করে না"। (সূরা আল আনআম: ৬১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾

"আর যদি তুমি দেখতে যখন ফেরেশতারা কাফেরদের জান কবয করার সময় তাদের মুখে এবং তাদের পশ্চাৎদেশে প্রহার করতে করতে বলবে, তোমরা জ্বলন্ত আগুনের আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো"। (সূরা আল আনফাল: ৫০) আবার কখনো মালাকুল মাওতের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾

“এদেরকে বলে দাও, মৃত্যুর যে ফেরেশতাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে সে তোমাদেরকে পুরোপুরি তার কবযায় নিয়ে নেবে এবং তারপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে”। (সূরা সাজদাহ: ১১)

মূলত আয়াতগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। এ আয়াতগুলোতে রূহ কবয করাকে প্রত্যেকের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোন থেকে। আল্লাহ তা'আলাই মওতের ফায়ছালা করেছেন এবং সেটা নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণ ও আদেশ অনুযায়ী মৃত্যু হয়। সে হিসাবে মৃত্যুকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। মালাকুল মাওত যেহেতু রূহ কবয করা ও দেহ থেকে সেটাকে বের করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। অতঃপর মালাকুল মাওতের নিকট থেকে রহমতের ফেরেশতারা অথবা আযাবের ফেরেশতারা নিয়ে নেয়। এরপর তারাই রূহের দায়িত্ব নিয়ে নেয়। তাই প্রত্যেকের প্রতি রূহ কবয করার সম্বন্ধ করা হয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে।

التوفي بالنوم والتوفي بالموت

নিদ্রার মাধ্যমে রূহ কবয করা এবং মৃত্যুর মাধ্যমে তা কবয করা

“যে রূহটি মাতৃগর্ভে ফুঁকে দেয়া হয়, যা দেহকে সচল রাখে এবং সেটিই মৃত্যুর সময় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এটিই নিদ্রার সময় দেহ থেকে আলাদা হয়। একবার নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বলাতের সময় যখন ঘুমিয়েছিলেন, তখন জাগ্রত হয়ে বলছিলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা আমাদের রূহগুলো কবয করে নিয়েছেন এবং যখন ইচ্ছা ফেরত দিয়েছেন। বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! যিনি আপনার জান কবয করে নিয়েছিলেন, তিনি আমার জানও কবয করে নিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

“মৃত্যুর সময় আল্লাহই রূহসমূহ কবয করেন আর যে এখনো মরেনি নিদ্রাবস্থায় তার রূহ কবয করেন। অতঃপর যার মৃত্যুর ফায়ছালা কার্যকরী হয় তাকে রেখে দেন এবং অন্যদের রূহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত পাঠান। যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য এর মধ্যে বড় নিদর্শন রয়েছে”। (সূরা আয যুমার: ৪২)

ইবনে আব্বাস এবং অধিকাংশ মুফাস্সির বলেন, আল্লাহ তা'আলা দুইভাবে রূহ কবয করেন। মৃত্যুর মাধ্যমে এবং ঘুমের মাধ্যমে। অতঃপর ঘুমের মধ্যেই যাদের হায়াত শেষ

হয়ে যায়, তাদের জান ঘুমের মধ্যেই কবয করা হয়। আর যাদের হায়াত অবশিষ্ট থাকে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ করার জন্য। অতঃপর মৃত্যুর সময় তাদের মৃত্যু আগমন করে।

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘুমানোর সময় বলতেন,

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

“হে আমার রব! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখছি। তোমার নামে তা বিছানা থেকে উঠাচ্ছি। তুমি যদি আমার রূহ আটকিয়ে রাখো, তাহলে তুমি তাকে ক্ষমা করো, তাকে রহম করো এবং তুমি যদি তাকে ছেড়ে দাও, তাহলে তাকে তুমি সেভাবে হেফাযত করো, যেভাবে তুমি তোমার সৎ বান্দাদেরকে হেফাযত করে থাকো”।[১৫১]

উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরের ব্যাপারে মুফাসসিরদের দু’টি মতের এটি একটি মত। যে রূহকে আটকিয়ে রাখা হয় এবং যাকে ছেড়ে দেয়া হয়, তাদের উভয়টিকে ঘুমের মধ্যে মৃত্যু দেয়া হয়। যার ঘুমের মধ্যে বয়স পূর্ণ হয়ে যায়, আল্লাহ তা‘আলার তার রূহ আটকিয়ে রাখেন; তাকে তার দেহের নিকট ফেরত দেন না। আর যে ব্যক্তি তার বয়স ঘুমের মধ্যে পূর্ণ করে না, তার রূহ দেহের মধ্যে ফেরত দেন”।

অন্য মতটি হলো, যার রূহ ঘুমের মধ্যে আটকিয়ে দেয়া হয়, তাকে প্রথমত ঘুমের মধ্যে মৃত্যু দেয়া হয় অতঃপর চিরতরে মৃত্যু দেয়া হয়। আর যাকে ছেড়ে দেয়া হয়, তাকে শুধু ঘুমের মৃত্যু দেয়া হয়। এর ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ তা‘আলা ঘুমের ঘোরে মৃতের রূহ কবয করেন এবং আটকিয়ে রাখেন। ক্বিয়ামতের পূর্বে তাকে ছাড়বেন না। ঘুমন্ত ব্যক্তির প্রাণ কবয করেন। অতঃপর জাগ্রত হওয়ার সময় সেটাকে তার দেহের মধ্যে ছেড়ে দেন। যাতে করে সে তার অবশিষ্ট হায়াত পূর্ণ করতে পারে। পরিশেষে তার অপর একটি মৃত্যু হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

“তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যা কিছু করো তা জানেন। আবার পরদিন তোমাদের সেই কর্মজগতে ফেরত পাঠান, যাতে জীবনের নির্ধারিত সময়-কাল পূর্ণ হয়। পরিশেষে তারই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি জানিয়ে দিবেন তোমরা কি কাজে লিপ্ত ছিলে”। (সূরা আল আনআম: ৬০)

[১৫১] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৩২০।

حقيقة الروح

রূহের হাকীকত

“শাইখুল ইসলাম (মাজমূউল ফাতাওয়া ১৩/৩৪১) ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ছাহাবী, উত্তমভাবে তাদের অনুসরণকারী এবং উম্মতের সমস্ত সালাফ ও সুন্নাতের ইমামগণের মতে রূহ স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি সত্তা। এটি দেহ থেকে আলাদা হয়, নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়, কষ্ট পায়। দেহ এবং রূহ একই সত্তা নয়, রূহ শরীরের কোনো অংশও নয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) এবং অন্যান্য ইমাম এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কথা বলেছেন। ইমামের অনুসারীগণ এ বিষয়ে কোনো মতভেদ করেননি।

শাইখুল ইসলাম (মাজমূউল ফাতাওয়া ৯/৩০৩) আরো বলেন, সঠিক কথা হলো রূহ মূল্যবান কিংবা সাধারণ কোনো ধাতু যেমন মণি-মুক্তা বা অন্য কিছু দ্বারা গঠিত নয় এবং এর কোনো কায়াও নেই। সেই সঙ্গে রূহ আমাদের পরিচিত দেহগুলোর মতো বিশেষ স্বভাব-প্রকৃতি সম্পন্ন কোনো সৃষ্টি নয়। রূহ এর দিকে ইঙ্গিত করার ব্যাপারে কথা হলো এর দিকে ইঙ্গিত করা যায়, রূহ উপরে উঠে, অবতরণ করে, দেহ থেকে বের হয় এবং তাতে চলাচল করে। শরী‘আতের দলীল-প্রমাণ দ্বারা এটি যেমন প্রমাণিত, তেমনি বিবেক-বুদ্ধির দলীল দ্বারাও সাব্যস্ত।

কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, রূহ দেহের কোথায় অবস্থান করে? তার জবাবে বলা হবে যে, রূহএর জন্য দেহের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই। বরং এটি দেহের মধ্যে চলাচল করে যেমন হায়াত বা জীবনী শক্তি শরীরের সবখানেই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং রূহ বিদ্যমান থাকার শর্তে প্রাণীর হায়াত বিদ্যমান থাকে। শরীরে রূহ থাকলে সেটাতে হায়াত থাকে। শরীর থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে হায়াতও শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

الروح مخلوقة

রূহ একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি

শাইখুল ইসলাম (মাজমূউল ফাতাওয়া ৪/২১৬) ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উম্মাতের সালাফগণ, ইমামগণ এবং সমস্ত আহলে সুন্নাতের ঐক্যমতে মানুষের রূহ একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। মুসলিমদের একাধিক ইমাম এটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের ইজমা বর্ণনা করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রূহ যে একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি অনেক পদ্ধতিতেই তা সাব্যস্ত করা যায়। অতঃপর তিনি ১২টি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন।

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ "প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ" এ কথার মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, كل شيئ এর মধ্যে যে عموم (ব্যাপকতা) রয়েছে মানুষের রূহও তার অন্তর্ভুক্ত। তাই রূহও আলাদা একটি সৃষ্টি। সুতরাং উপরোক্ত ব্যাপকতা থেকে কোনোভাবেই রূহকে আলাদা করা হয়নি। তবে আল্লাহর ছিফাতগুলো উপরোক্ত ব্যাপকতার মধ্যে গণ্য নয়। কেননা সেগুলো তার অতি সুন্দর নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা পূর্ণতার বিশেষণে বিশেষিত একক মাবুদ। তার পবিত্র সত্তা পূর্ণতার বহু গুণে গুণান্বিত। তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি ছাড়া বাকীসব সৃষ্টি।

(২) আল্লাহ তা'আলা যাকারীয়া (আলাইহিস সালাম) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

﴿كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾

"এভাবেই হবে। তোমার রব বলেন, এ তো আমার জন্য সামান্য ব্যাপার মাত্র। এর আগে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি। তখন তুমি কিছুই ছিলে না"। (সূরা মারইয়াম: ৯)

দেহ এবং রূহকে একসাথে মিলিয়ে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে যাকারীয়া (আলাইহিস সালাম) এর রূহ ও দেহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, সে কিছুই ছিল না, অতঃপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। শুধু তার শরীরকে সম্বোধন করা হয়নি। রূহ বিহীন শরীর সম্বোধন বুঝে না। তাই তাকে সম্বোধন করে কিছু বলা হয় না এমনকি তার বিবেক-বুদ্ধিও থাকে না। সুতরাং কেবল মাত্র রূহ সম্বোধন বুঝে, অনুধাবন করে এবং তাকে সম্বোধন করা হয়।

(৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾

"আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদেরকে মানবাকারে রূপদান করি, অতঃপর ফেরেশতাদেরকে বলি, তোমরা আদমকে সেজদাহ করো। তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সেজদাহ করলো। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না"। (সূরা আল-আরাফ: ১১)

এ সংবাদটি আমাদের রূহসমূহ এবং দেহসমূহ সৃষ্টি করাকেও শামিল করে। যেমন বলেছেন অধিকাংশ আলেম। অথবা শুধু রূহের ব্যাপারে এটি বলা হয়েছে দেহ সৃষ্টি করার আগেই। যেমন এক শ্রেণির লোক ধারণা করে থাকে। উভয় অবস্থাতেই উক্ত সম্বোধনটি রূহ সৃষ্টি করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট।

(৪) কুরআন ও ছ্বহীহ হাদীছের সুস্পষ্ট দলীলগুলো প্রমাণ করে যে, রূহ ও শরীর মিলেই মানুষ আল্লাহর বান্দায় পরিণত হয়। রূহ ব্যতীত শুধু দেহের উপর আবদ তথা বান্দা কথাটি প্রযোজ্য হয় না। বরং রূহের ইবাদতই হলো মূল আর শরীর হলো তার অনুগামী। এমনিভাবে শরী'আতের হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রেও রূহকে সম্বোধন করা হয়েছে। শরীরও তার অনুগামী। রূহ মানুষকে পরিচালিত করে এবং যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করে। সুতরাং ইবাদতের ক্ষেত্রেও দেহ রূহএর অনুগামী।

(৫) আল্লাহ তা'আলা সূরা দাহারের প্রথম আয়াতে বলেন,

﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾

"মানুষের উপরে কি অন্তহীন মহাকালের এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়নি যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না?"। সুতরাং মানুষের রূহ যদি অনন্ত-অবিনশ্বর অসৃষ্ট সত্তা হতো, তাহলে তার ব্যাপারে এটি বলা হতো যে, সে সর্বদাই ছিল। সুতরাং মানুষ হয় রূহ সহকারে; শুধু দেহকে মানুষ বলা হয় না।

(৬) ছ্বহীহ বুখারী এবং অন্যান্য কিতাবে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, তিনি বলেন, আমি নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ»

"রূহগুলো সমবেত একটি সেনাবাহিনীর মত। রূহজগতে এগুলোর মধ্য থেকে যারা পরস্পর পরিচিত থাকে, তারা দুনিয়াতে এসেও পরস্পরের সাথে মিলিত হয় এবং যারা রূহজগতে পরস্পর অপরিচিত থাকে, দুনিয়াতে এসেও তাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়"। সমবেত রূহগুলো মাখলুক ছাড়া অন্য কিছু নয়।

(৭) রূহএর অন্যতম বিশেষণ এ যে, সেটা মৃত্যু বরণ করে, সেটাকে কবয করা হয়, আটকিয়ে রাখা হয় এবং পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ বিশেষণগুলো কেবল নশ্বর ও প্রতিপালিত সৃষ্টির জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে।

كيفية قبض روح المتوفى وما لها بعد وفاته

রূহ কবয করার পদ্ধতি এবং মৃত্যুর পর তার গন্তব্যস্থল

বারা ইবনে আযিবের দীর্ঘ হাদীছের মধ্যে রূহ কবয করা এবং মৃত্যুর পর তার গন্তব্যস্থলের বিবরণ এসেছে। হাদীছের পূর্ণ বিবরণ নিম্নরূপ:

বারা ইবনে আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাথে বাকী গোরস্থানে জনৈক আনসারী ছাহাবীর জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য বের হলাম। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিবলামুখী হয়ে বসে পড়লেন। আমরাও তার চারপাশে বসে গেলাম। আমরা তখন এত নিরবতা অবলম্বন করেছিলাম যে, মনে হচ্ছিল, আমাদের মাথায় যেন পাখি বসে আছে। তার হাতে ছিল একটি কাঠি। তখনো কবরের খনন কাজ চলছিল। কাঠি দিয়ে তিনি মাটিতে খোঁচাচ্ছিলেন এবং একবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলেন আবার যমীনের দিকে মাথা অবনত করছিলেন। তিনবার তিনি দৃষ্টি উঁচু করলেন এবং নীচু করলেন। অতঃপর বললেন, “তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাও”। কথাটি দু’বার অথবা তিনবার বললেন। অতঃপর তিনবার এ দু’আটি পাঠ করলেন,

« أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

“আমি আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।” তারপর তিনি বললেন, মুমিন বান্দার নিকট যখন দুনিয়ার শেষ দিন এবং আখিরাতের প্রথম দিন উপস্থিত হয় তখন আকাশ থেকে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেশতা উপস্থিত হন। তাদের সাথে থাকে জান্নাতের পোশাক এবং জান্নাতের সুঘ্রাণ। মুমিন ব্যক্তির চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তারা ততোদূরে বসে থাকেন। এমন সময় মালাকুল মাউত উপস্থিত হয় এবং তার মাথার পাশে বসে বলতে থাকে, হে পবিত্র আত্মা! তুমি আপন প্রভুর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে আসো। এ কথা শুনার পর মুমিন ব্যক্তির রূহ্ অতি সহজেই বের হয়ে আসে। যেভাবে কলসীর মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে থাকে। অতঃপর মালাকুল মাওত রূহ কবয করে।

রূহ কবয করার পর ফেরেশতাগণ সেটাকে মালাকুল মাওতের হাতে চোখের পলক পরিমাণ সময়ও রাখেন না। অর্থাৎ রূহ বের হওয়ার সাথে সাথে ফেরশতাগণ তাকে উপরোক্ত সুঘ্রাণযুক্ত কাপড়ে জড়িয়ে নেন। তা থেকে এমন সুঘ্রাণ বের হতে থাকে যার চেয়ে উত্তম সুঘ্রাণ আর হতে পারে না। তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ আকাশের দিকে উঠে যায়। যেখান দিয়েই তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানেই ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করেন, এটা কার পবিত্র আত্মা? উত্তরে অতি উত্তম নাম উচ্চারণ করে বলা হয় অমুকের পুত্র অমুকের। আকাশে পৌঁছে গিয়ে দরজা খুলতে বলা হলে তা খুলে দেয়া হয়। তার সাথে প্রথম আকাশের ফেরেশতাগণ দ্বিতীয় আকাশ পর্যন্ত গমন করেন। এভাবেই এক এক করে সপ্তম

আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার নামটি ইল্লিয়ীনের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে দাও। অতঃপর তাকে নিয়ে যমীনে ফিরে যাও। কেননা আমি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। মাটির মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে দিবো এবং সেখান থেকে তাকে পুনরায় জীবিত করবো।

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন কবরে তার আত্মা ফেরত দেয়া হয়। ওখানে দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার প্রতিপালক কে? তিনি উত্তরে বলেন, আমার প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ। আবার জিজ্ঞাসা করেন, দুনিয়াতে তোমার দীন কী ছিল? তিনি উত্তর দেন, আমার দীন হচ্ছে ইসলাম। পুনরায় তাকে প্রশ্ন করেন, তোমাদের কাছে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল তিনি কে? জবাবে তিনি বলেন, তিনি হলেন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তখন ফেরেশতা দু'জন তাকে বলেন, তুমি কীভাবে তা জানতে পারলে? তিনি তখন বলেন, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি। অতঃপর তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি এবং সেটাকে বিশ্বাস করেছি।

তখন আকাশ থেকে মহান আল্লাহ ঘোষণা করতে থাকেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্যে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও, সে যেন জান্নাতের বাতাস ও সুঘ্রাণ পেতে পারে। তার কবরটি তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন একজন সুন্দর আকৃতি ও উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোক উত্তম পোশাক পরিধান করে এবং সুঘ্রাণে সুরভিত হয়ে তার কাছে আগমন করেন এবং বলেন, তুমি খুশি হয়ে যাও। তোমার সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা আজ পূর্ণ করা হবে। মুমিন ব্যক্তি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তুমি? তোমার চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে তুমি কোনো না কোনো সুখবর নিয়ে এসেছো। তিনি বলেন, আমি তোমার সৎ আমল। তখন মুমিন ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহ! তুমি এখনই ক্বিয়ামত সংঘটিত করো। আমি আমার পরিবারের সাথে মিলিত হবো। তখন তাকে বলা হয় তুমি এখানে আরামে বসবাস করতে থাক। তোমার কোনো চিন্তা ও ভয় নেই।

[মৃত্যুর সময় কাফেরদের করুণ অবস্থা]

অপর পক্ষে কাফের ব্যক্তির যখন দুনিয়া হতে বিদায় নেয়ার সময় হয় তখন কালো বর্ণের একদল ফেরেশতা এসে উপস্থিত হয়। তাদের সাথে থাকে দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়। চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তারা তথায় বসে থাকে। তারপর মালাকুল মাওত এসে তার মাথার পাশে বসেন। তাকে বলেন, ওহে অপবিত্র আত্মা! বেরিয়ে আয় আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির দিকে।

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কাফের, মুনাফেক ও পাপিষ্ঠ লোকের আত্মা তখন দেহের মাঝে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ফেরেশতা তাকে এমনভাবে

টেনে বের করে যেমনিভাবে লোহার পেরেককে ভেজা পশমের মধ্য থেকে টেনে বের করা হয়। তার রূহ্ বের হওয়ার সময় শরীরের রগসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। রূহ বের করার পর ফেরেশতাগণ তাকে মালাকুল মাওতের হাতে চোখের পলক পরিমাণ সময়ও রাখেন না। তারা তাকে উক্ত দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়ে রাখেন। তা থেকে মরা-পঁচা মৃত দেহের দুর্গন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। ফেরেশতাগণ তাকে আকাশের দিকে উঠাতে থাকে। যেখান দিয়েই গমন করে সেখানকার ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করেন, এ অপবিত্র আত্মা কার? উত্তরে ফেরেশতাগণ অতি মন্দ নাম উচ্চারণ করে বলতে থাকেন, অমুকের পুত্র অমুকের। দুনিয়ার আকাশে পৌঁছে তার জন্য আকাশের দরজা খুলতে বলা হলে আকাশের দরজা খোলা হয় না। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾

"তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে"। (সূরা আল আ'রাফ: ৪০)

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তার নাম সাত যমীনের নীচে সিজ্জীনে লিখে দাও। অতঃপর তার রূহ যমীনের যেখানে দাফন করা হয়েছে সেখানে নিক্ষেপ করা হয়। এরপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করল সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল। অতঃপর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো"। (সূরা আল হজ্জ: ৩১)

অতঃপর তার রূহকে দেহে ফেরত দেয়া হয়। তখন দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোর প্রভু কে? সে উত্তর দেয়, আফসোস! আফসোস! আমি জানি না। আবার জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কাছে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল তার সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? সে উত্তরে বলে, হায় আফসোস! হায় আফসোস! আমি তাও জানি না। তখন আকাশ থেকে এক ঘোষক ঘোষণা করেন, এ লোক মিথ্যা বলছে। তাকে জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও। যাতে তার কাছে জাহান্নামের গরম বাতাস ও তাপ পৌঁছতে পারে। তার কবর অতি সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। মাটি তাকে এমনভাবে চেপে ধরে যাতে তার এক পার্শ্বের হাড্ডী অপর পার্শ্বে ঢুকে যায়।

অতঃপর কালো চেহারা বিশিষ্ট, কালো পোশাক পরিহিত ও দুর্গন্ধযুক্ত এক ভয়ানক আকারের লোক এসে বলতে থাকে, তুই দুঃখের সংবাদ গ্রহণ কর্। ধ্বংস হোক তোর! আজ তোর সেই দিন যার অঙ্গিকার তোর সাথে করা হয়েছিল। তখন কাফের বা মুনাফেক ব্যক্তি বলে, তোমার পরিচয় কী? তোমার চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে তুমি কোনো দুঃখের

সংবাদ নিয়ে এসেছো। উত্তরে লোকটি বলে, আমি তোর্ সেই খারাপ আমল যা তুই দুনিয়াতে করেছিলে। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! ক্বিয়ামত যেন না হয়।[১৫২] ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, হাকেম, আবু আওয়ানা ও ইবনে হিব্বান হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে কবরের এ ভয়াবহ আযাব থেকে হেফাযত করেন। আমীন

আক্বীদা ত্বহাবীয়ার ভাষ্যকার ইমাম ইবনে আবীল ইয্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বারা ইবনে আযিবের উপরোক্ত হাদীছ থেকে যা আবশ্যক হয়, সমস্ত আহলুস্ সুন্নাহ ও মুহাদ্দিছগণ তাই গ্রহণ করেছেন। ছ্বহীহ বুখারীতে উক্ত হাদীছের সমর্থন রয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তির রূহ কবয করার ব্যাপারে উপরোক্ত যে হাদীছে বলা হয়েছে, মুমিনের রূহ ঐ আসমানে উঠানো হয় যেখানে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন রয়েছেন, তা একটি প্রসিদ্ধ হাদীছ। এর সনদ ভালো। হাদীছে রয়েছে যে, فيها الله যাতে রয়েছেন আল্লাহ! এ কথাটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের বাণীর মতই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾

"তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছ যে, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেবেন? অতঃপর ভূপৃষ্ঠ জোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে, কিংবা যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করবেন, এ ব্যাপারেও কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার ভীতি প্রদর্শন কেমন? (সূরা আল মুলক: ১৬-১৭)[১৫৩]

---

[১৫২] মুসনাদে আহমাদ, বারা ইবনে আযীবের হাদীছ।

[১৫৩] আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত মাখলুকের উপরে সমুন্নত, এ মর্মে আরো অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾

"তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, যিনি তাদের উপরে আছেন"। (সূরা আন নাহ্ল: ৫০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾

"ফেরেশতা এবং রূহ (জিবরীল) তাঁর দিকে উর্ধ্বগামী হয়"। (সূরা মাআরেজ: ৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ﴾

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মানুষের বারযাখী জীবনে রূহগুলোর আবাসস্থলে তাদের পদমর্যাদার অনেক পার্থক্য রয়েছে। এক শ্রেণির রূহ থাকে উর্ধ্বজগতের ইল্লিয়্যীনের সর্বোচ্চ স্থানে মর্যাদাবান ফেরেশতাদের সাথে। এগুলো হলো নাবী-রসূলদের রূহ। তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ছ্বলাত ও সালাম বর্ষিত হোক। নাবীগণের রূহগুলোও পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা সম্পন্ন হয়ে থাকে। মিরাজের রাতে নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখে এসেছেন।

মানুষের রূহ আলাদা একটি সৃষ্টি হওয়ার আরেকটি দলীল হলো, এক শ্রেণির রূহ সবুজ রঙের পাখির পেটের মধ্যে থাকে এবং জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে। এরা হলো কতিপয় শহীদের রূহ। সমস্ত শহীদের রূহ নয়। কেননা কতিপয় শহীদের রূহকে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বাধা প্রদান করা হবে। তার উপর ঋণ থাকার কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে।

কিছু কিছু রূহকে জান্নাতের দরজায় আটকিয়ে রাখা হবে।

কারো রূহ কবরে আটকা থাকে। যেমন চাদর ওয়ালার হাদীছে এসেছে যে, জনৈক ব্যক্তি কোনো এক যুদ্ধে গণীমতের মাল হতে একটি চাদর লুকিয়ে রেখেছিল। পরবর্তীতে সে যখন শহীদ হলো, লোকেরা তখন বলতে লাগলো, জান্নাত তার জন্য আনন্দ দায়ক হোক! নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, তা নয়; বরং ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, সে যে চাদরটি খেয়ানত করেছিল, তা আগুনে পরিণত হয়ে তাকে কবরে দহন করছে"।

কোনো কোনো রূহ জান্নাতের গেইটে অবস্থান করে। যেমন ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর হাদীছে এসেছে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهَرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

শহীদদের রূহ জান্নাতের দরজায় উজ্জ্বল-পরিচ্ছন্ন একটি নদীর কিনারায় সবুজ রঙের বাগানে থাকবে। জান্নাত থেকে তাদের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় রিযিক আসতে থাকবে।[১৫৪]

কিছু কিছু রূহ যমীনেই আটকা থাকে। উর্ধ্বজগতে উন্নীত হয় না। কেননা সেটি ছিল নিম্নজগতের জগতের সাথে সম্পৃক্ত রূহ। নিম্নজগতের রূহ কখনো উর্ধ্বজগতের রূহের সাথে মিলিত হয় না। যেমন উর্ধ্বজগতে উন্নীত হওয়ার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত রূহগুলো যমীনে থাকা অবস্থায় নিম্নজগতের রূহগুলোর সাথে কখনো মিলিত হয় না। যে রূহগুলো দুনিয়াতে থাকা

"আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন"। (সূরা সাজদাহ: ৫)

কুরআন ও সুন্নাহয় এ রকম আরো অনেক দলীল রয়েছে। কোন কোন আলেম এ বিষয়ে একহাজার দলীল উল্লেখ করেছেন। জানা থাকা আবশ্যক যে, সৃষ্টির উপরে হওয়া আল্লাহর সত্তাগত ছিফাত। কোন অবস্থায়ই তা আল্লাহ থেকে আলাদা হয় না।

[১৫৪] হাসান: মুসনাদে আহমাদ ২৩৯০।

অবস্থায় তাদের প্রভুর মারেফত, তার মুহাব্বত, তার যিকির, তার ঘনিষ্টতা এবং তার নৈকট্য হাসিল করতে পারে না; বরং তা নিম্নজগতের যমীনের রূহ হিসাবেই থেকে যায়, সেগুলো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর যমীনেই থেকে যায়। যেমন উর্ধ্বজগতের রূহগুলো যমীনে থাকা অবস্থায় আল্লাহর ভালোবাসা, তার যিকির, তার নৈকট্য এবং তার ঘনিষ্টতা অর্জনে ব্যস্ত থাকে, তেমনি সেগুলো দেহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর উর্ধ্বজগতের ঐসমস্ত রূহের সাথে মিশে যায়, যাদের সাথে থাকা তার জন্য শোভনীয় হয়। সুতরাং দুনিয়ার জীবনে মানুষ যাকে ভালোবাসে, বারযাখী জীবনে ও ক্বিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে। আল্লাহ তা'আলা রূহগুলোর কতককে অন্য কতকের সাথে বারযাখী জগতে এবং পুনরুত্থান দিবসে মিলিয়ে দিবেন। যেমন উপরে বর্ণিত হাদীছে অতিক্রান্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মুমিনকে পবিত্র আত্মার সাথে রাখবেন, যা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। অতএব রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তার অনুরূপ আকৃতির রূহের সাথে, তার সমজাতীয় রূহের সাথে এবং অনুরূপ আমলকারীর সাথে মিলবে। তারা সেখানে একসঙ্গে থাকবে।

কিছু কিছু রূহ আছে, যারা যেনাকারী ও যেনাকারীনীদের জন্য নির্ধারিত আগুনের চুলার মধ্যে থাকবে এবং সুদখোরদের রূহসমূহ রক্তের নদীতে সাঁতার কাটবে, তাদের মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যবান সমস্ত রূহের ঠিকানা একস্থানে হবে না। বরং কিছু রূহ থাকবে ইল্লিয়্যীনে আর কিছু থাকবে যমীনের নীচে সিজ্জীনে। এরা উপরে উঠবে না, যমীনেই থাকবে ও শাস্তি পাবে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, তুমি যদি এ সম্পর্কিত হাদীছগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করো এবং তার প্রতি যদি গুরুত্ব প্রদান করো, তাহলে তার দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে জানতে পারবে। তুমি এটি মনে করবে না যে, এ মর্মে বর্ণিত ছ্বহীহ হাদীছগুলো পরস্পর বিরোধী। কেননা সবগুলো হাদীছের বিষয়বস্তুই সত্য। একটি অন্যটিকে সত্যায়ন করে। কিন্তু তা বুঝতে পারলে, রূহের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত হতে পারলে এবং তার হুকুম-আহকাম জানতে পারলেই বিরোধীতার ধারণা দূর হয়ে যাবে। আর রূহের এমন অবস্থা রয়েছে, যা দেহের অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, রূহগুলো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়। মুক্ত-স্বাধীন রূহ, বন্দী রূহ, উর্ধ্বজগতের রূহ এবং নিম্নজগতের রূহ। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর রূহ দেহের মধ্যে থাকাকালীন অবস্থার চেয়ে অধিক সুস্থতা, অসুস্থতা, স্বাদ, সুখ-শান্তি এবং যন্ত্রণা অনুভব করে। রূহ জগতে রয়েছে বন্দীশালা, ব্যথা-বেদনা, শাস্তি, অসুস্থতা এবং রয়েছে হতাশা। যেমন রয়েছে ভোগবিলাস, আরাম-আয়েশ, নিয়ামত এবং স্বাধীনতার স্বাদ।

هل الروح والنفس شيئ واحد؟ أو شيئان متغايران؟

রূহ এবং নাফস্ কি একই জিনিস?

'রূহ' এবং নাফ্স কি দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়? না কি একই জিনিসের দু'টি নাম? এ বিষয়েও আলেমগণ মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ আলেমের মতে নাফ্স এবং রূহ একই বিষয়। কেউ কেউ বলেছেন, উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। সঠিক কথা হচ্ছে অনেকগুলো বিষয় বুঝাতে রূহ এবং নাফস্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো উভয়টির উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন হয়। আবার কখনো ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বুঝানোর জন্য রূহ এবং নাফ্স শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়।

النفس শব্দটির অনেক অর্থ রয়েছে। তবে সাধারণত এটি 'রূহ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, **خرجت نفسه** তার প্রাণ বের হয়ে গেছে। অর্থাৎ 'রূহ' বের হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿**أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ**﴾ "তোমরা তোমাদের রূহ বের করে আনো"। (সূরা আল আনআম: ৯৩)

রূহকে সত্তাও বলা হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়, رأيت زيدا نفسه وعينه আমি যায়েদকে দেখেছি। এখানে যায়েদের ব্যক্তিসত্তা দেখা উদ্দেশ্য। এ অর্থে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿**فَسَلِّمُوْا عَلى أَنْفُسِكُمْ**﴾"তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম দিবে"। (সূরা আন নূর: ৬১)

নাফ্সকে রক্তও বলা হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে, سالت نفسه তার রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। ফিক্বহবিদগণ বলেছেন, ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة যে প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যে প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত হয় না। হাদীছে এসেছে, যে প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত হয় না, তা পানিতে পড়ে মারা গেলে পানি নাপাক হয় না।[১৫৫] এ জন্যই মহিলার হায়েয শুরু হলে বলা হয়, نفست المرأة মহিলাটির ঋতুস্রাবের রক্ত প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়েছে। এমনি সন্তান প্রসবের রক্ত প্রবাহিত হওয়া শুরু হলেও বলা হয়, نفست।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বনী আদমের তিনটি নাফ্স রয়েছে।

---

[১৫৫] এটি আসলে হাদীছ নয়। তবে এই অর্থে বায়হাকীতে সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। দেখুন: শরহুল আক্বীদা আত্ তাহাবীয়া, হা/২৭৪।

(১) النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ নাফ্সে আম্মারা বা দুষ্ট আত্মা: পাপাচার ও গুনাহর কাজ করার প্রবণতা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ এ নাফ্সের উপর সবসময় বিজয়ী থাকে।

(২) النَّفْسُ اللَّوَّامَةُ নাফ্সে লাওয়ামাহ বা তিরস্কারকারী আত্মা: এ নাফসটি পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং তাওবা করে। এতে কল্যাণ-অকল্যাণ দু'টোই রয়েছে। কিন্তু যখন এটি পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন তাওবা করে এবং আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে। এ জন্যই এ নাফ্সকে দোষারোপকারী নাফ্স বলা হয়। কেননা এটি পাপাচারের কারণে মানুষকে দোষারোপ করে থাকে। কল্যাণ-অকল্যাণের মাঝে কখনো দোদুল্যমান থাকে না।

(৩) النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ নাফ্সে মুতমাইন্নাহ বা শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা: নাফ্সে মুতমাইন্নাহ সবসময় সৎ কাজ পছন্দ করে এবং মন্দকাজ অপছন্দ করে। ফলে ভালোকে পছন্দ করা ও ভালোবাসা এ নাফ্সের সাধারণ অভ্যাসে হয়েছে। এ হচ্ছে একই সত্তার তিনটি বৈশিষ্ট্য। কেননা প্রত্যেক মানুষের নাফ্স মাত্র একটি।

الروح শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) কুরআনকে 'রূহ' বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾

"এভাবেই আমি আমার নির্দেশে তোমার কাছে এক 'রূহ'কে ওহী করেছি। তুমি আদৌ জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী। (সূরা আশ শূরা ৪২:৫২)

(২) 'রূহ' দ্বারা জিবরীল 'আলাইহিস সালামকেও উদ্দেশ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾

"এটি রব্বুল আলামীনের নাযিল করা কিতাব। একে নিয়ে আমানতদার 'রূহ' (জিবরীল) অবতরন করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, পরিষ্কার আরবী ভাষায়"। (সূরা শুআরা: ১৯৩)

(৩) আল্লাহ তা'আলা তার নাবী-রসূলদের প্রতি যে ওহী পাঠান তাকেও রূহ বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِالْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

"তার বান্দাদের মধ্য থেকে যার কাছে ইচ্ছা নিজের হুকুমে ওহী নাযিল করেন। যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সাবধান করে দেয়"। (সূরা মুমিনঃ ১৫)

নাবীদের প্রতি প্রেরিত ওহীকে রূহ বলার কারণ হলো এর মাধ্যমেই উপকারী জীবন লাভ করা যায়। ওহীর আলো ব্যতীত জীবন দ্বারা কখনো কোনো মানুষ উপকৃত হয় না। ঐদিকে দেহের মধ্যকার রূহকে এ নামে নামকরণ করার কারণ হলো রূহএর মাধ্যমেই শরীর জীবিত থাকে।

(৪) শরীর থেকে যে প্রাণবায়ু নির্গত হয় এবং তাতে যে বাতাস প্রবেশ করে তাকেও রূহ বলা হয়। উপরোক্ত সবগুলো বিষয়কেই রূহ বলা হয়। এটি দেহ থেকে বের হয়ে গেলেই মানুষের মৃত্যু হয়। সে হিসাবে রূহ ও নাফস্ পরস্পর সমার্থবোধক এবং উভয় দ্বারা উদ্দেশ্য একটিই। তবে পার্থক্য হলো নাফ্স শব্দটি দেহ এবং রক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এভাবে রূহ শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয় না। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

ثالثا: فتنة القبر وعذابه ونعيمه

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কবরের ফিতনা, সেটার আযাব ও সুখ-শান্তি

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করা বলতে মরণের পর যা কিছু হবে বলে নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন তার প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়ন করা বুঝায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কবরের প্রশ্নোত্তর, কবরের আযাব এবং তার সুখ-শান্তি।

মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের প্রথম জীবন শেষ হয় এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে পরলৌকিক জীবন শুরু হয়। উভয় জীবনের মধ্যবর্তী আরেকটি জীবন রয়েছে। কুরআনুল কারীমে এ অন্তবর্তীকালীন সময়কে বারযাখী জীবন বলা হয়েছে। অন্য ভাষায় ছোট ক্বিয়ামত ও বড় ক্বিয়ামতের মধ্যবর্তী সময়কে বারযাখী জীবন বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

"যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করো। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়, এটি তো তার একটি কথা মাত্র। তাদের সামনে রয়েছে বারযাখ বা একটি পর্দা পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত"। (সূরা মুমিনূন: ৯৮-১০০)

দু'টি জিনিসের মধ্যকার পর্দা বা প্রাচীরকে বারযাখ বলা হয়। আখিরাত দিবসের প্রতিদান থেকে এ বারযাখী জীবনে কিছু কিছু নমুনা রয়েছে। কবর হলো আখিরাতের অন্যতম স্টেশন। তাতে রয়েছে দু'জন ফেরেশতার প্রশ্ন। অতঃপর রয়েছে কবরের আযাব অথবা সুখ-শান্তি।

سؤال الملكين

কবরে দু'জন ফেরেশতার প্রশ্ন

কবরে মুনকার-নাকীর ফেরেশতা দু'জনের প্রশ্নকে কবরের ফিতনা বলা হয়। ফেরেশতা দু'জনের প্রশ্নের মাধ্যমে কবরস্থ মৃত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হবে। কবরের এ ফিতনার ব্যাপারে নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির হাদীছ রয়েছে। তার মধ্যে বারা ইবনে আযিব, আনাস ইবনে মালেক, আবু হুরায়রা এবং অন্যান্য ছাহাবীর হাদীছ অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন। আমীন।

পাগল ও শিশুদেরকে কবরে প্রশ্ন করা হবে কি না?

কবরের ফিতনা বা প্রশ্ন সকল প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষকেই করা হবে। তবে নাবীদেরকে কবরে প্রশ্ন করা হয় কি না, এ ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। এমনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু এবং পাগলদেরকে প্রশ্ন করার ব্যাপারেও আলেমদের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না। কেননা প্রশ্ন তো করা হবে ঐসব লোকদেরকে যারা শরী'আতের সম্বোধন বুঝে। অন্যরা বলেছেন যে, তাদেরকেও প্রশ্ন করা হবে।

যারা বলেছে যে, পাগল ও শিশু বাচ্চাদেরকেও প্রশ্ন করা হবে, তাদের দলীল হলো তাদেরও জানাযার ছ্বলাত পড়া হয়, তাদের জন্য দু'আ করা হয় এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে এ প্রার্থনাও করা হয় যে, তিনি যেন তাদেরকে কবরের আযাব ও ফিতনা থেকে বাঁচান।

ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় মুআত্তায় আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে একটি শিশুর জানাযা ছ্বলাত পড়েছেন। তিনি সেদিন তাকে এ দু'আ করতে শুনেছেন,

«اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» হে আল্লাহ তুমি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

আলী ইবনে মা'বাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছ দ্বারাও তারা দলীল পেশ করেছেন। তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা একটি ছোট্ট শিশুর জানাযা তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলো। তিনি তা দেখে কাঁদলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, এ শিশুটিকেও কবর চাপ দিবে। সে কথা স্মরণ করে তার প্রতি স্নেহ-মমতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে আমি কাঁদছি।

তারা আরো বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বারযাখী জীবনে পরিপূর্ণ বিবেক-বুদ্ধি দান করবেন। এতে করে তারা তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে। অতঃপর তাদেরকে যে বিষয়ে কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তার জবাব সম্পর্কেও অবগত করা হবে। শিশু ও পাগলদেরকে আখিরাতে পরীক্ষা করার ব্যাপারে অনেক হাদীছ রয়েছে। সুতরাং তাদের আখিরাতে যেহেতু পরীক্ষা করা হবে, তাই কবরের ফিতনায় তারা আক্রান্ত হতে কোনো মানা নেই।

আর যারা বলেছে যে, শিশু ও পাগলদেরকে কবরে পরীক্ষা করা হয় না, তাদের দলীল হলো কবরে প্রশ্ন শুধু তাকে করা হয়, যে রসূল ও রসূলের রিসালাত বুঝার মতো বিবেক-বুদ্ধি রাখে। তাই বিবেক-বুদ্ধিমান লোকদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হবে, সে রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে কি না? সুতরাং যে শিশুর বোধশক্তি নেই, ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞান-বুদ্ধি নেই, তাকে কীভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমাদের মধ্যে এই যে লোকটিকে (রসূলকে) পাঠানো হয়েছিল, তার সম্পর্কে তুমি কী বলো? যদিও কবরে তার জ্ঞান ফিরিয়ে দেয়া হয়, তথাপিও তাকে এমন প্রশ্ন করা যুক্তিসঙ্গত নয়, যে সম্পর্কে সে দুনিয়াতে জ্ঞান

অর্জন করতে পারেনি কিংবা যাকে দুনিয়ায় থাকাকালে চিনতে পারেনি। সুতরাং এ প্রশ্নের মধ্যে কোনো লাভ নেই। তবে আখিরাতে তাদেরকে পরীক্ষা করার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাদের নিকট একজন রসূল পাঠাবেন। তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করার পর রসূলের আনুগত্য করার হুকুম দিবেন। তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করবে, সে নাজাত পাবে আর যে রসূলের অবাধ্য হবে তাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে পাঠাবেন। সুতরাং এ হলো তাদের পরীক্ষা। তাদেরকে একটি আদেশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করবেন। ক্বিয়ামতের দিন তারা আদেশটি বাস্তবায়ন করবে কিংবা করবে না। তাদেরকে আনুগত্য করা কিংবা অবাধ্য হওয়া সম্পর্কিত এমন কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না, যা তাদের দুনিয়ার জীবনে অতিক্রান্ত হয়েছে। যেমনটি কবরে দু'জন ফেরেশতা মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে থাকেন।

যারা বলেছেন কবরে শিশু এবং পাগলদেরও আযাব হবে তাদের দলীলের জবাবঃ

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছে কবরের যে আযাবের কথা এসেছে, তা দ্বারা আনুগত্য বর্জন করা কিংবা পাপ কাজ করার কারণে শিশুর শাস্তি হওয়া মোটেই উদ্দেশ্য নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বিনা অপরাধে কাউকে শাস্তি দিবেন না। ঐদিকে কবরের আযাব দ্বারা কখনো এমন কষ্ট উদ্দেশ্য হয়, যা মৃত ব্যক্তি অন্য কারো আমলের কারণে পেয়ে থাকে। তা তার নিজস্ব আমলের কারণে নয়। যেমন নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» "নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের লোকদের বিলাপের কারণে শাস্তি দেয়া হয়"।[১৫৬] অর্থাৎ জীবিতদের ক্রন্দনের কারণে মৃত ব্যক্তি কষ্ট পায়; কিন্তু জীবিতদের অপরাধের কারণে নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ "একজন অন্যজনের পাপের বোঝা বহণ করবে না"। (সূরা আল আনআম: ১৬৪) এটি নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীর মতোই, «السفر قطعة من العذاب» "সফর আযাবের একটি অংশ"। সুতরাং আযাব কথাটি শাস্তির চেয়ে ব্যাপকার্থবোধক। নিঃসন্দেহে কবরে এমন কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও হতাশা রয়েছে, যার প্রভাবে শিশুরাও আক্রান্ত হয় ও ব্যথিত হয়। সুতরাং শিশুর জানাযা ছ্বলাত আদায়কারীর জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে এমন দু'আ করা শরী'আত সম্মত, আল্লাহ তা'আলা তাকে যেন কবরের উপরোক্ত আযাব থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

---

[১৫৬] বুখারী অধ্যায়: জানাযা হা/ ১৩০৪। মুসলিম ৯২৭, অধ্যায়: জানাযা হা/১৫৩৭।

কবরের প্রশ্ন কি মুসলিম, মুনাফেক, কাফের সকলের জন্য? না কি এটি শুধু মুসলিম ও মুনাফেকের জন্য?

কেউ কেউ বলেছেন কবরের প্রশ্ন মুসলিম ও মুনাফেকের জন্য। নাস্তিক, কাফের ও বাতিলপন্থিদের জন্য নয়। কেউ কেউ বলেছেন, তা সমস্ত কাফের ও মুসলিমের জন্য। কুরআন ও সুন্নাহ এ কথারই প্রমাণ বহন করে। কাফেরকে কবরের প্রশ্নের আওতামুক্ত রাখার কোনো দলীল নেই।

কবরের প্রশ্ন কি শুধু এ উম্মতের জন্য?

কবরের প্রশ্ন কি শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য? না কি এটি তাদের জন্য এবং অন্যান্য উম্মতের জন্য? এ ব্যাপারে আলেমদের তিনটি মত রয়েছে।

প্রথম মত: কবরের প্রশ্ন শুধু এ উম্মতের জন্য। কেননা আমাদের পূর্বের উম্মতদের নিকট রসূল প্রেরণ করা হতো। তারা তাদের নিকট রিসালাতের বাণী নিয়ে আসতেন। তারা যখন রসূলদের রিসালাত কবুল করতে অস্বীকার করেছে, তখন রসূলগণ তাদেরকে দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন এবং তাদেরকে ছেড়ে দূরে চলে গেছেন। পরবর্তীতে আযাব প্রেরণ করে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর যখন মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হলো, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ “হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে সৃষ্টিজগতের জন্য আমার রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি”, তখন তাদেরকে দাওয়াত কবুল না করার কারণে শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন। তাকে কাফের-মুশরেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ করা হয়েছে। যাতে করে তলোয়ারের ভয়ে লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করে। অতঃপর তাদের অন্তরে ঈমান পরিপক্ক হয়ে যায়। সুতরাং তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে অবকাশ প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর তলোয়ারের ভয়ে নিফাকী প্রকাশিত হয়েছে। এক শ্রেণির লোক অন্তরে কুফুরী গোপন রেখে মুখে মুখে ইসলাম প্রকাশ করেছে। তারা মুসলিমদের কাতারে আত্মগোপন করে থাকতো। তাদের মৃত্যুর পর আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য এমন দু’জন পরীক্ষক নির্ধারণ করেছেন, যারা প্রশ্নের মাধ্যমে মুনাফেকদের অন্তরের গোপন বিষয় পরিষ্কার করবেন। এ মতের প্রবক্তাদের দলীল হলো নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

«إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِى قُبُورِهَا فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِى أَسْمَعُ مِنْهُ»

“এ উম্মতকে কবরের ফিতনায় ফেলা হবে। কবরের আযাব শুনালে আমার যদি এ আশঙ্কা না হতো যে, তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে দাফন করা বর্জন করবে, তাহলে

আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করতাম, তিনি যেন কবরের আযাব থেকে তোমাদেরকেও কিছু শুনান, যা আমি শুনতে পাই"।[১৫৭]

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, «أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ قريبا من فتنة المسيح الدجال» "আমার কাছে এ মর্মে ওহী এসেছে যে, দাজ্জালের ফিতনার মতো অথবা তার কাছাকাছি ফিতনার মাধ্যমে তোমাদেরকে কবরে পরীক্ষা করা হবে"।[১৫৮] এখানে সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, কবরের প্রশ্ন শুধু এ উম্মতের লোকদেরকেই করা হবে। ফেরেশতা দু'জনের কথা থেকেও তা সুস্পষ্ট হয়। তারা বলবেন, «ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟» "তোমাদের কাছে এই যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল, তার সম্পর্কে তুমি কী বলতে?

দ্বিতীয় মত: কবরের প্রশ্ন এ উম্মতকে এবং অন্যান্য উম্মতকেও করা হবে। এ মতের প্রবক্তাগণ প্রথম মতের সমর্থকদের জবাবে বলেন, কবরের প্রশ্ন সম্পর্কিত হাদীছগুলো এ কথা প্রমাণ করে না যে, অন্যান্য উম্মত ব্যতীত শুধু এ উম্মতকেই প্রশ্ন করা হবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, « إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا» "এই উম্মতকে কবরের ফিতনায় ফেলা হবে" এ দ্বারা সম্ভবত উদ্দেশ্য হলো বনী আদম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল প্রত্যেকটি জীব এবং মহাশূণ্যে নিজ ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রত্যেকটি পাখি তোমাদের মতোই এক একটি জাতি"। (সূরা আল-আনআম: ৩৮)

অতএব প্রাণী জগতের প্রত্যেক শ্রেণির প্রাণীই এক একটি জাতি। সুতরাং নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছের যেখানে বলা হয়েছে যে, কবরে এ জাতিকে প্রশ্ন করা হবে, কিন্তু অন্যান্য জাতিকে প্রশ্ন করার ব্যাপারটি নাকোচ করা হয়নি। এখানে শুধু খবর দেয়া হয়েছে যে, এ উম্মতকে তাদের কবরে প্রশ্ন করা হবে।

অনুরূপ «أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ قريبا من فتنة المسيح الدجال» "আমার কাছে এ মর্মে ওহী এসেছে যে, দাজ্জালের ফিতনার মত অথবা তার কাছাকাছি ফিতনার মাধ্যমে তোমাদেরকে কবরে পরীক্ষা করা হবে" এর মধ্যেও শুধু খবর দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তাদেরকে ছাড়া অন্যদেরকে প্রশ্ন করার বিষয়টি নাকোচ করা হয়নি।

তৃতীয় মত: কবরের প্রশ্ন শুধু এ উম্মতের জন্য না কি অন্যান্য উম্মতদের জন্যও, -এ ব্যাপারে নিরব থাকা উচিত। কেননা এ বিষয়ের দলীলগুলোর মধ্যে উভয় মতোই সঠিক

[১৫৭] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৭৩৯২।

[১৫৮] দেখুন, মুখতাসার ছ্বহীহ আল-বুখারী, হা/৭৬।

হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু এ উম্মতকে প্রশ্ন করার ব্যাপারে দলীলগুলো অকাট্য নয়। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

صفة سؤال الملكين على ما وردت به الأحاديث

হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক ফেরেশতা দু'জনের প্রশ্নের ধরন-পদ্ধতি

বারা ইবনে আযিবের হাদীছে এসেছে, মৃত ব্যক্তির রূহ তার দেহে ফেরত দেয়া হয় এবং তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আগমন করে। ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমের কাতাদার সূত্রে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إن الميت إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ عنه أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خفق نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيقْعَدَانه، فَيَقُولانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ؟ فأما المؤمن فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، قال فَيقول انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قد أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ» قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ و الْمُنَافِقُ، فَيَقُولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري: كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيَقولان له: لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطارق مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ عليها إلا الثقَلَيْنِ»

"মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীগণ দাফনের কাজ শেষ করে যখন সেখান থেকে চলে যায় তখন মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। এ সময় তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করেন, এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? মুমিন ব্যক্তি বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল। তখন তাকে বলা হয় তুমি তোমার জাহান্নামের ঠিকানা দেখো। আল্লাহ তা'আলা তা পরিবর্তন করে জান্নাতে তোমার ঠিকানা নির্ধারণ করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয় স্থানকেই দেখতে পায়।

আর মৃত ব্যক্তি যদি কাফের বা মুনাফেক হয়ে থাকে তাহলে তাকেও ফেরেশতাদ্বয় জিজ্ঞাসা করবেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? সে উত্তর দিবে আমি কিছুই জানি না। মানুষেরা যা বলত আমিও তাই বলতাম। অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি জান নেই এবং শিখো নেই। অতঃপর লোহার একটি মুগুর দিয়ে তার উভয় কানের মাঝখানে এমন

জোরে আঘাত করা হয়, যাতে সে ভয়ানকভাবে চিৎকার করতে থাকে। জিন এবং মানুষ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য সকল বস্তুই সে চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পায়"।

আবু হাতিমের ছ্বহীহ গ্রন্থে অন্য একটি হাদীছে এসেছে, নীল চোখ বিশিষ্ট দু'জন কালো আকৃতির ফেরেশতা আগমন করে। তাদের একজনের নাম নাকীর এবং অন্যজনের নাম মুনকার।

মুসনাদে আহমাদ এবং আবু হাতিমের ছ্বহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদীছে এসেছে, "মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীগণ দাফনের কাজ শেষ করে যখন সেখান থেকে চলে যায় তখন মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। সে মুমিন হয়ে থাকলে তার মাথার নিকট ছ্বলাত এসে হাজির হয়, ছ্বিয়াম এসে উপস্থিত হয় ডান দিকে, যাকাত এসে উপস্থিত হয় বাম দিকে এবং সাদকা, সিলায়ে রেহেমী বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখার নেকী, সৎকাজ, সৃষ্টির প্রতি দয়া-অনুগ্রহ ইত্যাদি এসে উপস্থিত হয় তার দু পায়ের নিকট। এ সময় তার মাথার দিক থেকে কবরের ফেরেশতা আগমন করতে চাইলে ছ্বলাত বলে আমার দিক থেকে আসার কোনো রাস্তা নেই, ডান দিক থেকে আসতে চাইলে ছ্বিয়াম আমার দিক থেকে আসার কোনো সুযোগ নেই, বাম দিক থেকে আসতে চাইলে যাকাত বলে আমার দিক থেকে আসার কোনো পথ নেই, অতঃপর তার দুই পায়ের দিক থেকে আসতে চাইলে দান-খয়রাত, সিলায়ে রেহেমী, সৎকাজ, মানুষের প্রতি সুন্দর আচার-আচরণ, দয়া-অনুগ্রহ ইত্যাদি বলে আমার দিক থেকে আসার কোনো রাস্তা নেই। অতঃপর তাকে বলা হয়, তুমি বসো। মৃত ব্যক্তি তখন উঠে বসে। এ সময় তার সামনে সূর্যাস্তের ছবি উপস্থিত করা হয়। অতঃপর মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়, তোমাদের নিকট এই যে ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছিল, তার সম্পর্কে তুমি কী বলতে? তার সম্পর্কে তুমি কী সাক্ষ্য প্রদান করতে? মৃত ব্যক্তি তখন বলে, আমাকে ছাড়ো, আমি ছ্বলাত পড়বো। ফেরেশতা তখন বলেন, অচিরেই তোমাকে ছ্বলাত পড়তে দেয়া হবে। তবে তোমাকে এখন যে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তার জবাব দাও। তোমাদের নিকট যে ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছিল, তার ব্যাপারে তুমি কী বলতে? তার ব্যাপারে তুমি কী সাক্ষ্য দিতে? মুমিন ব্যক্তি তখন বলে তিনি হলেন মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি হলেন আল্লাহর রসূল, আল্লাহর পক্ষ হতে তিনি সত্য দীন নিয়ে এসেছেন। তাকে তখন বলা হয়, এ আক্বীদা-বিশ্বাসের উপর তুমি জীবিত ছিলে, এর উপরই তুমি মৃত্যু বরণ করেছো এবং এর উপরই তোমাকে পুনরুত্থিত করা হবে ইনশা-আল্লাহ। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খোলা হবে এবং বলা হবে, এ হলো তোমার ঠিকানা। এসব নিয়ামত তোমার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাতে তৈরি করে রেখেছেন। এতে তার আনন্দ, খুশি ও সুখ-শান্তি আরো বৃদ্ধি পায়।

অতঃপর তার সামনে জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দেয়া হয় এবং তুমি আল্লাহর নাফরমানী করতে তাহলে এটি হতো তোমার ঠিকানা। এতে তার আনন্দ ও খুশি আরো বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর তার কবরকে সত্তর হাত প্রশস্ত করা হবে এবং তাকে আলোকিত করা

হবে। পরিশেষে যা দিয়ে তার দেহ সৃষ্টি করা হয়েছে, তা দিয়ে পুনরায় তাকে সৃষ্টি করা হবে এবং তার রূহকে পবিত্র রূহসমূহের মধ্যে স্থান দেয়া হবে। ফলে সে পাখির আকৃতিতে জান্নাতের বৃক্ষসমূহের মধ্যে বিচরণ করতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾

"আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে ইহকাল ও পরকালে মজবুত কথার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যালেমদেরকে করবেন পথভ্রষ্ট। আর আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন"। (সূরা ইবরাহীম: ২৭)

আর কাফেরের ব্যাপারে কথা হলো, ফেরেশতা যখন তার মাথার নিকট থেকে আসবে, তখন কোনো প্রতিবন্ধকতা পাবে না, ডান দিক থেকে আসলেও কোনো বাধা থাকবে না, বাম দিক থেকে আসলেও না এবং তার দুই পায়ের দিক থেকে আসলেও কোনো বাধা থাকবে না। অতঃপর বলা হবে, বসো। সে তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসবে। অতঃপর বলা হবে যেই ব্যক্তিকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল, তার ব্যাপারে তুমি কী বলতে? কাফের তখন বলে, কোন্ ব্যক্তি? ফেরেশতা বলবে, যিনি তোমাদের মধ্যে ছিলেন। সে তার নাম বলতে পারবে না। অতঃপর তাকে বলা হবে, তিনি তো ছিলেন মুহাম্মাদ। কাফের তখন বলবে, জানি না, লোকদেরকে কিছু একটা বলতে শুনেছি। আমিও মানুষের মত বলেছি। অতঃপর তাকে বলা হবে, এ অবস্থাতেই তুমি জীবিত ছিলে, এ অবস্থাতেই তুমি মৃত্যু বরণ করেছো এবং এর উপরই তোমাকে পুনরুত্থিত করা হবে, ইনশা-আল্লাহ।

অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খোলা হবে। বলা হবে, এটি তোমার ঠিকানা এবং এ শাস্তিগুলো আল্লাহ তোমার জন্য তাতে প্রস্তুত করে রেখেছেন। এতে তার দুঃখ-দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর জান্নাতের একটি দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তাতে যেসব নিয়ামত প্রস্তুত করা হয়েছে, তা দেখিয়ে তাকে বলা হবে, তুমি যদি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করতে তাহলে এ হতো তোমার ঠিকানা। এতে তার দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশা আরো বেড়ে যাবে। অতঃপর তার কবরকে এমন সংকীর্ণ করে দেয়া হবে যে, কবরের চাপে তার এক পার্শ্বের পাজরের হাড্ডী অন্যপার্শ্বের পাজরের হাড্ডীর মধ্যে ঢুকে যাবে। এটিই হবে তার সংকীর্ণ জীবন, যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ﴾

"আমার পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সৎ পথের নির্দেশ আসলে যে ব্যক্তি আমার সেই নির্দেশ মেনে চলবে সে বিভ্রান্ত হবে না এবং দুঃখ-কষ্ট পাবে না। আর যে ব্যক্তি আমার যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য হবে দুনিয়ায় সংকীর্ণ জীবন এবং ক্বিয়ামতের দিন আমি তাকে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার রব! কেন আমাকে অন্ধ

অবস্থায় উঠালেন? দুনিয়ায় আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। তিনি বলবেন, এভাবেই তো আমার আয়াত তোমার কাছে এসেছিল। কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। এভাবেই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে"। (সূরা তোহা: ১২৩)[১৫৯]

উপরোক্ত হাদীছগুলো এবং অনুরূপ অর্থে অন্যান্য হাদীছ থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

(১) মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সাথে সাথে প্রশ্ন করা হয়। এতে আবুল হুযাইল, মিরৃরিসী এবং তাদের অনুরূপ ঐসব বিদ'আতীদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা বলে উভয় ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে প্রশ্ন করা হবে।

(২) কবরে প্রশ্ন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা দু'জনের নাম মুনকার ও নাকীর। এতে ঐসব মু'তাযিলার প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা বলে এ নামে ফেরেশতাদের নামকরণ করা ঠিক নয়। তারা হাদীছে বর্ণিত منكر শব্দের ব্যাখ্যা এভাবে করেছে যে, তা দ্বারা প্রশ্ন করার সময় ফেরেশতাদের বিকট আওয়াজ উদ্দেশ্য। আর نكير দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফেরেশতাদের তিরস্কার করা ও ধমক দেয়া।

(৩) কবরে প্রশ্ন করার সময় মৃত ব্যক্তির রূহ তার দেহে ফেরত দেয়া হয়। তাকে বসানো হয় এবং কথা বলানো হয়। এতে যাহেরী মাযহাবের অন্যতম ইমাম আবু মুহাম্মাদ ইবনে হাযমের প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেননা তিনি উপরোক্ত বিষয়গুলো অস্বীকার করেছেন। তবে তিনি যদি তার কথা দ্বারা দুনিয়ার জীবনের অনুরূপ হায়াত ফেরত দেয়ার কথা নাকোচ করে থাকেন, তাহলে ঠিক আছে। কেননা মৃত ব্যক্তির রূহ তার দেহে রূহ ফেরত দেয়া পার্থিব জীবনে দেহের মধ্যে রূহ ফিরে দেয়ার অনুরূপ নয়। তবে কোনো কোনো দিক বিবেচনায় মৃত্যুর পর দেহের মধ্যে রূহ যখন ফিরে আসবে তখন দুনিয়ার জীবনে দেহের মধ্যে তা যে অবস্থায় ছিল এবং দেহের সাথে তার সম্পর্ক যত গভীর ছিল ফিরে আসার পর তার অবস্থা পূর্বের চেয়ে পূর্ণতম হবে। অনুরূপ পুনরুত্থান দিবসে নতুনভাবে মানুষের পুনর্বার সৃষ্টি এ পার্থিব জীবনের সৃষ্টির মতো নয়। যদিও তা হবে দুনিয়ার জীবনের চেয়ে পূর্ণাঙ্গতর; বরং এ নশ্বর জগৎ, বারযাখী জগৎ এবং ক্বিয়ামত দিবসের প্রত্যেকটি স্থানের হুকুম ও অবস্থা হবে ভিন্ন ভিন্ন। এ জন্যই নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, কারো কারো কবর প্রশস্ত করে দেয়া হবে, প্রশ্ন করা হবে এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন। যদিও যমীন পরিবর্তন হয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলে যায় না। মোটকথা রূহসমূহ দেহে ফেরত দেয়া হয় এবং দেহ থেকে তা বিচ্ছিন্নও হয়।

[১৫৯] ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে হাসান বলেছেন, দেখুন: আহকামুল জানায়েয, (১৯৮-২০২)।

تعلقات الروح بالبدن

দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক

দেহের সাথে রূহের বিভিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো। দেহের সাথে রয়েছে রূহ এর পাঁচ প্রকার সম্পর্ক। এ সম্পর্কগুলোর প্রত্যেকটির রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন হুকুম-আহকাম।

(১) মায়ের পেটে যখন মানবদেহ ভ্রূণ আকারে থাকে তখন সেটার সাথে রূহ এর এক প্রকার সম্পর্ক থাকে।

(২) মায়ের পেট থেকে বের হয়ে যমীনের পড়ার পর আরেক প্রকার সম্পর্ক তৈরি হয়।

(৩) মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন তার দেহের সাথে রূহ এর অন্য আরেক প্রকার সম্পর্ক থাকে। তখন একদিক থেকে রূহ তার দেহের সাথে যুক্ত থাকে এবং অন্যদিক বিবেচনায় তার রূহ দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়।

(৪) বারযাখী জীবনে দেহের সাথে রূহ এর অন্য প্রকার সম্পর্ক থাকে। যদিও তখন রূহ আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না যে, দেহের দিকে সেটা কখনো আর ফিরে তাকায় না। বরং একাধিক ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, মরণের পরে লাশ যখন কবরে রাখা হয়, তখন ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের সময় রূহ ফেরত দেয়া হয়। সেই সঙ্গে মুসলিমরা যখন কবরের পাশে গিয়ে সালাম দেয়, তখনও রূহকে দেহের মধ্যে ফেরত দেয়া হয় বলে দলীল রয়েছে। তবে এটি বিশেষ এক প্রকার ফেরত দেয়া। এ থেকে আবশ্যক হয় না যে, ক্বিয়ামত দিবসের পূর্বে মৃতের শরীর সম্পূর্ণরূপে দুনিয়ার জীবনের মত হায়াত ফিরে পায়।

(৫) মৃতদের দেহসমূহ পুনরুত্থান দিবসে জীবত করার পর দেহের সাথে আরেক প্রকার সম্পর্ক তৈরী হবে। এটি হবে দেহের সাথে রূহের পূর্ণতম সম্পর্ক। ইতিপূর্বে দেহের সাথে রূহের যত প্রকার সম্পর্কের আলোচনা করা হলো, তার সাথে এ সম্পর্কের কোনো তুলনাই চলে না। কেননা এটি এমন সম্পর্ক, যার পরে দেহের আর কোনো মরণ হবে না, ঘুমাবেও না এবং এ সম্পর্কের মধ্যে কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হবে না।

عذاب القبر ونعيمه

কবরের আযাব ও সুখ-শান্তি

উম্মতের সালাফে ছ্বলেহীন এবং ইমামগণের মাযহাব হলো, মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয় তখন সে সুখ-শান্তিতে থাকে অথবা আযাবে থাকে। তার দেহ ও রূহ উভয়টিই শান্তি পায় অথবা শাস্তি ভোগ করে। মোটকথা মানুষের রূহ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও নিয়ামতপ্রাপ্ত হয় অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। কখনো কখনো রূহ শরীরের সাথে যুক্ত হয় এবং উভয় মিলে সুখ-শান্তি ভোগ করে অথবা আযাব ভোগ করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐক্যমতে রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন হয়ে একাই শান্তি পায় ও শাস্তি পায় এবং দেহের সাথে মিলিত থেকেও শান্তি পায় অথবা শাস্তি পায়। সুতরাং দেহ এবং রূহ উভয়ই মিলিত অবস্থায় নিয়ামত কিংবা আযাব ভোগ করে। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা অবস্থাতেও রূহ এর আযাব হয় বা সে নিয়ামত পায়। রূহ ব্যতীত শুধু দেহ কি আযাব বা শাস্তি ভোগ করে? এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত, আহলে হাদীছ ও আহলে কালামদের দু'টি সুপ্রসিদ্ধ মত রয়েছে।

أدلة عذاب القبر و نعيمه من القرأن الكريم

কবরের আযাব অথবা শাস্তির ব্যাপারে কুরআনুল কারীমের দলীল

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾

"তুমি যদি যালেমদেরকে ঐ সময়ে দেখতে যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রনায় থাকবে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমরা নিজেরাই নিজেদের প্রাণ বের করে আনো। তোমাদের আমলের কারণে আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর আযাব দেয়া হবে। কারণ তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছিলে এবং তোমরা তার আয়াতের বিরুদ্ধে অহংকার করেছিলে"। (সূরা আল আনআম: ৯৩)

এটি মৃত্যুর সময় মানুষের জন্য ফেরেশতাগণের সম্বোধন। সত্যবাদী ফেরেশতাগণ এখানে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা মৃত্যুর সময় মানুষকে অবমাননাকর শাস্তি দিয়ে থাকেন। দুনিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত যদি তাদের শাস্তি বিলম্বিত করা হতো, তাহলে তাদেরকে সম্বোধন করে

এ কথা বলা ঠিক হতো না যে, আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে। এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, আয়াত দ্বারা কবরের আযাব উদ্দেশ্য।

(২) আল্লাহ তা'আলা সূরা তুরের ৪৫- ৪৭ নং আয়াতে বলেন,

﴿فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَوَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"অতএব, হে নাবী! তাদেরকে আপন অবস্থায় থাকতে দাও। যাতে তারা সে দিনটির সাক্ষাত পায়, যেদিন তাদেরকে (মেরে-পিটিয়ে) বেহুশ করা হবে। সেদিন না তাদের কোন চালাকি কাজে আসবে, না কেউ তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। আর সেদিনটি আসার আগেও যালেমদের জন্য একটা আযাব আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না"।

এখানে আযাব দ্বারা দুনিয়াতে হত্যা ও অন্যান্যভাবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া উদ্দেশ্য হতে পারে। আলমে বারযাখের শাস্তিও উদ্দেশ্য হতে পারে। এটিই অধিক সুস্পষ্ট। কেননা তাদের অনেকেই দুনিয়ার শাস্তি ভোগ না করেই মৃত্যু বরণ করেছে। কেউ কেউ বলেছেন, অপরাধীদের যারা দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করার আগেই মারা গেছে, তাদেরকে বারযাখী জিন্দেগীতে শাস্তি দেয়া হবে আর যারা রয়ে গেছে, তাদেরকে দুনিয়াতে হত্যা কিংবা অন্যান্যভাবে শাস্তি দেয়া হবে। সুতরাং তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। এ আযাব দ্বারা দুনিয়ার আযাব, বারযাখের আযাব এবং অন্যান্য আযাবও উদ্দেশ্য হতে পারে।

(৩) আল্লাহ তা'আলা সূরা গাফেরের ৪৫-৪৬ নং আয়াতে বলেন,

﴿ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِالنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

"অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি ঘিরে ফেললো। জাহান্নামের আগুনের সামনে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। ক্বিয়ামত সংঘটিত হলে নির্দেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের অনুসারীদেরকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো"। এখানে উভয় জগতের আযাবের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে অন্য কোনো কিছু বুঝার সুযোগ নেই। সুতরাং আয়াত দ্বারা কবরের আযাব সাব্যস্ত হয়েছে।

(৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (٨٣) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (٨٤) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (٨٥) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨٦) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٧) فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (٨٩) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠) فَسَلَامٌ لَكَ

مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾

"তবে কেন নয়; প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় এবং তখন তোমরা তাকিয়ে দেখো। আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতম। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। তবে কেন নয়; যদি তোমরা প্রতিদানপ্রাপ্ত না হও। তবে তোমরা ওটা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন হয়। তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম রিযিক ও নিয়ামতময় জান্নাত। আর সে যদি হয় ডান দিকের একজন। তাহলে তাকে সাদর অভিনন্দন জানানো হবে এভাবে যে, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আর সে যদি হয় অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের একজন। তাহলে তার সমাদরের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানি এবং জাহান্নামের দহন"। (সূরা আল-ওয়াকেয়া: ৮৩-৯৪)

এখানে মৃত্যুর সময় রূহ এর অবস্থা ও হুকুম-আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আল-ওয়াকিআর শুরুর দিকে পুনরুত্থান দিবসের হুকুম-আহকাম উল্লেখ করা হয়েছে। চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই মৃত্যুকালীন অবস্থার পূর্বে ক্বিয়ামতের আলোচনা করা হয়েছে। কেননা ক্বিয়ামত দিবসের আলোচনা করার গুরুত্ব বেশী। তাই তার আলোচনা বেশি করা দরকার। সূরা আল-ওয়াকিআতে মানুষকে যেমন তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে অনুরূপ আখিরাতেও তাদেরকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হবে।

أدلة عذاب القبر من السنة النبوية

সুন্নাত থেকে কবরের আযাবের দলীল

প্রিয় পাঠক! আপনি যখন কবরের আযাব কিংবা নিয়ামত সংক্রান্ত হাদীছগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবেন, তখন দেখবেন, এগুলো উক্ত বিষয়ে কুরআনের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশেণ্ডষণ স্বরূপ এসেছে। কবরের আযাব সম্পর্কিত হাদীছগুলো নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে আমরা কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করছি,

(১) ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

«أن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقبرين فَقال إنهما يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أما أَحَدُهُمَا فكان لا يَسْتَبرئ مِنْ البَوْلِ، وَأما الآخَرُ فكان يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فشقها نصفين فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا نصفين فقَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا». (بخارى:٢١٦)

"একদা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা অথবা মদীনার কোনো একটি বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দু'টি কবরের নিকট দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন।

তখন দু'জন মানুষের আওয়াজ শুনলেন। তাদেরকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তিনি বললেনঃ কবর দু'টির অধিবাসীদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে। আযাবের কারণ খুব বড় নয়। তাদের একজন নিজেকে পেশাব থেকে পবিত্র রাখত না। অন্য জন ছিল চোগলখোর। সে একজনের কথা অন্যজনের নিকট বলে বেড়াতো। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুরের ডাল আনতে বললেন। ডাল আনয়নের পর সেটাকে দু'ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক কবরের উপর এক অংশ গেড়ে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হতে পারে ডালগুলো না শুকানো পর্যন্ত তাদের আযাব হালকা করা হবে"।

(২) ছ্বহীহ মুসলিমে যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একদা নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী নাজ্জার গোত্রের কোনো একটি বাগানে খচ্চরের উপর আরোহণরত ছিলেন। আমরা তার সাথেই ছিলাম। এমন সময় খচ্চরটি তাকে নিয়ে ছুটাছুটি শুরু করলো। তিনি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। তখন সেখানে পাঁচ-ছয়টি বা চারটি কবর দেখা গেলো। তিনি বললেন, এসব কবরবাসীদের কে চিনে? তখন এক ব্যক্তি বললো, আমি তাদেরকে চিনি। তিনি বললেন, এরা কখন মারা গেছে? লোকটি বললো, জাহেলী যুগে। নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন,

«إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِى أَسْمَعُ مِنْهُ»

"এ উম্মতকে কবরের ফিতনায় ফেলা হয়। কবরের আযাব শুনালে আমার যদি এ আশঙ্কা না হতো যে, তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে দাফন করা বর্জন করবে, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করতাম, তিনি যেন কবরের আযাব থেকে তোমাদেরকেও কিছু শুনান, যা আমি শুনতে পাই"।[১৬০]

(৩) ছ্বহীহ মুসলিম এবং সুনান গ্রন্থসমূহে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন শেষ তাশাহুদ পাঠ করবে তখন যেন আল্লাহর কাছে চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সে যেন বলে,

«اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جهنم و من عذاب الْقَبْرِ وفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ ومِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব হতে, জাহান্নামের শাস্তি হতে, জীবণ ও মরণকালীন ফিতনা হতে এবং মসীহ দাজ্জালের ফিতনা হতে"।[১৬১]

---

[১৬০] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৮৬৭।

[১৬১] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৮৮।

(৪) ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু আইয়্যুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর ঘর থেকে বের হলেন। এ সময় তিনি একটি শব্দ শুনে বললেন, একজন ইয়াহূদীকে তার কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। আর এটি হচ্ছে সেই আযাবের শব্দ।

(৫) ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, একদা মদীনার ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে একজন বৃদ্ধ মহিলা আমার ঘরে প্রবেশ করলো। মহিলাটি বললো, কবরবাসীদেরকে তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি তার কথাকে মিথ্যা মনে করলাম এবং তাকে মোটেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। অতঃপর সে বের হয়ে যাওয়ার পর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি আমার কাছে প্রবেশ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! মদীনার জনৈক ইয়াহূদী বৃদ্ধ মহিলা আমার কাছে প্রবেশ করে বললো যে, কবরবাসীদেরকে তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, সে সত্য বলেছে। কবরবাসীদেরকে কবরে এমন শাস্তি দেয়া হয়, যার আওয়াজ সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুই শুনতে পায়। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এরপর থেকে তাকে প্রত্যেক ছ্বলাতেই কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

تنبيه هام

গুরুত্বপূর্ণ একটি সতর্কতা

প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকেই কবরের আযাব ও ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। যদিও তাকে দাফন না করা হয়। কবরের আযাব ও নিয়ামত বলতে বারযাখী জীবনের আযাব বা নিয়ামত উদ্দেশ্য। আখিরাতের জীবন ও দুনিয়ার জীবনের মধ্যবর্তী সময়কে বারযাখী জিন্দেগী বলা হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ “তাদের সামনে রয়েছে একটি পর্দা পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত”। (সূরা আল মুমিনূন: ১০০)

অধিকাংশ অবস্থার বিবেচনায় কবরের আযাব কিংবা কবরের শাস্তির কথা বলা হয়। অন্যথায় যাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়, যে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, যে পানিতে ডুবে মরে যায়, যাকে হিংস্র জীব-জন্তু ও পশু-পাখি খেয়ে ফেলে সেও স্বীয় আমল অনুপাতে বারযাখী জীবনের আযাব কিংবা নিয়ামত ভোগ করবে। তবে কবরের আযাব ও নিয়ামতের কারণ ও আযাবের ধরন -পদ্ধতিতে ভিন্নতা রয়েছে।

পূর্বকালের কেউ কেউ মনে করেছে, কারো শরীরকে যদি আগুনে পুড়ে ছাই বানিয়ে তার কিছু অংশ সাগরে ছিটিয়ে দেয়া হয় এবং বাকী অংশ প্রচণ্ড বাতাসের সময় ডাঙ্গায় ছিটিয়ে দেয়া হয়, তাহলে কবরের আযাব থেকে সে রেহাই পেয়ে যাবে। জনৈক ব্যক্তি তার সন্তানদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন মরার পর তার দেহকে আগুন দিয়ে পুড়ে ছাই বানিয়ে সাগরে ছিটিয়ে দেন। ছেলেরা তাই করলো। আল্লাহ তা'আলা সাগরকে তার মধ্যে ছিটিয়ে দেয়া অংশগুলোকে একত্রিত করার আদেশ দিলেন এবং যমীনের মধ্যে ছিটিয়ে দেয়া অংশগুলোকেও একত্রিত করার হুকুম করলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন, দাঁড়াও। দাঁড়ানোর আদেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে গেলো। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন এমনটি করেছো? সে বললো, হে আমার প্রভু! তোমার ভয়ে এরূপ করেছি। আর এ বিষয়ে তুমিই আমার চেয়ে বেশি অবগত রয়েছো। তখন আল্লাহ তা'আলা তার উপর রহম করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতএব, দেহের এই ছিন্ন-ভিন্ন অংশগুলোও বারযাখী জীবনের নিয়ামত ও কিংবা আযাব থেকে রেহাই পেলো না।

শুধু তাই নয়; মৃত ব্যক্তিকে যদি গাছের মাথায় বাতাস প্রবাহিত হওয়ার স্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয়, তাহলেও বারযাখের আযাবের অংশ তার দেহ ভোগ করবেই। একজন সৎ লোককে যদি আগুনের চুলার মধ্যে দাফন করা হয়, সেখানে তার দেহ এবং রূহ বারযাখী জীবনের নিয়ামত প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা তার উপর আগুনকে শান্তিময় ঠাণ্ডা করে দিবেন। ঐদিকে পাপিষ্ঠ কোনো লোককে গাছের উপর বাতাস প্রবাহের স্থানে ঝুলিয়ে রাখলেও সেখানকার বাতাস তার জন্য উত্তপ্ত আগুনে পরিণত হবে।

সৃষ্টিজগৎ তৈরি হওয়ার মূল উপদান এবং পদার্থসমূহ তার প্রভু ও স্রষ্টার প্রতি সদা অনুগত। তিনি এগুলোকে যেভাবে ইচ্ছা পরিচালিত করেন। আল্লাহ যা করার ইচ্ছা করেন, তা বাস্তবায়ন করা তার কাছে মোটেই কঠিন নয়। বরং সবকিছু তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগত এবং তার ক্ষমতার সামনে বশীভূত। সুতরাং ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তি এবং অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির রূহ তার দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া আল্লাহ তা'আলার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। যদিও আমরা এটি অনুভব করতে পারি না। কেননা বারযাখী জীবনে রূহকে দেহের মধ্যে ফেরত দেয়ার ধরন-পদ্ধতি আমাদের কাছে মোটেই পরিচিত নয়। আমরা দেখতে পাই যে, সংজ্ঞাহীন, নেশাগ্রস্ত এবং হতবুদ্ধি ব্যক্তিরা জীবিত থাকে এবং তাদের রূহসমূহ তাদের সাথেই থাকে। অথচ তারা তাদের জীবনী শক্তি অনুভব করতে পারে না। অতএব যার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার পক্ষে রূহকে তার শরীরের অংশগুলোর সঙ্গে জোড়া দেয়া মোটেই অসম্ভব নয়। যদিও দেহের অংশগুলো ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে বহু দূরে অবস্থান করুক কিংবা কাছাকাছি অবস্থান করুক। ঐ অংশগুলোর এক প্রকার অনুভূতি ও চেতনা শক্তি থাকে, যার মাধ্যমে তা কষ্ট কিংবা আরাম অনুভব করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে দুনিয়ার এ জগতে কারো কারো দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন করার পর তাতে পুনরায় ফেরত দেয়ার নমুনা দেখিয়েছেন। রূহ ফেরত পেয়ে কথা

বলেছে, চলা ফেরা করেছে, পানাহার করেছে বিবাহ-সাদী করেছে এবং তাদের কারো কারো সন্তানও হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾

"তুমি কি তাদের দেখনি, যারা মৃত্যু ভয়ে হাজারে হাজারে আপন ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করেছিলো? অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের মৃত্যু হোক! এরপর তাদেরকে জীবিত করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না"। (সূরা আল বাকারা: ২৪৩)

আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"অথবা পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেই ব্যক্তির কথা স্মরণ করো, যে এমন একটি গ্রাম অতিক্রম করেছিল, যার গৃহের ছাদগুলো উপুড় হয়ে পড়েছিল। সে বললো, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জনবসতিকে আল্লাহ আবার কীভাবে জীবিত করবেন? এ কথায় আল্লাহ তার প্রাণ হরণ করলেন এবং সে একশ বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় পড়ে রইলো। তারপর আল্লাহ পুনর্বার তাকে জীবন দান করলেন, এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কত বছর ঘুমিয়েছো? সে বললো, এই তো মাত্র একদিন বা তার চেয়েও কম সময় ঘুমিয়েছি। আল্লাহ বললেন, বরং তুমি একশ বছর ঘুমিয়েছো। এবার নিজের খাবার ও পানীয়ের উপর নজর বুলাও, দেখো তাতে সামান্য পরিবর্তনও আসেনি। অন্যদিকে তোমার গাধাটিকে দেখো। আর এটা আমি এ জন্য করেছি যে, মানুষের জন্য তোমাকে আমি একটি নিদর্শন হিসাবে দাঁড় করাতে চাই। তুমি গাধার অস্থিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো। লক্ষ্য করো, আমি কীভাবে একে উঠিয়ে এর গায়ে গোশত ও চামড়া লাগিয়ে দেই। এভাবে সত্য যখন তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো, তখন সে বলে উঠলো, আমি অবগত আছি, নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিশালী"। (সূরা আল বাকারা: ২৫৯)

বনী ইসরাঈলের লোকেরা যখন মূসা 'আলাইহিস সালামকে বললো,

﴿يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"হে মূসা! আমরা আল্লাহকে না দেখা পর্যন্ত কখনো তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো না। তখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে এবং নিজেরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করলাম। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও"। (সূরা আল বাকারা: ৫৫-৫৬)

আসহাফে কাহাফের ঘটনাও মৃতকে জীবিত করার একটি উজ্জ্বল নমুনা। ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের চারটি পাখির ঘটনাটিও এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন,

﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম বললো অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু এজন্য দেখতে চাচ্ছি, যাতে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। আল্লাহ বললেন, তাহলে চারটি পাখি ধরো। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলো যবেহ করে দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর ছিটিয়ে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাকো; তোমার নিকট দৌঁড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"। (সূরা আল বাকারা: ২৬০)

উপরোক্ত বিভিন্ন ঘটনায় দেহগুলো মৃত্যুর মাধ্যমে শীতল ও নিস্তেজ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা যখন তাতে পরিপূর্ণ হায়াত ফেরত দিলেন, তাহলে তার অসীম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে মৃত্যুর পর স্বীয় আদেশে মৃতদের দেহগুলোতে অস্থায়ীভাবে রূহগুলোকে ফেরত দেয়া, কথা বলানো, শাস্তি দেয়া কিংবা আমল অনুযায়ী নিয়ামত দান করা অসম্ভব হতে পারে? দেহের মধ্যে রূহ ফেরত দেয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করা নিছক কুফুরী, অবাধ্যতা, অবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

المنكرون لعذاب القبر ونعيمه وشبهتهم والرد عليهم

কবরের আযাব ও নিয়ামত অস্বীকারকারীদের বিভ্রান্তি ও তাদের জবাব

নাস্তিক ও অবিশ্বাসীরাই কেবল কবরের আযাব ও সুখ-শান্তিকে অস্বীকার করেছে। তাদের কথা হলো, আমরা কবর খনন করলে তাতে ফেরেশতা দেখি না এবং মৃতদেরকে পিটাতেও দেখি না। সেখানে সাপ-বিচ্ছু দেখি না এবং আগুনও জ্বলতে দেখি না। চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কবর প্রশস্ত করে দেয়া কিংবা তা খুব সংকীর্ণ করে দেয়া হয় কীভাবে? অথচ আমরা কবরকে হুবহু আপন অবস্থায় পাই। কবর যে পরিমাণ খনন করা হয়, সে পরিমাণ প্রশস্ত হিসাবেই পাই। তাতে কোনো বৃদ্ধি কিংবা সংকীর্ণতা দেখি না। সুতরাং কবর জান্নাতের বাগান কিংবা আগুনের গর্ত হয় কীভাবে!!

এর জবাব আমরা বিভিন্নভাবে দিতে পারি।

(১) বারযাখী জীবনের বিষয়গুলো গায়েবের অন্তর্ভুক্ত। নাবী-রসূলগণ এ ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন। তাদের খবরগুলো বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য হওয়া মূলত অসম্ভব নয়। সুতরাং তাদের খবরসমূহ বিশ্বাস করা আবশ্যক।

(২) কবরের আগুন ও সবুজ-শ্যামল পরিবেশ দুনিয়ার আগুন ও সবুজ-শ্যামল শস্যময় পরিবেশ এক রকম নয়। যাতে করে যে ব্যক্তি দুনিয়ার আগুন ও সতেজ-সবুজ পরিবেশ দেখেছে, সে কবরের আগুন কিংবা সবুজ-শ্যামল ও আনন্দময় পরিবেশ দেখতে পারে। সেটি আখিরাতের আগুন কিংবা শান্তিময় অবস্থা। সেটি দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ভয়াবহ। দুনিয়াবাসীরা সেটার উত্তাপ পাবে না। আল্লাহ তা'আলা কবরবাসীর উপরের মাটি-পাথর এবং তার নীচের মাটি-পাথর উত্তপ্ত করেন। তা দুনিয়ার আগুনের চেয়ে বেশি গরম হয়। যদিও যমীনবাসীরা যদি সে মাটি-পাথর স্পর্শ করে, তা অনুভব করে না। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা এর চেয়ে অধিক সুপ্রশস্ত ও বিস্ময়কর।

তবে আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা তার কতিপয় বান্দাকে কবরের আযাব বা সুখ-শান্তি দেখান এবং অন্যদের থেকে সেটা গায়েব রাখেন। তিনি যদি সমস্ত মানুষকে কবরের আযাব দেখাতেন, তাহলে শরী'আতের আদেশ-নির্দেশ দেয়া এবং গায়েবের প্রতি ঈমান আনয়নের হিকমত ছুটে যেতো। লোকেরা মরা লাশ দাফনও করতো না। যেমন ছ্বহীহ বুখারী-মুসলিমের হাদীছে এসেছে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِى أَسْمَعُ مِنْهُ»

"এ উম্মতকে কবরের ফিতনায় ফেলা হবে। আমার যদি এ আশঙ্কা না হতো যে কবরের আযাব শুনালে, তোমরা মৃতদেরকে দাফন করা বর্জন করবে, তাহলে আমি

আল্লাহর কাছে দু'আ করতাম, তিনি যেন কবরের আযাব থেকে তোমাদেরকেও কিছু শুনাতেন, যা আমি শুনতে পাই"।[১৬২]

পশু-পাখিকে কবরের আযাব না শুনানোর মধ্যে কোনো হিকমত ছিল না, তাই তারা কবরের আযাব শুনতে পায় এবং তা অনুভব করতে সক্ষম হয়। যেমন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খচ্চরের উপর আরোহণ করে এমন এক কিছু কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যেগুলোর অধিবাসীদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। খচ্চরের ছুটাছুটির কারণে তখন তিনি তার উপর থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন। কবরের আযাব দেখা ফেরেশতা ও জিন দেখার মতই। আল্লাহ তা'আলা যাকে দেখাতে চান সে দেখতে পায়।

সুতরাং যারা আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে ও তার স্বীকৃতি প্রদান করে তারা কীভাবে এমন ঘটনাসমূহ অস্বীকার করতে পারেন, যা তিনি ঘটান এবং বিশেষ হিকমত, বান্দাদের প্রতি দয়া ও তা দেখার ও শ্রবণ করতে সক্ষম নয় বলে তা থেকে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখেন? মূলত কবরের আযাব দেখতে বান্দার দৃষ্টি শক্তি দুর্বল এবং তার আযাব শোনাও তার শ্রবণ শক্তির ধারণ ক্ষমতার বাইরে।

আসলে কবরের প্রশস্ততা, সংকীর্ণতা, কবরের আলো, সবুজ-শ্যামল পরিবেশ কিংবা তার আগুন এ নশ্বর জগতের জ্ঞাত-পরিচিত জিনিস সমূহের মতো নয়। আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াতে কেবল এর মধ্যকার জিনিসগুলো দেখিয়েছেন। আর আখিরাতের বিষয়গুলোর উপর পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছেন। যাতে না দেখে ও না শুনে তা বিশ্বাস করা ও স্বীকার করা তাদের সৌভাগ্যের উপকরণ হয়। তিনি যদি তার বান্দা থেকে গায়েবের পর্দা উন্মুক্ত করে দেন, তখন সেগুলো প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার হিকমত যেহেতু এমনই ছিল যে, মানুষ তাকে না দেখেই তার প্রতি ঈমান আনয়ন করুক, কবরের আযাব ও আখিরাতের অন্যান্য বিষয় না দেখেই বিশ্বাস করুক এবং এর মাধ্যমে তারা তার প্রিয় বান্দা হিসাবে পরিণত হোক ও দুনিয়া আখিরাতে সৌভাগ্যবান হোক, তাই হিকমতের দাবি হিসাবে তিনি গায়েবের বিষয়গুলো তাদের থেকে আড়াল করে রেখেছেন। গায়েবী বিষয়গুলো তাদের সামনে প্রকাশ করলে গায়েবের প্রতি ঈমান আনয়নের হিকমত ঠিক থাকতো না।

কবর ও আখিরাতের অন্যান্য গায়েবী বিষয়গুলোর উপর আল্লাহ তা'আলা এমন পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছেন যে, কোনো মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার আগেই তার জীবিত আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য লোকদের সামনে মুনকার- নাকীর ফেরেশতাদ্বয় আগমন করে উপস্থিত লোকদের টের পাওয়া ছাড়াই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দেয়া মোটেই অসম্ভব নয়। মৃত ব্যক্তি ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের জবাবে যা বলে উপস্থিত লোকদের তা শ্রবণ করারও কোনো পথ নেই। ফেরেশতারা মৃত ব্যক্তিকে মাটির উপরে থাকতেই মারপিট শুরু করলেও উপস্থিত

[১৬২] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৭৩৯২।

লোকদের মারপিট দেখা ও তার ভয়ানক চিৎকারের আওয়াজ শ্রবণ করারও কোনো সুযোগ নেই।

আমাদের কেউ তার জাগ্রত সাথীর পাশে ঘুমিয়ে থাকে। তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নের মধ্যে মারপিট করা হয়, শাস্তি দেয়া হয়, সে কষ্ট পায়। তার পার্শ্বের জাগ্রত লোকেরা এ সম্পর্কে কোনো খবরই রাখে না।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কবরের আযাব এবং মুনকার-নাকীর সম্পর্কে অনেক হাদীছ রয়েছে। এগুলো নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, এ দু'জনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে বড় কোনো অপরাধের কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন চোগলখোরী করতো এবং অন্যজন পেশাব করার সময় নিজেকে মানুষ থেকে আড়াল করতো না। অতঃপর খেজুর গাছের একটি তাজা ডাল এনে দ্বিখণ্ডিত করে প্রত্যেক কবরের উপর একটি করে গেড়ে দিলেন। লোকেরা বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! কেন এমনটি করলেন? তিনি বললেন, সম্ভবত ডাল দু'টি না শুকানো পর্যন্ত তাদের কবরের আযাব হালকা করা হবে"।

ছ্বহীহ মুসলিম এবং সুনান গ্রন্থসমূহে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন শেষ তাশাহুদ পাঠ করবে তখন সে যেন আল্লাহর কাছে চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সে যেন বলে,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جهنم و من عذاب الْقَبْرِ وفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ ومِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব হতে, জাহান্নামের শাস্তি হতে, জীবণ ও মরণ কালীন ফিতনা হতে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা হতে"।

শাইখুল ইসলাম কবরের আযাব সংক্রান্ত বিষয়ে আরো হাদীছ বর্ণনা করার পর বলেন, যে ব্যক্তি কবরের আযাব ভোগ করার হকদার এবং যে তার সুখ-শান্তি উপভোগ করার যোগ্য, তার জন্য তা সাব্যস্ত হওয়া এবং কবরে মুনকার-নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্ন সাব্যস্ত হওয়ার অনেক মুতাওয়াতির হাদীছ রয়েছে। সুতরাং এটি বিশ্বাস করা আবশ্যক। তবে কবরের আযাব ও নিয়ামতপ্রাপ্ত হওয়ার ধরন-পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা কথা বলবো না। বিবেক-বুদ্ধি এটি উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। কারণ দুনিয়ার জীবনে বিবেক-বুদ্ধির এ বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আর শরী'আত বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য নয়, এমন কোনো বিষয় নির্ধারণ করে না। তবে কখনো কখনো এমন বিষয় শরী'আতভুক্ত করা হয়, যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে হয়রান করে ফেলে। কেননা মৃতদেহে রূহ ফিরে আসা দুনিয়ায়

পরিচিত স্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। বরং মৃতদেহে রূহ এমনভাবে ফেরত দেয়া হবে, যা দুনিয়ার মানুষের নিকট পরিচিত পদ্ধতির ব্যতিক্রম।

শাইখুল ইসলাম আরো বলেন, কবরের আযাব হলো বারযাখী জগতের আযাব। বারযাখী জীবনে আযাবের হকদার প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই তার অংশ ভোগ করবে। তাকে কবরস্থ করা হোক বা না হোক। তাকে হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলুক অথবা আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত করে দেয়া হোক। তাকে পিষে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হোক বা ক্রুশবিদ্ধ করা হোক অথবা সাগরে ডুবে যাক কিংবা মাছের পেটে চলে যাক। তার রূহ ও দেহের মধ্যে ঐ শাস্তিই গিয়ে পৌঁছাবে, যা কবরস্থ মৃত ব্যক্তির রূহ ও দেহের মধ্যে পৌঁছে থাকে। এমনি তাকে বসানো এবং তার একপাশের পাজরের হাড্ডী অন্যপাশের পাজরের হাড্ডীর মধ্যে ঢুকে পড়ার বিষয়টিও অনুরূপ। অতএব রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা এসেছে, বাড়ানো ও কমানো ছাড়া তা হুবহু সেভাবেই বুঝা আবশ্যক। তার কথা যে অর্থের সম্ভাবনা রাখে না সে অর্থে তাকে ব্যবহার করা যাবে না। তার কথা দ্বারা তিনি যা উদ্দেশ্য করছেন, যে হিদায়াত বর্ণনা করছেন তা উপেক্ষা করা যাবে না। কিন্তু উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি কতই না অবহেলা করা হচ্ছে! তাকে উপেক্ষা করার কারণে কতই না বিভ্রান্তি হয়েছে! সঠিক পথ থেকে কতই না দূরে সরে যাওয়া হচ্ছে!

শাইখুল ইসলাম আরো বলেন, মোটকথা ঘর হলো তিনটি। দুনিয়ার ঘর, বারযাখের ঘর ও স্থায়ীভাবে বসবাসের ঘর। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ঘরের জন্য আলাদা আলাদা হুকুম-আহকাম নির্ধারণ করেছেন। দুনিয়ার হুকুম-আহকাম শরীরের জন্য। রূহসমূহ তার অনুগামী। বারযাখের হুকুম রূহের উপর। শরীর তার অনুগামী। কিন্তু যখন শরীরসমূহ একত্রিত করার দিন উপস্থিত হবে এবং লোকেরা কবর থেকে উঠবে, তখন রূহ এবং শরীর উভয়ের জন্যই শাস্তি বা আযাব কিংবা অন্যান্য হুকুম-আহকাম শুরু হবে। প্রিয় পাঠক! আপনি যখন উপরোক্ত বিষয়টি নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা-গবেষণা করবেন, তখন বুঝতে সক্ষম হবেন যে, কবর জান্নাতের একটি বাগান কিংবা আগুনের একটি গর্ত হওয়া বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা পূর্ণ সমর্থিত। তা সত্য হওয়াতে কোনো সন্দেহ নেই। উপরোক্ত বিষয়গুলো বিশ্বাস করার মাধ্যমেই মুমিনগণ অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হতে পেরেছেন।

আরো জেনে রাখা আবশ্যক যে, কবরের আগুন ও সবুজ-শ্যামল অবস্থা দুনিয়ার আগুন ও সবুজ-শ্যামল অবস্থার মত নয়। আল্লাহ তা'আলা কবরে দাফনকৃত ব্যক্তির উপর এবং নীচের মাটি ও পাথর গরম করবেন। ফলে তা দুনিয়ার আগুনের চেয়ে বেশি উত্তপ্ত হবে। দুনিয়াবাসী যদি কবরের উপরের মাটি ও পাথর স্পর্শ করে তাহলে উত্তাপ অনুভব করে না; বরং এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, দু'জন মৃত ব্যক্তিকে পাশাপাশি দাফন করা হয়। তাদের একজন আগুনের গর্তের মধ্যে থাকে এবং অন্যজন থাকে জান্নাতের বাগানে। আগুনের গর্তে অবস্থানকারীর নিকট থেকে উত্তাপের কোনো অংশ জান্নাতের বাগানে অবস্থানরত ব্যক্তির কাছে যায় না এবং জান্নাতের বাগানে অবস্থানকারীর আনন্দের কোনো অংশ আগুনের গর্তে শাস্তিভোগকারীর কাছে যায় না। আল্লাহর কুদরত এর চেয়ে আরো

ব্যাপক ও বিস্ময়কর। তবে সমস্যা হলো মানুষের জ্ঞান যা আয়ত্ত করতে অক্ষম, তারা তা অস্বীকার করার ক্ষেত্রে খুব অগ্রগামী।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়াতে তার এমন কিছু বিস্ময়কর কুদরত দেখিয়েছেন, যা কবরের আযাব কিংবা তার শাস্তি সংক্রান্ত বিষয়ের চেয়েও ভয়াবহ। তিনি যখন তার কোনো কোনো বান্দাকে কবরের আযাব দেখানোর ইচ্ছা করেন, তখন তাকে তা দেখান এবং অন্যদের থেকে তা গোপন রাখেন। সমস্ত মানুষকে তা দেখালে শরী'আতের আদেশ-নির্দেশের হিকমত শেষ হয়ে যেতো এবং গায়েবের প্রতি বিশ্বাস করার উদ্দেশ্য নিঃশেষ হয়ে যেতো। সেই সঙ্গে মানুষ তাদের স্বজনদের লাশ মাটির নীচে দাফন করাও বাদ দিতো। যেমন ছ্বহীহ বুখারীর হাদীছে নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে,

فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِى أَسْمَعُ مِنْهُ»

"এই উম্মতকে কবরের ফিতনায় ফেলা হবে। আমার যদি এ আশঙ্কা না হতো যে, কবরের আযাব শোনালে তোমরা মৃতদেরকে দাফন করা বর্জন করবে, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করতাম, তিনি যেন কবরের আযাব থেকে তোমাদেরকেও কিছু শুনান, যা আমি শুনতে পাই"।

أسباب عذاب القبر

কবরের আযাবের কারণসমূহ

আল্লামা সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যেসব কারণে কবরবাসীদেরকে তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হবে, তা দু'ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। সংক্ষিপ্তভাবে ও বিস্তারিতভাবে।

সংক্ষিপ্তভাবে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে, তার আদেশসমূহ বাস্তবায়ন না করে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে কবরে আযাব হবে। তিনি এমন কোনো রূহকে কবরে আযাব দিবেন না, যে তাকে চিনতে পেরেছে, তাকে ভালোবেসেছে, তার আদেশ বাস্তবায়ন করেছে এবং তার নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থেকেছে। এরকম রূহ যে দেহের মধ্যে থাকে, সে দেহকেও তিনি কখনো শাস্তি দিবেন না। কেননা কবরের আযাব ও আখিরাতের আযাব বান্দার প্রতি আল্লাহর ক্রোধের কারণেই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি ইহজগতে আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করবে, তাকে অসন্তুষ্ট করবে এবং তার নাফরমানি করার পরও তাওবা না করেই মৃত্যুবরণ করবে, তার প্রতি আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি অনুপাতেই সে বারযাখের শাস্তি ভোগ করবে। অতএব কেউ কম শাস্তি ভোগ

করবে, কেউ বেশি ভোগ করবে। যারা কবরের আযাব ও শাস্তির প্রতি ঈমান আনয়ন করবে সে কবরে শান্তি পাবে এবং যারা তাকে অস্বীকার করবে, তারা শাস্তি পাবে।

কবরের আযাবের কারণগুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে গিয়ে আমরা ঐসব আমলগুলো উল্লেখ করতে চাই, যেগুলোকে কবরের আযাবের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন দুই ব্যক্তির সংবাদ দিয়েছেন, যাদেরকে তিনি কবরে আযাব ভোগ করতে দেখেছেন। তাদের একজন মানুষের মধ্যে চোগলখোরী করে বেড়াতো এবং অন্যজন স্বীয় পেশাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করতো না কিংবা পেশাব করার সময় নিজেকে আড়াল করতো না। যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করা ছাড়াই ছ্বলাত পড়তো তার আযাব হওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন। যে ব্যক্তি কোনো মাযলুম ব্যক্তির কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে সাহায্য করে না তারও কবরে আযাব হবে। যে ব্যক্তি কুরআন পড়তে শিখেছে, কিন্তু সে রাতে তা তেলাওয়াত করে না এবং দিনের বেলায় কুরআন অনুযায়ী আমল করে না তারও কবরে আযাব হবে।

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাতে যেনাকারী নর-নারী, সুদখোর ও ঘুমিয়ে থেকে ফজরের ছ্বলাত পরিত্যাগকারীর আযাব দেখেছেন। যারা মালের যাকাত দেয় না, তাদের কবরেও আযাব হবে। মানুষের মাঝে যারা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে, অহংকার করে, যারা লোক দেখানো আমল করে, মানুষকে নিন্দা করে তাদের কবরেও শাস্তি হবে। নাস্তিক ও অবিশ্বাসীরা তাদের বিবেক-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করে কবরের আযাব ও নিয়ামতকে অস্বীকার করেছে। তাদের সর্বোচ্চ দলীল হলো আমরা কাউকে তার কবরে আযাব বা নিয়ামত ভোগ করতে দেখি না বা কারো আযাবের শব্দ শুনিনা। শাইখুল ইসলামের বক্তব্য এখানেই শেষ। আমাদের জবাব হলো, কবরের আযাব ইলমে গায়েবের অন্তর্ভুক্ত। ছ্বহীহ দলীলের ভিত্তিতে এর প্রতি ঈমান আনয়ন করতে হবে। এতে বিবেক-বুদ্ধির কোনো দখল নেই। আখিরাতের বিষয়গুলোকে দুনিয়ার বিষয়গুলোর উপর কিয়াস করা যাবে না। কোনো বিষয়ে মানুষের জ্ঞান না থাকা উক্ত জিনিসের অস্তিত্ব না থাকার প্রমাণ নয়। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

رابعا: البعث والنشور

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ পুনরুত্থান ও পুনর্জীবন

জেনে রাখুন যে, কবর থেকে পুনরুত্থানের প্রমাণ রয়েছে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এবং অবিকৃত সৃষ্টিগত স্বভাব দ্বারাও এটি সাব্যস্ত। আল্লাহ তা'আলা তার মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সংবাদ দিয়েছেন এবং এ মর্মে দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনেক আয়াতে তিনি পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের প্রতিবাদ করেছেন। শুধু তাই নয়; সমস্ত নাবী-রসূল তাদের নিজ নিজ জাতির লোকদেরকে পুনরুত্থান সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন এবং বিরুদ্ধবাদীদেরকে তার প্রতি ঈমান আনয়নের দাবি করেছেন। আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু সর্বশেষ নাবী ছিলেন, তাকে যেহেতু ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে প্রেরণ করা হয়েছে, তাই তিনি আখিরাতের বিষয়গুলোর এমন সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, যা পূর্ববর্তী অন্যান্য আসমানী কিতাবে পাওয়া যায় না। ক্বিয়ামতে কুবরা তথা বড় ক্বিয়ামতের বিষয়টি আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য নাবী 'আলাইহিমুস সালামের নিকট পরিচিত ছিল।

আল্লাহ তা'আলা আদমকে যখন দুনিয়াতে নামিয়ে দিলেন তখন তিনি বলেছেন,

﴿اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾

"তোমরা নেমে যাও, তোমরা পরস্পরের শত্রু এবং তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত পৃথিবীতেই রয়েছে বসবাসের জায়গা ও জীবন যাপনের উপকরণ। তোমরা পৃথিবীতে জীবন যাপন করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে।"। (সূরা আল-বাকারা: ৩৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾

"সেখানেই তোমাদের জীবন যাপন করতে হবে এবং সেখানেই মরতে হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের সবশেষে আবার বের করে আনা হবে"। (সূরা আল-আরাফ: ২৫)

অভিশপ্ত ইবলীস যখন বললো,

﴿رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾

"হে আমার রব! এ কথাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এদেরকে যখন পুনরায় উঠানো হবে সে সময় পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও। আল্লাহ তা'আলা বললেন, ঠিক আছে,

তোমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হলো যার সময় আমি জানি"। (সূরা আল-হিজর: ৩৬-৩৮)

নূহ 'আলাইহিস সালাম তার লোকদেরকে বলেছেন,

﴿وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মাটি থেকে বিস্ময়কর রূপে উৎপন্ন করেছেন। আবার এ মাটির মধ্যে তোমাদের ফিরিয়ে নেবেন এবং এ মাটি থেকেই তোমাদের বের করে আনবেন"। (সূরা নূহ: ১৭-১৮) ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তার জাতির লোকদেরকে বলেছেন:

﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾

"আর তার কাছে আমি আশা করি, প্রতিদান দিবসে তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন"। (সূরা আশ শুআরা: ৮২) আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম) এর কথা উল্লেখ করে কুরআনে বলেন,

﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ﴾

"ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তার সময়টা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী প্রতিদান লাভ করতে পারে। কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান আনেনা এবং নিজের প্রবৃত্তির দাস হয়ে গেছে সে যেন তোমাকে সে সময়ের চিন্তা থেকে নিবৃত্ত না করে। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে"। (সূরা তোহা: ১৫-১৬)

মূসা (আলাইহিস সালাম) তার কাওমের লোকদের উদ্দেশ্যে আরো বলেছেন,

﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾

"আর আমাদের জন্য এ দুনিয়ার কল্যাণ লিখে দাও এবং আখিরাতেরও, আমরা তোমার দিকে ফিরেছি। জবাবে বলা হলো, শাস্তি তো আমি যাকে চাই তাকে দিয়ে থাকি কিন্তু আমার অনুগ্রহ সব জিনিসের উপর পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। কাজেই তা আমি এমন লোকদের নামে লিখবো যারা নাফরমানী থেকে দূরে থাকবে, যাকাত দেবে এবং আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনবে"। (সূরা আল-আরাফ: ১৫৬)

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, কাফেরদেরকে যখন জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে, তখন তারা স্বীকার করবে যে, রসূলগণ তাদেরকে এ দিন সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾

"তোমাদের কাছে কী তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে রসূলগণ আসেননি যারা তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন যে, একদিন তোমাদেরকে এ দিনটির সম্মুখীন হতে হবে? তারা বলবে, হ্যাঁ, এসেছিল। কিন্তু আযাবের সিদ্ধান্ত কাফেরদের জন্য অবধারিত হয়ে গেছে"। (সূরা আয যুমার: ৭১)

সুতরাং সবশেষ নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়ামত দিবসের যে সংবাদ দিয়েছেন, সমস্ত নাবী-রসূলই সে সংবাদ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, শিঙ্গা তৃতীয়বার ফুঁ দেয়ার সময় মৃতগণ তাদের কবর থেকে বের হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾

"অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। তৎক্ষনাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে"। (সূরা আয যুমার: ৬৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾

"তারপর শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে এবং সহসা তারা নিজেদের রবের সামনে হাযির হবার জন্য নিজেদের কবর থেকে বের হবে"। (সূরা ইয়াসীন: ৫১)

ইমাম সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ছা'লাবীর তাফসীরে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সূরা আয যুমারের তাফসীরে মারফু হিসাবে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা যমীনে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত যমীনে বৃষ্টিপাত হতে থাকবে। এতে তাদের উপর ১২ হাত পানি জমে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষদের দেহগুলোকে শাক-সবজি ও তৃণলতা উদ্গাত হওয়ার ন্যায় অঙ্কুরিত হওয়ার আদেশ দিবেন। দেহগুলো যখন পূর্বের ন্যায় পূর্ণতা লাভ করবে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে জীবিত হওয়ার আদেশ দিবেন। জিবরীল, মীকাঈল, ইসরাফীল, মালাকুল মাওতকেও জীবিত হওয়ার আদেশ দিবেন। তারা জীবিত হলে ইসরাফীলকে শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার আদেশ দিলে তিনি তাতে মুখ লাগাবেন। অতঃপর তিনি রূহ সমূহকে ডাক দিবেন। সমস্ত রূহকে আনয়ন করা হবে। মুমিনদের রূহসমূহ নূর চমকাতে থাকবে এবং কাফের ও মুনাফেকদের রূহসমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে। ইসরাফীল সবগুলো রূহকে শিঙ্গার ভিতর ঢুকাবেন।

অতঃপর তাকে শিঙ্গায় পুনরুত্থানের ফুঁ দেয়ার আদেশ দেয়া হবে। এতে সমস্ত রূহ মৌমাছির ন্যায় শিঙ্গা থেকে বের হয়ে আসমান-যমীনের মধ্যকার ফাঁকা জায়গা পরিপূর্ণ করে ফেলবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার বড়ত্ব ও মর্যাদার শপথ! প্রত্যেক

রূহ নিজ নিজ দেহে চলে যাও। রূহগুলো তখন প্রত্যেকের নাকের ছিদ্র দিয়ে নিজ নিজ দেহের মধ্যে প্রবেশ করবে। অতঃপর সাপে কাটা রোগীর শরীরের সর্বত্র যেমন বিষ ছড়িয়ে পড়ে সেভাবেই দেহের সর্বত্র রূহ সঞ্চালিত হবে। অতঃপর দ্রুততার সাথে যমীনকে বিদীর্ণ করা হবে। নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার কবরই সর্বপ্রথম বিদীর্ণ করা হবে। অতঃপর তোমরা সকলেই কবর থেকে তোমাদের প্রভুর নিকট দ্রুত উপস্থিত হবে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنْ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। সেখানে তারা এমনভাবে বেড়ে উঠবে যেমনভাবে বীজ থেকে তৃণলতা উদ্গত হয়। বনী আদমের দেহের অংশ 'আজবুয যানাব' ব্যতীত সবকিছুই যমীন খেয়ে ফেলে। এ থেকেই বনী আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ক্বিয়ামতের দিন এ থেকেই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে"।[১৬৩]

ছ্বহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, মানুষের শরীরের একটি হাড্ডী আছে, যা মাটি কখনো খেতে পারে না। এ থেকেই ক্বিয়ামতের দিন সৃষ্টিকে পুনর্বার সৃষ্টি করা হবে। লোকেরা বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! এটি কোন্ হাড্ডী? তিনি বললেন, এটি হলো আজবুয যানাব। আলেমগণ বলেছেন, পিঠের একদম নীচের ক্ষুদ্রতম হাড্ডীর নাম হলো আজবুয যানাব। হাদীছে এসেছে যে, এটি হলো সরিষার দানার মত। এ থেকে মানুষের শরীর নতুনভাবে তৈরী হবে। মুশরিকরা মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় নতুন জীবনে সৃষ্টি করার বিষয়কে অসম্ভব মনে করেছিল। তাই তারা পুনরুত্থান ও পুনর্জীবনকে অস্বীকার করেছিল।

আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে পুনরুত্থানের কথা শপথ করে বলার আদেশ দিয়েছেন যে, এটি সংঘটিত হবেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾

"কাফেররা বলে, আমাদের উপর ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না। হে নাবী! তুমি বলো, আমার রবের শপথ, তা তোমাদের উপর অব্যশই আসবে। তিনি গায়েবের সকল খবর রাখেন। তার কাছ থেকে অণু পরিমাণ কোনো জিনিস আকাশসমূহে লুকিয়ে নেই এবং পৃথিবীতেও না। অণুর চেয়ে বড়ই হোক কিংবা তার চেয়ে ছোটই হোক, সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে"। (সূরা সাবাঃ ৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

[১৬৩] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৭৬০৪।

﴿وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ﴾

"তারপর তারা জিজ্ঞেস করে যে, তুমি যা বলছো তা কি যথার্থই সত্য? বলো: আমার রবের শপথ! এটা যথার্থই সত্য এবং এর প্রকাশ হবার পথে বাধা দেবার মতো শক্তি তোমাদের নেই"। (সূরা ইউনুস: ৫৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

"কাফেররা দাবী করে বলেছে যে, মরার পরে আর কখনো তাদের জীবিত করে উঠানো হবে না। হে নাবী! তুমি তাদের বলে দাও, আমার রবের শপথ, তোমাদের অবশ্যই উঠানো হবে। তারপর তোমরা যা করেছো তা অবশ্যই তোমাদেরকে অবহিত করা হবে। এরূপ করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ"। (সূরা আত তাগাবুন: ৭)

ক্বিয়ামত অতি নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾

"ক্বিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে"। (সূরা আল কামার: ১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾

"মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় এসে গেছে, অথচ সে গাফিলতির মধ্যে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আছে"। (সূরা আল আম্বীয়া: ১)

পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদেরকে দোষারোপ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

"প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে মিথ্যা বলেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা মোটেই সঠিক পথে ছিল না"। (সূরা ইউনুস: ৪৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾

"জেনে নাও, যারা সে সময়ের আগমনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য বিতর্ক করে তারা গোমরাহীর মধ্যে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে"। (সূরা আশ শূরা ৪২:১৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ

اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾

"আমি ক্বিয়ামতের দিন তাদের সমবেত করবো তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় এবং অন্ধ, বোবা ও বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। যখনই জাহান্নামের অগ্নি নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে তখনই আমি তাদের জন্য অগ্নি আরো বৃদ্ধি করে দিব। এটি হচ্ছে তাদের এ কাজের প্রতিদান যে, তারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, যখন আমরা হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কী আবার আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করে উঠানো হবে? তারা কী খেয়াল করেনি, যে আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার অবশ্যই ক্ষমতা রাখেন? তিনি তাদের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন, যার আগমন অবধারিত। কিন্তু যালেমরা অস্বীকার না করে ক্ষান্ত হলো না"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ৯৭-৯৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾

"তারা বলে, আমরা যখন হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করে উঠানো হবে? এদেরকে বলো, তোমরা পাথর বা লোহা হয়ে যাও অথবা তার চেয়েও বেশী কঠিন কোনো জিনিস, যার অবস্থান তোমাদের ধারণায় জীবনী শক্তি লাভ করার বহুদূরে (তবুও তোমাদের উঠানো হবেই)। তারা নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবে, কে আমাদের আবার জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনবে? বলো, যিনি প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন। তারা মাথা নেড়ে নেড়ে জিজ্ঞাসা করবে, আচ্ছা, তাহলে এটা কবে হবে? বলো, সে সময়টা হয়তো নিকটেই এসে গেছে। যেদিন তিনি তোমাদের ডাকবেন, তোমরা তার প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতে করতে তার ডাকের জবাবে বের হয়ে আসবে এবং তখন তোমাদের এ ধারণা হবে যে, তোমরা অল্প কিছুক্ষণ মাত্র এ অবস্থায় কাটিয়েছো"। (সূরা বানী ইসরাঈল: ৪৯-৫২)

শারহুত্ তাহাবীয়ার ব্যাখ্যাকার উপরোক্ত আয়াতগুলো ব্যাখ্যায় বলেন, হে প্রিয় পাঠক! তাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব যে রকম বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে, তাতে আপনি চিন্তা করুন। তারা প্রথমে বলেছে, আমরা যখন হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কী আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করে উঠানো হবে? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, তোমরা যদি ধারণা করে থাকো যে, তোমাদের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই এবং তোমাদের কোনো রবও নেই, তাহলে তোমরা কেন এমন সৃষ্টিতে পরিণত হয়ে যাও না, যার কোনো মৃত্যু নেই?

যেমন মজবুত পাহাড় এবং লোহা কিংবা তোমাদের ধারণায় এর চেয়ে অধিক মজবুত কোনো সৃষ্টি।

অতএব তোমরা যদি বলো যে, আমরা হচ্ছি এমন সৃষ্টি, যা চিরস্থায়ী হয় না, তাহলে তোমাদের সৃষ্টিকর্তার মাঝে এবং তোমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় নতুন করে সৃষ্টি করার মাঝে কোন জিনিস প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো?

উপরের দলীলটি অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তোমাদেরকে যদি পাথর, লোহা অথবা এর চেয়ে অধিক শক্ত কোনো বস্তু হতেও সৃষ্টি করা হতো, তাহলেও তিনি তোমাদেরকে নিঃশেষ করতে ও তোমাদের শরীরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে সক্ষম। শুধু তাই নয়; তোমাদের শরীরকে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করতেও তিনি সক্ষম। মানুষের শরীরের হাড় এবং অন্যান্য বস্তু শক্ত হওয়া সত্ত্বেও যিনি একে নিঃশেষ ও মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে সক্ষম, তাকে এর চেয়ে কম কিছু করতে কিসে অক্ষম করতে পারে? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, কাফেররা আরেকটি প্রশ্ন করে থাকে। তাদের প্রশ্ন হচ্ছে, কে আমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবে? বিশেষ করে যখন আমাদের দেহসমূহ পচে যাবে এবং মাটির সাথে মিশে যাবে, তখন কে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবে? আল্লাহ তা'আলা তাদের জবাব এভাবে দিয়েছেন যে,

﴿قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾

"বলো, তিনিই তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন, যিনি প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেছেন" (সূরা বনী ইসরাঈল:৫১)।

যখন তাদের উপর এই দলীল কায়েম হয়ে গেল এবং তার হুকুম কবুল করে নেয়া আবশ্যক হয়ে গেলো, তখন তারা অন্য একটি প্রশ্ন করলো। তারা বললো, ক্বিয়ামত কখন প্রতিষ্ঠিত হবে? তখন তাদের জবাবে বলা হয়েছে, অবাক হবার কিছুই নেই, সে সময়টা হয়তো নিকটেই এসে গেছে।

خامسا: الإيمان بما يكون يوم القيامة

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ক্বিয়ামত দিবসে যা কিছু হবে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা

ইমাম সাফারায়েনী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, জেনে রাখুন যে, আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার দিবসে ভয়াবহ বিপদ রয়েছে। সেদিন হৃদপিণ্ড বিগলিত হবে, স্তন্যদানকারীনী মহিলারা তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে ভুলে যাবে এবং শিশু হয়ে যাবে।

এটি সত্য-সুপ্রমাণিত। আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে এবং মুসলিমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। এটি হলো ক্বিয়ামত দিবস। এ দিবসকে ক্বিয়ামত দিবস হিসাবে নামকরণ করার ব্যাপারে আলেমদের মতানৈক্য রয়েছে। কতিপয় আলেম বলেছেন, মানুষ যেহেতু এদিন তাদের কবর থেকে দণ্ডায়মান হবে, তাই এর নাম রাখা হয়েছে ক্বিয়ামত তথা দাঁড়ানোর দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾

"সেদিন তারা কবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। মনে হবে যে, তারা কোনো একটি লক্ষ্য স্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে"। (সূরা আল মাআরেজ: ৪৩)

কেউ কেউ বলেছেন, সেদিন হাশরের মাঠের বিভিন্ন বিষয় যেমন তাতে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া এবং অন্যান্য কারণে তাকে ক্বিয়ামত দিবস হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সেদিন রাব্বুল আলামীনের সামনে যেহেতু সমস্ত মানুষ দাঁড়াবে, তাই তাকে ক্বিয়ামত দিবস বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"সেদিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে" এ আয়াতের ব্যাখ্যা ইমাম মুসলিম তার ছ্বহীহ গ্রন্থে ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেন যে, সেদিন তাদের কেউ কেউ ঘামের মধ্যে দাঁড়াবে। পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম তার কান বরাবর পৌঁছে যাবে।

ইমাম সাফারায়েনী আরো বলেন, ইমাম আহমাদ, আবু ইয়ালা এবং ইবনে হিব্বান তার ছ্বহীহ গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। লোকেরা বললো, কতই না দীর্ঘ হবে এ দিনটি? নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, সেদিনটি মুমিনদের জন্য এক ওয়াক্ত ফরয ছ্বলাত আদায় করার সময়ের চেয়েও কম হবে।

কেউ কেউ বলেছেন, ফেরেশতাগণ এবং জিবরীল আমীন কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানোর কারণে এ দিবসকে ক্বিয়ামত দিবস বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلاَئِكَةُ صَفًّا لاَ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾

"যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত অন্য কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্য বলবে"। (সূরা আন-নাবা: ৩৮)

তিনি আরো বলেন, ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ».

"ক্বিয়ামতের দিন মানুষ ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে। আর তাদের ঘাম যমীনের উপর সত্তর গজ পরিমাণ হয়ে যাবে। তাদের মুখ পর্যন্ত এমনকি তাদের কান পর্যন্ত ঘাম পৌঁছে যাবে"। ছ্বহীহ বুখারীর কিছু কিছু শব্দে ৭০ গজের স্থলে ৭০ বছরের কথা এসেছে।[১৬৪]

ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

«إذا كان يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُدْنِيَت الشَّمْسُ مِنْ الْعباد حَتَّى تَكُونَ قدر ميل أو ميلين قَالَ فتصهرهم الشمس فَيَكُونُون في العرق كقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يأخذه إِلَى عقبيه وَمِنْهُمْ مَنْ يأخذه إِلَى حقويه وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا»

"ক্বিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের মাথার উপরে চলে আসবে। মাত্র এক মাইল কিংবা দুই মাইলের ব্যবধান থাকবে। সূর্যের উত্তাপ তাদেরকে গলিয়ে ফেলবে। মানুষ তাদের নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। মানুষের শরীরের পঁচা ঘাম কারো টাখনু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। ঘাম কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো নাকের ডগা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। একথা বলার পর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখের দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন"।[১৬৫] এ ভয়াবহ দিনে মানুষ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে।

[১৬৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৫৩২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৬৩।
[১৬৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৬৪, অধ্যায়: কিতাবুল জান্নাত

١ – الحساب

১. হিসাব-নিকাশ

আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের আমল অনুযায়ী বিনিময়ের পরিমাণ জানিয়ে দিবেন এবং তারা যা কিছু ভুলে যাবে, তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবেন। এর নামই হিসাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

"সেদিন আল্লাহ সমস্ত মানুষকে একত্রে পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যা তারা করতো। আল্লাহ তার হিসাব রেখেছেন। আর তারা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা"। (সূরা মুজাদালাহ: ৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

"এবং তারা বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এটা কেমন খাতা, আমাদের ছোট বড় কোনো কিছুই এখানে লেখা থেকে বাদ পড়েনি। তারা যাকিছু করেছিল সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে এবং তোমার রব কারোর প্রতি যুলুম করবেন না"। (সূরা আল-কাহাফ: ৪৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

"অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে"। (সূরা আল যিলযাল: ৭-৮)

ক্বিয়ামতের দিন মানুষের কাছ থেকে বদলা নেয়াও হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা যালেমের কাছ থেকে মাযলুমের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন অথবা মাযলুমকে যালেমের উপর সক্ষম করবেন এবং প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ করে দিবেন।

যেমন ছ্বহীহ মুসলিম ও সুনানে তিরমিযীতে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছে এসেছে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ

"তোমরা অবশ্যই প্রত্যেক হকদারের হক পরিশোধ করে দিবে। তা না করলে ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এমনকি শিং ওয়ালা ছাগল দুনিয়াতে শিংবিহীন

কোনো ছাগলকে শিং দিয়ে গুঁতা মেরে থাকলে তার থেকে শিং বিহীন ছাগলের জন্য প্রতিশোধ নেয়া হবে”।[১৬৬]

ক্বিয়ামতের দিন হিসাব বিভিন্ন রকম হবে। কারো হিসাব নেয়া হবে শক্তভাবে। আবার কারো হিসাব হবে একদম সহজ। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন সৃষ্টির হিসাব নিবেন এবং তার মুমিন বান্দার সাথে নির্জনে মিলিত হবেন ও তার গুনাহসমূহ স্বীকার করাবেন। আল্লাহ কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে এর বিবরণ এসেছে।

তবে যাদের সৎকর্ম ও অন্যায় কর্মগুলো ওজন করা হবে তাদের হিসাবের ন্যায় কাফেরদের হিসাব নেয়া হবে না। কেননা তাদের কোনো সৎকর্মই থাকবে না। কিন্তু তাদের কাজ-কর্মগুলো গণনা করে ও সংরক্ষণ করে রাখা হবে। তার কারণে তাদেরকে আটকানো হবে এবং স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হবে। শাইখুল ইসলামের কথা এখানেই শেষ।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার ছ্বলাতের হিসাব নেয়া হবে। আর মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম রক্তপাতের বিচার করা হবে”।[১৬৭]

ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ এবং হাকেম আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلَاةُ يَقُولُ الله تعالى لِمَلَائِكَتِهِ انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَلك

“ক্বিয়ামতের ময়দানে বান্দার সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব নেয়া হবে, তা হল তার ছ্বলাত। আল্লাহ তা'আলা তার ফেরেশতাদেরকে বলবেন, আমার বান্দার ছ্বলাত দেখো। সে কি তা পূর্ণরূপে আদায় করেছে না কি অসম্পূর্ণরূপে আদায় করেছে? সে যদি পূর্ণ রূপে আদায় করে থাকে, তাহলে তার জন্য পূর্ণ ছাওয়াব লেখা হবে। আর তাতে ত্রুটি করে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দেখো আমার বান্দার কোনো নফল ছ্বলাত আছে কি না? তার যদি নফল ছ্বলাত থাকে, তাহলে তিনি বলবেন, আমার বান্দার ফরয ছ্বলাতের ত্রুটি-বিচ্যুতি নফল দ্বারা পূরণ করো। অতঃপর সমস্ত ফরয আমলের ত্রুটি-বিচ্যুতি নফল দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে”।[১৬৮] ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন এবং হাকেম ছ্বহীহ বলেছেন।

---

[১৬৬] ছ্বহীহ: তিরমিযী, হা/২৪২০।

[১৬৭] বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুত দিয়া'ত

[১৬৮] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৮৬৪, মুস্তাদরাকুল হাকেম, হা/৯২২।

ইমাম নাসাঈ (রহিমাহুল্লাহ) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ

“ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার ছ্বলাতের হিসাব নেয়া হবে। আর মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম রক্তপাতের বিচার করা হবে”।[১৬৯]

২-إعطاء الصحائف

২. আমলনামা প্রদান

আমলনামা বলতে সেই কিতাবগুলো উদ্দেশ্য, যা ফেরেশতাগণ লিখে থাকেন এবং দুনিয়ার জীবনে প্রত্যেক মানুষের মৌখিক ও কর্মগত আমলসমূহ তাতে তারা সংরক্ষণ করেন। ক্বিয়ামতের দিন আমলনামা প্রদান সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾

“প্রত্যেক মানুষের আমলনামা আমি তার গলায় লাগিয়ে দিবো এবং ক্বিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করবো এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত অবস্থায়। আমি বলবো, তোমার আমলনামা নিজেই পাঠ করো। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট”। (সূরা বনী ইসরাঈল: ১৩-১৪)

আলেমগণ বলেছেন, طائره অর্থ হলো তার আমলসমূহ। কাউকে ক্বিয়ামতের দিন আমলনামা দেয়া হবে ডান হাতে আবার কাউকে দেয়া হবে তার বাম হাতে। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَه * إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَه * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ * وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَه * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَه * يَالَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ * مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَه * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَه * خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ * إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ * فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ * وَلاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ * لاَ يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئُونَ﴾

[১৬৯] বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুত দিয়া‘ত, নাসাঈ হা/৩৯৯১, ছ্বহীহ।

"অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে, এসো! তোমরাও আমার আমলনামা পড়ে দেখো। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে সুউচ্চ জান্নাতে। তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে তার প্রতিদান স্বরূপ তোমরা খাও এবং পান করো তৃপ্তি সহকারে। আর যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে হায় আমাকে যদি আমলনামা না দেয়া হতো! আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায় আমার মৃত্যুই যদি শেষ পরিণতি হতো! আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো উপকারে আসলো না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেলো। ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, একে ধর। অতঃপর গলায় বেড়ি লাগাও। অতঃপর নিক্ষেপ করো জাহান্নামে। অতঃপর তাকে এমন শিকল দিয়ে বাঁধো যার দৈর্ঘ হবে সত্তর গজ। নিশ্চয় সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না এবং মিসকীনকে খাদ্য দিতে উৎসাহিত করতো না। অতএব আজকের দিনে এখানে তার কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না এবং কোন খাদ্য নেই ক্ষতমিশ্রিত পুঁজ ব্যতীত। গুনাহগার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না"। *(সূরা আল-হাক্কাহ: ১৯- ৩৭)*

٣– وزن الأعمال

৩. আমলসমূহের ওজন

ক্বিয়ামতের দিন যা কিছু হবে, তার মধ্যে রয়েছে বনী আদমের আমলসমূহ ওজন করার বিষয়টি অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾

"আর সেদিন সত্য সত্যই ওজন হবে। অতঃপর যাদের সৎ আমলের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের সৎ আমলের পাল্লা হালকা হবে তারা এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতো"। *(সূরা আল-আরাফ: ৮-৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾

"আমি ক্বিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করবো। সুতরাং কারো প্রতি যুলুম করা হবে না। যদি কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট"। (সূরা আল আম্বিয়া: ৪৭)

সুতরাং বান্দার আমলসমূহ মাপা হবে প্রকৃত একটি দাঁড়িপাল্লা দিয়ে, যার একটি কাটা ও দু'টি পাল্লা থাকবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মীযান হলো এমন মানদণ্ড, যা দ্বারা আমলসমূহ মাপা হবে। ন্যায় বিচার ও মীযান দু'টি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত দ্বারা এটি সাব্যস্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ﴾

"অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে সে সুখী জীবন যাপন করবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে তার ঠিকানা হবে হাবিয়া (জাহান্নাম)। তুমি জানো কি হাবিয়া কী? তা হচ্ছে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি"। (সূরা আল-কারিআহ: ৬-১১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾

"আমি ক্বিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মান মানদণ্ড স্থাপন করবো"। (সূরা আল আম্বিয়া:৪৭)

অতঃপর শাইখুল ইসলাম এমন কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যাতে আমলসমূহ ওজন করার কথা এসেছে। অতঃপর তিনি বলেন, এ হাদীছটি এবং অনুরূপ অন্যান্য হাদীছ প্রমাণ করে যে, বান্দার আমলসমূহ অনেক দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করা হবে, যাতে কারো সৎ আমলের পাল্লা মন্দ আমলের পাল্লার চেয়ে ভারি হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে আবার কারো মন্দ আমলের পাল্লা সৎ আমলের পাল্লার চেয়ে ভারি হবে। এর মাধ্যমেই ন্যায় বিচার সুস্পষ্ট হবে। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্যই আমল ওজন করা হবে। মূলগত দিক থেকে দুনিয়ার দাঁড়িপাল্লার মতই হবে; কিন্তু ক্বিয়ামতের দিনের দাঁড়িপাল্লাসমূহের ধরন অন্যান্য গায়েবী বিষয়ের মতই। অর্থাৎ তার ধরন-পদ্ধতি আমাদের জানা নেই।

٤- الصراط والمرور عليه

৪. পুলছ্বিরাত ও তার উপর দিয়ে চলা

ক্বিয়ামতের দিন যা কিছু হবে, তার মধ্যে রয়েছে পুলছ্বিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করার বিষয়টি। এটি হলো জাহান্নামের উপর স্থাপিত দীর্ঘ একটি পুল। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। মানুষ তাদের আমল অনুযায়ী এর উপর দিয়ে দ্রুতবেগে কিংবা ধীরগতিতে অতিক্রম করবে। এটি হবে চুল হতে অধিক চিকন, তলোয়ারের চেয়ে অধিক ধারালো এবং আগুনের চেয়ে বেশী উত্তপ্ত। এর উপর থাকবে লোহার আঁকুড়াসমূহ। এখান থেকে যাকে ছিনতাই করার আদেশ দেয়া হবে, এগুলো তাকে দ্রুত গতিতে ছিনতাই করে নিবে। লোকেরা নিজ নিজ আমল অনুযায়ী এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। তাদের কেউ বিজলির গতিতে, কেউ দ্রুতগামী বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে পার হবে, কেউ দৌঁড়ে, কেউ হেঁটে এবং কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পার হবে। কাউকে সেখান থেকে টান মেরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১৭০] আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও মুক্তি কামনা করছি।

ইমাম সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মূলগত দিক থেকে পুলছ্বিরাত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন। তবে আহলে হকগণ এটাকে বাহ্যিক অর্থেই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ জাহান্নামের উপর একটি বাহ্যিক প্রকৃত লম্বা পুল স্থাপন করা হবে। যা

---

[১৭০] আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ছিরাতে মুসতাকীম তথা আল্লাহর দীনের উপর দৃঢ় ও মজবুত থাকবে, সে ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলছ্বিরাতের উপরর স্থির ও দৃঢ়পদ থাকবে। দুনিয়াতে ছিরাতে মুস্তাকীমের উপর টিকে থাকা অনুপাতেই জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলের উপর টিকে থাকা যাবে। হে মুসলিম ভাই! দুনিয়াতে ছিরাতুল মুস্তাকীমে চলার গতি অনুপাতেই পুলছ্বিরাতের উপর তোমার চলার গতি হবে। তুমি যদি এখানে দীনের পথে দ্রুত অগ্রসর হও, পুলছ্বিরাতেও তোমার গতি হবে দ্রুত, এখানে যদি তোমার গতি হয় দুর্বল, পুলছ্বিরাতেও তোমার গতি হবে দুর্বল।

দুনিয়াতে মানুষকে ছিরাতুল মুস্তাকীম তথা সঠিক পথে চলতে যে জিনিসগুলো বাধা দেয়, তা হল,

(১) شبهات শুবুহাত (কুফর, শিরক, বিদ'আত, নিফাকী ও দীনের ব্যাপারে সংসয়-সন্দেহ)

(২) شهوات শাহওয়াত (কুপ্রবৃত্তি, লালসা, অন্যায় যৌন কামনা ইত্যাদি)।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) আরও বলেন, দুনিয়ার শুবুহাত ও শাহওয়াতগুলোই পুলছ্বিরাতের কাঁটায় (বক্র মাথা বিশিষ্ট বড়শিতে) পরিণত হবে। দুনিয়াতে যে যত বেশী পরিমাণ শুবুহাত ও শাহওয়াতে লিপ্ত হবে ক্বিয়ামতের দিন পুলছ্বিরাতের কাঁটার আঘাতও তার শরীরে বেশি লাগবে। আর দুনিয়াতে যে শুবহাত ও শাহওয়াত থেকে দূরে থাকবে কিংবা তাতে কমই লিপ্ত হবে, তার শরীরে পুলছ্বিরাতের কাঁটার আঘাতও কম লাগবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ "তোমার প্রভু বান্দার উপর বিন্দু মাত্র যুলুম করবেন না"। (সূরা ফুসসিলাত: ৪৬)

হবে তলোয়ারের চেয়ে বেশি ধারালো এবং চুলের চেয়ে অধিক চিকন। কাযী আব্দুল জাব্বার মুতাযেলী এবং তার অনেক অনুসারী এটিকে অস্বীকার করেছে। তাদের মতে এ রকম পুল পার হওয়া সম্ভব নয়। পার হওয়া সম্ভব হলেও তাতে অনেক কষ্ট হবে। অথচ ক্বিয়ামতের দিন মুমিন ও সৎ লোকদের কোনো শাস্তি নেই। সুতরাং পুলছ্বিরাত বলতে জান্নাতের রাস্তা উদ্দেশ্য। এদিকে ইশারা করেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾

"তিনি অচিরেই তাদের পথপ্রদর্শন করবেন, তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিবেন এবং তাদেরকে সে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পরিচয় তিনি তাদেরকে আগেই অবহিত করেছেন"। (সূরা মুহাম্মাদ: ৫) সুতরাং তা দ্বারা জাহান্নামের রাস্তা উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা এদিকে ইশারা করে বলেন,

﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾

"ক্বিয়ামতের দিন আদেশ করা হবে, ধরে নিয়ে এসো যালেমদেরকে, তাদের সহযোগীদেরকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব মাবুদের ইবাদত করতো তাদেরকেও। অতঃপর তাদের সবাইকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দাও"। (সূরা আস্ সাফ্ফাত: ২৩)

কেউ কেউ ছিরাতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এর দ্বারা সুস্পষ্ট দলীলসমূহ, মুবাহ-বৈধ কাজ-কর্ম এবং মন্দ কাজ-কর্ম দেখা উদ্দেশ্য। যাতে করে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় এবং তার কারণে পাকড়াও করা যায়। এসব কথা বাতিল ও মিথ্যা। কেননা কুরআন-সুন্নাহর দলীলগুলো তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করা ওয়াজিব। পুলছ্বিরাতের উপর দিয়ে পারাপার হওয়া পানির উপর দিয়ে চলা, বাতাসের সাথে উড়াল দেয়া অথবা পানি কিংবা শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে বেশি বিস্ময়কর নয়। নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন কাফেরকে মুখের উপর উপুড় করে হাঁটানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন কুদরত দ্বারা এটি সম্পন্ন করা মোটেই অসম্ভব নয়।

٥- الحوض

৫. নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাউয

হাফেয সুয়ূতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, পঞ্চাশোর্ধ ছাহাবী থেকে হাউযের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে চারজন খোলাফায়ে রাশেদীন এবং ছাহাবীদের মধ্য থেকে হাদীছের হাফেযগণও রয়েছেন। তাদের সকলের উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি নাযিল হোক। হাফেয সুয়ুতীর কথা এখানেই শেষ। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلا يَظْمَأُ أَبَدًا»

“আমার হাওযের প্রশস্ততা হচ্ছে এক মাসের দূরত্বের সমান। এর পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা, তার সুঘ্রাণ হবে কস্তুরীর চেয়েও পবিত্র, তার পেয়ালার সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমান। যে ব্যক্তি একবার তা থেকে পান করবে সে আর কখনো পিপাসিত হবে না।[১৭১]

ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) তার ছ্বহীহ গ্রন্থে আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, একদা রসূলুল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে মসজিদে নববীতে বসে ছিলেন। হঠাৎ তার মধ্যে তন্দ্রার ভাব দেখা দিলো। তারপর তিনি হাঁসিমুখে মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরা প্রশ্ন করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার হাসির কারণ কী? তিনি বললেন, এ মুহূর্তে আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তিনি পাঠ করলেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম,

---

[১৭১] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৫৭৯। বিদ‘আতীরা ক্বিয়ামতের দিন নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর হাউযে কাউছার থেকে বঞ্চিত হবে। তিনি বলেন,

«إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي»

“ক্বিয়ামতের দিন আমি তোমাদের জন্য হাউযে কাউছারের নিকট উপস্থিত থাকবো। যে ব্যক্তি আমার কাছে আসবে আমি তাকে তা থেকে পান করাবো। আমার হাউজ থেকে যে একবার পানি পান করবে সে আর কখনো পিপাসিত হবে না। এমন সময় আমার কাছে একদল লোক আগমন করবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব। তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার ও তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে। আমি বলবো, এরা আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না তারা আপনার পরে কত বিদ‘আত তৈরী করেছিল। আমি বলবো আমার রেখে আসা দীনের মধ্যে যারা পরিবর্তন করেছো তারা এখান থেকে সরে যাও। অতঃপর তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হবে”। (ছ্বহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুর রিকাক)

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)﴾

“নিশ্চয় আমি তোমাকে হাওযে কাওছার প্রদান করেছি। তাই তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছ্বলাত আদায় করো ও কুরবানী করো। নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই লেজকাটা নির্বংশ”।

অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান কাওছার কী? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তার রসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন,

«هُوَ نَهْرٌ أعطانِيهِ رَبِّي في الجنة عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

এটি জান্নাতের একটি নহর। আমার রব আমাকে সেটা প্রদান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে প্রচুর কল্যাণ রয়েছে। এটি একটি হাওয, যেখানে ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে।

এর পান পাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকাসম। তখন কতক লোককে ফেরেশতাগণ হাওয থেকে তাড়িয়ে দিবেন। আমি বলবো, হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি জানো না, তোমার পরে এরা কী পরিমাণ নতুন নতুন পথ ও মত অবলম্বন করেছিল”।

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আলেমগণ বলেছেন, যারা আল্লাহর দীন থেকে মুরতাদ হয়ে যাবে অথবা দীনের মধ্যে আল্লাহর অপছন্দনীয় কোনো কিছু তৈরি করবে অথবা তার আদেশ ছাড়াই কোনো কিছু তৈরি করবে, সে হাউযে কাউছার থেকে বিতাড়িতদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যারা মুসলিমদের জামা‘আতের বিরোধিতা করবে, তাদেরকে আরো কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়া হবে। খারেজী, রাফেযী এবং মু‘তাযিলাদের বিভিন্ন ফির্কার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা সকলেই রসূলের সুন্নাতকে পরিবর্তন করেছে। এমনি যেসব যুলুম, অন্যায়, সত্যকে বিলুপ্ত করা এবং সত্যপন্থিদেরকে অপদস্ত করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে তাদেরকেও হাউয থেকে তাড়ানো হবে। প্রকাশ্যে কাবীরা গুনাহকারী, পাপাচারে লিপ্ত হওয়াকে তুচ্ছ জ্ঞানকারী এবং বিপথগামী ও বিদ‘আতীদেরকেও হাউয থেকে বিতাড়িত করা হবে।

অতঃপর কাউকে প্রথমে বিতাড়িত করা হবে। কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে ক্ষমা করার পর তারা হাউযে কাউছারের নিকটবর্তী হবে। বিশেষ করে তারা যদি আক্বীদার ক্ষেত্রে পরিবর্তন করে থাকে। ইমাম কুরতুবীর কথা এখানেই শেষ।

ছ্বহীহ ও সুস্পষ্ট সুন্নাত দ্বারা হাউয সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও মু‘তাযিলারা হাউয সাব্যস্ত করে না। যারাই হাউয সাব্যস্ত করার বিরোধীতা করবে, তারা বিদ‘আতী বলে গণ্য হবে এবং তারাই হাউয থেকে বিতাড়িত হওয়ার বেশি হকদার।

٦- الشفاعة

৬. শাফা'আত

الشفاعة অর্থ হলো উপায়, মাধ্যম উসীলা, ব্যবস্থা ইত্যাদি। আর শরী'আতের পরিভাষায় শাফা'আত অর্থ হলো, سؤال الخير للغير অন্যের জন্য কল্যাণের আবেদন করা। الشفاعة শব্দটি الشفع থেকে নেওয়া হয়েছে। এটা الوتر শব্দের বিপরীত। شفع অর্থ জোড় আর وتر অর্থ বেজোড়। শাফা'আতকারী তার আবেদনের সাথে সুপারিশ প্রার্থীর আবেদনকেও শামিল করে নেয় বলেই তাকে সুপারিশকারী বলা হয়। অথচ এর আগে সে ছিল একাকী।

কুরআন ও হাদীছের দলীল দ্বারা এমন শাফা'আত সত্য বলে সাব্যস্ত, যার শর্তাদি বাস্তবায়ন হয়।

(১) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শাফা'আত করার অনুমতি পাওয়া এবং শাফা'আত প্রার্থীর উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ﴾

"আসমানে অনেক ফেরেশতা আছে, যাদের সুপারিশও কোনো কাজে আসবে না। যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় যাকে খুশি তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করেন"। (সূরা আন্ নাজম: ২৬) এ আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে দু'টি শর্তে শাফা'আত উপকারে আসবে।

প্রথম শর্ত: শাফ'আতকারীকে শাফা'আত করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শাফা'আতের অনুমতি লাভ করতে হবে।

কেননা শাফা'আত আল্লাহ তা'আলার সম্পূর্ণ মালিকানাধীন। আল্লাহ তা'আলা সূরা যুমারের ৪৪ নং আয়াতে বলেন, ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ "বলো, সমস্ত শাফা'আত কেবল আল্লাহরই মালিকানাধীন"।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿ مَنْ ذَاالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ "কে আছে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তার কাছে সুপারিশ করবে?" (সূরা আল বাকারা: ২৫৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ "কোনো শাফা'আতকারী এমন নেই, যে তার অনুমতি ছাড়া শাফা'আত করতে পারে।

দ্বিতীয় শর্ত: যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা অপরিহার্য। অর্থাৎ তাকে তাওহীদপন্থি হতে হবে। কেননা মুশরেকের জন্য সুপারিশ কোনো উপকারে

আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ "সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কাজে আসবে না"।

কবরপূজারীরা বর্তমানে মৃতদের কাছে যে শাফা'আত চাচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে যারা কবরবাসীদের নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করে উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে তাদের কর্মকাণ্ড বাতিল প্রমাণিত হলো। এসব কবরপূজারীদের পূর্বসূরীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"আর তারা ইবাদত করে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, এরা তো আল্লাহ্র কাছে আমাদের সুপারিশকারী। বলো, তোমরা কি আল্লাহ্কে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যা তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি পবিত্র ও মহান সেসব বস্তু থেকে যাকে তোমরা শরীক করছো"। (সূরা ইউনুস: ১৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"তবে কি ওরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদেরকে সুপারিশকারী স্থির করে নিয়েছে? বলো, ওদের কোনো ক্ষমতা না থাকলে এবং ওরা না বুঝলেও কী? বলো, সমস্ত শাফা'আত কেবল আল্লাহরই মালিকানাধীন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। অতঃপর তার নিকটেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে"। (সূরা আয যুমার: ৪৩-৪৪)

আমাদের নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাফা'আত করবেন। যার জন্য তাকে শাফা'আত করার অনুমতি দেয়া হবে তিনি তার জন্য তা করবেন।

শাইখুল ইসলাম বলেন, ক্বিয়ামতের দিন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিনটি শাফা'আত হবে।

১) শাফা'আতে উয্মা:

এ শাফা'আত হবে মাকামে মাহমুদে। তিনি হাশরের মাঠে উপস্থিত সকলের জন্য শাফা'আত করবেন। যাতে তাদের মধ্যে দ্রুত ফায়ছালা করা হয়। নাবীগণ যেমন আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ইবনে মারইয়াম 'আলাইহিমুস সালাম এর কাছে সুপারিশ করার আবেদন নিয়ে যাওয়ার পর তারা সবাই যখন অপারগতা প্রকাশ করবে তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসা হবে।

২) জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর শাফা'আত:

হিসাবের পর জান্নাতীদেরকে দ্রুত জান্নাতে প্রবেশের অনুমতির জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট শাফা'আত করবেন। উপরোক্ত দুই প্রকারের শাফা'আত কেবল তার জন্যই নির্দিষ্ট হবে।

৩) তাওহীদপন্থিদের মধ্য হতে যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে, তাদেরকে তথায় না পাঠানোর শাফা'আত:

যেসব গুনাহগারদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে, তাদেরকে জাহান্নামে না পাঠানোর জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়ামতের দিন সুপারিশ করবেন। তিনি ছাড়া অন্যান্য নাবীগণ, সিদ্দীক এবং অন্যরাও এ প্রকার শাফা'আত করার সুযোগ পাবেন। যারা জাহান্নামে যাওয়ার হকদার হয়ে গেছে, তাদেরকে জাহান্নামে না দেয়ার জন্য সুপারিশ করবেন এবং যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, তাদেরকে বের করে আনার জন্যও সুপারিশ করবেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, তার উম্মতের কাবীরা গুনাহকারীদের জন্য সুপারিশ করার বিষয়টি ছাহাবী, উত্তমভাবে তাদের অনুসরণকারী তাবেঈ, মুসলিমদের চার ইমাম এবং অন্যান্য আলেমদের ঐক্যমত দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু অনেক বিদ'আতী যেমন খারেজী, মু'তাযিলা এবং যায়েদীয়া সম্প্রদায় পাপীদের জন্য শাফা'আত থাকার কথা অস্বীকার করেছে। তারা বলেছে যে, যারাই জাহান্নামে যাবে তারা আর সেখান থেকে বের হবে না। কারো শাফা'আতের মাধ্যমেও না এবং অন্যভাবেও না। তাদের কাছে কথা একটাই। যারা জান্নাতে যাবে, তারা আর কখনো জাহান্নামে যাবে না এবং যারা জাহান্নামে যাবে তারা আর কখনো জান্নাতে যাবে না। তাদের মতে একই ব্যক্তির নিকট পুরস্কার ও আযাব একত্রিত হতে পারে না।

পাপীদের ব্যাপারে শাফা'আত অস্বীকারকারীদের জবাব

যারা বলেছে, ক্বিয়ামতের দিন শাফা'আত কোনো কাজে আসবে না, তাদের কথার দু'টি অর্থ হতে পারে।

(১) মুশরিকদের জন্য কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾

"তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করেছে? তারা বলবে, আমরা মুছ্বল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না এবং আমরা সমালোচকদের সাথে

সমালোচনা করতাম। আর আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। এমতাবস্থায় আমাদের কাছে মৃত্যু আগমন করলো। ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো কাজে আসবে না"। *(সূরা আল-মুদ্দাছছির: ৪২-৪৮)* সুপারিশ এদের কোনো উপকারে না আসার কারণ হলো, এরা ছিল কাফের।

(২) এখানে যে শাফা'আতকে নাকোচ করা হয়েছে, যা সাব্যস্ত করতো মুশরেক ও তাদের অনুরূপ মুসলিম ও আহলে কিতাবদের বিদ'আতীরা। তারা মনে করে আল্লাহর নিকট কোনো কোনো সৃষ্টির এমন মর্যাদা ও ক্ষমতা রয়েছে যে, তারা আল্লাহর বিনা অনুমতিতেই তার নিকট সুপারিশ করতে পারেন। যেমন একজন মানুষ অন্য মানুষের নিকট বিনা অনুমতিতেই সুপারিশ করতে পারে।

٧– الجنة والنار

৭. জান্নাত ও জাহান্নাম

ক্বিয়ামত দিবসে দু'টি বিরাট ঘর বা বাসস্থান হবে, যা কখনো ধ্বংস হবে না। একটি হলো জান্নাত আর অন্যটি জাহান্নাম। জান্নাত হলো মুত্তাকীদের বাসস্থান ও জাহান্নাম হলো কাফেরদের বাসস্থান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾

"পুণ্যবানগণ থাকবেন পরমানন্দে। আর পাপাচারীরা থাকবে জাহান্নামে"। (সূরা আল-ইনফিতার: ১৩-১৪) জান্নাত ও জাহান্নাম দু'টিই বর্তমানে প্রস্তুত আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের ব্যাপারে বলেন,

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

"তোমরা দৌঁড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের সমান। যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৩) আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

"তোমরা সেই আগুনকে ভয় করো, যা কাফেরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৩১)* এ রকম আরো দলীল প্রমাণ করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম এখনো প্রস্তুত আছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে এ দু'টি কখনো নিঃশেষ হবে না।

আক্বীদা তাহাবীয়ার ব্যাখ্যাকারী বলেন, বিশেষভাবে একটি কথা জেনে রাখা দরকার যে, ছাওয়াব পাওয়ার কারণ পাওয়া গেলে আল্লাহ তা'আলা কাউকে ছাওয়াব থেকে মাহরুম

করবেন না। আর সৎ কাজ না করাই হচ্ছে ছাওয়াব না পাওয়ার কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾

"আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, যদি সে মুমিন হয়, তাহলে এ ধরনের লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দু মাত্র যুলুম করা হবে না"। (সূরা আন নিসা: ১২৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾

"আর যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে এবং সেই সাথে সে মুমিনও হবে তার প্রতি কোনো যুলুম বা অধিকার হরণের আশংকা নেই"। (সূরা তোহা: ১১২) এমনি শাস্তি দেয়ার কারণ না পাওয়া গেলে আল্লাহ তা'আলা কাউকে বিনা অপরাধে শাস্তি দিবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾

"তোমাদের উপর যে মসিবতই এসেছে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে। বহু সংখ্যক অপরাধকে তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন" (সূরা আশ শূরা ৪২:৩০)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলাই দানকারী এবং তিনিই প্রতিহতকারী। তিনি যা দান করেন, কেউ তা প্রতিহত করতে পারে না এবং তিনি যা প্রতিহত করেন, কেউ তা দান করতে পারে না। ভাষ্যকারের উক্তি এখানেই শেষ।

মোটকথা সৎ আমল জান্নাতে প্রবেশের কারণ ও মাধ্যম। ঐদিকে অসৎ কর্ম জাহান্নামে প্রবেশের কারণ। আমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, বান্দার দু'আ কবুলকারী।

الأصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر

ষষ্ঠ মূলনীতি: القضاء ও القدر [১৭২] (আল্লাহর ফায়ছালা ও ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা)

নিঃসন্দেহে القضاء ও القدر সাব্যস্ত করা এবং এতোদুভয়ের প্রতি বিশ্বাস করা ও তার অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ঈমানের বিরাট একটি রুকন। জিবরীল 'আলাইহিস সালাম যখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি জবাব দিয়েছেন যে,

(أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)

"তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে (১) আল্লাহ পাকের উপর (২) তার ফেরেশতাদের উপর (৩) তার কিতাবসমূহের উপর (৪) তার রসূলদের উপর (৫) আখিরাত বা শেষ দিবসের উপর এবং (৬) তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর"।[১৭৩]

---

[১৭২] আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল-উছাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, القدر ও القضاء এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না, এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, أزل বা আদিতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সবকিছু নির্ধারণ করে রাখাকে القدر বলা হয়। আর যথাসময়ে তা সৃষ্টির ফায়ছালাকে القضاء বলা হয়। আল্লাহ যখন নির্দিষ্ট কোনো জিনিস অমুক সময় হবে বলে নির্ধারণ করেন, তখন তাকে ক্বদর বলা হয়। আর যখন ঐ জিনিসটি সৃষ্টি করার নির্দিষ্ট সময় এসে উপস্থিত হয়, তখন তার ফায়ছালা করা এবং অস্তিত্বে নিয়ে আসাকে ক্বদ্বা বলা হয়। কুরআনুল কারীমে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقُضِيَ الْأَمْرُ "তখন সবকিছুর ফায়ছালা হয়ে যাবে"। (সূরা আল-বাকারা: ২১০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ﴾ "আল্লাহ সঠিকভাবে ফায়ছালা করেন"। (সূরা গাফের: ২০) এ রকম আয়াত আরো রয়েছে। সুতরাং ক্বদর হলো আদিতেই আল্লাহর নির্ধারণের নাম। আর ক্বদ্বা হলো সংঘটিত হওয়ার সময় সে সম্পর্কে ফায়ছালা করার নাম।

কেউ কেউ বলেছেন, ক্বদ্বা ও ক্বদরের অর্থ একই। তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত কথা হলো, উভয় শব্দকে একসঙ্গে উল্লেখ করা হলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হবে। আর যদি উভয়টিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়, তাহলে উভয়টি দ্বারা একই অর্থ বুঝতে হবে। ঈষৎ পরিবর্তনসহ শাইখের কথা এখানেই শেষ।

কেউ কেউ বলেছেন, ভবিষ্যতে সৃষ্টিসমূহের যা কিছু হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার অবগতিকে ক্বদর বলা হয়। আর আল্লাহ তা'আলার ইলম ও ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু সৃষ্টি করাকে ক্বদ্বা বলা হয়। (আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত)

[১৭৩] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ "আমি প্রত্যেক জিনিসকে একটি পরিমাপ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি"।[১৭৪] *(সূরা কামার: ৪৯)*

القدر শব্দটি قدرت الشيئ إذا أحطت بمقداره এর মাসদার। অর্থাৎ আমি জিনিসটির পরিমাণ-পরিমাপ নির্ধারণ করলাম। এ কথা আপনি তখনই বলে থাকেন, যখন উক্ত জিনিসের পরিমাণ-পরিমাপ সম্পর্কে আপনার পূর্ণ জ্ঞান থাকে।

এখানে القدر দ্বারা সৃষ্টিজগৎ অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই সে সম্পর্কে আদিতে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ইলম থাকা উদ্দেশ্য। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা অবগতি, নির্ধারণ ও ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই সৃষ্টি হয় না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব হলো তাক্বদীরের ভালো-মন্দ ও মিষ্ট-তিক্ততার প্রতি ঈমান আনয়ন করাকে الإيمان بالقدر বলা হয়। তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের চারটি স্তর রয়েছে। যথা:

প্রথম স্তর: প্রত্যেক জিনিস অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই আদিতে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ইল্‌মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ তিনি সকল বস্তুকে স্বীয় জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করে আছেন, -এ কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আসমান ও যমীনে সরিষার দানা পরিমাণ বস্তুও তার জ্ঞানের বাইরে নয়। সৃষ্টি করার পূর্ব হতেই তিনি সকল বস্তু সম্পর্কে অবগত আছেন। তাদের রিযিক, বয়স, কথা, কাজ, চলাচল, অবস্থান, গোপন-প্রকাশ্য, তাদের মধ্যে কে জান্নাতী এবং কে জাহান্নামী তাও তিনি জানেন। বান্দাগণ আমল করার পূর্বেই তিনি তাদের আমলসমূহ সম্পর্কে অবগত থাকা এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় স্তর: দ্বিতীয় স্তর হলো প্রথম স্তরে বর্ণিত সকল বিষয় আল্লাহ্ তা'আলা লাওহে মাহফুযে লিখে দিয়েছেন। অর্থাৎ এ কথার উপর ঈমান আনয়ন করা এবং বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমুদয় বস্তুই লিখে রেখেছেন, যা হবে বলে তার জ্ঞানের আওতায় ছিল। লাওহে মাহ্‌ফুয ও কলমের প্রতি ঈমান আনয়নও উপরোক্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় স্তর: প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা এবং তার উপর তার পরিপূর্ণ ক্ষমতার প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

---

[১৭৪] অর্থাৎ দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তুরই একটি পরিমাণ আছে। সে অনুসারে প্রত্যেক বস্তু একটি নির্দিষ্ট সময় অস্তিত্ব লাভ করে, একটি বিশেষ রূপ ও আকৃতি গ্রহণ করে। একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত ক্রমবিকাশ লাভ করে, একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত টিকে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। স্বভাবগত নিয়ম-নীতি অনুসারে এ দুনিয়ারও একটি 'তাক্বদীর' বা পরিমাণ আছে। সে অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা চলছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়েই তার চলার পরিসমাপ্তি ঘটবে। এর পরিসমাপ্তির জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তার এক মুহূর্ত পূর্বে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে না কিংবা এক মুহূর্ত পরে তা অবশিষ্টও থাকবে না। এ পৃথিবী অনাদি ও চিরস্থায়ী নয় যে, চিরদিনই তা আছে এবং চিরদিন থাকবে। কিংবা কোনো শিশুর খেলনাও নয় যে, যখনই তোমরা চাইবে তখনই তিনি এটিকে ধ্বংস করে দেখিয়ে দিবেন। (আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত)

চতুর্থ স্তরঃ এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। আরো বিশ্বাস করা যে, তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া বাকি সবকিছুই সৃষ্টি।

তাক্বদীরের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের দলীলঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

"তুমি কি জানো না, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহ জানেন? সবকিছু একটি কিতাবে লিখিত আছে। আল্লাহর জন্য এটা মোটেই কঠিন নয়"। (সূরা আল হজ্জঃ ৭০)

তৃতীয় স্তরের দলীলঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ﴾

"সৃষ্টিজগত সমূহের মহান প্রভু আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোনো কিছুরই ইচ্ছা পোষণ করতে পারো না"। (সূরা তাকভীরঃ ৩০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

"আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না; কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই সম্পন্ন করে থাকেন"। (সূরা আল-হাজ্জঃ ২৫৩)

তাক্বদীরের চতুর্থ স্তরের দলীলঃ

আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

"আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থাপক"। (সূরা আয যুমারঃ ৬২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ "আর তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ"। (সূরা ইয়াসীনঃ ৮২)

انواع التقدير

তাক্বদীরের প্রকারভেদ

(১) সমস্ত সৃষ্টির প্রত্যেক বিষয়কে একসঙ্গে একত্রিতকারী ব্যাপক তাক্বদীরঃ

এ প্রকার তাক্বদীর লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের তাক্বদীর লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ স্বীয় সুনান গ্রন্থে উবাদাহ ইবনে সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

(إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ: لَهُ اكْتُبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)

“আল্লাহ্ তা‘আলা কলম সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম তাকে বললেন, লিখো। কলম বললো, হে আমার প্রভু! কী লিখবো? আল্লাহ্ বললেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের তাক্বদীর লিখো”।[১৭৫] এ প্রকার তাক্বদীর সমস্ত সৃষ্টির জন্য।

(২) সমস্ত সৃষ্টির প্রত্যেক বিষয়কে একত্রিতকারী তাক্বদীরঃ এটা কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত।

(ক) التقدير العمري তাক্বদীরে উমুরী বা সারা জীবনের তাক্বদীরঃ যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদীছে এসেছে, মায়ের পেটে থাকা অবস্থাতেই শিশুর উপর যে চারটি বাক্য লিখে দেয়া হয়, তাই হচ্ছে তাক্বদীরে উমুরী। লিখে দেয়া হয় তার রিযিক, তার বয়স, তার আমল এবং তার হতভাগ্য হওয়া কিংবা সৌভাগ্যবান হওয়ার কথা।

(খ) التقدير الحولي তাক্বদীরে হাওলী বা সারা বছরের তাক্বদীরঃ লাইলাতুল কদরে বাৎসরিক তাক্বদীর লিখিত হয়। তাতে সারা বছরের সকল বিষয় ও ঘটনা একসাথে লেখা হয়। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾

“আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে

---

[১৭৫] তিরমিযী, অধ্যায়ঃ আবওয়াবুল কাদ্‌র। তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান গরীব। তবে ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন সিলসিলা ছ্বহীহাঃ (১/৩০৭) আল্লাহর আরশ পানির উপরে থাকার অর্থ হলো সপ্তম আকাশের উপরে রয়েছে পানি। আর সেই পানির উপর আল্লাহর আরশ। এখনো আরশ স্বীয় অবস্থানেই রয়েছে।

প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফায়ছালা করা হয় আমার আদেশক্রমে। আমিই প্রেরণকারী"। (সূরা দুখান: ৩-৫)

(গ) التقدير اليومي। তাক্বদীরে ইয়াওমী বা দৈনন্দিন তাক্বদীর: হায়াত, মওত, সম্মান, অপমান ইত্যাদি আরো যা প্রতিদিন নির্ধারণ করা হয়, তাই দৈনন্দিন তাক্বদীর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ "তিনি প্রতিদিন কোনো না কোনো মহান কার্যে রত আছেন"। (সূরা আর্-রাহমান: ২৯)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্য হতে অন্যতম একটি সৃষ্টি হচ্ছে লাওহে মাহ্ফুয। সাদা মুক্তা দিয়ে তিনি এটি তৈরি করেছেন। তার উভয় পার্শ্ব তৈরি করা হয়েছে লাল রঙের হিরা দিয়ে। কলমটি হচ্ছে নূরের তৈরী, কালিও নূরের। সেটার প্রশস্ততা হচ্ছে আসমান-যমীনের মধ্যকার প্রশস্ততার সমান। আল্লাহ্ তা'আলা তাতে দৈনিক তিনশ ষাটবার দৃষ্টি দেন। প্রত্যেকবার দৃষ্টি দেয়ার সময় কাউকে জীবিত রাখেন, কারো মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত করেন, কাউকে অপমানিত করেন এবং তিনি যা চান তাই করেন।

এটিই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী, ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ "তিনি প্রতিদিন কোনো না কোনো মহান কাজে রত আছেন", এর মর্মার্থ। (সূরা আর্-রাহমান: ২৯) ইমাম আব্দুর রায্যাক, ইবনুল মুনযির, তাবারানী এবং হাকেম এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

প্রত্যেক মুসলিমের উপর সমস্ত সৃষ্টির প্রত্যেক বিষয়কে একসঙ্গে একত্রিতকারী তাক্বদীর এবং তার সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এগুলো থেকে যে ব্যক্তি কোনো কিছুকে অস্বীকার করবে, সে তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নকারী বলে গণ্য হবে না। সে ঈমানের একটি রুকন অস্বীকারকারী হিসাবে গণ্য হবে। যেমন পথভ্রষ্ট কাদারীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা তাক্বদীর অস্বীকার করে থাকে। তাক্বদীর অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তারা দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত।

তাদের মধ্যে এক শ্রেণির লোক তাক্বদীর অস্বীকার করার ক্ষেত্রে অত্যাধিক সীমালঙ্ঘন করেছে। এমনকি তারা সৃষ্টিজগতের বিষয়গুলো সংঘটিত হওয়া ও অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান থাকার কথাও অস্বীকার করেছে। সেই সঙ্গে সৃষ্টির সবকিছু লাওহে মাহফুযে লিখে রাখাও অস্বীকার করেছে। তারা বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা আদেশ-নিষেধ করেছেন। তিনি জানেন না, কে এগুলো মানবে আর কে তা মানবে না। তাদের মতে আল্লাহর ইলমের সাথে এমন কিছু যুক্ত হয়, যা পূর্বে তার ইলম ও তাক্বদীরের মধ্যে ছিল না। সম্ভবত কাদারীয়া সম্প্রদায়ের এই শ্রেণির লোক বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিংবা বিলুপ্ত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে।

কাদারীয়া সম্প্রদায়ের যে ফির্কা এখনো বাকি আছে তারা আল্লাহ তা'আলার ইলমকে স্বীকার করে। কিন্তু তারা বান্দার কাজ-কর্ম তাক্বদীরের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে অস্বীকার করে।

তারা মনে করে বান্দারা নিজেরাই তাদের কাজ-কর্ম স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা তা সৃষ্টি করেন না এবং সেটা সৃষ্টি করার ইচ্ছাও পোষণ করেন না। এটিই হলো মু'তাযিলাদের মাযহাব। তাক্বদীর সাব্যস্ত করতে গিয়ে কাদারীয়াদের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি সম্প্রদায় মারাত্মক বাড়াবাড়ি করেছে। এমনকি তারা বান্দার কাজ করার ক্ষমতা ও স্বাধীনতাকে নাকোচ করেছে। তাদের কথা হলো বান্দার কাজে সে বাধ্য। এ জন্যই এ সম্প্রদায়কে জাবরীয়া বলা হয়।[১৭৬]

অনেক দলীল-প্রমাণ দ্বারা উভয় মাযহাবই বাতিল সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

"তোমাদের মধ্যে যে সরলপথে চলতে চায় তার জন্য এ কুরআন উপদেশ স্বরূপ। আর বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তোমরা কোনো ইচ্ছা করতে পারো না"। *(সূরা তাকভীর: ২৮-২৯)*

আল্লাহ তা'আলার বাণী, "তোমাদের মধ্যে যে সরলপথে চলতে চায়" এর দ্বারা জাবরীয়াদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেননা এখানে আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য ইচ্ছা সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু জাবরীয়ারা বলে যে, বান্দা তার কাজে বাধ্য। কাজ করা বা না করায় তাদের কোনো স্বাধীনতা ও ইচ্ছা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর বিশ্বজাহনের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তোমরা কোনোই ইচ্ছা করতে পারো না"। এখানে কাদারীয়াদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা বলে থাকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভর করা ব্যতীতই বান্দা কাজ করার স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখে। এটি একটি বাতিল কথা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বান্দার ইচ্ছাকে স্বীয় ইচ্ছার সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন।

এটিই হলো ক্বদ্বা ও ক্বদরের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব। তারা তাক্বদীর অস্বীকারকারী কাদারিয়া (মু'তাযিলা) সম্প্রদায়ের ন্যায় শৈথিল্য প্রদর্শন ও ঢিলামি করেনি এবং জাবরীয়াদের ন্যায় তাক্বদীর সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেনি।

উম্মতের সালাফ ও ইমামদের মাযহাব হলো, তারা বলে সকল প্রকার সৎ কাজ, পাপাচার, কুফুরী ও ফিতনা-ফাসাদ আল্লাহর ফায়ছালা ও নির্ধারণ অনুযায়ীই হয়ে থাকে। তাদের বিশ্বাস হলো, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো স্রষ্টা নেই। তাই তিনি বান্দা ও তাদের

---

[১৭৬] কাদারীয়াদের মতে বান্দার কাজ বান্দা নিজেই সৃষ্টি করে; তাতে আল্লাহর কোনো ইচ্ছা নেই। সে হিসেবে তারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকে দুইভাগে তথা ইরাদায়ে কাওনীয়া (সৃষ্টিগত ইচ্ছা) এবং ইরাদায়ে শারঈয়া (শরী'আতের আদেশগত ইচ্ছা) এই দুইভাগে বিভক্ত করাকে সমর্থন করে না। তারা বলে থাকে আল্লাহ তা'আলা শুধু সকল মানুষ থেকে ঈমান আনয়নেরই ইচ্ছা করেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু বান্দা ঈমানের পরিবর্তে যেই কুফরী ও পাপাচারে লিপ্ত হয়, বান্দা নিজেই সৃষ্টি করে; আল্লাহ তা'আলা নন। জাবরীয়াদের মাযহাব এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা বলে, বান্দা কিছুই করে না। ভালো-মন্দ সবকিছু আল্লাহ তা'আলাই বান্দাকে দিয়ে করে থাকেন। এমনকি বান্দার কোনো ইচ্ছা ও স্বাধীনতা নেই। উভয় দলের কথাই কুরআন, সুন্নাহ এবং বিবেক-বুদ্ধির দলীল দ্বারা প্রত্যাখ্যাত।

সমস্ত কর্মেরও স্রষ্টা। তারা ভালো-মন্দ, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট যা কিছু করে তারও স্রষ্টা। তবে বান্দা তার কাজে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য নয়; বরং সে কাজ করার ক্ষমতা রাখে, ইচ্ছা রাখে এবং তা সম্পন্নকারীও বটে। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সমস্ত কাজ-কর্ম, আনুগত্য ও পাপাচার বান্দার দ্বারা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বান্দার দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা অর্জিত হয়। বান্দার কাজ-কর্ম দ্বারা তাকে বিশেষিত করা হয়, বান্দাই তা চালু করে এবং এগুলোর হুকুম-আহকাম তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।

আর বান্দার কাজ-কর্মগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এ অর্থে যে, বান্দার মধ্যে তিনি তা সৃষ্টি করেছেন, বান্দার কাজ হিসাবে তাকে নির্ধারণ করেছেন এবং তার উপার্জন হিসাবে স্থির করেছেন। যেমন তিনি সমস্ত উপায়-উপকরণ ও কাজ-কর্ম এবং তার ফলাফল সৃষ্টি করছেন। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার কাজ-কর্ম হয় মানে তিনি তার স্রষ্টা। আর বান্দার পক্ষ হতে তা হয় মানে বান্দার শক্তি দ্বারা যেহেতু তা সম্পন্ন ও অর্জিত হয়, তাই তার কাজকে তার সাথে প্রতিষ্ঠিত বিশেষণ হিসাবে গণ্য করা হয়। যেমন আমরা বলে থাকি, এ ফলটি অমুক গাছের, এ ফসল অমুক যমীন থেকে। এসব কথার অর্থ হলো, এগুলো অমুক গাছ ও অমুক যমীন থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অনুরূপ এগুলো আল্লাহর পক্ষ হতেও। এ কথার অর্থ হলো, তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। উভয় কথার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। ইমাম সাফারায়েনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আহলুস সালাফ ও আহলুস সুন্নাতের গবেষক আলেমদের মতে আল্লাহ তা'আলা বান্দার ক্ষমতা, ইচ্ছা ও কাজ-কর্ম সৃষ্টি করেন। বান্দা প্রকৃত পক্ষেই তার কাজ-কর্ম সম্পাদনকারী এবং সে তা উদ্ভাবনকারী। আল্লাহ তা'আলা তাকে তার কর্ম সম্পাদনকারী ও উদ্ভাবনকারী বানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

"আর বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তোমরা কোনো ইচ্ছা করতে পারো না"। *(সূরা তাকভীর: ২৮-২৯)*

আল্লাহ তা'আলা এখানে বান্দার ইচ্ছা সাব্যস্ত করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে, বান্দার ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত কার্যকর হয় না। কাজ-কর্ম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বান্দার ইচ্ছা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের এটি সুস্পষ্ট বক্তব্য। আর তা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত হতেই পারে না। ইমাম সাফারায়েনীর বক্তব্য এখানেই শেষ।

ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر

ক্বদ্বা (ফায়ছালা) ও ক্বদর (ভাগ্য) এর প্রতি ঈমান আনয়নের ফলাফল

ক্বদ্বা ও ক্বদরের প্রতি ঈমান আনয়নের বিরাট ফলাফল রয়েছে। এর মাধ্যমেই ঈমানের বাকিসব রুকন সহকারে মানুষের ঈমান পরিপূর্ণ হয়। ক্বদ্বা ও ক্বদরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ঈমানের ছয়টি রুকনের অন্তর্ভুক্ত। ক্বদ্বা ও ক্বদর বা ফায়ছালা ও তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন না করলে কারো ঈমান সঠিক হবে না। আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের বিবরণ অনুযায়ী ক্বদ্বা ও ক্বদরের প্রতি বিশ্বাস না করলে কেউ ঈমানদার হতে পারবে না।

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমেই মানুষের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে, প্রফুল্ল হয় এবং পার্থিব জীবনের বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হলে অস্থির-উদ্বিগ্ন হয় না। কেননা বান্দা যখন বিশ্বাস করবে, যে মুছীবতে সে আক্রান্ত হয় তা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত, তা হবেই, তা প্রতিহত করার ক্ষমতা কেউ রাখে না এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী উপলব্ধি করবে যেখানে তিনি বলেছেন,

«واعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ»

“হে বৎস! তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে যে, তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটারই ছিল। আর যা ঘটেনি তা কোনো দিন ঘটার ছিল না”।

এ বিশ্বাস করার মাধ্যমেই অন্তরে স্থিরতা অর্জিত হয় এবং হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। যারা ক্বদ্বা (ফায়ছালা) ও ক্বদরে (ভাগ্যে) বিশ্বাস করে না, তারা এর বিপরীত। তারা বিপদাপদ ও মুছীবতে আক্রান্ত হয়ে উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় তারা অস্থির হয়ে যায়। ফলে তার জীবন যাপন বিরক্তিকর ও অসহনীয় হয়ে উঠে। এমনকি স্বাভাবিক জীবন-যাপন করা তাদের কাছে ভারি হয়ে যায় বলে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আত্ম-হত্যা করার চেষ্টা করে। পার্থিব জীবনের কঠিন বাস্তবতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং ভবিষ্যৎ জীবনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে করে যারা আত্মহত্যা করে তাদের মধ্যে এটিই লক্ষণীয়। কারণ তারা তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করে না। ফলে তারা তাদের খারাপ আক্বীদার অপরিহার্য ফলাফল হিসাবেই আত্মহত্যার মত অন্যায় কাজের প্রতি অগ্রসর হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ لِّكَيْلاَ تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

"পৃথিবীতে এবং তোমাদের উপর যে বিপদ আসে তা সৃষ্টি করার পূর্বেই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ। যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ্ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না"। *(সূরা আল হাদীদ: ২২-২৩)*

আল্লাহ তা'আলা এখানে সংবাদ দিয়েছেন যে, যমীনে এবং মানুষের শরীরের যেসব মুছীবত হয়, তা তিনি আগেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। সুতরাং সেটা নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ আছে। আমরা সেটা প্রতিরোধ করার যতই চেষ্টা করি না কেন, তা সংঘটিত হবেই। অতঃপর তিনি আমাদেরকে সেটা অবগত করার হিকমত হলো, যাতে আমরা প্রশান্তি লাভ করি, অধৈর্য না হই, মুছীবতে পড়ে আফসোস না করি এবং সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, ধন-সম্পদ ইত্যাদির নিয়ামত লাভ করে এত আনন্দিত না হই, যা আমাদেরকে শেষ পরিণামের কথা ভুলিয়ে দেয়। বরং মুছীবতের সময় আমাদের ছ্ববর করা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া আবশ্যক। সেই সঙ্গে সুখ-সমৃদ্ধির সময় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক এবং তার পাকড়াও থেকে যেন নিজেদেরকে সম্পূর্ণ নিরাপদ না মনে করা জরুরী। মোটকথা উভয় অবস্থাতেই আমরা আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক রাখবো।

ইকরিমা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, প্রত্যেকেই আনন্দিত ও দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। তোমরা আনন্দের সময় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং দুঃখের সময় ছ্বর করো।

এ থেকে বুঝার সুযোগ নেই যে, বান্দা অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে এবং কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে ক্বদ্বা ও ক্বদরের উপর ভরসা করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। যেমন কিছু অজ্ঞ লোক ধারণা করে থাকে। এটি মারাত্মক বোকামি। বরং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার হুকুম করেছেন এবং অলসতা ও উপায়-উপকরণের প্রতি অবহেলা করতে নিষেধ করেছেন। উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার পরও যদি উদ্দেশ্যের বিপরীত ফলাফল অর্জিত হয় তাহলে আমাদের করণীয় হলো, আমরা অধৈর্য-অস্থির হবো না। বিশ্বাস করবো এটিই নির্ধারিত ফায়ছালা। এ ছাড়া অন্য কিছু নির্ধারিত থাকলে তা অবশ্যই হতো।

ছ্বহীহ মুসলিমে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»

"শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম ও প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। যে জিনিস তোমার উপকার করবে, তা অর্জন করার জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও। আর এ রকম যেন না হয় যে, তাক্বদীরের উপর

ভরসা করে হাত গুটিয়ে অপারগ-অক্ষম হয়ে বসে থাকবে। কল্যাণকর ও উপকারী জিনিস অর্জনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করার পরও যদি তোমার উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে, তবে কখনও এ কথা বলোনা, আমি যদি এ রকম করতাম, তাহলে অবশ্যই এমন হতো; বরং তুমি বলো, আল্লাহ যা তাক্বদীরে রেখেছেন এবং তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে। কেননা যদি কথাটি শয়তানের জন্য কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয়”।[১৭৭]

তাক্বদীরের উপর ঈমান রাখা, কল্যাণ অর্জন করতে এবং অকল্যাণ বিদূরিত করতে উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার সাথে সাথে বান্দা নিজ কাজ-কর্মের হিসাব নিজেই নিবে এবং ভুল-ত্রুটি সংশোধন করবে। বিশ্বাস করবে যে, তার নিজের গুনাহর কারণেই বিপদাপদ ও মুছীবত আসে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾

“তোমাদের উপর যে মুছীবতই এসেছে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে এসেছে। বহু সংখ্যক অপরাধকে তো আল্লাহ ক্ষমা করে থাকেন” *(সূরা শূরা: ৩০)*

ক্বদ্বা ও ক্বদরের প্রতি ঈমানের অন্যতম সুফল হলো এর মাধ্যমেই বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি ও সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সময় সুদৃঢ় থাকা যায় এবং পার্থিব জীবনের দুঃখ-কষ্টকে এমন অবিচল হৃদয় ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করা যায়, যাকে কঠিন বিপদাপদ নড়াতে পারে না এবং প্রচণ্ড ঝড়-তুফানেও সে অনড় থাকে। কেননা সে জানে যে, এ পার্থিব জগত হলো পরীক্ষাগার ও পরিবর্তনশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾

“তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। আর তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল”। *(সূরা মূলক: ২)* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾

“আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো যে পর্যন্ত না জানতে পারি তোমাদের জেহাদকারীদেরকে, ছ্বরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি”। *(সূরা মুহাম্মাদ: ৩১)*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার ছাহাবীগণ কতই না কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং তারা কতই না কঠিন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন! কিন্তু তারা সত্য খাঁটি ঈমান ও অবিচল প্রত্যয়ের মাধ্যমে এগুলোর মোকাবেলা করেছেন। ফলে তারা

[১৭৭] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৪, অধ্যায়: শক্তিশালী হওয়া এবং অপারগতা প্রকাশ বর্জনের আদেশ। ইবনে মাজাহ হা/৭৯।

সমুজ্জল সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। ক্বদ্বা ও ক্বদরের প্রতি সুগভীর-সুদৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই তাদের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে উজ্জল সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। সে সঙ্গে তারা আল্লাহ তা'আলার এই বাণী পুরোপুরি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

"তাদের বলো, আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কোনো কিছুই আমাদের হয় না। আল্লাহই আমাদের অভিভাবক এবং ঈমানদারদের তার উপরই ভরসা করা উচিত"। *(সূরা আত তাওবা: ৫১)*

ক্বদ্বা (ফায়ছালা) ও ক্বদরের (ভাগ্যের) প্রতি ঈমান আনয়নের আরেকটি সুফল হলো এটি মানুষের দুঃখ-কষ্টকে অনুদানে রূপান্তরিত করে দেয় এবং মুছীবতকে বিনিময়ে পরিণত করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোনো বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। *(সূরা তাগাবুন: ১১)*

আলকামা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে ঐ ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে মুছীবতে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বাস করে যে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে। অতঃপর সে তাকে আল্লাহর ফায়ছালা বলে মনে করে সন্তুষ্ট থাকে ও মেনে নেয়।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমার অর্থ হলো, মুছীবতে আক্রান্ত হয়ে কেউ যদি বিশ্বাস করে, এটি আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত। অতঃপর ছ্বর করে, ছাওয়াব প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহর ফায়ছালা মেনে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন এবং দুনিয়ার যে নিয়ামত ছুটে যায়, তার বিনিময়ে তাকে অন্তরের হিদায়াত ও সত্য ঈমান দান করেন। তার থেকে যা কিছু ছিনিয়ে নেয়া হয় তার বদলে কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ কিছু দান করেন অথবা তারচেয়ে উত্তম কিছু দান করেন। আল্লাহ তা'আলার ফায়ছালা ও নির্ধারণ অনুযায়ী যেসব বালা-মুছীবত আসে সে ক্ষেত্রে বান্দার কোনো হাত থাকে না। তবে বান্দা যেন নিজে এটি আসার কারণে পরিণত না হয়। যেমন সে আল্লাহর কোনো আদেশ বাস্তবায়নে ত্রুটি করলো কিংবা তার কোনো নিষেধ থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি করলো। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বান্দার উচিত সে আল্লাহ তা'আলার ফায়ছালা ও নির্ধারণের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং তার যে ভুলের কারণে মুছীবতটি এসেছে, তা সংশোধন করে নিবে।

কতিপয় মানুষ ক্বদ্বা (ফায়ছালা) ও ক্বদরের (ভাগ্যের) দলীল দিয়ে যখন পাপাচারে লিপ্ত হয় কিংবা ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেয় তখন তারা এতে মারাত্মক ভুল করে। তারা বলে

এটি আমাদের উপর নির্ধারিত। এই বলে তারা পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং গুনাহ থেকে তাওবা করে না। যেমন মুশরিকরা বলেছিল,

﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾

"আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে আমরা এবং আমাদের বাপ-দাদারা শিরক করতাম না এবং কোনো কিছুই হারাম করতাম না। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা মনে করেছিল। অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। বলো, তোমাদের নিকট কোনো ইলম আছে কি? থাকলে তা আমাদের নিকট পেশ করো। তোমরা কেবল ধারণা অনুসরণ করে থাকো এবং তোমরা শুধু অনুমান ভিত্তিক কথাই বলে থাকো"। (*সূরা আল আন'আম ১৪৮)।*

ক্বদ্বা ও ক্বদর সম্পর্কে এটি ছিল তাদের খুব নিকৃষ্ট বুঝ। কেননা তাক্বদীর দ্বারা দলীল পেশ করে বিপদাপদ ও পাপাচারের দিকে এগিয়ে যাওয়া বৈধ নয়। তবে মুছীবত এসে গেলে তাক্বদীর দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে। পাপাচার করে ক্বদ্বা ও ক্বদর দিয়ে দলীল দেয়া খুব নিকৃষ্ট কাজ। এতে করে তাওবার পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং আদিষ্ট সৎ আমল বর্জন করা হয়। কিন্তু মুছীবত এসে যাওয়ার সেটার মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করা ভালো। কেননা তখন ক্বদ্বা ও ক্বদরের দ্বারা দলীল গ্রহণ মুছীবতগ্রস্তকে ছ্ববর ও ছাওয়াবের প্রত্যাশা করতে উৎসাহ দেয়।

ক্বদ্বা ও ক্বদরের প্রতি ঈমান মানুষকে কাজের প্রতি উৎসাহ দেয়, সৎ আমলে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার মধ্যে শক্তি ও সাহস যোগায়। আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত বীর পুরুষেরা নির্ভয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়। তারা মৃত্যুকে ভয় করে না। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, মৃত্যু থেকে পলানোর কোনো সুযোগ নেই। তা যখন আগমন করবে তখন তাকে পিছিয়ে দেয়া কিংবা সংরক্ষিত দূর্গ ও সেনাবাহিনী দিয়ে ঠেকানো যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾

"তোমরা যেখানে থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো"। *(সূরা আন নিসা: ৭৮)* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾

"বলো, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তথাপি যাদের ভাগ্যে মৃত্যু লেখা ছিল, তারা তাদের বধ্যভূমির পানে বের হয়ে পড়তো"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৫৪)*

এভাবেই মুজাহিদ যখন তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের প্রবল অনুপ্রেরণা উপলব্ধি করবে, তখন সে শত্রুদের মোকাবেলায় বিজয় অর্জন এবং ইসলাম ও মুসলিমদের শক্তি অর্জন না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাবে।

এমনি ক্বদ্বা (ফায়ছালা) ও ক্বদরের প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে উৎপাদন ও সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। কেননা বিশ্বাসী যখন বিশ্বাস করে যে, লোকেরা কেবল তার ঐ পরিমাণ ক্ষতিই করতে পারে, যা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য লিখে দিয়েছেন এবং তারা কেবল ঐ পরিমাণ উপকারই করতে পারে, যা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য নির্ধারণ করেছেন, তখন একে অন্যের উপর নির্ভর করবে না, সৃষ্টিকে ভয় করবে না এবং মানুষের উপর নির্ভরশীল হবে না। সে কেবল আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করে উন্নতি, উৎপাদন ও উপার্জনের পথে অগ্রসর হবে। কল্যাণ, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও উন্নতি অর্জনের পথে অগ্রসর হয়ে যখন অবনতির সম্মুখীন হবে এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হবে, তখন সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হতে পিছিয়ে পড়বে না এবং নিরাশ হবে না। সে কখনো এ কথা বলবেনা যে, আমি যদি এমন করতাম, তাহলে এমন হতো, ওমন হতো। বরং সে বলবে এটিই আল্লাহর নির্ধারণ। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেছেন। সেই সঙ্গে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে প্রচেষ্টা চালানো অব্যাহত রাখবে। তবে একই সঙ্গে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করবে ও আত্মসমালোচনা করবে। এর মাধ্যমেই সামাজিক কাঠামো ঠিক থাকবে এবং সমাজিক কল্যাণ অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন,

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই। আল্লাহ স্থির করেছেন প্রত্যেক জিনিসের মাত্রা"। *(সূরা তালাক: ৩)* আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

الولاء والبراء

'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' - বন্ধুত্ব ও শত্রুতা

ইসলামী আক্বীদার মৌলিক বিষয়গুলো (আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, নাবী-রসূলগণের প্রতি ঈমান, আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এবং তাক্বদীরের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি ঈমান আনয়ন করা) কে দীন হিসাবে গ্রহণকারী প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো, যারা এ বিষয়গুলোকে তাদের আক্বীদা হিসাবে গ্রহণ করে তাদেরকে বন্ধু বানানো এবং যারা এগুলোর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তাদের সাথে শত্রুতা করা।

সুতরাং সে তাওহীদপন্থি ও একনিষ্ঠদেরকে ভালোবাসবে এবং তাদেরকে বন্ধু বানাবে। একই সঙ্গে কাফির-মুশরিকদেরকে ঘৃণা করবে এবং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে। এটি ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম ও তার সাথীদের দীনের অন্তর্ভুক্ত। আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীগণের মধ্যে চমৎকার নমুনা রয়েছে। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করছি। তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চির শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে"। *(সূরা আল মুমতাহিনা ৬০:৪)*

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের কথাও তাই। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে সেও তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। অবশ্যই আল্লাহ যালিমদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না"। *(সূরা আল মায়িদা ৫:৫১)*

এ আয়াতে নির্দিষ্ট করে আহলে কিতাব (ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান) দেরকে বন্ধু বানানো হারাম করা হয়েছে। সমস্ত কাফেরদেরকে বন্ধু বানানো হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য আগমন করেছে, তারা তা অস্বীকার করে। তারা রসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করে, এ অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছো? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি ভালভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ হতে বিচ্যুত"। *(সূরা মুমতাহিনাহ ৬০:১)*

আল্লাহ মুমিনদের উপর কাফিরদেরকে বন্ধু বানানো হারাম করেছেন। যদিও তারা তার বংশের সর্বাধিক নিকটবর্তী লোক হয়।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা কুফরকে ঈমানের উপর প্রাধান্য দেয়। তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, তারাই হবে যালিম"। *(সূরা আত-তাওবা ৯: ২৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾

"যারা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাদেরকে তুমি আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে না। হোক না এ বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র"। *(সূরা মুজাদালা ৫৮:২২)*

এ বৃহৎ মূলনীতি সম্পর্কে অনেক মানুষ অজ্ঞ। আমি আরবী ভাষায় প্রচারিত একটি রেডিও অনুষ্ঠানে একজন আলিম ও দাঈকে খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, খ্রিষ্টানরা আমাদের ভাই। এ রকম ভয়ঙ্কর কথা খুবই দুঃখজনক।

আল্লাহ তা'আলা যেমন ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাসের দুশমন কাফিরদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করা হারাম করেছেন, ঠিক তেমনি তিনি মুমিনদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করা ও তাদেরকে বন্ধু বানানো ওয়াজিব করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾

"আল্লাহ, তার রসূল এবং মুমিনগণই হচ্ছেন তোমাদের বন্ধু। যারা ছ্বলাত কায়িম করে, যাকাত দেয় এবং রূকু করে। আর যে আল্লাহ তার রসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধু বানায়, তারাই আল্লাহর দলভুক্ত। নিশ্চয় আল্লাহর দল বিজয়ী"। *(সূরা আল মায়িদা ৫:৫৫-৫৬)*

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর যারা তার সাথে আছে তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল"। *(সূরা আল ফাতহ ৪৮:২৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

"মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা দু'ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও"। *(সূরা আল হুজুরাত ৪৯:১০)*

মুমিনগণ পরস্পর দীন ও আক্বীদা সম্পর্কিত ভাই। যদিও তাদের বংশ, দেশ ও যামানার মধ্যে অনেক দূরত্ব বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

যারা অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের সেসব ভাইকে মাফ করে দাও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। *(সূরা আল হাশর ৫৯:১০)*

অতএব মুসলিমগণ সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে শেষ পর্যন্ত পরস্পর ভাই ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। যদিও তাদের জন্মভূমি ও যামানার মধ্যে অনেক দূরত্ব থাকে। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি সর্ব প্রথম ব্যক্তিকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করে। তাদের একজন অন্যজনের জন্য দু'আ করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। মানুষের সাথে বন্ধুত্ব রাখা এবং শত্রুতা পোষণ করার কিছু বাহ্যিক রূপ রয়েছে। এ বাহ্যিক রূপগুলো বন্ধুত্ব রাখা কিংবা শত্রুতা পোষণের প্রমাণ বহন করে।

أولا– مظاهر موالاة الكفار

প্রথম. কাফিরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার কিছু বাহ্যিক রূপ

আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে কাফিরদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক রূপে গ্রহণ করার বাহ্যিক রূপসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে-

(১) পোশাক-পরিচ্ছদ ও কথা-বার্তায় কাফিরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা। কেননা পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা ও অন্যান্য বিষয়ে কাফিরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা তাদেরকে ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুসরণ করবে, সে উক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৭৮]

সুতরাং কাফিরদের বিশেষ স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, তাদের অভ্যাস, ইবাদত, পথ-পদ্ধতি ও আখলাক-চরিত্রের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম। যেমন- দাড়ি কামিয়ে ফেলা, মোচ লম্বা করা, বিনা প্রয়োজনে বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা, বিনা প্রয়োজনে বিদেশী ভাষায় কথা বলা, পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার এবং অন্যান্য বিষয়ে কাফিরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম।

(২) কাফিরদের দেশে বসবাস করা এবং সেখান থেকে মুসলিমদের দেশে দীন নিয়ে হিজরত না করা। কেননা অমুসলিম দেশে দীন নিয়ে বসবাস করা সম্ভব না হলে মুসলিমদের উপর হিজরত করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় কাফিরদের দেশে বসবাস করা তাদেরকে ভালোবাসা ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করা প্রমাণ করে। এ জন্যই হিজরত করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের উপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের মাঝে বসবাস করা হারাম করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১৭৮. হাসান ছ্বহীহ: আবু দাউদ ৪০৩১, অধ্যায়: কিতাবুল্ লিবাস।

{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً إِلاّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً}

"যারা নিজেদের উপর যুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে, আল্লাহর যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না? এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান। তবে যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথও পায় না তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল"। *(সূরা আন-নিসা: ৯৭-৯৯)*

যেসব দুর্বল লোকেরা হিজরত করার সামর্থ রাখে না, তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে কাফিরদের দেশে বসবাস করার অনুমতি দেননি। তবে অমুসলিমদের দেশে যাদের বসবাস করার মধ্যে দীনের কল্যাণ রয়েছে, যেমন আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়া, কাফিরদের দেশে ইসলাম প্রচার করা তাদের জন্য অমুসলিম দেশে বসবাস করার অনুমতি রয়েছে।

(৩) আমোদ-প্রমোদ, বিনোদন ও ভোগ-বিলাসের জন্য কাফিরদের দেশে ভ্রমণ করাও তাদেরকে বন্ধু বানানোর লক্ষণ। বিনা প্রয়োজনে কাফিরদের দেশে ভ্রমণ করা হারাম। তবে চিকিৎসা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কাফিরদের দেশে ভ্রমণ করা বৈধ। এমনি অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা ব্যতীত মানুষের কল্যাণার্থে যেসব বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব নয়, ঐসব বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনার্থেও অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা বৈধ। এসব প্রয়োজনে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা জায়েয। প্রয়োজন শেষ হলেই মুসলিম দেশে ফিরে আসা আবশ্যক। এসব উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা জায়েয হওয়ার শর্ত হলো মুসলিম সেসব দেশে গিয়ে স্বীয় দীনের নিদর্শনাবলী প্রকাশ করবে এবং ইসলামকে নিয়ে গর্ব করবে। সে সঙ্গে শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত থেকে বাঁচার জন্য ক্ষতিকর স্থানগুলো থেকে দূরে থাকবে। এমনি আল্লাহর দীনের দাওয়াত প্রচারের জন্য কাফিরদের দেশে সফর করা বৈধ, এমনকি ওয়াজিব।

(৪) মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের প্রশংসা করা ও তাদের পক্ষপাতিত্ব করাও তাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করা ও বন্ধু বানানোর আলামত। এটি ইসলাম ভঙ্গের ও মুরতাদ হওয়ার অন্যতম কারণ। আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(৫) বিনা প্রয়োজনে অমুসলিমদের সাহায্য নেয়া, তাদেরকে বিশ্বস্ত মনে করা, মুসলিমদের গোপন বিষয়গুলোতে ও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে তাদেরকে নিয়োগ করা, তাদেরকে ঘনিষ্ট ও উপদেষ্টা হিসাবে গ্রহণ করাও তাদেরকে অভিভাবক বানানোর লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨) هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١١٩) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের আপনজন ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে কোনো ত্রুটি করবে না। যা তোমাদের ক্ষতি করে তাই তাই তারা কামনা করে। তাদের মনের হিংসা ও বিদ্বেষ তাদের মুখ থেকে প্রকাশ পেয়ে গেছে এবং যা কিছু তারা নিজেদের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে তা এর চেয়েও মারাত্মক। আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি। যদি তোমরা অনুধাবন করো। তোমরা তাদেরকে ভালোবাসো; কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালোবাসেনা অথচ তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তারা তোমাদের সাথে মিলিত হলে বলে, আমরাও বিশ্বাস করি। কিন্তু তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও আক্রোশ এতো বেশী বেড়ে যায় যে, তারা নিজেদের আঙুল কামড়াতে থাকে। তাদেরকে বলো, নিজেদের ক্রোধ ও আক্রোশে তোমরা নিজেরাই জ্বলে পুড়ে মরো। আল্লাহ মনের গোপন কথাও জানেন। তোমাদের ভালো হলে তাদের খারাপ লাগে এবং তোমাদের উপর কোনো বিপদ এলে তারা খুশি হয়। তোমরা যদি ছ্বর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তা বেষ্টন করে আছেন"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১১৮-১২০)*

উপরোক্ত আয়াতগুলো কাফেরদের অন্তরের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে, মুসলিমদের প্রতি তারা যে হিংসা-বিদ্বেষ গোপন রাখে, তাদের বিরুদ্ধে তারা যে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করে, মুসলিমদের যে ক্ষতি তারা পছন্দ করে এবং যে কোনো উপায়ে তারা মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয়ার যে পরিকল্পনা তারা করে, উপরোক্ত আয়াতগুলো তাও প্রকাশ করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, মুসলিমগণ অমুসলিমদের প্রতি যে আস্থা এবং বিশ্বাস রাখে তারা তাকে কাজে লাগিয়ে মুসলিমদের ক্ষতি করার পরিকল্পনা করে এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করে।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) আবু মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললাম, আমার একজন খ্রিষ্টান সেক্রেটারী রয়েছে।

তিনি বললেন, তোমার কী হলো? আল্লাহ তোমার অকল্যাণ করুন! তুমি কি আল্লাহর এ কথা শোননি? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে সেও তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। অব্যশ্যই আল্লাহ যালিমদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না"। *(সূরা আল মায়িদা ৫:৫১)*

তুমি কেন একজন মুসলিমকে লেখক নিযুক্ত করোনি। আবু মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! সে আমার লেখক হিসাবে কাজ করবে এবং তার দীন সে পালন করবে। তিনি তখন বললেন, আল্লাহ যেখানে তাদেরকে অপদস্ত করেছেন, আমি সেখানে তাদেরকে সম্মানিত করবো না। আল্লাহ যেহেতু তাদেরকে দুর্বল করেছেন, তাই আমি তাদেরকে শক্তিশালী করবো না। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, তাই আমি তাদেরকে কাছে টানতে যাবো না।

ইমাম আহমাদ ও মুসলিম আরো বর্ণনা করেন যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বদরের উদ্দেশ্যে বের হলেন, তখন মুশরিকদের জনৈক লোক তার পিছনে বের হলো। হাররার নিকট সে নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করলো। সে বললো, আমি আপনার সাথে যুদ্ধে শরীক হতে চাই। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান রাখো? সে বললো, না। তিনি বললেন, ফেরত যাও। আমি কোনো মুশরিকের সাহায্য নিবো না।[১৭৯]

উপরোক্ত দলীলগুলোর মাধ্যমে আমাদের নিকট মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ-কর্মে কাফেরদেরকে নিয়োগ করা হারাম হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল। বিশেষ করে ঐসব গুরুত্ব পূর্ণ দায়-দায়িত্বে তাদেরকে নিয়োগ করা হারাম, যার মাধ্যমে তারা মুসলিমদের অবস্থা ও তথ্যসমূহ অবগত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা ও তাদেরকে কষ্ট দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে মুসলিমদের দেশে বিশেষ করে হারামাইনের দেশে কাফেরদেরকে নিয়ে আসা, তাদেরকে শ্রমিক, গাড়িচালক, সেবক ও বাড়িঘরের পরিচর্যাকারী হিসাবে নিযুক্ত করা এবং তাদেরকে পরিবারের সাথে মিশ্রিত করে রাখা অথবা মুসলিমদের সাথে তাদেরকে বসবাস করতে দেয়া অমুসলিমদেরকে অভিভাবক ও বন্ধু বানানোর লক্ষণ।

---

[১৭৯] এ হাদীছটি অপ্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বলা হয়েছে যে, এ হুকুম মানসুখ হয়ে গেছে। কেননা পরবর্তীতে তিনি কতক কাফেরের সহায়তা নিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

(৬) কাফেররা দিন-তারিখ গণনা করার জন্য যে ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে তা ব্যবহার করা তাদেরকে অভিভাবক ও বন্ধু বানানোর অন্যতম লক্ষণ। বিশেষ করে যেসব ক্যালেন্ডারের মধ্যে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ঈদ-উৎসব সনাক্ত করা আছে, তা ব্যবহার করাও তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত। যেমন ইংরেজী ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা। মূলত এটি ঈসা 'আলাইহিস সালামের জন্ম তারিখকে স্মরণ করে রাখার জন্যই তৈরী করা হয়েছে। এটি খ্রিষ্টানরা নিজেদের পক্ষ হতে তৈরী করেছে। ঈসা 'আলাইহিস সালামের জন্ম দিবস পালন করা এবং তাকে স্মরণ করে রাখার জন্য ক্যালেন্ডার বানানো তার দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এ ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা তাদের ধর্মীয় নিদর্শন ও উৎসবকে পুনর্জীবিত করায় অংশগ্রহণ করার শামিল।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খেলাফতকালে ছাহাবীগণ যখন মুসলিমদের জন্য তারিখ নির্ধারণ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন তারা কাফেরদের সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তাদের তারিখ পরিহার করে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের বছর থেকে হিজরী সাল ও তারিখ গণনা শুরু করলেন। এতে প্রমাণ মিলে যে, সাল ও তারিখ গণনার ক্ষেত্রেও কাফেরদের বিরোধিতা করা আবশ্যক। এ ছাড়াও কাফেরদের অন্যান্য খাছ অভ্যাসগুলোর বিরোধিতা করা জরুরী।

(৭) কাফের-মুশরিকদের ঈদ-উৎসবে শরীক হওয়া অথবা তা উদযাপনে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অভিনন্দন জানানো এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়াও তাদেরকে বন্ধু বানানোর লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

﴿ وَالَّذِيْنَ لاَيَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ﴾

"এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না কিংবা মিথ্যা কথা বলে না" (সূরা আল-ফুরকান ২৫:৭২)। এর ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেছেন যে, আল্লাহর বান্দাদের গুণাবলি হলো, তারা কাফেরদের ঈদ-উৎসবে উপস্থিত হয় না।

(৮) কাফেরদেরকে অভিভাবক ও বন্ধু বানানোর আরেকটি লক্ষণ হলো তাদের প্রশংসা করা এবং তাদের তামাদ্দুন, সভ্যতার সুনাম করা এবং তাদের বাতিল আক্বীদা ও ভ্রান্ত দীনের দিকে দৃষ্টি না দিয়েই শুধু তাদের স্বভাব-চরিত্র, অভিজ্ঞতা ইত্যাদিকে পছন্দ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾

"আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনো তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না। তোমার প্রতিপালকের জীবিকাই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী"। (সূরা ত্বহা: ১৩১)

উপরোক্ত কথার অর্থ এ নয় যে, মুসলিমগণ কাফেরদের থেকে বিভিন্ন পেশা শিক্ষা করা, বৈধভাবে অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করা এবং যুদ্ধনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে শক্তিশালী হওয়ার উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করবে না; এ সব বিষয়ে তাদের থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم﴾

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়ার মধ্য থেকে। তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদেরকে"। (সূরা আল-আনফাল: ৬০)

এ উপকারী জিনিসসমূহ এবং সৃষ্টিজগতের গোপন সম্পদগুলো আসলে মুসলিমদের জন্যই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

"বলো, আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যে সব সুশোভন বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? বলো, পার্থিব জীবনে বিশেষ করে ক্বিয়ামতের দিনে এ সমস্ত জিনিস ঈমানদারদের জন্যই"। (সূরা আল-আরাফ: ৩২) আল্লাহ্ তা'আলা সূরা জাসিয়ার ১৩ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"এবং তিনি আসমান ও যমীনের সমস্ত জিনিসকেই তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। সবকিছুই তার পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে"। (সূরা জাসিয়া: ১৩) তিনি আরো বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

"তিনি তোমাদের জন্য ভূপৃষ্টের সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা আল-বাকারা: ২৯)

সুতরাং এসব উপকারী সম্পদগুলো কাজে লাগানোর জন্য মুসলিমদের অগ্রসর হওয়া উচিত। এগুলো অর্জন করার জন্য কাফেরদের দ্বারস্থ হওয়া ঠিক নয়। মুসলিমদেরও শিল্প-কারখানা, কারিগরি ও প্রযুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

(৯) কাফেরদের নামে মুসলিমদের নামকরণ করাও তাদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করার নামান্তর। পিতা-মাতা, দাদা-দাদি ও মুসলিম সমাজের সুপ্রসিদ্ধ নামগুলো বাদ দিয়ে ছেলে-মেয়েদের জন্য বিদেশী নাম চয়ন করা কাফের-মুশরিকদেরকে বন্ধু বানানোর অন্তর্ভুক্ত। নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রাহমান। ইসলামী নাম পরিবর্তন করার কারণেই

বর্তমানে এমন প্রজন্ম দেখা যাচ্ছে, যারা অদ্ভুত ও অপরিচিত নাম রাখে। মুসলিমদের নাম পরিবর্তন করা এমন একটি বিষয়, যা তাদের নতুন প্রজন্মকে পূর্ববতী লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কারণ হতে পারে এবং যেসব পরিবার বিশেষ নামের মাধ্যমে পরিচিত ছিল, তারাও অপরিচিত হয়ে যেতে পারে।

(১০) কাফেরদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা এবং তাদের জন্য রহমত কামনা করাও তাদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এহেন কর্মকে হারাম করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾

"নাবী ও ঈমানদারদের জন্য উচিত নয় যে তারা কোন মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয় হয়। যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী"। (সূরা আত-তাওবা: ১১৩)

কেননা কাফের-মুশরেকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তাদেরকে ভালোবাসা এবং তাদের দীনকে সঠিক বলার লক্ষণ।

ثانيا: مظاهر موالاة المؤمنين

দ্বিতীয়: মুমিনদের বন্ধু বানানোর লক্ষণসমূহ

আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে মুমিনদেরকে বন্ধু বানানোর বেশ কিছু লক্ষণ বর্ণনা করেছে। তার মধ্যে

(১) কাফেরদের দেশ পরিত্যাগ করে মুসলিমদের দেশে হিজরত করা। কাফেরদের দেশ থেকে মুসলিমদের দেশে দীন নিয়ে পলায়ন করাকে হিজরত বলা হয়। এ উদ্দেশ্যে হিজরত ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত হিজরত ওয়াজিব থাকবে। যেসব মুসলিম কাফেরদের মাঝে বসবাস করে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে দায়মুক্ত হয়েছেন। সুতরাং কাফেরদের দেশে মুসলিমদের বসবাস করা হারাম। তবে সেখান থেকে যদি হিজরত করার ক্ষমতা না রাখে কিংবা সেখানে বসবাস করার মধ্যে কোনো দীনি কল্যাণ থাকে, যেমন আল্লাহর দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়া ও ইসলাম প্রচার করা, তাহলে সে কথা ভিন্ন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٧) إِلَّا

الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾

"যারা নিজেদের উপর যুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে, আল্লাহর যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না? এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান। তবে যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথও পায় না তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী পরম ক্ষমাশীল"। (সূরা আন-নিসা: ৯৭-৯৯)

(২) মুসলিমগণ তাদের দীন ও দুনিয়ার যেসব বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতার প্রতি মুখাপেক্ষী হয়, তাদেরকে জান-মাল ও জবান দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, এরা সবাই পরস্পরের বন্ধু। এরা ভালো কাজের হুকুম দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, ছ্বলাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করে"। (সূরা আত-তাওবা: ৭১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজের জানমালের ঝুঁকি নিয়ে জিহাদ করেছে আর যারা হিজরাতকারীদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, আসলে তারাই পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক। আর যারা ঈমান এনেছে ঠিকই, কিন্তু হিজরত করেনি, তারা হিজরত করে না আসা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্ব ও অভিভাবকত্বের কোন সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ দীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের জন্য ফরয। কিন্তু এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন"। (সূরা আল আনফাল: ৭২)

(৩) মুসলিমদের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া এবং তাদের আনন্দে আনন্দিত হওয়া। তিনি আরো বলেন,

«تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»

"পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও ভালোবাসা প্রদর্শনে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি মমিনদেরকে একটি দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের কোনো অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়"।[১৮০] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ»

"এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাচীর সদৃশ। তারা একে অপরকে শক্তিশালী করে। এই বলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলেন"।[১৮১]

(৪) মুসলিমদের কল্যাণ কামনা করা, তাদের ভালো কিছু ভালোবাসা, তাদেরকে ধোঁকা না দেয়া এবং তাদের সাথে কোনো প্রকার প্রতারণার আশ্রয় না নেয়া। নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». (بخارى:١٣)

"তোমাদের কেউ ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা নিজের জন্য পছন্দ করে"।[১৮২]

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»

"এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। সে তার ভাইয়ের উপর যুলুম করতে পারে না, তাকে পরিত্যাগ করতে পারে না এবং তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারে না। তাকওয়া হলো এখানে। এ কথা বলে তিনি তিনবার তার বক্ষদেশের দিকে ইঙ্গিত করলেন। কোনো ব্যক্তি নিকৃষ্ট চরিত্রবান হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অপদস্ত ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে। একজন মুসলিমের জান, মাল ও সম্মানসহ সবকিছুই অন্য মুসলিমের উপর হারাম"।[১৮৩]

---

[১৮০] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৬০১১।

[১৮১] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪৮১।

[১৮২] ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৩।

[১৮৩] ছ্বহীহ বুখারী, হা/ ২৪৪২, ছ্বহীহ মুসলিম ২৫৬৪।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ».

"তোমরা একে অপরের প্রতি ঘৃণা পোষণ করো না। পরস্পর হিংসা করবে না এবং একে অন্যের অসাক্ষাতে নিন্দা করবে না। আর তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে যাও। কোনো মুসলমানের পক্ষে তার মুসলিম ভাইকে তিন দিনের অধিক সময় বর্জন করা বৈধ নয়।[১৮৪]

(৫) মুসলিমদেরকে বন্ধু বানানোর আরেকটি লক্ষণ হলো তারা তাদেরকে সম্মান করবে, তাদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করবে এবং তাদের মানহানি করবে না ও তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۚ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾

"হে ঈমানদারগণ, পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদের বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। আর মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরকে বিদ্রূপ করো না এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর কাউকে ফাসেক নামে ডাকা অত্যন্ত জঘণ্য ব্যাপার। যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই যালেম। হে ঈমানদারগণ, বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো কারণ কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গুনাহ। অন্যের দোষ অন্বেষণ করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? দেখো, তা খেতে তোমাদের ঘৃণা হয়। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ অধিক পরিমাণে তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু"। (সূরা আল হুজুরাত: ১১-১২)

(৬) মুসলিমদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করার আরেকটি লক্ষণ হলো অভাব-অনটন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ এবং বিপদাপদ ও আরাম-আয়েশ সকল অবস্থায় তাদের সাথে থাকবে। তারা মুনাফেকদের বিপরীত। কেননা মুনাফেকরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও আরাম-আয়েশের সময়

[১৮৪] ছ্বহীহ বুখারী, হা/ ৬০৬৫।

মুসলিমদের সাথে থাকে এবং বিপদাপদের সময় কেটে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"যারা তোমাদের (শুভাশুভ পরিণতির) প্রতীক্ষায় থাকে, তাদের অবস্থা হলো আল্লাহর অনুগ্রহে তোমাদের বিজয় হলে তারা বলে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? আর যদি কাফেরদের আংশিক বিজয় হয়, তাহলে তারা কাফেরদেরকে বলে আমরা কি তোমাদের উপর জয়ী ছিলাম না এবং বিশ্বাসীদের থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি? অতএব আল্লাহই ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংশা করবেন"। (সূরা আন নিসা: ১৪১)

(৭) মুসলিমদের সাথে সাক্ষাত করা, ভালোবাসা, বিনিময়ের জন্য পরস্পর মিলিত হওয়া এবং তাদের সাথে একত্রিত হওয়া।

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, «وجبت محبتي للمتزاورين فيّ» "আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর সাক্ষাতকারীদের প্রতি আমার ভালোবাসা আবশ্যক হয়ে গেছে। অন্য হাদীছে এসেছে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ»

"জনৈক লোক তার এক ভাইয়ের সাক্ষাতে অন্য একটি গ্রামের উদ্দেশ্যে বের হলো। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য রাস্তায় একজন ফেরেশতা বসিয়ে রাখলেন। লোকটি যখন ফেরেশতার নিকট আসলো, তখন তিনি বললেন, কোথায় যাও? সে বললো, আমি এ গ্রামে আমার একজন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি। ফেরেশতা বললেন, তার কাছে তোমার এমন কোনো সম্পদ আছে কি, যার খোঁজ-খবর নিতে ও ঠিকঠাক করতে যাচ্ছো? সে বললো, না তবে আমি তাকে আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসি। ফেরেশতা তখন বললো, আমি আল্লাহর পক্ষ হতে দূত হিসাবে এসেছি এ খবর দেয়ার জন্য যে, তুমি যেমন তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসো, সেরকমই আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন"।[১৮৫]

(৮) মুসলিমদের অধিকারসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। কোনো মুসিলম তার মুসলিম ভাইদের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করবে না, তাদের দরদামের উপর দরদাম করবে না এবং তাদের প্রস্তাবের প্রস্তাব করবে না। এমনি যেসব হালাল ও বৈধ

[১৮৫] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৪৬৫৬।

বিষয়ের প্রতি মুসলিমগণ অগ্রগামী হয়েছে তার পথে বাধা সৃষ্টি করবে না। নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (بخارى: ٢١٤٠)

“কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের প্রস্তাব না করে”।[১৮৬] অন্য বর্ণনায় আছে, কেউ যেন তার ভাইয়ের দামাদামির উপর দামাদামি না করে”।

(৯) মুসলিমদের দুর্বলদের প্রতি দয়া করা। যেমন নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا»

“যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না এবং ছোটদের প্রতি রহম করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়”।[১৮৭]

তিনি আরো বলেছেন, «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ» “তোমাদের দুর্বল ও অসহায়দের কারণেই তোমরা রিযিক ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাকো”। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً﴾

“তুমি নিজেকে তাদের সঙ্গে রাখো, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে আহবান করে। তারা তার সন্তুষ্টি চায়। তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। আর তুমি তার অনুসরণ করো না, যারা অন্তরকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি। সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে”। (সূরা কাহাফ: ২৮)

(১০) মুসলিমদেরকে অভিভাবক ও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার অন্যতম লক্ষণ হলো, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং দু‘আ করা। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

“জেনে রেখো, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই। অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার গুনাহর জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য”। (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯)

---

[১৮৬] ছ্বহীহ বুখারী, হা/২১৪০।

[১৮৭] তিরমিযী, হা/১৯২১।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

"তারা বলে, "হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে ক্ষমা করো। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না"। (সূরা আল হাশর ৫৯:১০)

একটি সতর্কতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

"যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং বাড়ীঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয়নি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের পছন্দ করেন"। (সূরা আল মুমুতাহিনা ৬০:৮)

এ আয়াতের অর্থ হলো যেসব কাফের মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয় না, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না এবং মুসলিমদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকে বের করেও দেয় না, মুসলিমগণ তার বিনিময় স্বরূপ তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে এবং দুনিয়াবী বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাদের সাথে ইনসাফ করবে। তবে তারা তাদেরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না"। তিনি এটি বলেননি যে, তাদেরকে বন্ধু বানাতে এবং ভালোবাসতে নিষেধ করেন না। মুসলিমদের কাফের পিতা-মাতার ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ﴾

"তোমার পিতা-মাতা যদি এমন কিছুকে আমার সাথে শরীক করার জন্য চাপ দেয় যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তাহলে তাদের আনুগত্য করো না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করো এবং যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন করো"। (সূরা লুকমান: ১৫)

একদা আসমা বিনতে আবু বকরের কাছে তার মা এসে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার আবেদন করলো। সে ছিল কাফের। তিনি এ ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে বললেন, صلي أمك তোমার মার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে তুমি আল্লাহ্ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তার অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্র দল। জেনে রাখো! আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে"। (সূরা মুজাদালা: ২২)

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও পার্থিব বিষয়াদির বদলা দেয়া এক জিনিস এবং অন্তরের ভালোবাসা অন্য জিনিস। কেননা অমুসলিম আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করা যায়। এটি দাওয়াতের অন্যতম মাধ্যম। তবে এটি অন্তর দিয়ে ভালোবাসা এবং বন্ধু বানানোর সম্পূর্ণ বিপরীত। কাফেরদেরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসলে এবং অভিভাবক বানানো হলে তাদের দীনের স্বীকৃত প্রদান করা হয় এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা বুঝায়। এতে করে ইসলামের প্রতি তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়।

কাফেরদেরকে অন্তরের বন্ধু বানানো হারাম হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তাদের সাথে বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য করা, তাদের কাছ থেকে পণ্যদ্রব্য, তাদের তৈরী করা উপকারী জিনিস-পত্র আমদানি করা এবং তাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা উপকৃত হওয়া ও তাদের অত্যাধুনিক আবিষ্কৃত জিনিসগুলো ব্যবহার করাও হারাম। নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের পথে আব্দুল্লাহ ইবনে আরীকাত লাইছীকে ভাড়া করেছিলেন। যাতে করে সে তাকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়। অথচ সে ছিল তখন কাফের। কতিপয় ইয়াহূদী থেকে তিনি ঋণ নিয়েছেন। বর্তমানেও মুসলিমগণ কাফেরদের নিকট থেকে পণ্যসামগ্রী ও তাদের তৈরী জিনিস আমদানি করে আসছে। মূল্য দিয়ে তাদের কাছ থেকে এগুলো ক্রয় করে আনছে। এতে করে আমাদের উপর তাদের কোনো ফযীলত সাব্যস্ত হয় না। এটি তাদেরকে ভালোবাসা ও অভিভাবক বানানোর কারণও নয়। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক

বানানো আবশ্যক করেছেন এবং কাফেরদেরকে ঘৃণা করা ও তাদেরকে দুশমন মনে করা ওয়াজিব করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٧٢) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজের জানমালের ঝুঁকি নিয়ে জিহাদ করেছে আর যারা হিজরতকারীদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে ঠিকই কিন্তু হিজরত করেনি, তারা হিজরত করে না আসা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্ব ও অভিভাবকত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ দীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের জন্য ফরয। কিন্তু এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন। যারা কুফুরী করেছে তারা পরস্পরের বন্ধু। যদি তোমরা এটা না করো তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা সৃষ্টি হবে ও বড় বিপর্যয় দেখা দেবে"। (সূরা আল আনফাল: ৭২-৭৩)

ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ "যদি তোমরা এটা না করো তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা সৃষ্টি হবে ও বড় বিপর্যয় দেখা দেবে" -এর অর্থ হলো তোমরা যদি মুশরিকদের থেকে দূরে না থাকো এবং মুমিনদেরকে অভিভাবক ও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করো, তাহলে মানুষের মধ্যে বিরাট ফিতনা ও বিপর্যয় দেখা দিবে। তা হলো সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণ এবং কাফেরদের সাথে মুমিনদের মিশে যাওয়া। এতে করে মানুষের মাঝে ভয়াবহ বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়বে। ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা এখানেই শেষ। আমি বলছি, সাম্প্রতিক কালে তাই হয়েছে। আল্লাহ সহায়।

أقسام الناس فيما يجيب في حقهم من الولاء والبراء

মানুষকে ভালোবাসা, বন্ধু বানানো কিংবা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের শ্রেণিবিন্যাস

ولاء (ওয়ালা) এবং براء (বারা) তথা মানুষকে ভালোবাসা, বন্ধু বানানো কিংবা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে তারা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত।

(১) যাদেরকে শুধু ভালোবাসতে হবে: তারা হলেন ঐসব লোক, যাদের সাথে খালেছ ভালোবাসা রাখা আবশ্যক এবং কোনো প্রকার শত্রুতা পোষণ করা যাবে না। তারা হলেন খাঁটি মুমিন। যেমন নাবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ। তাদের সর্বাগ্রে রয়েছেন মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাকে নিজের জীবন, সন্তানাদি, পিতা-মাতা এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি ভালোবাসা আবশ্যক। অতঃপর মুমিনদের জননী তার সম্মানিত স্ত্রীগণ, তার পবিত্র আহলে বাইতগণ, সম্মানিত ছাহাবীগণ, বিশেষ করে খেলাফায়ে রাশেদীনগণ, জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন ছাহাবী, আনসার ও মুহাজিরগণ, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, বাইআতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী অতঃপর অবশিষ্ট ছাহাবীগণ। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন। অতঃপর তাবেঈগণ, সম্মানিত তিন যুগের লোকগণ, এ উম্মতের সালাফগণ এবং ইমামগণ যেমন চার ইমামকে ভালোবাসতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

"যারা অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের সেসব ভাইকে মাফ করে দাও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু"। (সূরা আল হাশর: ১০)

যার অন্তরে ঈমান আছে, সে এই উম্মতের ছাহাবী ও সালাফদেরকে মোটেই ঘৃণা করতে পারে না। বক্র অন্তরের অধিকারী, মুনাফেক ইসলামের শত্রু যেমন রাফেযী, খারেজী ইত্যাদি পথভ্রষ্ট লোকেরাই তাদেরকে ঘৃণা করতে পারে। আমরা আল্লাহর কাছে উপরোক্ত কাজ থেকে মুক্তি চাই।

(২) যাদেরকে শুধু ঘৃণা করতে হবে: সম্পূর্ণরূপে ঘৃণা করতে হবে এবং যাদের সাথে ভালোবাসা ও অভিভাবকত্বহীন শত্রুতা পোষণ করতে হবে, তারা হলো নিরেট কাফের, মুশরিক, মুনাফেক মুরতাদ এবং বিভিন্ন শ্রেণির নাস্তিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾

"যারা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাদেরকে তুমি আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেনা। হোক না এই বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র"। (সূরা মুজাদালা: ২২) আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে দোষারোপ করতে গিয়ে বলেন,

﴿تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾

"তাদের অনেককে তুমি অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। তাদের কৃতকর্ম এতো নিকৃষ্ট, যে কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। আর তারা চিরকাল শাস্তিভোগ করবে। যদি এ লোকেরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ, নাবী এবং নাবীর উপর যা নাযিল হয়েছিল তা মেনে নিতো তাহলে কখনো কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের অনেক লোক আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করেছে"। (সূরা আল মায়িদা: ৮০-৮১)

(৩) যাদেরকে একই সঙ্গে ভালোবাসতে হবে এবং ঘৃণা করতে হবে: তৃতীয় আরেক শ্রেণির মানুষ রয়েছে, যাদেরকে এক দৃষ্টিকোন থেকে ভালোবাসতে হবে এবং অন্যদিক মূল্যায়ন করে ঘৃণা করতে হবে। এ রূপ ব্যক্তির মধ্যে একসঙ্গে ভালোবাসা ও ঘৃণার স্বভাব একত্রিত হয়। এরা হলো পাপাচারী মুমিন। তাদের মধ্যে ঈমানের যে বিশেষণ রয়েছে, তার কারণে তাদেরকে ভালোবাসতে হবে এবং তাদের মধ্যে শিরক ও কুফুরী ব্যতীত অন্যান্য যেসব পাপাচার রয়েছে, তার কারণে তাদেরকে ঘৃণা করতে হবে।

এ শ্রেণির লোকদেরকে ভালোবাসার দাবি হলো তাদেরকে নছীহত করা এবং তাদের অন্যায়গুলোর প্রতিবাদ করা। তাদের পাপাচারগুলোর সামনে চুপ থাকা মোটেই বৈধ নয়; বরং তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হবে, তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেয়া হবে এবং তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হবে। তারা যেন অন্যায় কাজ থেকে ফিরে আসে ও মন্দকাজ থেকে তাওবা করে সে জন্য ইসলামী শরী'আতের দণ্ডবিধি কার্যকর করতে হবে এবং শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। তবে এই শ্রেণির লোকদেরকে সম্পূর্ণরূপে ঘৃণা করা যাবে না এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। যেমন শিরকের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের কাবীরা গুনাহতে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে খারেজীরা বলে থাকে। ঠিক তেমনি তাদের সাথে খালেছ ভালোবাসা পোষণ করে তাদেরকে অভিভাবক ও বন্ধুরূপে গ্রহণও করা যাবে না। যেমন বলে থাকে মুর্জিয়ারা। বরং তাদের ব্যাপারে উপরোক্ত পন্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হবে। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা ঈমানের সবচেয়ে শক্তিশালী রশি। যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসবে, ক্বিয়ামতের দিন সে তার সাথেই থাকবে। যেমনটি হাদীছে উল্লেখ আছে।

বর্তমানে অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং মানুষের অধিকাংশ ভালোবাসা-বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা দুনিয়ার স্বার্থেই হয়ে থাকে। কারো কাছে যদি তাদের দুনিয়ার স্বার্থ থাকে, তাহলে তাকে বন্ধু বানায়। যদিও সে আল্লাহ ও তার রসূল এবং মুসলিমদের দীনের দুশমন হয়। আর যদি কোনো মানুষের কাছে তাদের দুনিয়ার স্বার্থ না থাকে, তাহলে তারা তাকে সামান্য কারণেও দুশমন মনে করে, তাকে কষ্ট দেয় এবং তিরস্কার করে যদিও সে আল্লাহ ও তার রসূলের বন্ধু হয়ে থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন,

«من أَحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ وَوَالَى فِي اللَّهِ وَعَادَى فِي اللَّهِ فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلايَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ وَلن يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلاتُهُ وَصِيَامُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ وَصَارَتْ عامة مُؤَاخَاةُ النَّاسِ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَ ذَلِكَ لا يُجْدِيْ عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا»

“যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ঘৃণা করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করে; তার এ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করা যাবে। আর এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া ব্যতীত কোনো বান্দাই ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না, তার ছ্বলাত -ছ্বিয়ামের পরিমাণ যত বেশীই হোক না কেন। বর্তমানে মানুষের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্থিব স্বার্থ। এ ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের দ্বারা তার কোনো উপকার হবে না।[১৮৮] ইমাম ইবনে জারীর হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছে কুদসীতে বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

«مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ قبض نَفْسِ عبدي الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ولا بد له منه»

“যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। আমার বান্দা যে সব ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল করে থাকে, তার মধ্যে ঐ ইবাদতের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় আর কোন ইবাদত নেই, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার এতটুকু

[১৮৮] ইবনে জারীর এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ সনদে হাদীছটি দুর্বল। দেখুন কুররাতুল উয়ুন, পৃষ্ঠা নং- ২৭৬।

নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, যার কারণে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। আমি যখন তাকে ভালোবাসতে থাকি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে স্পর্শ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে চলা ফেরা করে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা দিয়ে দেই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে আশ্রয় প্রদান করি। আমি আমার মুমিন বান্দার জান বের করতে যতটা দ্বিধা-সংকোচ করি, অন্য কোনো কাজ করতে গিয়ে ততটা দ্বিধা-সংকোচ করি না। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে দীর্ঘ হায়াত দিয়ে অতি বৃদ্ধ করে কষ্ট দেয়াকে অপছন্দ করি।[১৮৯]

যারা ছাহাবীদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং তাদেরকে গালি দেয় তারাই আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড় দুশমন। ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ»

"তোমরা আমার ছাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা আমার ছাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আমার পরে তোমরা তাদেরকে সমালোচনার পাত্রে পরিণত করো না। যে ব্যক্তি আমার ছাহাবীদেরকে ভালোবাসলো, সে আমার ভালোবাসার খাতিরেই তাদেরকে ভালোবাসলো। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে ঘৃণা করলো, সে আমাকে ঘৃণা করার কারণেই তাদেরকে ঘৃণা করলো, যে তাদেরকে কষ্ট দিল, সে আমাকেই কষ্ট দিলো। আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিলো, সে স্বয়ং আল্লাহকেই কষ্ট দিলো। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দিবে, অচিরেই আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।[১৯০]

ছাহাবীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা এবং তাদেরকে গালি দেয়াকে কিছু কিছু সম্প্রদায় দীন ও আক্বীদা হিসাবে গ্রহণ করেছে। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তার ক্রোধ ও কঠিন শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

[১৮৯] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৬৫০২।

[১৯০] যঈফ: ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান হা/৭২৫৬, সিলসিলায়ে যঈফা, হা/২৯০১।

خاتمة في التحذير من البدع

বিদ'আত থেকে সতর্ক করণার্থে একটি পরিশিষ্ট

الفصل الأول: تعريف البدعة أنواعها وأحكامها

প্রথম পরিচ্ছেদ: বিদ'আতের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও আহকাম

الفصل الثاني: ظهور البدع في حياة المسلمين

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মুসলিম সমাজে বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ও তার কারণ

الفصل الثالث: الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মুসলিম সমাজে বিদ'আত প্রকাশের কারণসমূহ

الفصل الرابع: موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: বিদ'আতীদের ব্যাপারে মুসলিম মিল্লাতের আলেমদের অবস্থান

الفصل الخامس: منهج أهل السنة والجماعة في الرد على البدع

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: বিদ'আতীদের প্রতিবাদে আলেমগণের পদ্ধতি

الفصل السادس: بيان نماذج من البدع المعاصرة

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সমকালীন বহুল প্রচলিত কতিপয় বিদ'আতের উদাহরণ

الفصل السابع: ما يعامل به المبتدعة

সপ্তম পরিচ্ছেদ: বিদ'আতীদের সাথে কিরূপ আচরণ করা উচিত?

الفصل الأول: تعريف البدعة أنواعها وأحكامها

প্রথম পরিচ্ছেদ: বিদ'আতের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও আহকাম

বিদ'আতের সংজ্ঞা (تعريف البدعة): বিদ'আত শব্দটি আরবী (البدع) শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ হল পূর্বের কোনো দৃষ্টান্ত ও নমুনা ছাড়াই কোনো কিছু সৃষ্টি করা ও উদ্ভাবন করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

"পূর্বের কোনো নমুনা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা আল বাক্বারা: ১১৭) তিনি আরো বলেন,

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ﴾

"হে নাবী! আপনি বলে দিন, আমি প্রথম রসূল নই"। (সূরা আহ্কাফ: ৯)

অর্থাৎ মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে আমিই প্রথম রিসালাতের দায়িত্ব নিয়ে আসিনি; বরং আমার পূর্বে আরও অনেক রসূল আগমন করেছেন। বলা হয়ে থাকে «ابتدعة فلان بدعة» অমুক ব্যক্তি বিদ'আত তৈরী করেছে। অর্থাৎ এমন পথ আবিষ্কার করেছে, যা পূর্বে ছিল না। ইসলামের পরিভাষায় বিদ'আত বলা হয় দীনের মধ্যে এমন বিষয় তৈরী করাকে, যা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ছিল না বরং পরবর্তীতে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বিদ'আতের প্রকারভেদ (أنواع البدع):

বিদ'আত প্রথমত দু'প্রকার:

(১) পার্থিব বিষয়ে বিদ'আত এবং

(২) দীনের ক্ষেত্রে বিদ'আত।

পার্থিব বিষয়ে বিদ'আতের অপর নাম নতুন আবিষ্কৃত বিষয়। এ প্রকার বিদআত বৈধ। কেননা দুনিয়াবী সকল বিষয়ের ব্যাপারে মূলনীতি হল তা বৈধ। তবে শর্ত হলো তাতে শারঈ কোন নিষেধ না থাকা। দীনের ক্ষেত্রে বিদআত তথা নতুন কিছু উদ্ভাবন করা হারাম। কারণ দীনের ব্যাপারে মূলনীতি হল তা ওহীর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ দীনের সমস্ত বিধান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করতে হবে।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»

যে দীনের মধ্যে নতুন কিছু তৈরী করবে যা তার অর্ন্তভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।[১৯১]

তিনি আরও বলেন,

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

“যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে, যে বিষয়ে আমার অনুমোদন নেই, তা আমলকারীর উপর প্রত্যাখ্যাত হবে”।[১৯২]

দীনের মধ্যে বিদ‘আত দু’প্রকার। (ক) বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিদ‘আত এবং (খ) আমলের ক্ষেত্রে বিদ‘আত।

ক) আক্বীদার ভিতরে বিদ‘আত, যেমন যাহমীয়া, মু‘তাযিলা, রাফেযী এবং অন্যান্য সকল বাতিল ফির্কার আক্বীদাসমূহ।

খ) ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদ‘আত, যেমন আল্লাহ আদেশ দেননি কিংবা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেননি, এমন বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা। এটি আবার কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যেমন

(১) নতুন কোনো ইবাদত আবিষ্কার করা। এমন নতুন ইবাদত আবিষ্কার করা, ইসলামী শরী‘আতে যার কোনো ভিত্তি নেই। যেমন নতুন কোনো ছ্বলাত, ছ্বিয়াম এবং ঈদে মীলাদুন্ নাবী ও অন্যান্য নামে বিভিন্ন ঈদের প্রচলন করা।

(২) শরী‘আত সম্মত ইবাদতের মধ্যে কম-বেশি করা। শরী‘আত সম্মত ইবাদতের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করা অথবা হ্রাস করা। যেমন কোনো ব্যক্তি আসর কিংবা যোহরের ছ্বলাত এক রাকাত বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে আদায় করলো।

(৩) শরী‘আত সম্মত ইবাদত বিদ‘আতী নিয়মে পালন করা। শরী‘আত সম্মত ইবাদত বিদ‘আতী নিয়মে পালন করা। যেমন হাদীছে বর্ণিত যিকিরের বাক্যগুলি দলবদ্ধভাবে সংগীতাকারে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা কিংবা ইবাদত পালনে শরীরকে এমন কষ্ট দেয়া, যা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের বিরোধী।

(৪) শরী‘আত সম্মত ইবাদতকে সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা, যা শরী‘আতে নির্ধারিত নয়। শরী‘আত সম্মত ইবাদতকে এমন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করে আদায় করা, যা শরী‘আত নির্ধারণ করেনি। যেমন অর্ধ শাবানের দিনের বেলা ছ্বিয়াম রাখা এবং রাতে নির্দিষ্ট ছ্বলাত আদায় করা। মূলত ছ্বিয়াম ও ছ্বলাত শরী‘আত সম্মত ইবাদত। কিন্তু এটাকে

[১৯১] ছ্বহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭ ও ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮, সুনানে আবূ দাউদ ৪৬০৬।

[১৯২] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮।

নির্দিষ্ট সময়ের সাথে খাছ করার কোনো দলীল নেই। ছিয়াম নির্দিষ্ট মাস এবং ছ্বলাত নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রতিটি ইবাদত তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে হবে। কিন্তু অর্ধ শাবানের দিনের বেলা ছিয়াম রাখা এবং দিবাগত সারা রাত নফল ছ্বলাত আদায় করা নিশ্চিতভাবে বিদ'আত। কারণ এ সম্পর্কে কোন ছ্বহীহ দলীল নেই।

حكم البدعة في الدين

দীনের মধ্যে বিদ'আতের বিধান

দীনের ব্যাপারে সকল প্রকার বিদ'আতই হারাম ও গোমরাহী। কেননা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

"তোমরা দীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আতের পরিণাম গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা"।[১৯৩] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»

"যে ব্যক্তি আমাদের দীনের মধ্যে এমন নতুন বিষয় তৈরী করবে, যা তার অন্তর্গত নয়, তা প্রত্যাখ্যত হবে"।[১৯৪] তিনি আরও বলেন,

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে, যার মধ্যে আমাদের আদেশ নেই, তা আমলকারীর উপর প্রত্যাখ্যাত হবে"।[১৯৫]

উপরের হাদীছগুলোর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দীনের মধ্যে প্রতিটি নতুন বিষয়ই বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আতই হারাম ও গোমরাহী। তবে এ হারাম বিদ'আতের প্রকারভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিদ'আতের কিছু কিছু প্রকার প্রকাশ্য কুফুরীর নামান্তর। যেমন কবরবাসীদের নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে কবরের চতুর্দিকে কাবা ঘরের তাওয়াফের ন্যায় তাওয়াফ করা, কবরের উদ্দেশ্যে পশু যবাই করা, নযর-মান্নত

[১৯৩] ছ্বহীহ: আবু দাউদ, হা/৪৬০৭।

[১৯৪] ছ্বহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭ ও ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮, সুনানে আবূ দাউদ ৪৬০৬।

[১৯৫] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮।

পেশ করা, কবরবাসীর কাছে দু'আ করা, তাদের কাছে আশ্রয় চাওয়া ইত্যাদি। এমন কিছু বিদ'আতও রয়েছে, যা শিরক না হলেও মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়। যেমন কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করা, কবর উঁচু করা, পাকা করা, কবরের উপর কিছু লেখা, কবরের কাছে ছ্বলাত আদায় করা, দু'আ করা ইত্যাদি। এমন কিছু বিদ'আতও আছে, যা শিরক বা তার মাধ্যমও নয়, তবে সঠিক আক্বীদার পরিপন্থি ও বহির্ভূত। যেমন খারেজী, ক্বাদরীয়া ও মুর্জিয়াদের আক্বীদা সমূহ। তা ছাড়া এমন কিছু বিদ'আত রয়েছে, যা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত যেমন বৈরাগী হয়ে সংসার ত্যাগ করা, সূর্যের উত্তাপে দাঁড়িয়ে ছিয়াম পালন করা এবং যৌন উত্তেজনা দমন করার জন্য খাসী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

একটি সতর্কতা

আমাদের দেশের কিছু কিছু আলেম বিদ'আতকে হাসানা এবং সাইয়্যেআ, এ দুই শ্রেণিতে ভাগ করে থাকে। বিদ'আতকে এভাবে ভাগ করা সম্পূর্ণ ভুল এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছের সম্পূর্ণ বিপরীত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা। আর এই শ্রেণির আলেমগণ বলে থাকে, প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী নয়। বরং এমন কিছু বিদ'আত রয়েছে, যা হাসানা বা উত্তম বিদ'আত।

হাফেয ইবনে রজব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী" এটি খুব সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য হলেও তার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও পরিপূর্ণ। এখানে প্রতিটি বিদ'আতকেই গোমরাহী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদ'আতের কোন প্রকারকেই হাসানা বলেননি। এই হাদীছটি দীনের অন্যতম মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর রসূলের বাণী "যে ব্যক্তি আমাদের দীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করল, যা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। অতএব যে ব্যক্তি কোন নতুন বিধান রচনা করে দীনের মাঝে প্রবেশ করিয়ে দিবে, তা গোমরাহী বলে বিবেচিত হবে। তা থেকে দীন সম্পূর্ণ মুক্ত। চাই সে বিষয়টি বিশ্বাসগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হোক অথবা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য আমলগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হোক। সুতরাং বিদআতে হাসানার পক্ষে মত প্রকাশকারীদের কোন দলীল নেই। কিছু লোক তারাবীর ছ্বলাতের ব্যাপারে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)এর উক্তি, এটি কত উত্তম বিদ'আত! এ কথাটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। তারা আরও বলেন, এমন অনেক বিদ'আত আবিষ্কৃত হয়েছে, যা সালাফে ছ্বলেহীনগণ সমর্থন করেছেন। যেমন গ্রন্থাকারে কুরআন একত্রিত করণ, হাদীছ সংকলন করণ ইত্যাদি।

উপরোক্ত যুক্তির উত্তর এ যে, শরী'আতের ভিতরে এ বিষয়গুলোর মূলভিত্তি রয়েছে। এ গুলো নতুন কোন বিষয় নয়। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কথা, "এটি একটি উত্তম বিদ'আত" এর দ্বারা তিনি বিদ'আতের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। ইসলামের পরিভাষায় যাকে বিদ'আত

বলা হয়, সে অর্থ গ্রহণ করেননি। মৌলিকভাবে ইসলামী শরী'আতে যে বিষয়ের অস্তিত্ব রয়েছে, তাকে বিদ'আত বলা হয়নি। এমন বিষয়কে যদি বিদ'আত বলা হয়, তার অর্থ দাড়ায় জিনিসটি শাব্দিক অর্থে বিদ'আত, পারিভাষিক অর্থে বিদ'আত নয়। সুতরাং শরী'আতের পরিভাষায় এমন বিষয়কে বিদ'আত বলা হয়, যার পক্ষে কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। আর গ্রন্থাকারে কুরআন সংকলনের পক্ষে দলীল রয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের আয়াতসমূহ লেখার আদেশ দিয়েছেন। তবে এই লেখাগুলো এক স্থানে একত্রিত অবস্থায় ছিল না। তা ছিল বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। ছাহাবীগণ তা এক গ্রন্থে একত্রিত করেছেন। যাতে কুরআনের যথাযথ হেফাযত করা সম্ভব হয়।

তারাবীর ছ্বলাতের ব্যাপারে সঠিক কথা হল, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছাহাবীদেরকে নিয়ে জামা'আত বদ্ধভাবে কয়েক রাত পর্যন্ত তারাবীর ছ্বলাত আদায় করেছেন। ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পরবর্তীতে তা ছেড়ে দিয়েছেন। আর ছাহাবীগণের প্রত্যেকেই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত থাকা কালে ও মৃত্যুর পর একাকী এ ছ্বলাত আদায় করেছেন। পরবর্তীতে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সবাইকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করেছেন, যেমনিভাবে তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে তার ইমামতিতে এ ছ্বলাত আদায় করতেন। তাই এটা বিদ'আত নয়।

হাদীছ লিখিতভাবে সংরক্ষণের ব্যাপারেও দলীল রয়েছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতিপয় ছাহাবীর জন্য তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাদীছ লিখে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। বিদায় হজ্জের ভাষণ দেয়ার পর আবু শাহ নামক জনৈক ছাহাবী রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ভাষণটি লিখে দেয়ার আবেদন করলে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «اكتبوا لأبي شاه» অর্থাৎ আবু শাহের জন্য আমার আজকের ভাষণটি লিখে দাও। তবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে সুনির্দিষ্ট কারণে ব্যাপকভাবে হাদীছ লেখা নিষেধ ছিল। যাতে করে কুরআনের সাথে হাদীছ মিশ্রিত না হয়ে যায়। পরবর্তীতে যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন এবং কুরআনের সাথে হাদীছ মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দূরিভুত হলো, তখন মুসলমানগণ হাদীছ সংরক্ষণ করে রাখার জন্য তা লেখা র কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। যারা এ মহান কাজে আঞ্জাম দিয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম বিনিময় দান করুন। কারণ তারা আল্লাহর কিতাব এবং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতকে বিলুপ্তির আশঙ্কা থেকে হেফাজত করেছেন।

الفصل الثاني: ظهور البدع في حياة المسلمين

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মুসলিম সমাজে বিদ'আত প্রকাশিত হওয়া

এতে দু'টি মাসআলা রয়েছে

(১) বিদ'আত প্রকাশের সময়: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের শেষের দিকে মুসলিম জাতির আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিদ'আতের প্রকাশ ঘটেছে। যার সংবাদ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগেই আমাদেরকে প্রদান করেছেন এবং বিদ'আত থেকে মুসলিম জাতিকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন,

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»

"আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা সে সময় আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে তোমরা দীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতের পরিণাম গোমরাহী"।[১৯৬]

বিদ'আতী ফির্কাসমূহের মধ্যে কাদরীয়া, মুর্জিয়া, শিয়া এবং খারেজী সম্প্রদায়ের বিদ'আত সর্বপ্রথম হিজরী দ্বিতীয় শতকে প্রকাশ পায়। এ সময় ছাহাবীদের অনেকেই জীবিত ছিলেন। তারা এ সমস্ত বিদ'আতের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। অতঃপর মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। যার ফলে মুসলমানদের মাঝে অসংখ্য ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়। মুসলিম জাতির বিরাট এক অংশ বিদ'আতী মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অতঃপর সম্মানিত ছাহাবীদের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর ছূফীবাদ নামে আরেক নতুন মতবাদ দেখা দেয়। পর্যায়ক্রমে কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ, কবর পাকা করা ও কবর কেন্দ্রিক অসংখ্য বিদ'আতের প্রকাশ ঘটে। এভাবে সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে বিদ'আতের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং বিভিন্ন আকার ধারণ করতে থাকে।

২) বিদ'আত প্রকাশের অঞ্চল সমূহ:

বিদ'আত প্রকাশের দিক দিয়ে ইসলামী অঞ্চলগুলো কয়েক ভাগে বিভক্ত। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

---

[১৯৬] আবু দাউদ হা/৪৬০৭, অধ্যায়: কিতাবুস্ সুন্নাহ, তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবুল ইল্ম। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি হাসান ছ্বহীহ। মুসনাদে আহমাদ, (৪/১২৬), মাজমূ' ফাতাওয়া (১০/৩৫৪)।

ছাহাবীগণ মোট পাঁচটি শহরে বসবাস করতেন। এ সমস্ত দেশ থেকে ঈমানের আলো বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। শহর পাঁচটি হলো মক্কা, মদীনা, বসরা, কুফা ও শাম (সিরিয়া)। এ সমস্ত দেশ থেকে কুরআন, হাদীছ, ফিক্হ ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিস্তার লাভ করেছে।

পরবর্তীতে মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারা ব্যতীত বাকি স্থানগুলো থেকেই বড় বড় বিদ'আত বের হয়েছে। কুফা নগরী থেকে বের হয়েছে শিয়া ও মুর্জিয়াদের বিদ'আতী কথা ও মতবাদ। অতঃপর তা অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বসরা শহর থেকে কাদরীয়া ও মু'তাযিলাদের বিদ'আতসহ বিভিন্ন ভ্রান্ত ইবাদতের আবির্ভাব হয়ে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

সিরিয়া থেকে বের হয় আহলে বাইত তথা নাবী পরিবারের প্রতি ঘৃণা ও তাঁদের সম্মানে কালীমা লেপনকারীদের বিদ'আতী কথা-বার্তা। জাহ্মীয়াদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে খোরাসানের সীমান্তবর্তী কোন এক অঞ্চলে। আর এটি হল সর্বনিকৃষ্ট বিদ'আত। যে দেশ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনা থেকে যত দূরে অবস্থিত, সেখানকার বিদ'আতও তত ভয়াবহ ও জঘন্য। উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর শাহাদাত বরণের পরপরই বের হয়েছে খারেজী সম্প্রদায় ও তাদের বিদ'আতসমূহ। তবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শহর মদীনা এ সমস্ত বিদ'আত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। যদিও কোন কোন লোক মদীনাতে অবস্থান করেও গোপনে কিছু কিছু বিদ'আতী আক্বীদা পোষণ করতো। কিন্তু তারা অপমানিত অবস্থায় মদীনা বাসীদের সাথে বসবাস করতো। মদীনাতে তাদের সামাজিক কোন প্রভাব ও মূল্য ছিল না। একদল ক্বাদরীয়া মতবাদের লোক মদীনাতে লাঞ্ছিত অবস্থায় বসবাস করতো। অপর দিকে কুফায় শীয়া ও মুর্জিয়া, বসরায় মু'তাযিলা ও বিদ'আতী নিয়মে ইবাদতকারীদের দল এবং সিরিয়ায় নাসীবীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রকাশ্যে বিদ'আতের চর্চা করতো। ছ্বহীহ বুখারীতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, আখিরী যামানায় দাজ্জালের ফিতনা মদীনাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) এর সময়কাল পর্যন্ত মদীনাতে ইলম ও ঈমানের শিক্ষা বর্তমান ছিল। সম্মানিত তিন যুগে মদীনাতে বিদ'আতের নাম-নিশানা ছিল না। দীনের মৌলিক বিশ্বাসে আঘাতকারী কোন বিদ'আতও বের হয়নি। যেমনটি বের হয়েছে অন্যান্য শহর থেকে।

الفصل الثالث: الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মুসলিম সমাজে বিদ'আত প্রকাশের কারণসমূহ

নিঃশর্তভাবে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের অনুসরণই বিদ'আত ও সকল প্রকার গোমরাহী থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

"এটিই আমার সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এই সঠিক পথের অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের দিকে গমন করো না। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর সঠিক পথ হতে বিপথগামী করে দিবে"। *(সূরা আল আন'আম: ১৫৩)*

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীছে (সনদ হাসান: সুনানে দারেমী) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতের অর্থকে অতি সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

«خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ -هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ تَلَا ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

"রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে মাটিতে একটি রেখা টানলেন। সে রেখার উপর হাত রেখে বললেন, এটি হল আল্লাহর পথ। অতঃপর সে রেখার ডানে ও বামে আরো অনেকগুলো রেখা অঙ্কন করে বললেন, এ সবগুলোই পথ। তবে এ সব পথের মাথায় একটি করে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে। সে সর্বদা মানুষকে ঐ পথের দিকে আহবান করছে। এ কথা বলার পর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

"এটিই আমার সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এই সঠিক পথের অনুসরণ করো। অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর সঠিক পথ হতে বিপদগামী করে দিবে"। *(সূরা আল আন'আম: ১৫৩)*

সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাতের পথ থেকে বিমুখ হবে, বিদ'আতী ও ভ্রান্ত পথগুলো তাকে নিজের দিকে টেনে নিবে।

যে সমস্ত কারণে মুসলিম জাতির ভিতরে বিদ'আতের উৎপত্তি হয়েছে, সে কারণগুলো সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলো

১. দীনের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অজ্ঞতা (الجهل بأحكام الدين): সময় যতই অতিবাহিত হয়েছে এবং মানুষ যখনই নবুওয়াতের শিক্ষা থেকে দূরে অবস্থান করেছে, তখনই ইসলাম সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের কমতি দেখা দিয়েছে এবং মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

“আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে। তোমরা দীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ‘আত। আর প্রত্যেক বিদ‘আতের পরিণাম ভ্রষ্টতা।[১৯৭] তিনি আরও বলেন,

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»

“আল্লাহ মানুষের অন্তর থেকে ইলমকে টেনে বের করে নিবেন না। বরং আলেমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নিবেন। শেষ পর্যন্ত যখন কোনো আলেম জীবিত থাকবে না, মানুষেরা তখন মূর্খদেরকে নিজেদের নেতা নির্বাচন করবে। তাদেরকে দীনের কোনো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বিনা ইলমেই তারা ফতোয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হওয়ার সাথে সাথে মানুষদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে”।[১৯৮]

দীনের সঠিক জ্ঞান ও জ্ঞানী লোক ব্যতীত বিদ‘আতের মুকাবেলা করার মত কোনো শক্তি নেই। যখন জ্ঞান ও জ্ঞানীগণ উঠে যাবেন, তখন বিদ‘আত ও বিদ‘আতীদের পক্ষে সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২. প্রবৃত্তির অনুসরণ (اتباع الهوى): এটাই স্বাভাবিক যে, কোন লোক যখন আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে, তখন সে আপন প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

[১৯৭] ছ্বহীহ: আবু দাউদ, হা/ ৪৬০৭, মুসনাদে আহমাদ।

[১৯৮] ছ্বহীহ বুখারী, হা/১০০।

"অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জেনে নিন যে, তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আল্লাহর হেদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তারচেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে? নিশ্চয় আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না"। *(সূরা ক্বছাছ: ৫০)* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

"তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছো? যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবে? অতএব তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না?" *(সূরা আল-জাসিয়া: ২৩)* সুতরাং খেয়াল-খুশির অনুসরণ বিদ'আতের পথকে উন্মুক্ত করে।

৩. আলেম ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ (التعصب للآراء والرجال): আলেম ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ মানুষকে দলীল-প্রমাণের অনুসরণ এবং সত্য জানার আগ্রহ ও তা কবুল করার পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

"যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার অনুসরণ করো, তখন তারা বলে থাকে আমরা বরং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করবো। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না এবং সত্য পথ প্রাপ্তও ছিল না"। *(সূরা আল বাকারা: ১৭০)*

বর্তমান যুগের কতক মাযহাবপন্থি, ছুফী ও কবর পুজারীদের একই অবস্থা। তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ডাকা হলে এবং কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আমলসমূহ বর্জন করতে বলা হলে তারা তাদের মাযহাব, মাশায়েখ এবং বাপ-দাদার দোহাই দেয়।

৪. কাফের-মুশরেকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা (التشبه بالكفار): বিধর্মী কাফের-মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য রাখা নতুন নতুন বিদ'আত সৃষ্টির বিরাট একটি কারণ। আবু ওয়াকেদ আল-লাইছী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছে এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হুনাইন যুদ্ধের জন্য বের হলাম। আমরা ছিলাম নব মুসলিম। আমরা দেখলাম মুশরিকদের জন্য একটি বড়ই গাছ রয়েছে। তারা বরকত লাভের আশায় নিজেদের অস্ত্র ঐ গাছে ঝুলিয়ে রাখে। গাছটির নাম ছিল যাতু আনওয়াত অর্থাৎ বরকতময় বৃক্ষ। আমরা সে গাছটির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাদের যেমন বরকতময় বৃক্ষ রয়েছে, আমাদের জন্যও একটি

বরকতময় বৃক্ষ নির্ধারণ করে দিন। যাতে আমরা যুদ্ধের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখবো এবং বরকত হাসিল করবো।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথা শুনে বললেন, "আল্লাহু আকবার" নিশ্চয়ই এটি একটি পথ। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, তোমরা এমন রীতি-নীতির কথা বললে যেমনটি বলেছিল বনী ইসরাইল সম্প্রদায় আল্লাহর নাবী মূসা (আলাইহিস সালাম) কে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالُوا يَامُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾

"তারা বলেছিল, হে মূসা! তাদের জন্য যেমন মাবূদ রয়েছে, আমাদের জন্যও অনুরূপ একটি মাবূদ নির্ধারণ করে দিন। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, নিশ্চয় তোমরা একটি মূর্খ জাতি"। *(সূরা আল-আরাফ: ১৩৮)*

অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তো দেখছি অবশ্যই অতীত জাতিসমূহের পথের অনুসরণ করবে।[১৯৯]

এই হাদীছের মাধ্যমে সুস্পষ্ট জানা যায় যে, কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য করাই বনী ইসরাঈল ও মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতিপয় সাথীদেরকে তাদের নাবীর কাছে এরকম একটি জঘন্য আবদার করতে উৎসাহিত করেছিল। বনী ইসরাঈলের লোকেরা মূসা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করেছিল, তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য একটি মাবূদ নির্ধারণ করে দেয়া হোক, তারা সে মাবূদের ইবাদত করবে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তা থেকে বরকত হাসিল করবে।

বর্তমানেও একই অবস্থা লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ মুসলিম বিদ'আত ও শিরকী কর্মসমূহে কাফের-মুশরেকদের অনুসরণ করে চলেছে। যেমন ঈদে মীলাদুন্ নাবী, বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে বিশেষ দিন ও সপ্তাহ পালন করা, ধর্মীয় বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান পালন করা, নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিমূর্তি তৈরী করা, স্মৃতিচিহ্ন ও ভাস্কর্য স্থাপন করা, মাতম করা, মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকার বিদ'আতের প্রচলন করা, কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা ইত্যাদি।

[১৯৯] ছ্বহীহ: সুনানে তিরমিযী, হা/২১৮০।

الفصل الرابع: موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ বিদ'আতীদের ব্যাপারে মুসলিম মিল্লাতের আলেমদের অবস্থান

যুগে যুগে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ বিদ'আতীদের বিদ'আতী কার্য-কলাপের সামনে কখনই চুপ থাকেননি। বরং সব সময়ই তারা প্রতিবাদ করেছেন এবং তাদের কর্মকান্ডে বাঁধা দিয়ে এসেছেন। ছাহাবীদের যুগ থেকেই বিদ'আতীদের প্রতিবাদের সূচনা হয়েছে। পাঠক সমীপে এসম্পর্কে কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো:

১. উম্মে দারদা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু দারদা রাগান্বিত অবস্থায় একদা আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি বললাম, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! জামা'আতে ছ্বলাত আদায় করা ব্যতীত মুসলমানদের মধ্যে আমি নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।[২০০]

২. আমর ইবনে ইয়াহইয়া হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার পিতাকে আমার দাদা হতে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা একবার ফজরের ছ্বলাতের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘরের দরজার সামনে বসা ছিলাম। উদ্দেশ্য হলো, তিনি যখন বের হবেন, আমরা তার সাথে পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে যাত্রা করবো। এমন সময় আমাদের কাছে আবু মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আগমন করে বললেন, আবু আব্দুর রাহমান (ইবনে মাসউদের উপনাম) কি বের হয়েছেন? আমরা বললাম, এখনও বের হননি। তিনিও আমাদের সাথে বসে গেলেন। তিনি যখন বের হলেন, আমরা সকলেই তার কাছে গেলাম। আবু মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আবু আব্দুর রাহমান! আমি মসজিদে এখনই একটি নতুন বিষয় দেখে আসলাম। আলহামদুলিল্লাহ, এতে খারাপ কিছু দেখিনি। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন সেটি কী? আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আপনার হায়াত দীর্ঘ হলে আপনিও তা দেখতে পাবেন। আবু মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি দেখলাম, মসজিদে একদল লোক গোলাকারে বসে ছ্বলাতের অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক দলের মাঝখানে একজন লোক রয়েছে। আর সবার হাতে রয়েছে ছোট ছোট পাথর। মাঝখানের লোকটি বলছে, একশত বার আল্লাহু আকবার পাঠ করো। এতে সবাই একশতবার আল্লাহ্ আকবার পাঠ করছে। তারপর বলে, একশতবার আল-হাম্‌দুলিল্লাহ পাঠ করো। এ কথা শুনে সবাই একশতবার আল-হাম্‌দুলিল্লাহ পাঠ করছে। তারপর লোকটি বলে, এবার একশতবার সুবহানাল্লাহ্ পাঠ করো। সবাই একশতবার সুবহানাল্লাহ্ পাঠ করে। এ কথা শুনে ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তুমি তাদেরকে তাদের পাপের কাজগুলো গণনা করে রাখতে বললে না কেন? আর দায়িত্ব নিলে না কেন যে, তাদের নেকীর কাজগুলো থেকে একটি নেকীও নষ্ট হবে না। কাজেই এগুলো হিসাব করে রাখার কোন দরকার নেই।

---

[২০০] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৬৫০

অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) চলতে থাকলেন। আমরাও তার সাথে চললাম এবং একটি হালাকার কাছে এসে উপস্থিত হলাম। তিনি তাদের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, একি করছো তোমরা? তারা সকলেই বলল, পাথরের মাধ্যমে গণনা করে আমরা তাকবীর, তাসবীহ্ ইত্যাদি পাঠ করছি। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তাহলে তোমরা তোমাদের পাপের কাজগুলোর হিসাব করো। কারণ পাপের কাজগুলো হিসাব করে তা থেকে তাওবা করা দরকার। আমি এ ব্যাপারে জিম্মাদার হলাম যে তোমাদের ভালো কাজগুলোর একটিও নষ্ট হবে না। এ কথা বলার কারণ এই যে আল্লাহর কাছে কারও আমল বিনষ্ট হয় না। বরং একটি আমলের বিনিময়ে দশটি ছাওয়াব দেয়া হয় এবং দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়।[২০১]

তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত! অমঙ্গল হোক তোমাদের! কিসে তোমাদেরকে এত তাড়াতাড়ি ধ্বংস করলো? এখনও নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসংখ্য ছাহাবী জীবিত আছেন। এই তো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড়-চোপড় এখনও পুরাতন হয়নি। তার ব্যবহৃত থালা-বাসনগুলো এখনও ভেঙ্গে যায়নি। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমরা যে দীন তৈরী করেছ তা কি মুহাম্মাদের দীন হতে উত্তম? না কি তোমরা গোমরাহীর দ্বার উম্মুক্ত করেছো? তারা বলল, হে আবু আব্দুর রাহমান! আমরা এর মাধ্যমে কল্যাণ ছাড়া অন্য কোনো ইচ্ছা করিনি। তিনি বললেন অনেক কল্যাণকামী আছে, সে তার কল্যাণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

আল্লাহর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, একটি দল কুরআন তেলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন তাদের গলদেশে প্রবেশ করবে না। আল্লাহর শপথ করে বলছি, মনে হয় তাদের অধিকাংশই তোমাদের মধ্য থেকে বের হবে। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে ছেড়ে চলে আসলেন। আমর ইবনু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা তাদের অধিকাংশকেই দেখলাম, নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের সাথে আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে।[২০২]

৩. একজন লোক ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) এর নিকট আগমন করে বলল, আমি কোথা হতে ইহরাম বাঁধব? তিনি বললেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহ্রাম বাঁধার জন্য যে সমস্ত স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেখান থেকে ইহরাম বাঁধো। লোকটি বলল, আমি যদি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্ধারিত স্থান থেকে আরেকটু দূর হতে ইহরাম বাঁধি, তাহলে কি বৈধ হবে না? ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বললেন, আমি এটাকে বৈধ মনে করি না। সে বলল, আপনি এটার মধ্যে অপছন্দের কি দেখলেন? তিনি বললেন, আমি তোমার উপর ফিত্নার আশঙ্কা করছি। সে বলল, ভালো কাজ বেশি করে করার

---

[২০১] অনুবাদক।

[২০২] তিরমিযী, ছ্বহীহাহ হা/২০০৫।

ভিতর ফিত্নার কি আছে? ইমাম মালেক লোকটির এ কথা শুনে বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"অতএব, যারা তার নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, ফিতনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে আক্রমণ করবে"। *(সূরা আন নূর: ৬৩)*

এর চেয়ে বড় মুছীবত আর কি হতে পারে যে, তুমি এমন একটি ফযীলতের মাধ্যমে নিজেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করতে চাচ্ছ, যার মাধ্যমে স্বয়ং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেননি।[২০৩]

---

[২০৩] ইমাম মালেক থেকে আরেকটি প্রসিদ্ধ কথা বর্ণিত: একদা এক বিদ'আতী লোক তার মজলিসে প্রবেশ করে বলল,

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

"দয়াময় আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নত"। (সূরা ত্বহা: ৫) সে বললো আল্লাহ কিভাবে আরশে সমুন্নত হলেন? জবাবে ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) বললেন,

الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان واجب والسوال عنه بدعة

অর্থাৎ ইস্তিওয়া তথা সমুন্নত হওয়া একটি জানা বিষয়, পদ্ধতি অজানা, এর উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত। প্রশ্নকারী এই জবাবে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তাকে ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) এর মজলিস থেকে বের করে দেয়া হল।

বিদ'আতের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে সালাফদের থেকে এমনি আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ কয়েকটি উদাহরণই পাঠক সমাজের জন্য পেশ করা হল। আশা করি এতেই যথেষ্ট হবে।

الفصل الخامس: منهج أهل السنة والجماعة في الرد على البدع

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: বিদ'আতীদের প্রতিবাদে আলেমগণের পদ্ধতি

বিদ'আতীদের প্রতিবাদে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমদের পদ্ধতি হলো তারা এ ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের উপর নির্ভর করে থাকেন। আর এটিই হল সঠিক ও সন্তোষজনক পদ্ধতি। তারা বিদ'আতীদের কথাগুলো প্রথমে বর্ণনা করেন। তারপর একটি একটি করে সেগুলো খণ্ডন করে থাকেন। সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব এবং বিদ'আত থেকে বিরত থাকা জরুরী, এবিষয়ে তারা কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণাদি উপস্থিত করে থাকেন।

বিদ'আতীদের প্রতিবাদে তারা বহু বই-পুস্তক রচনা করেছেন। ইসলামের আক্বীদার উপর লিখিত তাদের কিতাবগুলোতে তারা খারেজী, যাহ্মীয়া, মু'তাযিলা এবং আশায়েরা সম্প্রদায়ের আক্বীদা বিষয়ক বিদ'আতী কথাগুলোর জবাব দিয়েছেন। এব্যাপারে তারা বিশেষ গ্রন্থও রচনা করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) যাহ্মীয়াদের উত্তরে الرد على الجهمية নামক কিতাব লিখেছেন। অন্যান্য ইমামগণও বিভিন্ন ফির্কার লোকদের উত্তরে বিভিন্ন কিতাব রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে উছমান ইবনে সাঈদ দারেমীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া, তার সুযোগ্য ছাত্র ইবনুল কাইয়িম, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব এবং অন্যান্য আলেমগণ উপরোক্ত বাতিল ফির্কার লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করেছেন। তারা কবরপূঁজারী, ছূফীদেরও প্রতিবাদ করেছেন।

বিদ'আতীদের প্রতিবাদে খাছ করে যেসব কিতাব রচিত হয়েছে, তার সংখ্যা অনেক। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলো,

পুরাতন লেখনীগুলোর মধ্যে রয়েছে।

(১) ইমাম শাতেবী রচিত 'আল-ইতিছাম' (الاعتصام)।

(২) ইকতেজাউস্ ছিরাতিল মুসতাকীম (اقتضاء الصراط المستقيم): কিতাবটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) রচিত। কিতাবের বিরাট অংশ জুড়ে তিনি বিদ'আতীদের প্রতিবাদ করেছেন।

(৩) ইনকারুল হাওয়াদেছ ওয়াল বিদাই (إنكار الحوادث والبدع), রচনায় ইবনে ওয়াযযাহ।

(৪) আল হাওয়াদেছ ওয়াল বিদাই (الحوادث والبدع): তারতুসী

(৫) আবু শামা কর্তৃক রচিত 'আল বা-ইছু আলা ইনকারিল বিদ্আহ্ ওয়াল হাওয়াদেছ' (الباعث على إنكار البدع والحوادث)।

(৬) মিনহাজুস্ সুন্নাহ আন্ নাববীয়াহ: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ)। এতে তিনি রাফেযী এবং ক্বাদরীয়া ফির্কার প্রতিবাদ করেছেন।

বর্তমান যুগে বিদ'আতীদের প্রতিবাদে যেসমস্ত কিতাব রচিত হয়েছে:

(১) শাইখ আলী মাহফুয কর্তৃক সংকলিত আল ইবদা'উ ফী মাযার্‌রিল ইবতিদা (الإبداع في مضار الابتداع)।

(২) শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আশ্-শুকাইরী আল-হাওয়ামেদী কর্তৃক রচিত আস্ সুনানু ওয়াল মুবতাদাআহ ওয়াল মুতাআল্লাকাতু বিল আযকার ওয়াস্ সালাওয়াত (السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات)।

(৩) শাইখ ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক রচিত আত্-তাহযীরু মিনাল বিদা (التحذير من البدع)। এ কিতাবটি বাংলাভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! সর্বযুগের আলেমগণই লেখনী, ভাষণ, জুমআর খুৎবা, প্রচার মাধ্যম, পত্রিকা, রেডিও, সেমিনার ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ'আত ও বিদ'আতীদের প্রতিবাদ করে আসছেন। এসব কর্ম তৎপরতা মুসলমানদের সজাগ করণে এবং বিদ'আতের মূলোৎপাটনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখে চলেছে।

الفصل السادس: بيان نماذج من البدع المعاصرة

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সমকালীন বহুল প্রচলিত কতিপয় বিদ'আতের উদাহরণ

সময় অতিক্রম, দীনী ইলমের স্বল্পতা, বিদ'আতের দিকে আহবানকারীর সংখ্যাধিক্য, ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ এবং কাফেরদের আচার-আচরণের সাথে সাদৃশ্য করণ ইত্যাদি কারণে বর্তমানে বিদ'আতের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

«لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»

"তোমরা অবশ্যই পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সুন্নাতের অনুসরণ করবে"।[২০৪]

[২০৪] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৭৩২০, ইবনে মাজাহ, হা/৩৯৯৪।

সমকালীন বিদ'আত সমূহের মধ্যে থেকে নিম্নে আমরা কতিপয় বিদ'আতের আলোচনা করব।

(১) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম উপলক্ষে ঈদে মীলাদুন্ নাবী পালন করা।

(২) কবর, মাযার ও বিভিন্ন স্থান থেকে বরকত লাভ করা।

(৩) ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ইবাদত তৈরী করা।

أولا: الاحتفال بمناسبة المولد النبي في ربيع الأول

১. রবীউল আওয়াল মাসে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিবস উপলক্ষে মীলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন করা

অমুসলিম ইয়াহূদী-নাসারাদের অনুসরণ থেকেই এসেছে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মদিবস উপলক্ষে ঈদে মীলাদুন্ নাবীর অনুষ্ঠান। অজ্ঞ মুসলমানেরা এবং একদল গোমরাহ আলেম প্রতি বছর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম উপলক্ষে রবিউল আওয়াল মাসে এই অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। কেউ কেউ মসজিদে এই অনুষ্ঠান করে থাকে। আবার কেউ ঘরে বা এর জন্য প্রস্তুতকৃত স্থানে এ অনুষ্ঠান করে থাকে। আর এতে অসংখ্য সাধারণ লোক উপস্থিত হয়। খ্রিষ্টানরা যেমন ঈসা 'আলাইহিস সালামের জন্মদিবস উদযাপন করে থাকে, তাদের অন্ধ অনুসরণ করেই মুসলিমগণ এ অনুষ্ঠান শুরু করেছে।

এ অনুষ্ঠানে বিদ'আত ও খ্রিষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য থাকার সাথে সাথে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার শিরক ও পাপাচার। এতে এমন কিছু কবিতা আবৃতি করা হয়, যাতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে এমন বাড়াবাড়ি রয়েছে, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দু'আ করা এবং আশ্রয় প্রার্থনা করা পর্যন্ত নিয়ে যায়। অথচ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

«لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»

" খ্রিষ্টানরা যেমন মারইয়ামের পুত্র ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আমার ব্যাপারে সেরূপ বাড়াবাড়ি করো না। আমি কেবলমাত্র আল্লাহর একজন বান্দা। তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রসূল বলো"।[২০৫]

[২০৫] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৪৪৫।

প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করাকে إطراء বলা হয়। খ্রিষ্টানরা ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর মর্যাদা বাড়াতে বাড়াতে আল্লাহর পুত্র হওয়ার আসনে বসিয়েছিল। আবার কেউ কেউ তাকে স্বয়ং আল্লাহ হিসাবে বিশ্বাস করে তার ইবাদত শুরু করেছে। কেউ বা তাকে তিন আল্লাহর এক আল্লাহ্ হিসাবে নির্ধারণ করে নিয়েছে। কিছু কিছু বিদ'আতী নাবী প্রেমিক বিশ্বাস করে যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন। তা ছাড়া এ সমস্ত মীলাদ মাহফিলে যে সব পাপ কাজের চর্চা করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে দলবদ্ধভাবে গান গাওয়া, ঢোল বাজানো এবং ছূফীদের বানানো বিদ'আতী নিয়মে বিভিন্ন যিকির-আযকার করা। কখনও কখনও নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে এ সমস্ত কাজে অংশ নিয়ে থাকে। যার কারণে অনেক সময় অশালীন কাজকর্ম সংঘটিত হওয়ার সংবাদও শুনা যায়। এমনকি যদি এ সমস্ত অনুষ্ঠান এধরনের অশ্লীল কাজ হতে মুক্ত হয় এবং শুধুমাত্র একত্রিত হয়ে খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ-ফুর্তির মাঝে সীমিত থাকে, তথাপিও তা বৈধ নয়। কারণ এটি নব আবিষ্কৃত অনুষ্ঠান। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দীনের ব্যাপারে প্রতিটি নতুন বিষয়ই বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী। তা ছাড়া এতে অন্যান্য অনুষ্ঠানের মত অশ্লীল কাজ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

আমরা মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদ'আত বলি। যদি প্রশ্ন করা হয়, কেন আপনারা বিদ'আত বলেন? উত্তর হলো, আল্লাহর কিতাব, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সুন্নাত, ছাহাবীদের আমল এবং সম্মানিত তিন যুগের কোনো যুগে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। তাই আমরা এটাকে বিদ'আত বলি। কারণ যে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হবে, কুরআন বা সুন্নায় অবশ্যই তার পক্ষে দলীল থাকতে হবে। আর মীলাদ মাহফিলের পক্ষে এ রকম কোন দলীল নেই বলেই এটি এটি বিদ'আত, যা হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পর তৈরী করা হয়েছে। মিশরের ফাতেমীয় শিয়া শাসকরা এটি সর্বপ্রথম ইসলামের নামে মুসলিমদের মাঝে চালু করেছে। বিখ্যাত আলেমে দীন ইমাম আবু হাফস্ তাজুদ্দীন ফাকেহানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, একদল লোক আমাদের কাছে বারবার প্রশ্ন করছে যে, কিছু সংখ্যক মানুষ মীলাদের নামে রবীউল আওয়াল মাসে যে অনুষ্ঠান করে থাকে, শরী'আতে কি এর কোনো ভিত্তি আছে?

প্রশ্নকারীগণ সুস্পষ্ট উত্তর চেয়েছিল। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে উত্তর দিলাম যে, আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে এর পক্ষে কোনো দলীল পাইনি এবং যে সমস্ত আলেম মুসলিম জাতির জন্য দীনের ব্যাপারে আদর্শ স্বরূপ এবং পূর্ববর্তীদের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী তাদের কারও থেকে এ ধরনের আমলের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এই মীলাদ নামের ইবাদতটি একটি জঘণ্য বিদ'আত, যা দুর্বল ঈমানদার ও পেট পূজারী লোকদের আবিষ্কার মাত্র।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এমনি আরও বিদ'আতের উদাহরণ হল, কিছু সংখ্যক মানুষ হয়ত ঈসা 'আলাইহিস সালামের জন্ম দিবস পালনে খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে কিংবা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি

ভালোবাসা ও সম্মান দেখানোর জন্য তার জন্ম দিবসকে ঈদ হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। অথচ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঠিক জন্ম তারিখ সম্পর্কে আলেমগণ যথেষ্ট মতবিরোধ করেছেন। সালাফগণ এ ধরনের অনুষ্ঠান করেননি। কাজটি যদি ভালো হত, তাহলে অবশ্যই তারা কাজটি করার দিকে আমাদের চেয়ে অনেক অগ্রগামী থাকতেন। তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন। তারা ছিলেন ভালো কাজে আমাদের চেয়ে অনেক আগ্রগামী। তবে তাদের ভালোবাসা ও সম্মান ছিল তার অনুসরণ, আনুগত্য, তার আদেশের বাস্তবায়ন এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তার সুন্নাতকে বাস্তবায়ন করার মধ্যেই। তিনি যে দীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, তার প্রচার ও প্রসারের ভিতরে এবং অন্তর-মন, জবান এবং শক্তি দিয়ে সে পথে জিহাদের মাধ্যমে। এটিই ছিল উম্মতের প্রথম যুগের আনসার ও মুহাজির এবং উত্তমভাবে তাদের অনুসারীদের পথ। শাইখুল ইসলামের কথা এখানেই শেষ।

মীলাদ নামের এ বিদ'আতটির প্রতিবাদে ছোট-বড় অনেক কিতাব রচনা করা হয়েছে। এতে বিদ'আত ও নাসারাদের সাথে সাদৃশ্য থাকার সাথে সাথে অন্যান্য মীলাদ অনুষ্ঠানের দ্বার উম্মুক্ত করার আশঙ্কা রয়েছে। যেমন মাশায়েখ ও নেতাদের মীলাদ পালন করা, যাতে মন্দ কাজের আরো অনেক দরজা খোলার ভয় রয়েছে। বাস্তবেও তাই হয়েছে। বর্তমানে এ মীলাদ মাহফিল শুধু রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিবসের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। এখন নেতা-নেত্রী, পীর-ফকীর, শায়েখ-মাশায়েখ এমনকি সাধারণ মানুষের জন্ম দিবসেও মীলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে।

ثانيا: التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا

২. বিশেষ স্থান, সৎ লোকদের পরিত্যক্ত জিনিস, প্রাচীন নির্দশনাবলী ও জীবিত-মৃত ওলীর কাছ থেকে বরকত হাসিল করা

কোনো বস্তুতে স্থায়ীভাবে কল্যাণ থাকা এবং তা বৃদ্ধি হওয়ার নাম তাবার্‌রুক। কাজেই যে বস্তুতে বরকত নেই এবং যে ব্যক্তি বরকতের ক্ষমতা রাখে না, তা থেকে বরকত লাভের আশা করা বৈধ নয়। বরকতের সঠিক অর্থ অনুযায়ী একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই সমস্ত বরকতের মালিক। তিনিই বরকত নাযিল করেন এবং স্থায়ী করেন। কোনো সৃষ্টির পক্ষে বরকত দান করা অথবা বরকত তৈরী করা সম্ভব নয়। তেমনি কোন মাখলুকের পক্ষে বরকত স্থায়ীভাবে ধরে রাখা বা আটকিয়ে রাখাও সম্ভব নয়। সুতরাং কোনো স্থান, স্মারকচিহ্ন অথবা জীবিত কিংবা মৃত আওলিয়া থেকে বরকত গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেউ যদি এ বিশ্বাস করে যে, কোনো মাখলুক বরকত দিতে সক্ষম, তাহলে এ ধরনের বিশ্বাস শিরক হবে। আর যদি বিশ্বাস করে যে, অমুক স্থান যিয়ারত করলে অথবা স্পর্শ করার

কারণে আল্লাহর পক্ষ হতে বরকত লাভ হবে, তাহলে তা সরাসরি শিরক না হলেও শিরকের পথকে উন্মুক্ত করবে এবং পরবর্তীতে শিরকের দিকে নিয়ে যাবে।[২০৬]

কোনো কোনো লোক শাইখ বা পীরদের শরীর, অযুর পানি এবং পাগড়ীসহ অন্যান্য বস্তু থেকে বরকত নেয়ার পক্ষে ছাহাবীগণ কর্তৃক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উচ্ছিষ্ট বস্তু থেকে বরকত গ্রহণ করাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। তাদের এ দলীল গ্রহণ সঠিক নয়। কারণ ছাহাবীগণ কর্তৃক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীরের লোম, মুখের থুথু এবং শরীরের অন্যান্য অংশ থেকে বরকত গ্রহণ শুধু রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নির্দিষ্ট ছিল। তাও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত থাকাবস্থায়। মৃত্যুর পর নয়।

যদি প্রশ্ন করা হয়, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে খাছ বা নির্দিষ্ট ছিল, এর দলীল কী? উত্তর হলো, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃতুর পর ছাহাবীগণ তার ঘর-বাড়ী, আসবাব পত্র এবং তার কবর থেকে বরকত হাসিল করার চেষ্টা করেননি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত স্থানে ছ্বলাত আদায় করতেন এবং যেখানে তিনি বসতেন, সেসব স্থানেও তারা বরকতের জন্য গমন করতেন না। অথচ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর ছাহাবীদের বরকতের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে আরও বেশী প্রয়োজন ছিল। তা সত্ত্বেও কোনো ছাহাবী রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেখে যাওয়া কোন জিনিস থেকে বরকত লাভ করার চেষ্টা করেননি। কারণ তারা জানতেন যে, বরকত লাভের ধারাবাহিকতা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর শেষ হয়েছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত আবস্থায় তার শরীর থেকে বরকত লাভ করাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে আওলীয়াদের ব্যবহৃত বস্তু থেকে বরকত লাভ করা বৈধ মনে করা আরও কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। কারণ ছাহাবীগণ তাদের মধ্যকার সৎ লোক যেমন আবু বকর, উমার এবং অন্যান্য সম্মানিত ছাহাবাদের কারও নিকট থেকে বরকত লাভ করেননি। জীবিত ছাহাবীদের কাছ থেকেও নয় এবং মৃত ছাহাবীদের কাছ থেকেও নয়। তাদের কেউ ছ্বলাত আদায় কিংবা দু'আ করার জন্য হেরা পাহাড়েও যেতেন না, যেখানে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ওহী নাযিল হতো। তেমনি তারা ছ্বলাত পড়া অথবা দু'আ করার জন্য তুর পাহাড়েও যেতেন না, যেখানে মূসা (আলাইহিস সালাম) এর সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন। যে সমস্ত পাহাড়ের কিছু কিছু স্থানে নাবী ও ওলীদের অবস্থানের কথা প্রমাণিত আছে, সে সমস্ত স্থানে তারা যেতেন বলেও কোন প্রমাণ নেই।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাতে সবসময় যে স্থানে ছ্বলাত আদায় করতেন, ছাহাবীদের কেউ সেখানে গিয়ে তা স্পর্শ করেছেন বা চুম্বন করেছেন বলে

---

[২০৬] তবে হাজরে আসওয়াদের কথা ভিন্ন। কারণ হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা মুস্তাহাব। কারণ এ ব্যাপারে নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দলীল রয়েছে। শুধু তাই নয়, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে কোন সুন্নাত পালনের মাধ্যমে বরকত লাভের আশা করা বৈধ।

প্রমাণিত নয়। এমনি মক্কা বা অন্যান্য কোন স্থানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ। সুতরাং যে সমস্ত স্থানে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মানিত পা দু'টি দিয়ে হেঁটেছেন, যেখানে তিনি ছ্বলাত আদায় করেছেন, উম্মতের জন্য সে সমস্ত স্থান স্পর্শ বা চুম্বন করা যদি বৈধ না হয়, তাহলে অন্য কোন ওলীর ছ্বলাত বা ঘুমানোর স্থানে বরকতের জন্য স্পর্শ করা বা চুম্বন করা কীভাবে বৈধ হতে পারে? মোট কথা মুসলিম উম্মার আলেম সম্প্রদায় এ ব্যাপারে একমত যে, বরকতের জন্য কোন স্থান স্পর্শ বা চুম্বন করা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরী'আতের কোনো অংশ নয়।

ثالثا: البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله

৩. ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদ'আতসমূহ

বর্তমানে ইবাদতের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিদ'আতের আবিষ্কার হয়েছে, তার সংখ্যা অনেক। যার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। অথচ আল্লাহর ইবাদতের জন্য মূলনীতি হলো, التوقيف অর্থাৎ সকল প্রকার ইবাদতের পক্ষে কুরআন বা হাদীছ থেকে দলীল থাকতে হবে। দলীল ছাড়া কোনো ইবাদত শরী'আতভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। যে ইবাদতের পক্ষে কোন দলীল নেই, তা বিদ'আত হিসাবে পরিগণিত হবে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যার পক্ষে আমাদের কোন আদেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে"।[২০৭] বর্তমানে যে সমস্ত বিদ'আতের চর্চা করা হয়, তার কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো:

১. ছ্বলাতের শুরুতে মুখে নিয়্যাত পাঠ করা: পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাতসহ অন্যান্য সকল ছ্বলাতের শুরুতে নাওয়াইতু বলে মুখে নিয়্যাত উচ্চারণ করা বিদ'আত। কারণ এটা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতে নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"বলো, তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দীনের ব্যাপারে শিক্ষা দিতে চাও? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ-যমীনের মধ্যকার সকল বস্তু সম্পর্কে অবগত আছেন। আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত"। *(সূরা হুজরাত: ১৬)* নিয়্যাতের স্থান অন্তর। এটা অন্তরের কাজ, মুখের কাজ নয়।[২০৮]

---

[২০৭] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮।

[২০৮] মুখে নিয়্যাত উচ্চারণের পক্ষে ছ্বহীহ তো দূরের কথা, কোন যঈফ হাদীছও পাওয়া যায় না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ছাহাবায়ে কেরাম, কোন তাবেঈ বা চার ইমামের কোন ইমাম এভাবে নিয়্যাত উচ্চারণ করেননি। এটা কোন এক বুযুর্গ ব্যক্তির তৈরী প্রথা। ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং তা বর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য ফরয। পূর্বেই বলা হয়েছে, নিয়্যাত শব্দের অর্থ

২. ফরয ছ্বলাতের আগে-পরে দলবদ্ধভাবে যিকির করা: প্রত্যেক ফরয ছ্বলাতের পরে হাদীছে বর্ণিত যিকির-আযকারগুলো একাকী পাঠ করা মুস্তাহাব।

৩. বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফাতিহা পাঠ করা: বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উপলক্ষে এবং মৃত ব্যক্তিদের ফাতিহা পাঠ করার জন্য মানুষকে জমায়েত করা বিদ'আত।[২০৯]

৪. মৃতদের জন্য মাতম করা: মৃত ব্যক্তিদের জন্য মাতম করা, তাদের উপকারের জন্য ভোজনের আয়োজন করা এবং এ উদ্দেশ্যে কারীদেরকে ভাড়া করে এনে তাদেরকে দিয়ে কুরআন পড়ানো হয় এই ভেবে যে, এটি শোক প্রকাশের অন্তর্ভুক্ত কিংবা এগুলো মৃত ব্যক্তির উপকারে আসবে, -এসবগুলোই বিদ'আত। এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। এগুলো দীনের উপর চাপিয়ে দেয়া বোঝা স্বরূপ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কোনো দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি।

৫. ধর্মীয় বিভিন্ন উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিরাজে গমন উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা এবং রজব মাসের ২৭ তারিখের রাত্রিতে শবে মিরাজের নামে এ রাত্রি উয্যাপন করা ও এতে বিভিন্ন ইবাদতে মগ্ন হওয়া বিদ'আত। এমনিভাবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিজরত উপলক্ষে হিজরী নববর্ষ পালন করা, এসব উপলক্ষে উৎসব-অনুষ্ঠান করার কোনো ভিত্তি নেই। এসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় করার কোনো দলীল নেই।

৬. রজব মাস ও শবে মিরাজের বিভিন্ন বিদ'আত: রজব মাস ফযীলতপূর্ণ মনে করে এমাসে বিভিন্ন ইবাদত করা বিদ'আত। এ মাসে উমরাহ পালন করা, এটিকে রজবী উমরাহ্ বলা হয়ে থাকে, এমনি এ মাসে বেশী করে নফল ছ্বলাত আদায় করা এবং নফল ছ্বিয়াম রাখা, সবই বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা অন্যান্য মাসের উপর রজব মাসের আলাদা কোনো ফযীলত নেই। এমাসের উমরাহ, ছ্বলাত, ছ্বিয়াম, ইবাদত হিসাবে এতে পশু যবেহ করা এবং অন্য কিছু করারও আলাদা কোনো ফযীলত নেই।[২১০]

ইচ্ছা বা সংকল্প করা। আর তা অন্তরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। মুখের মাধ্যমে নয়। সুতরাং কোন কিছু করার জন্য অন্তরে ইচ্ছা বা সংকল্প করলেই সে কাজের নিয়্যাত হয়ে গেল। তা মুখে বলতে হবে না।

[২০৯] আমাদের সমাজে মৃত ব্যক্তিদের উপকারের জন্য কুলখানি, চল্লিশা, হাফেজ-আলেমদের দাওয়াত দিয়ে কুরআন খতম, সাবীনা খতম পড়িয়ে মৃতের রূহের উপর বখশানো, খতমে ইউনুস, খতমে জালালী, ফাতেহা খানি, ইছালে ছাওয়াব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করা সম্পূর্ণ বিদ'আত। এগুলোর পক্ষে কোন দলীল নেই। এ সমস্ত অনুষ্ঠানে শরীক হয়ে হাদীয়া ও টাকা-পয়সা গ্রহণ বা প্রদান করা সম্পূর্ণ হারাম।

[২১০] আমাদের সমাজে রজব মাসের ২৭ তারীখে ব্যাপকভাবে শবে মিরাজ পালন করা হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবেও এটি পালন করা হয় এবং সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন গণমাধ্যমে এর পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। মূলত শবে মিরাজ নামে যেই রাত্রি উদযাপন করা হয় এবং সে উপলক্ষে যে সমস্ত ইবাদত করা হয় তার সবই বিদ'আত। এ মর্মে শরী'আতে কোনো দলীল নেই। তাছাড়া রজব মাসের ২৭ তারিখে মিরাজ হয়েছিল, এটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিতও নয়।

৭. ছূফীদের বানোয়াট যিকির-আযকারঃ ছূফীদের যত যিকির রয়েছে, তা সবই বানোয়াট ও বিদ'আতী যিকির। কেননা এগুলো সবই হাদীছে বর্ণিত শরী'আত সম্মত যিকিরের পরিপন্থি। এ যিকিরগুলোর শব্দ-বাক্য ও তা পাঠ করার পদ্ধতি সম্পূর্ণ শরী'আত বিরোধী। এ ছাড়া যেসব সময়ে তা পাঠ করা হয় তাও শরী'আত সম্মত নয়।[২১১]

৮. শবে বরাতের বিদ'আতঃ শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে কিয়াম করা (রাতের ছ্বলাত আদায়) এবং পরের দিন ছিয়াম পালন করা বিদ'আত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ রাতের নফল ছ্বলাত এবং দিনের বেলা ছিয়াম রাখার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো ছ্বহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না।[২১২]

---

[২১১] এ ছাড়া দলবদ্ধ হয়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর যিকির, আল্লাহু আল্লাহু বলে যিকির করা, যিকিরে যলী, যিকিরে খফী, যিকিরে রূহী, যিকিরে কলবী ইত্যাদি সবই ইবাদতের নামে নতুন সৃষ্টি তথা বিদ'আত।

[২১২] এ রাতকে আমাদের দেশের পরিভাষায় শবে বরাত বলা হয়ে থাকে। এ রাত সম্পর্কে মানুষের বিদ'আতী ধারণা এবং এ রাতে মানুষ যে সমস্ত বিদ'আতী আমল করে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন। নিম্নে তার কিছু বিবরণ পেশ করা হলো:

শবে বরাতে কুরআন নাযিল হয়েছে বলে ধারণাঃ

শবে বরাত পালনকারীদের বক্তব্য হল, শবে বরাতের রাতেই কুরআন নাযিল হয়েছে। সূরা দুখানের ৩নং আয়াতকে তারা দলীল হিসাবে পেশ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾

"আমি কুরআনুল কারীমকে একটি বরকতপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। এবরকতপূর্ণ রাতই হল শবে বরাতের রাত। কতিপয় আলেম এভাবেই অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন।

তাদের এব্যাখ্যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এখানে বরকতপূর্ণ রাত বলতে লাইলাতুল ক্বদর উদ্দেশ্য। আল্লামা ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অত্র বরকতপূর্ণ রাতই হল লাইলাতুল ক্বদর বা ক্বদরের রাত। যেমন অন্যত্র সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কথা হল, কুরআনের কোন অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা যদি অন্য কোন আয়াতে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়, তাহলে কুরআনের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করতে হবে। আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ সূরা কদরের শুরুতে বলেন,

﴿إِنَّ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾

"আমি কুরআনকে ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি"। (সূরা ক্বদরঃ ১) আর এ কথা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, লাইলাতুল ক্বদর রামাযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে নেই। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা রামাযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে সূরা আল বাকারায় বলেন,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ﴾

"রামাযান মাস এমন একটি মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে"। (সূরা আল বাকারাঃ ১৮৫) সুতরাং শবে বরাতে কুরআন নাযিল হওয়ার কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

শবে বরাতের রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার ধারণাঃ

শবে বরাতসহ অন্যান্য বিদ'আতী ইবাদতের পক্ষের আলেমগণ বলে থাকে, এ রাতের শেষের দিকে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং সকল মানুষকে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দেন। আল্লাহ্ রাব্বুল

আলামীন ক্বলব গোত্রের বকরীগুলোর লোম সংখ্যার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোকের গুনাহ ক্ষমা করে থাকেন।

উপরোক্ত অর্থ বহনকারী হাদীছটি কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সকল বর্ণনাই যঈফ বা দূর্বল। নির্দিষ্টভাবে এ রাতে আল্লাহর দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার এবং সকল বান্দাকে ক্ষমা চাওয়ার প্রতি আহবান জানানোর হাদীছটি সুনানে ইবনে মাজায় জাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছের সনদে ইবনে আবু সাব্‌রাহ্ নামে একজন জাল হাদীছ বর্ণনাকারী রাবী রয়েছে। তা ছাড়া হাদীছটি বুখারী সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত ছ্বহীহ হাদীছের বিরোধী। ছ্বহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি ক্ষমা করে দিব। অমুক আছো কি? অমুক আছো কি? এভাবে প্রতি রাতেই ঘোষণা করতে থাকেন। সুতরাং জাল হাদীছের উপর ভিত্তি করে ছ্বহীহ হাদীছের মর্ম প্রত্যাখ্যান করে শবে বরাতের রাতে আল্লাহ্ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার আক্বীদা পোষণ করা এবং সে রাতে বিশেষ ইবাদত করার কোন বৈধতা নেই।

মৃত ব্যক্তির রূহ দুনিয়াতে আগমনের বিশ্বাসঃ

শবে বরাত পালনের পিছনে যুক্তি হল, এরাতে মানুষের মৃত আত্মীয়দের রূহসমূহ দুনিয়াতে আগমন করে স্ব স্ব আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করে। এটি একটি অবান্তর ধারণা, যা কুরআন-সুন্নার সুস্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ﴾

"ওদের (মৃতদের) পিছনে রয়েছে অন্তরায়, তারা সেখানে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবস্থান করবে"। (সূরা মুমিনূনঃ ১০০)

এরাত্রে মানুষের ভাগ্য লেখা হয় বলে ধারণাঃ

তাদের এধারণাটিও ঠিক নয়। এ কথার পিছনে কুরআন হাদীছের কোন দলীল নেই। ছ্বহীহ হাদীছে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»

"আকাশ-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলুকের তাকদীর লিখে রেখেছেন" মুসলিম ২৬৫৩।

হালুওয়া রুটির রহস্যঃ তাদের বক্তব্য হচ্ছে শবে বরাতের দিন ওহুদ যুদ্ধে নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দন্ত মোবারক শহীদ হয়েছিল। তাই নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শক্ত খাবার খেতে না পারায় নরম খাদ্য হিসাবে হালুওয়া-রুটি খেয়েছিলেন। তাই আমরাও নবীর দাঁত ভাঙ্গার ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করে হালুওয়া-রুটি খেয়ে থাকি। এটি একটি কাল্পনিক কথা। কারণ উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে, শাবান মাসে নয়।

এ রাতে কবর যিয়ারতের পিছনে যুক্তি ও তা খণ্ডনঃ এ রাতে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকী কবরস্থান যিয়ারত করেছেন। তাই আমাদেরকেও এ রাতে কবর যিয়ারত করতে হবে। এ মর্মে সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। হাদীছের সনদে হাজ্জাজ ইবনে আরত্বাত নামক একজন যঈফ রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন।

একশত রাকাত ছ্বলাতের ভিত্তি খণ্ডনঃ এরাতে একশত রাকাত ছ্বলাতের ব্যাপারে যত হাদীছ রয়েছে, তার সবই জাল বা বানোওয়াট। এ ছ্বলাত সম্পর্কে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন হাদীছ

৯. কবরের সাথে সম্পৃক্ত বিদ'আত সমূহ: বর্তমানকালে অনেক মুসলিম সমাজ যেসমস্ত বিদআতে পরিপূর্ণ তার মাঝে কবরের সাথে সম্পৃক্ত বিদ'আত সবচেয়ে ভয়াবহ। কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা, কবর পাকা করা, কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা, কবর থেকে বরকত হাসিলের জন্য এবং মৃত ওলীদের উসীলা দেয়াসহ অন্যান্য উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা, মহিলাদের কবর যিয়ারত করা[২১৩] এসব কিছুই বিদ'আত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারতকারী মহিলা এবং কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণকারী ও কবরে প্রদীপ প্রজ্জলনকারীদের উপর লা'নত করেছেন।

পরিশেষে বলতে চাই যে, বিদ'আত হলো কুফরীর প্রাথমিক পর্যায়। তা দীনের মাঝে এমন বিষয় যা অতিরিক্ত করার নামান্তর, যার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল

প্রমাণিত নেই। একশত রাকাত ছ্বলাত পড়ার বিদ'আতটি ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুজালেমের বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের ইমামগণ অন্যান্য ছ্বলাতের ন্যায় এ ছ্বলাত ও চালু করে দেয়।

শবে বরাতের ছ্বিয়াম: শবে বরাতের ছ্বিয়াম রাখার প্রমাণ স্বরূপ দু'টি হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে। প্রথম হাদীছ: শাবান মাসের মধ্যরাত এলে তোমরা রাতে কিয়াম (ছ্বলাতের জন্য দাঁড়াও) কর এবং দিনে ছিয়াম পালন কর। এ হাদীছের সনদে ইবনে আবু সাব্‌রাহ নামক একজন জাল হাদীছ রচনাকারী রাবী থাকার কারণে হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় হাদীছ: ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একবার রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি সিরারে শাবানের ছ্বিয়াম রেখেছ? লোকটি বললো না। অতপর নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযানের পরে ছ্বিয়াম দু'টি কাযা আদায় করতে বললেন।

অধিকাংশ আলেমদের মতে সিরার অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শাবানের শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত রোযা পালনে অভ্যস্ত ছিল অথবা এটা তার মানতের ছ্বিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ভয়ে সে ছ্বিয়াম রাখা ছেড়ে দিয়েছিল। কারণ শাবান মাসের শেষের দিকে রামাযানের ছ্বিয়ামের সাথে মিশিয়ে রোযা রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাই রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ছ্বিয়াম দু'টি কাযা আদায় করতে বলেছিলেন।

প্রিয় পাঠক মণ্ডলী! শবে বরাতের পিছনে এত আয়োজন, যার জন্য সরকারী ছুটি পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা এর পিছনে ব্যয় করা হয়ে থাকে। অথচ এর কোনো ভিত্তি নেই। মুসলিম জাতির উচিৎ এই বিদ'আত থেকে বিরত থাকা। পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেকেই এ বিদ'আতকে বিদ'আতে হাসানাহ বলে থাকে। আসলে বিদ'আতে হাসানাহ বলতে কিছু নেই। ইসলামের নামে তৈরীকৃত সকল বিদ'আতই মন্দ, হাসানাহ বা ভাল বিদ'আত নামে কোন বিদ'আতের অস্তিত্ব নেই। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ»

"প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা আর সমস্ত ভ্রষ্টতার পরিণাম হল জাহান্নাম" নাসাঈ হা/১৫৭৮, ছ্বহীহ। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, "সমস্ত বিদ'আতই ভ্রষ্টতা যদিও মানুষ তাকে উত্তম বলে থাকে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, শবে বরাতের এ আয়োজন শুধুমাত্র বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ অনারব দেশসমূহেই দেখা যায়। আরব দেশসমূহে এর তৎপরতা নেই বললেই চলে।

[২১৩] তবে বেপর্দা, বিলাপ এবং অন্যান্য ফিতনার আশঙ্কা থেকে মুক্ত হলে কবর অতিক্রম করার সময় মহিলারা কবর যিয়ারত করতে পারবে।

ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদান করেননি। বিদ‘আত যে কোনো কাবীরা গুনাহ থেকে নিকৃষ্ট। শয়তানের কাছে কাবীরা গুনাহের চেয়ে বিদ‘আত অনেক বেশী প্রিয়। কেননা পাপী লোক পাপ করার সময় ভাল করেই জানে যে, সে পাপের কাজে লিপ্ত হচ্ছে। তাই সে তাওবা করার সুযোগ পায়। কিন্তু বিদ‘আতী বিদ‘আতকে দীন মনে করেই পালন করে থাকে। কাজেই সে তাওবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। বিদ‘আত সুন্নাতকে মিটিয়ে ফেলে। বিদ‘আতীদের কাছে সুন্নাত অনুযায়ী আমল করা অপ্রিয় হয়ে যায়। তারা সুন্নাত অনুযায়ী আমলকারীদেরকেও ঘৃণা করে। বিদ‘আত মানুষকে আল্লাহ তা‘আলা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তিকে আবশ্যক করে, অন্তরকে বাঁকা করে দেয় এবং সেটাকে নষ্ট করে ফেলে।

الفصل السابع: ما يعامل به المبتدعة

সপ্তম পরিচ্ছেদ: বিদ‘আতীদের সাথে কিরূপ আচরণ করা উচিত?

বিদ‘আতীকে নছ্বীহত (সদুপদেশ) করা এবং তার বিদ‘আতের প্রতিবাদ করা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বিদ‘আতীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া, তাদের সাথে চলা-ফেরা করা হারাম। কেননা এতে করে তাদের সাথে মেলা-মেশাকারীদের মধ্যে খারাপ আক্বীদা ও আমলগুলোর প্রভাব পড়তে পারে এবং অন্যদের মাঝেও তাদের বিদ‘আত প্রবেশ করতে পারে।

বিদ‘আতীদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে ঠেকানো সম্ভব না হলে বিদ‘আতী এবং তাদের অনিষ্টতা হতে মানুষকে সতর্ক করা আবশ্যক। আর শক্তি প্রয়োগ করার সুযোগ থাকলে মুসলিম সমাজের আলেমদের এবং শাসকদের উচিত শক্তি প্রয়োগ করে বিদ‘আত প্রতিহত করা ও বিদ‘আতীদেরকে শাস্তি দেয়া। কেননা তারা ইসলামের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। জেনে রাখা উচিত যে, কুফরী রাষ্ট্রসমূহ বিদ‘আতীদেরকে তাদের বিদ‘আত প্রচারে উৎসাহ এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকে। তারা এটাকে ইসলাম ধ্বংসের অন্যতম মাধ্যম মনে করে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তার দীনকে বিজয়ী করেন এবং তার শত্রুদেরকে অপমানিত করেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার এবং তার সাথীদের উপর অজস্র শান্তির ধারা বর্ষিত হোক। আমীন

আজ রোববার ৪/৮/১৪৩৮ হিজরী, কিতাবটির অনুবাদ শেষ করতে পেরে আল্লাহর শোকর আদায় করছি। আল-হামদুলিল্লাহ।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ
- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২. আহলুল হাদীছদের আক্বীদা
-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

৩. উসূলুস সুন্নাহ
-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪. শারহুস সুন্নাহ
-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৫. লুম'আতুল ই'তিক্বদ
-ইবনে ক্বুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]

৬. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা
- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৭. কিতাবুল ঈমান
- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৮. কিতাবুত তাওহীদ
- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

৯. আক্বীদাতুত তাওহীদ
-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১০. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)
- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪৫০ টাকা]

১১. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১২. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া
- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫ টাকা]

১৩. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া
-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০০ টাকা]

১৪. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ
- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১৫. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১৬. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৭. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১৮. নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৯. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২০. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২১. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ 'ইছ্বাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২২. খিলাফাত ও বায়'আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২৩. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়'আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২৪. 'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৫. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৬. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৭. এক নজরে ছ্বলাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২৮. যাকাতুল ফিতর

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২৯. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবয়্যিাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩০. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩১. মদীনা মুনাওয়ারা

- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মাদ আল-কাসেম [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩২. মানহাজ-কর্মপদ্ধতি

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৩৩. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩৪. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩৫. ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৩৬. ফায়ছালা ও তাক্বদীরের প্রতি ঈমান

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-হামাদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

৩৭. কিতাবুল ফারায়েয-উত্তরাধিকার আইন

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]